
ব্লু ফ্লাওয়ার
১•২•৩
অভীক দত্ত

ব্লু ফ্লাওয়ার

তিনটি খন্ড একত্রে

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

প্রথম প্রকাশ- অগাস্ট, ২০২০

Blue Flower
By Abhik Dutta

SWIFT BOOX iWRITE

https ://iwrite.app

এ দেশকে যারা প্রতি মুহূর্তে রক্ষা করে চলেছেন, তাদের

সূচিপত্র

পর্ব ১

১।

এটিএম ফাঁকা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাইক থেকে নেমে এটিএমের সামনে গিয়ে বীরেন দেখল ভেতরে একটা ছেলে আছে।

বীরেন ভাবল ঠিক আছে। চাপ নেই। কতক্ষণ আর লাগবে।

মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর তার টনক নড়ল। একটু উঁকি মেরে ভেতরের দিকে তাকিয়ে থেকে দেখল ছেলেটা বার বার বিভিন্ন এটিএম কার্ড ঢোকাচ্ছে আর এটিএম "রঙ পিন" এরর দেখাচ্ছে। ছেলেটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বীরেন এবার ছেলেটাকে দেখা চেষ্টা করল। রোগা পাতলা ছেলে। থ্রি কোয়ার্টার পরা। দাড়ি গোঁফ নেই। বীরেন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে বলল "ওভাবে হয় না"।

ছেলেটা চমকে তার দিকে তাকাল। দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিল বীরেন শক্ত হাতে ছেলেটার হাত ধরল।

ছেলেটা চেষ্টা করছিল হাতটা ছাড়াতে। বীরেন ধরে বলল "মানিব্যাগটা কোথায় পেয়েছিস?"

ছেলেটা ছটফট করতে করতে বলল "ছাইড়া দ্যান"।

বীরেন বুঝল ছেলেটা বাংলাদেশী। এলাকায় আজকাল এদেরই দৌরাত্ম্য। শোলাপট্টিতে আসে ছেলেগুলো, প্রথমে একটা পরিবার আসে। এলাকার মাথাদের টাকা খাইয়ে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড করে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে এক এক করে লোক আনতে থাকে ওদেশ থেকে। একইভাবে এরা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ছেলেগুলো দশটাকার জন্য মানুষ খুন করতে পারে।

বীরেন বলল "কোথায় মেরেছিস মানিব্যাগটা? এটিএমে ক্যামেরা থাকে জানিস?"

ছেলেটা এবার একটা জোরে ঝটকা দিল। মানিব্যাগটা মেঝেতে পড়ে গেল। মেঝের মধ্যে অনেকগুলো কার্ড ছড়িয়ে পড়েছে। বীরেনের হাত ছাড়িয়ে দৌড় মারল ছেলেটা।

বীরেন দৌড়াল না আর। সে কার্ডগুলো মানিব্যাগে ঢুকিয়ে নিজের টাকা তুলল।

মানিব্যাগটা একটু খুঁজতেই একটা কার্ড পাওয়া গেল।

বীরেন দেখল নাম লেখা সায়ক বড়াল, ঠিকানা কলকাতার। মানিব্যাগটা হাতড়ালো বীরেন। তেমন কিছুই পাওয়া গেল না।

কী মনে হতে একটা কার্ড বের করে এটিএমে ঢোকাল। নিজের পিনটাই দিল। দশ হাজার টাকা উইথড্র করল। টাকা বেরিয়ে এল।

চমকাল সে। খানিকটা ঘোরের মধ্যেই ব্যাপারটা করেছিল সে। ভাবতেও পারে নি টাকা চলে আসবে। এটিএমের স্লিপ বেরিয়ে এসেছে। অ্যাকাউন্ট ব্যালান্সের অংকটা

দেখে মাথা ঘুরে গেল। প্রায় পঁচিশ লাখ টাকা আছে অ্যাকাউন্টে।

বীরেন অন্য একটা কার্ড ঢোকাল মেশিনে। আগের পিনটাই দিল। একইভাবে দশহাজারটাকা বেরিয়ে এল। এটিএমের প্রবল এসিতেও ঘাম হচ্ছিল তার। এই কার্ডের ব্যালান্স কোটিরও বেশি। সে টাকাগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এটিএমের ভিতর।

২।

প্রচন্ড ভিড় ট্রেন। ঘাম হচ্ছিল খুব।

বীরেন কোন মতে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। বনগাঁ লোকালে ভিড়ের কোন মা বাপ নেই। অফিস টাইমেও ভিড় থাকে, অফিস টাইম না থাকলেও ভিড় থাকে। এগারোটা চোদ্দর লোকালে ভালই ভিড়। ব্যাগটা ধরে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাগের মধ্যে মানিব্যাগটা।

বাড়ি ফিরে বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল বীরেন। প্রথমে ভেবেছিল থানায় দিয়ে আসবে মানিব্যাগটা। তারপরে মনে হল পুলিশ একগাদা প্রশ্ন করতে পারে।

যদি জিজ্ঞেস করে কুড়ি হাজারটাকা তুলেছে কেন তাহলে কী উত্তর দেবে?

হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল। এটিএমে ক্যামেরা থাকে। যার টাকা সে অভিযোগ

করলে কী হবে? তার তো ছবি উঠে গেছে নিশ্চয়ই। হুলিয়া বেরিয়ে যাবে তার

নামে। ছটফট করছিল বীরেন। মানিব্যাগে কোন ফোন নাম্বার নেই। তবে একটা

ঠিকানা আছে। ঠিক করল যার ব্যাগ তার কাছেই টাকা আর ব্যাগ ফেরত দিয়ে

আসবে। ভাবামাত্রই আর দেরী করে নি সে। বাইকটা স্টেশনের কাছে ভবানীদার গ্যারেজে রেখে চোখ বুজে ট্রেনে উঠে পড়েছে।

বাবা ডেলিপ্যাসেঞ্জার ছিলেন। রিটায়ারমেন্টের পর ঘরে বসে প্রায়ই গল্প করেন বনগাঁ লোকালের। বার তিনেক পকেটমার হয়েছিল বাবার। বীরেনের সেসব গল্প

মগজে গাঁথা হয়ে আছে। একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছিল সে।

ট্রেনের মধ্যে একটা বিতিকিচ্ছিরি ঘেমো গন্ধ। মাঝে মাঝেই গা গুলিয়ে উঠছে।

এর ফাঁকেই বেশ কিছু লোক ব্রিফকেস পেতে জমিয়ে তাস খেলছে। এক যুগল

ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করে কথা বলছে। বেশ কিছু মহিলা এক গাদা বস্তা নিয়ে গেটটা জাম করে জোরে জোরে গল্প করছে। একজন হকার উঠে এক পৃথিবী বকবক শুরু করে দিয়েছে। বীরেন একটু লক্ষ্য করে দেখল হজমিগুলি বিক্রি করতে উঠেছে।

নাকটা চুলকাচ্ছে। বীরেন প্রমাদ গুণল। অ্যালার্জি অ্যাটাক এখন শুরু হলে চিত্তির। ডাস্ট অ্যালার্জি আছে তার। পর পর হাঁচি শুরু হলে থামতেই চায় না। প্রাণপণে অন্য কিছু ভাবতে শুরু করল সে। অ্যালার্জির কথা ভাবলে অ্যালার্জি আসবেই। কিছুতেই আটকানো যাবে না।

ট্রেন বারাসাত দাঁড়িয়েছে। ভেবেছিল বারাসাত থেকে খালি হবে খানিকটা। ব্যাপারটা উলটো হল। ভিড় বাড়ছে। কেউ একজন পা মাড়িয়ে চলে গেল। বীরেন পারছিল না। ট্রেন সবে ছেড়েছিল। ভিড় ঠেলে চলন্ত ট্রেন থেকেই স্টেশনে নেমে পড়ল। স্টেশনে যে ক'জন দাঁড়িয়ে ছিল রে রে করে উঠল। বীরেন কান দিল না। কোন দিকে না তাকিয়ে ওভারব্রিজের দিকে জোর পায়ে হাঁটা দিল।

ওভারব্রিজের সিঁড়িতেই ফোনটা শব্দ করে বেজে উঠল। বীরেন ফোন বের করে দেখল অরিত্রি ফোন করছে। ধরল "বল"।

"কোথায় তুই?" অরিত্রির গলায় উদ্বেগ।

বীরেন বলল "বারাসাতে"।

"বারাসাতে? কী করছিস বারাসাতে?"

বীরেন বলল "কোলকাতা যাচ্ছি। একটা জরুরি কাজে। কেন বলত?"

"তোকে বার বার বলেছিলাম আজ রজত আসবে"।

বীরেন অবাক গলায় বলল "রজত কে?"

অরিত্রি রেগে গেল "গান্ডু নাকি তুই? রজত আমার উড বি। ভুলে গেছিস সব?"

বীরেন বলল "ওহ। আচ্ছা আসবে আমি কী করব?"

অরিত্রি বলল "তোর আমাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল না বাইকে?"

বীরেন বলল "তোর বাড়ির সামনে দিয়ে অটো ছাড়ে তো। চলে যা"।

অরিত্রি রেগে মেগে ফোন কেটে দিল। রাগবারই কথা। আগে থেকেই কথা হয়ে ছিল রজত এলে বীরেন নিয়ে যাবে। এভাবে ভুলে মেরে দেবে বীরেন, অরিত্রি কী করে বুঝবে?

বীরেন বারাসাত স্টেশন থেকে বেরিয়ে চাপাডালি পর্যন্ত একটা রিক্সা নিল।

সায়ক বড়ালের ঠিকানাটা একবার মনে করে নিল সে।

একটা ফাঁকা বাসে উঠে জানলার ধারে গিয়ে বসল। ঠিক করল এয়ারপোর্টের কাছে পৌঁছে বাস থেকে নেমে ট্যাক্সি ধরবে।

৩।

গোপালের মেজাজ ভাল ছিল না। একে প্যাচপ্যাচে গরম। তার ওপর মেসবাড়ির ছেলেগুলো হাজার গন্ডা বাকি রেখে দিয়েছে। সকালে খাতা নিয়ে বসেছিল। হিসেব দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গ্লাস ভর্তি জল নিজের মাথাতেই ঢেলে তার ওপরে গামছা রেখে বসেছিল। মশারির জালে ভাতের ফ্যান গালা হচ্ছে। একটু পরেই মেসবাড়ির ছেলেগুলো খেতে আসবে।

গোপাল যে কড়া কড়া কথাগুলো বলবে, সেগুলোই মাথার মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্র্যাক্টিস করছিল। ঠিক করে নিয়েছে, আজকের পরেও যদি ছেলেগুলো বিল না দেয়, তবে এরপরে ডালের মধ্যে কাস্টর অয়েল মিশিয়ে দেবে। পাড়ার মেনি বেড়ালটাকে মেরে চিলি চিকেনে মিশিয়ে ছেলেগুলোকে খাইয়ে দেবে। ঝুপড়িতে বসে এসবই সাত পাঁচ প্ল্যান আঁটছিল সে এমন সময় একটা ছেলে ঘামতে ঘামতে তার কাছে এসে বলল "দেখুন তো দাদা, এই ৮/২ পশুপতি মল্লিক স্ট্রীটটা কোথায় হবে?"

গোপাল ভাল করে ছেলেটাকে মাপল। এই থোবড়া আগে দেখে নি সে। নতুন এসেছে এলাকায়। সে অন্যমনস্ক গলায় ছেলেটাকে জরিপ চালিয়ে যেতে যেতে বলল "কার বাড়ি বলুন না"।

ছেলেটা বলল "সায়ক বড়াল"।

গোপাল ভ্রু কুঁচকে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল "সে আবার কে? এই পাড়ায় থাকে নাকি?"

ছেলেটা একটা কাগজ দেখে বলল "হ্যাঁ, এই ঠিকানাই তো দেখছি"।

গোপাল চিন্তিত গলায় বলল "ঠিকানাটা কী বললেন যেন?"

ছেলেটা বলল "৮/২ পশুপতি..."

গোপাল বলল "৮/২ তো ওই লাল বাড়িটা ছেড়ে দুটো বাড়ি পরে। কিন্তু সে তো
ভটচাজদের বাড়ি। সায়ক বড়াল বলে তো কেউ থাকে না!"

ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড গোপালের দিকে তাকিয়ে আর একটাও কথা না বাড়িয়ে
উলটো দিকে ঘুরে হাঁটা লাগাল।

গোপাল গজগজ করতে লাগল "কোত্থেকে আসে কে জানে"।

মেসবাড়ির ছেলেগুলো আসছে, গোপালের আবার মাথা গরম হয়ে গেল।

পাঁচটা ছেলে আসে। একটার আবার মুখে ফ্রেঞ্চকাট, চুলে হাইলাইট করা। এটারই সব থেকে বেশি দেনা। গোপাল বিড় বিড় করল "বাপের পোঁদে বাল নেই, ছেলে রেখেছে ফ্রেঞ্চকাট"।

ছেলেগুলো নিজেদের মধ্যে খিক খিক করতে করতে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। গোপাল গম্ভীর গলায় বলল "টোটাল সাত হাজার আটশো টাকা হয়েছে তোমাদের। কবে দেব?"

ফ্রেঞ্চকাট পকেট থেকে পাঁচটা দুহাজার টাকার নোট বের করে একটা ছেলেকে দিয়ে বলল "দিয়ে দে"।

ছেলেটা গোপালের হাতে দশ হাজারটাকা দিল। ফ্রেঞ্চকাট বলল "বাকিটাকাটা তোমার টিপস। পুজোয় জাঙ্গিয়া কিনো"।

বাকি ছেলেগুলো খিক খিক করে হেসে উঠল।

গোপালের মুখটা হাঁ হয়ে গেছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে কিছুতেই হাঁ-টা বন্ধ করার কথা ভাবতেই পারছিল না।

৪।

মিনি ঘুম থেকে উঠেছে দুপুর দেড়টায়। মা মামার বাড়ি গেলে মিনি সাপের পাঁচ পা দেখে। মামীর শরীর খারাপের খবর আসায় মা মামা বাড়ি গেছে। দুদিনের ধাক্কা।

কাকিমাকে মিনি বলেই রেখেছিল জাগাতে এলে খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে। কাকিমা অবশ্য মিনিকে মার মত বেশি বকে ঝকে না। বরং উলটো। টাকা পয়সা, এটা সেটা কাকিমাই তাকে ম্যানেজ করে দেয়।

আজকেও কাকিমা বেশি ঘাটায় নি তাকে। তবে সাড়ে বারোটা বাজতে দেখে আর পারে নি। দরজায় বিশুর মাকে ধাক্কা দিতে বলেছিল।

মিনি উঠে ঘড়ি দেখে একবার জিভ কেটেছে। তারপর উলো ঝুলো চুলে নাইটি

পরেই খানিকক্ষণ খাটে বসে ঢুলতে ঢুলতে কাকিমার ঘরে গিয়ে কাকিমাকে আদুরে

বেড়ালের মত জড়িয়ে ধরেছে।

কাকিমা কপট রাগে বলল "রাজকন্যের ঘুম ভাঙল?"

মিনি বলল "হু"।

কাকিমা বলল "তোর মা ফোন করেছিল দুবার"।

মিনি বলল "কী বললে?"

কাকিমা বলল "কী আর বলব। একবার বললাম স্নানে গেছিস, আরেকবার বললাম পড়ছিস"।

মিনি হিহি করে খানিকক্ষণ হেসে বলল "তোমার অনেকগুলো ফুচকা পাওনা হয়ে গেল"।

কাকিমা বলল "তা তো হলই। আচ্ছা, আমাকে বল তো অত রাত জেগে কী করিস

মোবাইলে? কোনো ছোড়াকে জুটিয়েছিস নাকি?"

মিনি ভুরু নাচিয়ে বলল "হুহ, আমি কাউকে জুটাই না বুঝলে? আমার জন্যই

সবাই পাগল"।

কাকিমা মিনির নাক টিপে বলল "তা তো হবেই। এমন সুন্দরীর জন্য সবাই তো পাগল হবেই। তবে এখন এমন বান্দরী সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? যা গিয়ে মুখ টুখ ধুয়ে নে। স্নানটাও সার। হ্যাঁরে, এই যে তুই আজ কলেজে গেলি না, কেউ কিছু বলবে না?"

মিনি বলল "ধুস, কী যে বল। আমি তো শুধু একদিন ডুব মারলাম। রোজই তো যাই"।

কাকিমা বলল "আমি কিন্তু জানি না, দিদি কিছু বললে তুই বুঝবি"।

মিনি হাই তুলে বলল "দুপুরে কী খাওয়াচ্ছো? খেয়ে দেয়ে আবার ঘুমাব ভাবছি"।

কাকিমা বড় বড় চোখ করে মিনির দিকে তাকিয়ে বলল "মানে? আবার ঘুমাবি?"

মিনি বলল "হ্যাঁ, আজ ঘুম ডে। সারাদিন ঘুমাব। বাবা অফিস থেকে ফিরে আসার আগে ডেকে দিও তাহলেই হবে"।

কাকিমা বলল "আমি জানিনা বাপু, তুই যা শুরু করেছিস, খুব শিগগিরি কুম্ভকর্ণশ্রী পুরস্কার দেবে তোকে পিসি"।

মিনি বলল "দিক না। খুব ভাল হবে। কিন্তু ওখানে গিয়ে ঘুমিয়ে দেখাতে হবে না তো? ধর একটা দারুণ এসি রুম দিল, আর সুন্দর একটা বিছানা। গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, গোটা বাংলার লোক দেখল, পিসি খুশি হয়ে আমাকে একটা এক্সট্রা সাইকেল গিফট করে দিল, সাইকেলে আবার স্পেশাল বালিশ লাগানো থাকবে, সাইকেল চালাতে চালাতেও যেন ঘুমানো যায় সেই সিস্টেম থাকবে"।

কাকিমা হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল "উফ তুই পারিসও বটে। মাথাতেও আসে তোর"।

বিশুর মা এসে কাকিমাকে বলল "দিদি, দোতলায় কর্তাবাবুর খাবারটা দিয়ে আসব?"

কাকিমা হাঁ হয়ে বলল "সেকী গো, তোমাকে তো সেই কখন বললাম, এখনও দিলে না?"

বিশুর মা তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল। কাকিমা উঠল "দেখেছিস তো, একটু বসার জো নেই, দাদার খাবারটা দিতে বললাম, ভুলে মেরে দিয়েছে"।

মিনি বলল "বিশুর মা তো মোবাইল ইউজ করছে। রিমাইন্ডার সেট করে দিও যে এই টাইমে জ্যেঠুকে খাবার দিয়ে আসতে হবে। তাহলেই হল"।

কাকিমা বলল "তাই করতে হবে। জানিস সেদিন দেখি হোয়াটস অ্যাপ করছে কাকে"।

মিনি হাঁ করে বলল "বল কী গো"।

কাকিমা বলল "তা আবার বলছি কী! জিজ্ঞেস করতে বলল বিশুর বউ দেখিয়ে দিয়েছে। বিশুর মা ক্লাস টেন পাস জানিস তো?"

মিনি বলল "হ্যাঁ, ভাল বাড়ির মহিলা দেখলে বোঝা যায়"।

কাকিমা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কলিং বেল বেজে উঠল।

কাকিমা বলল "দেখ তো কে এল, আমি রান্নাঘরের দিকে গেলাম"।

মিনি ব্যাজার মুখে বলল "বিশুর মাকে বল না দেখতে"।

কাকিমা বলল "যা না মা, ওদিকে না গেলে আবার দাদাকে কী দিতে কী দিয়ে দেবে, আবার রাগারাগি শুরু হয়ে যাবে। দেখ দেখ, আমার মনে হয় লন্ড্রিওয়ালাটা হবে। কাপড়গুলো বুঝে নিস"।

মিনি বিরক্ত মুখে হাই তুলতে তুলতে উঠে বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলল। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ঘেমেছে ছেলেটা। সে ভাবল সেলসম্যান হবে। মুখে বিরক্তির ভাবটা বজায় রেখে বলল "আমাদের কিছু লাগবে না। আপনি আসুন"।

ছেলেটা একটা ক্যাবলা হাসি হেসে বলল "আমি কিছু বিক্রি করতে আসি নি, একটা জিনিস জানতে এসেছি। সায়ক বড়াল নামে কি কেউ এই বাড়িতে থাকেন?"

মিনি বলল "নাহ, এই নামে কেউ এই বাড়িতে থাকে না"।

ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে মেঝেতেই বসে পড়ল। চোখে কেমন একটা শূন্য দৃষ্টি।

মিনি অবাক হয়ে বলল "একী! আপনি এখানেই বসে পড়লেন যে!"

ছেলেটা ভাঙা গলায় বলল "আমি অনেক দূর থেকে আসছি। একটা বিরাট সমস্যায় পড়ে গেছি। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না"।

ছেলেটার অবস্থা দেখে মিনির করুণা হচ্ছিল। আবার ভয়ও হচ্ছিল, আজকাল অনেক খবর শোনা যায় লোকের বাড়িতে ফ্রডেরা ঢুকে খুন টুন করে চলে যায়। সে বলল "আপনি একটু বাইরের বসার জায়গাটায় বসুন আমি কাকিমাকে ডেকে দিচ্ছি"।

ছেলেটা ধীরে ধীরে উঠে দরজার বাইরের বসার জায়গাটায় গিয়ে বসল।

মিনি দরজা বন্ধ করে রান্না ঘরে গেল। কাকিমা জ্যেঠুর ভাত বেড়ে দিচ্ছিল থালায়। তাকে দেখে বলল "দিল কাপড়?"

মিনি বলল "লন্ড্রি না কাকিমা। একটা ছেলে"।

কাকিমা অবাক গলায় বলল "ছেলে মানে? কী চায়?"

মিনি বলল "কে জানে। একটু দেখো না"।

কাকিমা বলল "ঘরে বসিয়েছিস নাকি?"

মিনি বলল "না না বাইরের বেঞ্চে বসেছে। বলছে অনেক দূর থেকে এসছে। কী একজনের নাম বলে বলছে এই নামে কি এই বাড়িতে কেউ থাকে? না বলায় কেমন থতমত খেয়ে গেল। একবার দেখো না প্লিজ"।

কাকিমা বিরক্ত গলায় বলল "উফ, পাগল হয়ে যাব। ঘরের চাপ, বাইরের চাপ, কোন দিকে যে যাব। এক কাজ কর, এই থালায় বেগুন ভাজা আর কুমড়োর তরকারিটা দিয়ে বিশুর মাকে বল জ্যেঠুকে দিয়ে আসতে।

আমি দেখছি কে এল”।

মিনি বলল “তাই হোক। তুমি দেখে এসো কী ব্যাপার”।

কাকিমা তার হাতে থালাটা দিয়ে ঘর থেকে বেরোল।

৫।

জ্যোতির্ময় টিভি দেখছিলেন।

স্নান করার পর থেকেই খিদে পেয়ে যায়। বিশুর মা যথারীতি ভুলে গেছে।

খানিকটা বিরক্ত বোধ করছিলেন জ্যোতির্ময়। এই জন্যই বোধহয় বউয়ের দরকার। ভাইবউরা যত ভালই হোক, খিদের সময় ভাত দিতে দেরী হবেই। নিজের বউ থাকলে সে সমস্যাটা থাকে না। কোই, মেজো সোমেন কিংবা ছোট তাপসের বেলায় তো খাবার দিতে দেরী হয় না! অথচ সংসারে তার কন্ট্রিবিউশন কোন অংশে কম? বরং বেশিই বলা চলে।

দোতলার টেবিলে গ্লাসে জল ভরে রেখে দুগ্লাস জল খেয়ে জ্যোতির্ময় টিভির দিকে নজর রাখছিলেন। টিসিএস উঠছে, লাখ খানেক টাকার টিসিএসের শেয়ার কিনেছিলেন ছ সাত মাস আগে। শেয়ারের দাম বেশ খানিকটা বেড়েছে। কিছু নতুন শেয়ার কিনবেন বলে ঠিক করছিলেন মনে মনে।

দরজায় নক হল। জ্যোতির্ময় বুঝলেন বিশুর মা এসেছে। সামান্য গলা তুলে বললেন “দরজা খোলাই আছে”।

বিশুর মা দরজা ঠেলে ঢুকল।

টেবিলে খাবার রেখে চলে গেল।

জ্যোতির্ময়ের নিক্তিতে মাপা ভাত। একটা ছোট বাটিতে যতটা ভাত ওঠে ঠিক ততটাই ভাত খান তিনি। ভাতে হাত রেখে কয়েক সেকেন্ড ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে খাওয়া শুরু করলেন জ্যোতির্ময়।

খেতে বেশিক্ষণ লাগে না। খেয়ে দেয়ে পোশাক পরে বাইরে বেরোন তিনটে নাগাদ। কিছু কাজ থাকে, সেগুলো মিটিয়ে বিকেলের মধ্যে ঘরে ঢুকে যান। কোন কোন দিন এগারোটা বারোটায় বেরোন। সারাদিন পরে রাতে বাড়িতে ঢোকেন। মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করতেন পারেন না ঠিক ভাবে। অনেকবারই ভেতরে ভেতরে ঠিক করে নেন, খাওয়া দেবার সময়ের ব্যাপারে ভাইদের কাছে বিশুর মার কমপ্লেইন করবেন, শেষ মেশ করতে পারেন নি। নির্বিবাদ, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ হিসেবেই এলাকায় পরিচিত তিনি। ভাইয়েরাও বেশ সম্মান করেন।

জ্যোতির্ময়ের ভাত খাওয়া হয়ে গেছিল। টিভির দিকে তাকিয়ে শেয়ার মার্কেট ব্রেকিং নিউজ দেখছিলেন এমন সময় মিনি এসে পড়ল তার ঘরে। ফিসফিসিয়ে বলল “ও জ্যেঠুমণি। একটা কান্ড হয়েছে জানো?”

জ্যোতির্ময় ভ্রু কুচকালেন, “কী কান্ড?”

মিনি বলল “একটা ছেলে সেই ঠাকুরনগর থেকে এসেছে, বলে এইটা কি সায়ক বড়ালের বাড়ি! বোঝ! এতদিন জানতাম মিসড কল শুধু ফোনেই হয়। এ তো দেখছি ঠিকানার ক্ষেত্রেও হয়?”

জ্যোতির্ময়ের একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। ক’দিন ধরে এই স্বভাবটা হয়েছে। দুপুরে ঘন্টাখানেক ঘুম। না চাইলেও ঘুম চলে আসে। মিনির কথা শুনে জ্যোতির্ময় বললেন “তা ছেলেটাকে জল খাবার দিয়েছিস? অত দূর থেকে এসেছে”!

মিনি বলল “তুমি ক্ষেপেছ? জানি না, চিনি না, একটা লোককে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দেব? নিচে আমি কাকি আর বিশুর মা বাদে তো কেউ থাকে না। যদি কিছু করে দেয়?”

জ্যোতির্ময় রেগে গেলেন “এই রোদের দুপুরে একটা লোক তেতেপুড়ে এসেছে, আর তোরা এসব ভাবছিস। ছি ছি ছি, ভটচাজবাড়ির ঐতিহ্য নষ্ট করে দিলি একেবারে তোরা। যা, ছেলেটাকে এখানে পাঠিয়ে দে”।

মিনি অবাক গলায় বলল “একবারে দোতলায়? তোমার মাথা ঠিক আছে তো জ্যেঠু”?

জ্যোতির্ময় বললেন “সব ঠিক আছে। যা। দেখ গিয়ে চলে গেল কিনা”!

মিনি তড়িঘড়ি নিচে নামল। কাকিমা ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে চলেছে। মিনি গিয়ে বলল “ওনাকে জ্যেঠু পাঠাতে বলল”।

কাকিমা বলল “তাই? দাদা পাঠাতে বলেছেন! ঠিক আছে, ওকে সিড়িটা দেখিয়ে দে তো মিনি”।

বীরেন দোতলায় উঠল। জ্যোতির্ময়বাবু মন দিয়ে টিভি দেখছিলেন।

তাকে দেখে বললেন “আপনি নাকি কোন একটা সমস্যায় পড়েছেন? জানতে পারি কী হয়েছে?”

মিনি দরজায় দাঁড়িয়েছিল। বীরেন সেদিকটায় একবার তাকিয়ে বলল “এই বাড়িতে সায়ক বড়াল বলে কেউ থাকেন না?”

জ্যোতির্ময়বাবু টিভির থেকে মুখ না সরিয়েই বললেন “কস্মিনকালেও নয়”।

মিনি দরজায় দাঁড়িয়েছিল। জ্যোতির্ময়বাবু ধমকালেন “যা গিয়ে ওর জন্য এক গ্লাস জল আর পারলে কিছু টিফিন নিয়ে আয়। সেই সকালে বেরিয়ে এখন পৌঁছেছে। খিদে পাবে তো!”

ছেলেটা মাথা নাড়ল “আমি খেয়ে নেব ঠিক।”

জ্যোতির্ময়বাবু বললেন “এরকম বললে হয় নাকি? ভটচাজবাড়িতে কেউ দুপুরে এসেছে আর সে খালিপেটে থেকেছে, এসব আমাদের বাড়িতে হয় না”।

বীরেন আর কিছু বলল না। মিনি নিচে নামল।

জ্যোতির্ময়বাবু শান্ত গলায় বললেন “মানিব্যাগ আর টাকাটা ঐ টিভি স্ট্যান্ডের তলার ড্রয়ারে রেখে দিয়ে যেভাবে বসেছিলে সেভাবেই বস যেন মিনি কিছু বুঝতে না পারে”।

বীরেন চমকে জ্যোতির্ময়বাবুর দিকে তাকাল।

জ্যোতির্ময় বললেন “লাস্ট মান্থে ডিফেন্সের এক্সামে হান্ড্রেড আর ফোর হান্ড্রেড মিটারে ফার্স্ট হয়েছিলে, সবক’টা পরীক্ষাতেই এক্সপেক্টেড মার্কস পেয়েছিলে। তবু মেডিকেলে কেটে গেলে? কেন? কত টাকা চেয়েছিল ওরা তোমার কাছে?”

৬।

“কেক আছে না কাকিমা?” নিচে নামতে নামতে প্রশ্ন করল মিনি।

কাকিমা ভাত বাড়ছিল। তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল “এখন কেক খাবি নাকি?”

মিনি হেসে ফেলল “ধুস, আমি কেন? জ্যেঠু বলল ছেলেটা দুপুরবেলা এসেছে কিছু টিফিন দিতে তাই জিজ্ঞেস করলাম। বলে ভটচাজ বাড়িতে দুপুরে এসে কেউ খালিপেটে যায় না”। মিনি জ্যেঠুর গলা নকল করল শেষটায়।

কাকিমা চিন্তিত মুখে বলল “ওহ, তা এই দুপুরে তো ওই ভাত খাইয়ে দিলেই ভাল হত। এখন আবার ওসব কেকের জ্বালাতন করার কী দরকার?”

মিনি বলল “সেটাও কেমন কেমন ঠেকে না? চিনি না জানি না, এক থালা ভাত নিয়ে গিয়ে বলবে ভাত খেয়ে নাও?”

কাকিমা বলল “তাও তো ঠিক, এই কথাটা আমার মাথায় আসে নি। তাহলে আমি একবার বরং জিজ্ঞেস করে আসি”।

কাকিমা দোতলায় যাচ্ছিল মিনি কাকিমার হাত ধরে টেনে বলল “দাঁড়াও, কোথাও যেতে হবে না, আমি জ্যেঠুকে ফোন করে নিচ্ছি”।

কাকিমা বিরক্ত মুখে বলল “নিচের ঘর থেকে ফোন করবি কেন? আমি দেখছি বললাম তো”।

মিনি বলল “ধুস, এখন সব ফ্রি ফোন। দাঁড়াও তো”।

মিনি জ্যেঠুকে ফোন করল, একবার ডায়াল হতেই জ্যোতির্ময় ধরলেন "কী হল আবার?"

মিনি ফিসফিস করে বলল "জ্যেঠু, কাকিমা বলছে দুপুরবেলা কেক টেকের থেকে ভাত খাইয়ে দিলে ভাল হত না?"

জ্যোতির্ময় থমকে বললেন "তাই কর, আমি ওকে নিচে যেতে বলছি, ভাত বেড়ে ফোন করে দিস"।

ফোন রেখে মিনি বলল "ওই দেখো, কাজ হয়ে গেল। ভাত বেড়ে ফেল"।

কাকিমা বিশুর মার দিকে তাকালেন "ভাত বাড়ো, আমি একটা ডিম ভেজে ফেলি, বাইরের লোককে তো তোমার ওই বিখ্যাত কুমড়োর তরকারি দেওয়া যাবে না"!

বিশুর মা কাকিমার কথার উত্তর না দিয়ে ভাত বাড়তে শুরু করল। মিনি ফিসফিস করে বলল "আমার জন্যেও কিন্তু একটা ডিম ভাজবে, নইলে এমন নজর দেব, ওই ছেলের বা হাতের জল শুকাবে না"।

কাকিমা হাসতে হাসতে বলল "তা আর জানি না, হ্যাংলাটা আমার! যা, এবার এই উড়নচন্ডী হয়ে ঘুরে না বেরিয়ে স্নানটা সেরে আয়"।

মিনি হাই তুলল একটা "আজ আর স্নান করব না ভাবছি"।

কাকিমা বলল "তা তুই যা ইচ্ছা কর। কিন্তু গা থেকে এরপরে যখন গরুর মত গন্ধ বেরোবে তখন বুঝবি"।

মিনি একটা ভেঙচি কেটে বলল "মোটেও না, আমি স্নান না করলে মোটেও গরুর মত গন্ধ বেরোয় না"।

কাকিমা বলল "সে নিজের গায়ের গন্ধ সবারই ভাল লাগে। তুই তো বলবিই। যা তো স্নান করতে, নইলে কিন্তু কিচ্ছু পাবি না আমি আগেই বলে দিলাম"।

মিনি অলস পায়ে "ধুস ভাল্লাগে না" বলতে বলতে স্নানে ঢুকল। মিনিট পনেরোর মধ্যে স্নান সেরে জামাকাপড় চেঞ্জ করে চিরুনি দিয়ে জোরে জোরে চুল আঁচড়ে একটা ছোট্ট টিপ পরে খাবার ঘরে এসে দেখল ছেলেটা কেমন জড়োসড়ো হয়ে খেতে বসেছে।

মিনি একটা চেয়ার নিয়ে ছেলেটার সামনে বসে পড়ে বলল "আপনি কী যেন কাকে খুঁজছিলেন, পেলেন?"

বীরেন উদভ্রান্তভাবে মিনির দিকে তাকিয়ে বলল "না না, কিছুই খুঁজে পাই নি এখনও। দেখি খেয়েদেয়ে স্যারের কাছে পাই, যদি কিছু ব্যবস্থা হয়"।

কাকিমা রান্নাঘরে দূর থেকে মিনিকে চোখ দিয়ে বকছিল। এভাবে অচেনা অজানা অপরিচিত কারও সামনে বসে পড়ার জন্য। মিনি সেটাকে আমল না দিয়ে বলল "জ্যেঠু কি চেনে নাকি আপনি যাকে খুঁজছেন তাকে?"

কাকিমা বলল "আহ, মিনি, তুই ওকে খেতে দিবি নাকি? পুলিশের মত জেরা শুরু

করে দিয়েছিস! এই তুই এদিকে শোন তো!"

মিনি উঠে কাকিমার কাছে গেল। কাকিমা নিচুস্বরে বলল "কী হচ্ছে মিনি? তুই চিনিস ছেলেটাকে? এভাবে কথা বলছিস কেন?"

মিনি মুখ টিপে হেসে বলল "কেমন ক্যাবলাটাইপ লাগছে। চোখের দিকে পর্যন্ত তাকিয়ে কথা বলছে না"।

কাকিমা বলল "খুব পেকেছিস তুই। দিদি থাকলে আজ তোর কপালে দুঃখ ছিল"।

মিনি বলল "দুঃখের দরকার নেই। তুমি আমার ব্রাঞ্চ দাও"।

কাকিমা অবাক গলায় বলল "ব্রাঞ্চটা কী বস্তু?"

মিনি বিরক্ত গলায় বলল "উফ কাকিমা তুমি না সেই এখনও আদ্যিকালের যুগেই পড়ে আছো। ব্রাঞ্চ মানে হল ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের সন্ধি। তুমি শোন নি আগে?"

কাকিমা বলল "না, শুনি নি"।

কলিংবেল বেজে উঠল।

কাকিমা বলল “ওই দেখ, আবার কে এল। দেখ তো আবার”।

মিনি বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলল। পাড়ার মেসবাড়ির একটা ছেলে। আজকাল মাঝে মাঝেই জ্যেঠুর কাছে আসে। কারও সঙ্গে কোন কথাও বলে না। সোজা দোতলায় চলে যায়।

মিনি দরজা খুলে ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে দরজাটা ছেড়ে দাঁড়াল।

ছেলেটা মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হেঁটে দোতলায় জ্যেঠুর কাছে চলে গেল।

মিনি দরজা বন্ধ করে আবার রান্নাঘরে এল।

কাকিমা ফিসফিস করে বলল “সেই ছেলেটা না?”

মিনি বলল “হু”।

কাকিমা বিরক্ত গলায় বলল “কী যে শুরু করেছে দাদা আজকাল, কিছুই বুঝতে পারি না। বোঝা উচিত বাড়িতে এতজন মহিলা আছে, একটা বাইরের লোককে এভাবে ঢোকানো ঠিক না”।

মিনি বলল “জ্যেঠু তো আগেই চেয়েছিল আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকবে। বাবা আর কাকাই তো বাধা দিয়েছিল”।

কাকিমা গালে হাত দিল “কী যে বলিস, তা আবার হয় নাকি? সবাই একসঙ্গে না থাকলে সেটা আবার পরিবার হয় নাকি?”

মিনি বলল “তাহলে আর এখন বিরক্তি প্রকাশ করে কী করবে কাকিমা?”

কাকিমা বলল “আচ্ছা, অনেক কথা বলেছিস, এবার খেয়ে নে। ও ছেলের খাওয়া হয়ে গেছে। তুই বসে পড়”।

বীরেন তড়িঘড়ি খেয়ে নিয়েছিল।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে জ্যোতির্ময়ের ঘরে পৌঁছে দেখল একটা ছেলে এসে বসে আছে। তাকে দেখিয়ে জ্যোতির্ময় ছেলেটিকে বললেন “এই যে সেই...”।

ছেলেটা চোখ তুলে বীরেনের দিকে তাকাল। বীরেনের অপ্রস্তুত লাগছিল। এ বাড়িতে আসার পর থেকে সব কিছুই তার অদ্ভুত লাগছে। সে হাসার চেষ্টা করল। মুখে হাসি এল না।

জ্যোতির্ময় বললেন “ওর নাম ইউসুফ। তুমি ওর সঙ্গে যাও। ওই তোমাকে দিল্লির ফ্লাইটে তুলে দেবে। আজ রাতের মধ্যে তুমি শ্রীনগরে পৌঁছে আমাকে ফোন করবে। মনে রেখো তোমার নাম এখন থেকে সায়ক বড়াল, তোমার আই কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এয়ারপোর্টে ঢোকার আগেই ইউসুফ তোমায় দিয়ে দেবে”।

বীরেন নিস্প্রাণ নিস্পলক চোখে জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

৭।

দিল্লিতে যখন ফ্লাইটটা নামল তখন রাত সাড়ে আটটা। এয়ারপোর্টে গিয়ে চেক আউট করে আবার চেক ইন করে শ্রীনগরের ফ্লাইট ধরতে হল। ফ্লাইটের বেশিরভাগ লোকই কাশ্মীরের বাসিন্দা। দিল্লিতে নেমে বাড়িতে একবার ফোন করেছে সে। বাবাকে বলেছে হঠাৎ করে কলকাতায় এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে থেকে যেতে হয়েছে। দু তিন দিন লাগতে পারে। বাবা বেশি চিন্তা না করলেও মা করেছে। মার কাছে নানারকম জবাবদিহি করতে হয়েছে। শেষমেষ হসপিটালে আছে, ফোনে বেশি কথা বলা যাবে না বলে ফোনটা কেটেছে সে।

দিল্লি অবধি ফ্লাইটের একরকম মেজাজ ছিল। কাশ্মীরের ফ্লাইটে অনেক বেশি চেকিং হল। একটা ব্যাগে একগাদা জামা কাপড়, শীতবস্ত্র দিয়ে দিয়েছিল ইউসুফ। সিকিউরিটি চেকিং এর সময় বীরেনের বার বার মনে হচ্ছিল এই বুঝি কিছু না কিছু ধরা পড়ে। কিন্তু তেমন কিছুই হল না। তার ছবি দিয়ে কীভাবে সায়ক বড়ালের আধার কার্ড বানিয়ে ফেলা হল কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না সে। সেই একই ঠিকানা।

বীরেনের চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যর ইস্পাত কঠিন গলা যখন তাকে বলছিল তার বাবা মা বোনের সমস্ত ডিটেলস তাদের কাছে আছে, তার কথা না শুনলে সে ধারণাও করতে পারবে না তাদের কী হাল হতে চলেছে তখন বীরেনের মনে হচ্ছিল শিরদাঁড়া দিয়ে বোধ হয় কেউ হীমশীতল বরফ ঢেলে দিয়েছে। ভদ্রলোকের চোখের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি আছে। যখন কথা বলেন, তখন অন্যদিকে তাকানোর কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

ইউসুফ আবার অন্য ধরণের। মনে হচ্ছিল একটা রোবট। সে পাড়ারই একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটা ব্যাগ তাকে দিয়ে গড় গড় করে বলে গেল মীর্জা শেখ নামের একজন তার জন্য শ্রীনগর এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করে থাকবে। বীরেন বারবার ইউসুফকে জিজ্ঞেস করে গেছে কীভাবে সায়কের এটিএমের সঙ্গে তার এটিএম পিন মিলল, তাকেই কেন এই ঝামেলায় পড়তে হল, ইউসুফ কেবল ইস্পাত কঠিন মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছে সে কিচ্ছু জানে না।

দিল্লি থেকে রাত সাড়ে ন'টায় ফ্লাইটটা যখন টেক অফ করল তখন বীরেনের হঠাৎ মনে পড়ল, আর চব্বিশ ঘন্টা আগেও সে ভাবতেও পারেনি পরের দিন তার সঙ্গে কী হতে চলেছে। সে দেখল তার পাশের কাশ্মীরি ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে বসে আছে, খানিক দূরে এক শিখ পরিবার উচ্চস্বরে কথা বলছে, কেউ কেউ প্লেনে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দিল্লি থেকে কাশ্মীর বেশিক্ষণ লাগবে না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। যতবার চোখ বুজছিল, ততবার শুধু মায়ের মুখটাই ভেসে উঠছিল বীরেনের কাছে। আর কি কোনদিন বাড়ি ফিরতে পারবে? পাড়ার মোড়ে পটলদার চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে পারবে?

একটার পর একটা জিগস পাজল কিছুতেই মেলাতে পারছিল না সে। তবে কি সায়ক বড়ালের মানিব্যাগটা পাওয়া আসলে কাকতালীয় ছিল না? ভাবতে পারল না বীরেন। চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

হাজার সিকিউরিটি চেক আপের পর শ্রীনগর এয়ারপোর্ট থেকে সে যখন বেরোল তখন তার মোবাইল চার্জের অভাবে সুইচ অফ হয়ে গেছে। এক কাশ্মীরি ভদ্রলোক গোটা গোটা ইংরেজি অক্ষরে "সায়ক বড়াল" লিখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে এগিয়ে যেতে শুধু বললেন "ফলো মি"।

ভদ্রলোক প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। গায়ের রং আপেলের মত। বীরেন সম্মোহিতের মত তার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে পার্কিং লটে পৌঁছল। গাড়িতে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসিয়ে গাড়ি যখন এয়ারপোর্ট চত্বর ছাড়ল ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় তাকে বললেন "পথে আসতে কোন অসুবিধে হয় নি তো?"

বীরেন চমকে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। বলল "আপনি বাংলা জানলেন কী করে?"

ভদ্রলোক হাসলেন "পনেরো বছর টানা কলকাতায় ছিলাম। তাছাড়া এত অবাক হবার কিছু নেই, অনেক কাশ্মীরীই আছে যারা আপনাদের মত অনেক কলকাতার লোকেদের থেকে ভাল বাংলা বলতে পারেন। তাদের রুজি রুটি জোগানের মধ্যে বাঙ্গালের বিরাট একটা কন্ট্রিবিউশন আছে"।

বীরেন বলল "আপনিই মীর্জা?"

ভদ্রলোক বললেন "ইয়েস। আমিই"।

বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সব দোকানপাট বন্ধ। দু পা যেতে না যেতেই রাস্তার মধ্যে আর্মির গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বীরেন বলল "আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

মীর্জা বললেন "বলুন"।

বীরেন বলল "আমি কি দেশ বিরোধী কোন কাজ করতে যাচ্ছি?"

মীর্জা এতক্ষণ হাসিখুশি ছিলেন। বীরেনের প্রশ্ন শুনে বললেন "আপনাকে বোধ হয় বলা হয়েছে কোন প্রশ্ন না করতে, তাই না?"

বীরেন চুপ করে গেল।

বাকি রাস্তাটা মীর্জা একটাও কথা বললেন না। একটা জায়গায় লোকাল পুলিশের গাড়ি তাদের দাঁড় করাল। মীর্জা তার আধার কার্ড নিয়ে অজানা কোন ভাষায় সন্দিগ্ধ লোকাল পুলিশকে বোঝাল সে এক পর্যটককে এয়ারপোর্ট থেকে পিক আপ করতে গেছিল। বীরেনের আইকার্ড চেক করে তাদের গাড়ি ছাড়ল পুলিশ। বীরেন একবার ভেবেছিল চ্যাঁচামেচি জুড়ে দেবে, পরক্ষণেই বাবা মার মুখটা মনে পড়ে গেছিল তার।

গাড়ির কাঁচ বন্ধ ছিল। মীর্জা হঠাৎ করে কাঁচ নামিয়ে দিলেন। প্রবল ঠান্ডা হাওয়া গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। বীরেনের ঠান্ডা লাগলেও সে কিছু বলল না। পাথরের মত গাড়ির ভেতর বসে রইল।

৮।

একটা মাটির দোতলা বাড়ি। সংকীর্ণ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বীরেন দেখল একটা ছোট্ট ঘরে মেঝেতে বিছানা করা। তাকে একটা অন্য সিম কার্ড দেওয়া হয়েছে। তার প্রি পেড সিম ছিল। এখানে প্রিপেড কাজ করে না। বলা হয়েছে বাড়িতে ফোন করলে করতে পারে।

বাইরে প্রবল শীত। বীরেনকে একটা জ্যাকেট দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও ঠান্ডা লাগছিল। এ পাড়াটা যথেষ্ট ঘিঞ্জি, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কোন বাড়ি থেকেই কোন রকম শব্দ বাইরে আসছিল না।

ঘরের ভেতরটা অদ্ভুতভাবে গরম। বাড়িগুলো মাটির হলেও এমনভাবে তৈরী করা যে খুব একটা ঠান্ডা ভিতরে আসে না। মীর্জাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল তাকে কী করতে হবে কিন্তু মীর্জা কোন উত্তর দেয় নি। এবাড়িতে নিচের ঘরে একজন অত্যন্ত বয়স্কা কাশ্মীরি মহিলা ছিলেন। তিনি মীর্জাকে অজানা একটা ভাষায় কিছু বললেন। প্রত্যুত্তরে মীর্জাও কিছু বললেন।

মেঝেতে খানিকক্ষণ বসে থেকে বীরেন মোবাইলটা নাড়া চাড়া করছিল। ফেসবুক খুলে দেখল বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম আপডেট দিয়েছে। কেউ বৃষ্টির ছবি দিয়েছে, কেউ বা জন্মদিনে বন্ধুদের ট্রিট দিচ্ছে, ফলাও করে তার ছবি দিয়েছে, ফেসবুকটা বেশ খানিকক্ষণ তাকে অনেক কিছু ভুলিয়ে দিচ্ছিল। বাড়িতে আর ফোন করে নি সে। ফোন করলেই বাবা মার একগাদা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হবে।

মিনিট পনেরো বাদে মীর্জা নীচ থেকে ডাকলেন "খেতে আসুন"।

বীরেন প্রথমে ভেবেছিল বলে দেবে খাবে না, কিন্তু সেটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রবল খিদে পেয়ে গেল। আর কিছু না ভেবে সে নিচে নামল। বুড়ি মহিলাটি মেঝেতে যত্ন করে কার্পেট পেতে ভাত বেড়েছেন। ভাত আর কিছু একটার তরকারি। বীরেন মাথা নীচু করে খেতে শুরু করল।

মীর্জা বললেন "বুড়ির দুই ছেলে। বড়টা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল বাজার করতে। হঠাৎ করে কারফিউ লেগে গেছিল বুঝতে পারে নি, গুলি খেয়ে মরেছে"।

বীরেন এক নিঃশ্বাসে খেয়ে যাচ্ছিল। মীর্জার কথা শুনে খাওয়া থামিয়ে বুড়ির দিকে তাকাল। বুড়ি অজানা ভাষায় তাকে কিছু বললেন। বীরেন মীর্জার দিকে তাকাল। মীর্জা বললেন "আর ভাত নেবেন কী না জিজ্ঞেস করছে"।

বীরেন সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল "আর ছোট ছেলে?"

মীর্জা বললেন "লস্কর ই তইবার নাম শুনেছেন"?

বীরেন হাঁ করে মীর্জার দিকে তাকাল। মীর্জা বললেন "এখান থেকে পাঞ্জাবের দূরত্ব বেশি নয়। সে রাজ্যে এক বাড়ির দুই ছেলের একজন কানাডা কিংবা আমেরিকায় থাকে, অপরজন হয়ত চাষবাস করে, কাশ্মীরে এক বাড়ির এক ছেলে গুলি খেয়ে মরে, কেউ বা কাশ্মীর স্বাধীন করবে কিংবা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে বলে ..."

মীর্জা চুপ করে গেলেন।

বীরেন আতঙ্কিত গলায় বলল "আমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে একটু বলবেন?"

মীর্জা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন “আজকের রাতটা বিশ্রাম করুন। সকালে আমার সঙ্গে বেরোবেন”।

প্রবল শীতেও বীরেন ঘামছিল। এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময়েই সে দেখছিল প্রতিটা রাস্তার কোণায় কোণায় সেনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই কারও। হাতে রাইফেল নিয়ে রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সেনা।

মীর্জা বললেন “খেয়ে নিন। খালি পেটে থাকবেন না”।

বীরেন বলল “কেন?”

মীর্জা বললেন “কাশ্মীরে এই অভ্যাসটা রাখবেন। উপকার হবে”।

বীরেন আবার খাওয়া শুরু করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ খেল। তারপর বলল “কাল সকালে কোথায় নিয়ে যাবেন?”

মীর্জা বললেন “অনন্তনাগ”।

বীরেন বলল “সেখানে কী করতে হবে?”

মীর্জা বললেন “বিশেষ কিছু না। একটা খাম দেওয়া হবে। সেটা ফিরে গিয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে জমা দিয়ে দেবেন”।

বীরেন বলল “একটা খামের জন্য আমাকে কেন এত কিছু করে পাঠানো হল! যে কেউই তো নিয়ে যেতে পারত !”

মীর্জা বীরেনের কথার উত্তর দিলেন না।

বীরেনের খাওয়া হয়ে গেছিল। একটা পাত্রের মধ্যেই বুড়ি তার হাত ধুইয়ে দিল।

মীর্জা বললেন “আমি নিচে শুচ্ছি। আপনি মোবাইলে ফুল চার্জ দিয়ে রাখুন”।

বীরেন কয়েক সেকেন্ড মীর্জার দিকে তাকিয়ে বলল “একটা কথা জানতে পারি?”

মীর্জা বললেন “বলুন”।

বীরেন বলল “আপনারা টেরোরিস্ট না সিবি আই? পার্সেলে বোম থাকবে না তো? সিনেমায় যেমন দেখায়। এমন জিনিস হয়ত দিয়ে দিলেন প্লেনেই ফেটে গেল জিনিসটা!”

মীর্জা বীরেনের প্রশ্ন শোনা মাত্রই জোরে জোরে হেসে উঠলেন। বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে হেসে বললেন “আপনার একজন গার্ল ফ্রেন্ড আছে না?”

বীরেন অবাক হয়ে মীর্জার দিকে তাকাল।

মীর্জা হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বীরেন গম্ভীর হল “না, অরিত্রি আমার গার্লফ্রেন্ড না। ওর বিয়ে হয়ে যাবে”।

মীর্জা বললেন “স্যাড”।

বীরেন বলল “স্যাডের কিছু নেই। প্রথমে আমিও গার্লফ্রেন্ডই ভেবেছিলাম। তারপর দেখা গেল কখন যেন চাকর বানিয়ে দিয়েছে। যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, তার সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাবে। ফ্রেন্ড জোনড লেভেল ইনফিনিটি”।

মীর্জা একটা সিগারেট ধরালেন। কয়েকটা টান দিয়ে বললেন “বেচারা”।

৯।

মিনি ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিল। মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হলে কিচ্ছু ভাল লাগে না। সব সময় এ ব্যথা আসে না, যখন আসে তখন পাগল করে দেয়। ছটফট করতে করতে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

অন্যান্য দিন এই সময় মিনি পড়তে বসে। বিকেলে হঠাৎ করেই মাথা ব্যথা শুরু হয়েছিল। তার পর থেকে কমার কোন লক্ষণ নেই। আগে হলে সে গোছা গোছা স্যারিডন খেয়ে নিত। ডাক্তার আন্টি জানার পর থেকে খুব বকাবকি করেছেন।

বলেছেন মাইগ্রেনের আলাদা ওষুধ আছে। এত বেশি স্যারিডন খাওয়া ভাল না। মিনি দেখেছে স্যারিডনের সঙ্গে তার একটা আত্মিক যোগ তৈরী হয়েছে। যত ওষুধই খাওয়া হোক, স্যারিডন না খেলে মাথা ব্যথা কমে না। যে ক'টা স্যারিডন ছিল মা সব লুকিয়ে রেখেছে। হয়ত ফেলেই দিয়েছে। অনেক খোঁজা খুজি করেও না পেয়ে মিনি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়েছে। সমস্যা হল সকালে ভাবছিল মা নেই সে স্বাধীন, যা ইচ্ছা করতে পারে। এখন মনে হচ্ছিল মা থাকলেই ভাল হত। প্রতিবারের মত অন্তত মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেও ব্যথা খানিকটা কমত।

দরজায় কেউ একজন নক করল।

মিনি গলা তুলল "কে?"

কাকিমা বলল "দরজা খোল"।

মিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দরজা খুলল।

কাকিমা বলল "কী হয়েছে? আবার মাথা ধরেছে?"

মিনি বলল "হ্যাঁ। বাবা কাকা ফিরেছে?"

কাকিমা বলল "না, পাড়ার ক্লাবে কী একটা মিটিং আছে, অফিস ফেরতা সে মিটিং করে ফিরবে"।

মিনি বলল "পুজোর মিটিং?"

কাকিমা বলল "হবে হয়ত। শুনছিলাম তো এবারের থিম বিশ্বকাপ ফুটবল"।

মিনি হাসল "কত ক্লাবে একই থিম হবে এবার দেখবে"।

কাকিমা বলল "যা বলেছিস। সব তো একই দিকে যাবে"।

মিনি বলল "জ্যেঠু মিটিঙে যায় নি নিশ্চয়ই"?

কাকিমা বলল "খেপেছিস? বড়দা যাবে মিটিঙে? তবেই হয়েছে"।

মিনি বলল "বেরিয়েছে, না ঘরেই আছে?"

কাকিমা বলল "ঘরেই আছে। কেন রে?"

মিনি বলল "সেই যে লোকটা এসেছিল, দুপুরে খেল, কোথায় গেল কে জানে।

কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা মার্কা চেহারা তাই না?"

কাকিমা বলল "হ্যাঁ। কেমন করে খেল দেখলি তো? কেমন কেমন যেন"!

মিনি বলল "বাদ দাও। তোমার কাছে স্যারিডন আছে?"

কাকিমা চোখ বড় করল "একদম না। দিদি জানতে পারলে কী হবে বুঝতে পারছিস?"

মিনি রেগে গেল। বড় বড় পা ফেলে সিঁড়িতে উঠল, কাকিমা পেছন থেকে ডাকছিল সে কানেও নিল না। দোতলায় উঠে জ্যেঠুর ঘরে নক করল "জ্যেঠু আছো?"

জ্যোতির্ময় ঘরেই ছিলেন। বললেন "আয়"।

মিনি ঘরের ভেতরে ঢুকল। জ্যোতির্ময় টিভি দেখছিলেন। মিনি বলল "স্যারিডন আছে?"

জ্যোতির্ময় ভ্রু কুঁচকালেন "আবার ধরেছে?"

মিনি বলল "হ্যাঁ। মা সব লুকিয়ে রেখে গেছে"।

জ্যোতির্ময় বললেন "দেখ আমার ওষুধের বাক্সে পাস নাকি"।

মিনি আর দেরী করল না। টেবিলের ওপরেই জ্যোতির্ময়ের ওষুধের বাক্স। সেটা তড়িঘড়ি খুঁজতে শুরু করল। পেয়েও গেল। একটা স্যারিডন জল গিয়ে গিলে বলল "উফ, ভাগ্যিস তোমার কাছে ছিল! বাঁচালে"।

ওষুধের বাক্সটা নিতে গিয়ে একটা লিফলেট মাটিতে পড়ে গেছিল। মিনি সেটাকে তুলতে গিয়ে দেখল আরবী ভাষায় কী সব লেখা আছে। সে অবাক হয়ে জ্যেঠুর দিকে তাকাল "এটা কী জ্যেঠু?"

জ্যোতির্ময় টিভি দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে বললেন 'হবে কিছু একটা।

কাগজের মধ্যে ছিল"।

মিনি বলল "এটা কী লেখা?"

জ্যোতির্ময় কাঁধ নাচালেন "কে জানে"।

মিনি কাগজটা ওষুধের বাক্সের নিচে রেখে দিল। জ্যোতির্ময় বললেন "তোর বাবা এলে একবার পাঠাস তো এই ঘরে। কথা আছে কিছু"।

মিনি বলল "আচ্ছা"।

জ্যোতির্ময় বললেন "স্যারিডন আমার ঘরে পেয়েছিস..."

মিনি জ্যোতির্ময়কে থামিয়ে দিয়ে বলল "জানি জানি, কাউকে বলব না"। জ্যোতির্ময় হাসলেন। ফোনটা বাজছিল। জ্যোতির্ময় বললেন "ফোনটা দে তো"।

মিনি ফোনটা দিয়ে ঘর থেকে বেরোল। পরক্ষণেই সিঁড়ি দিয়ে নামার পরিবর্তে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সম্পূর্ণ অজানা ভাষায় জ্যেঠু গড়গড়িয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছে।

মিনি কিছুই বুঝল না, তার শুধু একটা কথাই মনে হল, জ্যেঠু ঠিক ক'টা ভাষা জানে?

১০।

ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে তুলে দিয়েছেন মীর্জা। এমনিতেই সারা রাত এপাশ ওপাশ করেছিল বীরেন। শেষ রাতের দিকে ঘুম এসেছিল। মীর্জা ডাকলেন যখন বীরেন প্রথমে ভেবেছিল বাড়িতেই আছে সে। বাবা হয়ত ডাকছে। দ্বিতীয়বার ডাকার পরে হুশ ফিরল তার। ধড়মড় করে উঠে বসল।

মীর্জা বললেন "নিচে টয়লেট আছে। কাম কাজ সেরে তৈরী হয়ে নিন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে"।

বীরেন অনিচ্ছুক শরীরে উঠল। বাইরে বেশি শীত না থাকলেও শালের প্রয়োজন পড়ছিল। অন্ধকার বাইরেটা। তৈরী হয়ে গাড়িতে যখন উঠল তখন পৌনে ছ'টা বাজে। নিচের ঘরে বুড়ি শুয়েছিল। ডাকবে ভেবেও ডাকল না। হঠাৎ করে কেন জানে না, মায়ের কথা মনে পড়ল তার। একটু মন খারাপ হল।

মীর্জা ড্রাইভারের সিটে তৈরী হয়েই বসে ছিলেন। তাকে বসতে দেখে গাড়ি স্টার্ট করে বললেন "আধার হাতের কাছে রাখুন। রাস্তায় চেকিং হবে। নাম কী আপনার?"

বীরেন মৃদু গলায় বলল "সায়ক বড়াল"।

মীর্জা খুশি হলেন "গুড"।

বৃষ্টি পড়ছিল ঝিরি ঝিরি। এখনও অন্ধকার চারদিক।

মীর্জা বললেন "কাশ্মীর কাদের দেশ?"

বীরেন বলল "ভারতের"।

মীর্জা বললেন "কাশ্মীরিরা কাদের?"

বীরেন বলল "নিশ্চয়ই এদেশের"।

মীর্জা বললেন "তার মানে ভারতের? তাই তো?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ"।

মীর্জা বললেন "নিজের দেশের লোকেদের কেউ কুকুরের মত মারে? আপনার কী মনে হয়?"

বীরেন বুঝল মীর্জা উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। সে কিছুটা সংকুচিত হয়ে বলল "আমার এই ব্যাপারে তেমন কোন ধারণা নেই"।

মীর্জা বললেন "সেটা স্বাভাবিক। আম ভারতীয় সেসব নিয়ে চিন্তা করবে না সেটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের আগুনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন"।

বীরেন কিছু বলল না। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে এসব উত্তেজিত কথা বার্তা সে ঠিক নিতে পারছিল না। বাইরেটা যেন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে আছে। খানিক দূর পর পর সেনা ছাউনি, সেনা টহল দিচ্ছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। শ্রীনগর ছাড়িয়ে

বেরোতে বেশিক্ষণ লাগল না। রাস্তা ফাঁকাই ছিল।

মীর্জা বললেন "কোথায় যাচ্ছি জানেন?"

বীরেন বলল "না। আমি কেন এতদূর এসেছি সে সম্পর্কেও আমার কোন ধারণা নেই"।

মীর্জা কিছু বললেন না।

বীরেন বলল "অ্যাকচুয়ালি আমি একেবারেই অন্ধকারে আছি। কাল সকালে এই সময়েও আমি ঘুমাচ্ছিলাম নিজের বিছানায়, আমার কোন ধারণাই ছিল না আমার সঙ্গে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় কী হতে চলেছে..."

মীর্জা বীরেনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন "একজ্যাক্টলি আপনার মত মানসিক অবস্থাই আম কাশ্মীরীদের জানেন তো? তারাও জানে না আগামী চব্বিশ... না না চব্বিশ কেন, আগামী এক ঘন্টায় তাদের সঙ্গে ঠিক কী হতে চলেছে। একদিকে আছে আপনাদের দেশের সেনাবাহিনী, অপরদিকে ওদেশের, যে ছেলেটা বাড়ি থেকে বেরোল সকালবেলা, দুপুরে দেখা গেল আর্মির গুলি খেয়ে কোন রাস্তায় কুকুরের মত পড়ে আছে"।

বীরেন মরিয়া হল খানিকটা "এসব কথা আমাকে বলছেন কেন মীর্জা সাহেব?"

মীর্জা বললেন "বিরক্ত লাগছে?"

বীরেন বলল "ঠিক তা নয়, কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না আমি ঠিক কোন মেন্টাল স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি... বাড়িতে জানে না আমি কোথায়, ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও জানি না আমাকে ঠিক কী করতে হবে..."

মীর্জা বললেন "আপনাকে তো বলেছি আপনাকে শুধু একটা খাম নিয়ে যেতে হবে। আজ অনন্তনাগ যাব। বিকেলের মধ্যেই আপনাকে শ্রীনগর পৌঁছে দেব আমি"।

বীরেন বলল "অনন্তনাগে কোথায়? মানে ঠিক কোথায় যেতে হবে?"

মীর্জা বললেন "গেলেই দেখতে পাবেন"।

বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

মীর্জা বললেন "কাল রাতে খুব হালকা একটা আর্থ কোয়েক হয়েছে। টের পেয়েছিলেন?"

বীরেন মাথা নাড়ল "না"।

মীর্জা বললেন "স্বাভাবিক। টায়ার্ড ছিলেন। আমিও বুঝিনি। সকালে একজন জানাল"।

বীরেন বলল "কে?"

মীর্জা বললেন "চিনবেন না। খিদে পেয়েছে?"

বীরেন মাথা নাড়ল "না। এখন কিছু খাব না"।

গাড়ি কিছুটা যাবার পর রাস্তায় একদল পুলিশ দাঁড় করাল। মীর্জা গাড়ি দাঁড় করাতে করাতে ফিসফিস করে বলল "সায়কবাবু কিচ্ছু ভুলবেন না"।

আর্মি নয়। জম্মু কাশ্মীরের পুলিশ। গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রথমে গাড়ির কাগজপত্র চেক করল। তারপর তার আধার কার্ড চেক করল। বেশ খানিকক্ষণ পরে গাড়িটা আবার যাত্রা শুরু করল।

মীর্জা বললেন "এক নম্বরের জানোয়ারের বাচ্চা এই পুলিশগুলো। টাকা খাওয়া ছাড়া আর কিছু জানে না"।

আলো ফুটছে চারপাশের। কাল রাতে এয়ারপোর্টে নেমে কাশ্মীরের কিছুই দেখতে পায় নি বীরেন। এখন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার চারপাশ দেখে মুগ্ধ হতে শুরু করল বীরেন। কী অপূর্ব চারপাশ! ভূ স্বর্গ কি সাধে বলে?

১১।

অনন্তনাগ পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল ন'টা হয়ে গেল। শহর থেকে বেরিয়ে একটা গ্রামে পৌঁছল তাদের গাড়ি। একটা বড় বাড়ি। বিরাট গেট। মীর্জার গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার হর্ন দিলে গেটটা খুলে গেল। গেট খুলতে দেখা গেল অনেকটা জায়গা নিয়ে বারান্দা। সুদৃশ্য বাগান।

মীর্জা বললেন "কাল আপনাকে কষ্ট করতে হয়েছে। আজ ভাল খাওয়া পাবেন"।

বীরেন কিছু বলল না।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে মীর্জা বীরেনের দরজা খুলে দিল। বীরেন নামল।

এক ভদ্রমহিলা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন বাড়ির ভেতর থেকে, মীর্জাকে কিছু বললেন। মীর্জা জানিয়েছিলেন এটা পুস্তু ভাষা। তারা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। বীরেনকে বসার ঘরে বসিয়ে মীর্জা বাড়ির ভেতরে গেলেন।

বীরেন অবাক হয়ে বাড়ির আসবাবপত্র দেখছিল। কাঠের এমন সূক্ষ্ম কাজ আগে সে দেখেনি। যে কার্পেটটা পাতা আছে মেঝেতে, সেরকম কার্পেটও সে আগে দেখেনি।

ভদ্রমহিলা খানিকক্ষণ পরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলেন। কাওয়া চা, বাখরখানি, আর এক বড় জামবাটিতে মাংস। মীর্জা এসে বসলেন তার পাশে "খেয়ে নিন, গরু না। ভেড়া। ইট উইল নট হার্ট ইওর রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট"।

বীরেনের সত্যিই খিদে পেয়েছিল। সে খাওয়া শুরু করল। খেতে খেতে আলো চলে গেল।

মীর্জা বললেন "লোডশেডিং। কাশ্মীরের রেগুলার ইনসিডেন্ট"।

ভদ্রমহিলার রান্না অপূর্ব। বীরেনের খাওয়া শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগল না। মীর্জা বললেন "ওই ঘরে ঢুকে ডানদিকে বেসিন আছে। মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে চলে যান। ওখানেই আপনার সামান রাখা আছে। রেস্ট নিয়ে নিন। আমি ডেকে নেব"।

বীরেন বিনা বাক্যব্যয়ে মীর্জার নির্দেশ পালন করল। মুখ হাত ধুয়ে মীর্জার দেখানো ঘরে প্রবেশ করল।

ছোট্ট ঘর কিন্তু অত্যন্ত সাজানো গোছানো। সুদৃশ্য কাঠের আসবাব বসার ঘরের মতই। কাশ্মীরীদের রুচি সম্পর্কে সে শুনেছিল, সিনেমায় দেখেছিল কিন্তু এই বাড়িতে আসার পরে সে বুঝতে পারছিল এরা কতটা সৌন্দর্যপ্রিয়।

খাটে শুতেই খানিকটা পথশ্রমে, খানিকটা গতরাতের কম ঘুমের জন্য তার একবারে ঘুম চলে এল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল ছিল না, ঘুম ভাঙল দরজা ধাক্কার শব্দে। সে ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলল। মীর্জা বিরক্ত গলায় বললেন "দরজা বন্ধ করার কী ছিল? ফোন ধরুন, স্যার কথা বলবেন"।

বীরেন দেখল মীর্জা তার দিকে ফোনটা এগিয়ে দিয়েছেন। সে ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে জ্যোতির্ময়ের গলা ভেসে এল "ঘুম হয়েছে?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ"।

জ্যোতির্ময় বললেন "তৈরী হয়ে নাও। এখান থেকে মীর্জা তোমাকে শ্রীনগর এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। দিল্লি পৌঁছে আমাকে ফোন করবে"।

বীরেন বলল "দিল্লি থেকে কোলকাতা ফিরব তো?"

জ্যোতির্ময় বললেন "দেখছি, দিল্লি পৌঁছে ফোন করলে বলব"।

বীরেন বিরক্ত গলায় বলল "এসব কী তামাশা চলছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বাড়িতে চিন্তা করবে তো"।

জ্যোতির্ময় শান্ত গলায় বললেন "তোমার বাড়িতে জানাও চাকরির একটা আর্জেন্ট ইন্টার্ভিউর জন্য তোমাকে দিল্লি যেতে হচ্ছে। কেউ চিন্তা করবে না"।

বীরেন কিছু বলতে যাচ্ছিল ফোনটা কেটে গেল।

সে অবাক চোখে মীর্জার দিকে তাকাল। মীর্জা বললেন “দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিন। আর সময় দেওয়া যাবে না। অনেক ঘুমিয়েছেন।”

মীর্জার গলায় একটা কড়া ভাব ছিল যেটা এতক্ষণ ছিল না। বীরেন বাথরুমে ঢুকে গরম জলে স্নান সেরে নিল। তৈরী হয়ে তারা যখন বেরোল তখন দুপুর দুটো বাজে। মীর্জা বললেন “আপনার ব্যাগ চেঞ্জ করে দেওয়া হবে শ্রীনগরে। ড্রেসও। আর কোন শীতের জায়গায় মনে হয় না আপনাকে যেতে হবে”।

বীরেন কিছু বলল না। তার রাগ হচ্ছিল। এতক্ষণ সে বাবা মা, বোনের কথা ভেবে নিঃশব্দে জ্যোতির্ময় যা বলছিলেন সব পালন করে যাচ্ছিল, এখন তার ভেতরের বিপ্লবী সত্বাটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল।

সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

মীর্জা বললেন “অনন্তনাগে গত তিন দিন ধরে কারফিউ চলছে। কোন কোন জায়গায় ঝামেলা চললেই শ্যুট অ্যাট সাইটের অর্ডার আছে”।

বীরেন বলল “আপনার গাড়িকে কোন ঝামেলা ছাড়াই এভাবে গোটা কাশ্মীর ঘুরতে দিচ্ছে কেন?”

মীর্জা শব্দ করে হাসলেন। বীরেনের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না।

১২।

মিনি ঘুমাচ্ছিল। কাকিমা ঘুম থেকে তুলল সকাল আটটায়।

মিনি বিরক্ত গলায় বলল “কী হয়েছে”?

কাকিমা বলল “কলেজ যাবি না আজ? তোর মা ফোন করেছিল সকালে। বলল তোকে ঘুম থেকে তুলে দিতে”।

মিনি ঘুমন্ত চোখে খানিকক্ষণ কাকিমার দিকে তাকিয়ে বলল “ঢপ মারতেও জানো না”।

কাকিমা বলল “হ্যাঁ, আমি ঢপ মারব আর তোর মা এসে আমাকে ঝাড়ুক”।

মিনি বলল “বাবা কোথায়?”

কাকিমা বলল “বাজারে গেছে”।

মিনি বলল “কাকু নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে”।

কাকিমা বলল “হ্যাঁ। তুই এবার ঘুম থেকে ওঠ। অনেক হয়েছে”।

মিনি আড়মোড়া ভাঙল। কাকিমা জানলা খুলে বলল “ঈশ, সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে”।

মিনি চোখ পিটপিট করে বাইরের দিকে তাকিয়ে আবার শুয়ে পড়ল “আমি এই বৃষ্টিতে কোথাও যাচ্ছি না। মেরে ফেললেও যাব না”।

কাকিমা খাটে বসে পড়ে বলল “তাহলে তোর মাকে ফোন করে বলে দিস। আমি এত দায়িত্ব নিতে পারলাম না”।

মিনি কাকিমাকে জড়িয়ে ধরল “প্লিজ প্লিজ কাকিমা, আজকের দিনটা ম্যানেজ দাও। তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব”।

কাকিমা বলল “হ্যাঁ, অনেক গোলাম হয়েছিস। আর গোলাম হয়ে কাজ নেই। বিশুর মা আসার আগে বিছানা ছাড়। বাসী বিছানা রাখিস না”।

মিনি বলল “বিশুর মা আসুক। তারপরে দেখছি। তবে আজ আমি কলেজ যাচ্ছি না এটা শিওর”।

কাকিমা বলল “কী করবি সারাদিন?”

মিনি বলল “কী আবার করব? ঘুমাব? ওটাই তো ভাল পারি”।

কাকিমা বলল “ওদিকে দাদার পাগলামিটা আবার বেড়েছে”।

মিনি চোখ বড় বড় করল “জ্যেঠুর?”

কাকিমা বলল "হ্যাঁ। সকালে দেখছি আজান শুনছিল মোবাইলে। বলে আরবী ভাষায় কী সব পড়াশুনা করার জন্য ওটা দরকার"।

মিনি হাসতে হাসতে বলল "কনভার্ট হয়ে গেল নাকি জ্যেঠু? তাহলেই হয়েছে? ভটচাজ বাড়ির বড় ছেলে দাড়ি বাগিয়ে লুঙ্গি পরে ঘোরাফেরা করবে"।

কাকিমাও হাসল, বলল "ওভাবে জেনারালাইজেশন করাটা কি ঠিক? সব মুসলমানই কিন্তু ওরকম দাড়ি রাখেন না, লুঙ্গিও পরেন না। তবে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হঠাৎ করে ধর্ম নিয়ে পড়লে একটু কেমন কেমন লাগে। আমি দেখেছি সাধারণত যারা প্রথম দিকে নাস্তিক হয়, তারাই চট করে কেমন ব্রেইন ওয়াশড হয়ে যায়"।

মিনি হাই তুলল "হ্যাঁ কথাতেই আছে নতুন মুসলমান গরু খাবার যম হয়"।

কাকিমা বলল "গরু খেলে কি না খেলে জাত ধর্ম ঠিক হয় বলে আমি মনে করি না। তুই কি মনে করিস শুয়োর বা গরুতে জাত যায়?"

মিনি বলল "আমার তো এসব জিনিস কোনকালেই ভাল লাগে না তুমি জানোই।

যে জিনিস দাঙ্গার কারণ হয়, মানুষের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, সে জিনিস একেবারেই আমি পছন্দ করি না"।

কাকিমা বলল "একজ্যাক্টলি। দ্যাখ তো, সকাল সকাল আমরা দুজনে কেমন গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করে দিলাম"।

মিনি একটু চিন্তিতভাবে বলল "কথাটা উঠল বলে আমারও একটু একটু মনে হচ্ছে জানো তো, কাল দেখলাম জ্যেঠুর ঘরে একটা আরবী ভাষার লিফলেট টাইপ। কী লেখা ছিল পড়ি নি। বাবাকে বলব এ ব্যাপারে কিছু?"

কাকিমা মাথা নাড়ল "ধুস, অত সিরিয়াস কিছু না। প্রতিভাবান মানুষদের এরকম পাগলামি আসে। সেরেও যায়। ঘরে বসে দেখছিস না সারাক্ষণ শেয়ার বাজারে বেচা কেনা করে যাচ্ছে। দেখলে কে বলবে এই লোকটাই এককালে আই আই টিতে প্রথম দিকে র‍্যাঙ্ক করেছিল?"

মিনি বলল "সেটাই তো চিন্তার। কী যে করছে জ্যেঠু। আচ্ছা ধরে বেঁধে একটা বিয়ে দিয়ে দিলে হয় না?"

কাকিমা শব্দ করে হেসে উঠল "কী যা তা বলছিস?"

মিনি বলল "হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তাহলে অ্যাটলিস্ট আমাকে এসব নিয়ে ভাবতে হত না। আচ্ছা, আজ একটা কাজ করি চল"।

কাকিমা উৎসুক হল "কী?"

মিনি বলল "জ্যেঠু তো এগারোটা নাগাদ বেরোয় প্রায় রোজই। আজ বেরোলে চল আমরা জ্যেঠুর ঘরে হানা দি"।

কাকিমা গালে হাত দিল "সে আবার কী? জানতে পারলে তো তুলকালাম হবে"!

মিনি বলল "আরে চলই না। কী আর হবে? অ্যাটলিস্ট পাগলামিটা কোন লেভেলে আছে খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে।"

কাকিমা ঠোঁট কামড়ে বলল "কিন্তু..."

মিনি কাকিমাকে চুপ করিয়ে দিল "কোন কিন্তু না। জ্যেঠু বেরোলে আমরা তদন্ত শুরু করছি, ব্যস। অপারেশন জ্যেঠু। হি হি"। কাকিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "কত রকমের যে পাগল হয় তোকে না দেখলে জানতেই পারতাম না"।

১৩।

শ্রীনগর এয়ারপোর্টের গেটের সামান্য আগে মীর্জা গাড়ি থামিয়ে বললেন "গাড়ির ডিকিতে ব্যাগটা রাখা আছে। পুরনো ব্যাগটা গাড়িতেই থাকুক। নতুন ব্যাগটা নিয়ে সিকিউরিটি চেক আপে নেমে যাবেন। এখানে

সমস্ত কিছু ম্যানুয়াল প্রসেসে হয়। প্লেনে ওঠার আগেও নিজের ব্যাগ আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে। ভাল করে ব্যাগটা বুঝে নেবেন। মনের মধ্যে নিজের নামটা যে সায়ক বড়াল সেটা বারবার বলতে থাকুন। শ্রীনগর এয়ারপোর্ট কিন্তু দেশের আর পাঁচটা এয়ারপোর্টের মত নয়। মনে করুন আপাতত ভারত অধিকৃত পাকিস্তানে আছেন। এখানে প্রচুর চেকিং হতে পারে যদি ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়। ”

বীরেন ভাবলেশহীন মুখে বলল “ঠিক আছে”।

মীর্জা গাড়ি স্টার্ট করে এয়ারপোর্টের ভেতর গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চললেন। গেটের মুখে গাড়ি দাঁড় করানো হল। বীরেনের টিকিট দেখে তবেই গাড়ি ছাড়ল নিরাপত্তারক্ষীরা।

মীর্জা সিকিউরিটি কাউন্টারের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললেন “এখানেই নেমে যান। আর কোন দিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে নাকি জানি না। ভাল থাকবেন”।

বীরেন মীর্জাকে কিছু বলল না। সে গাড়ি থেকে নামল। মীর্জা কিছু একটা সন্দেহ করে গাড়ি থেকে নেমে ডিকিটা খুলে বীরেনকে ফিসফিস করে বললেন “কোন রকম চালাকি করবেন না। এখানে যদি পুলিশকে আপনার আসল নামও বলেন, মনে রাখবেন সে ক্ষেত্রেও আপনার জেলই হবে। আশা করছি আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, আমাকে বেশি এক্সপ্লেইন করতে হবে না। আর হ্যাঁ, প্লেনে উঠেই সোয়েটার খুলে নেবেন। দিল্লিতে সোয়েটার পরে থাকলে আর দেখতে হবে না”।

বীরেন কিছু না বলে ব্যাগটা নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্টারের দিকে এগোল। মীর্জা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সিকিউরিটি চেকিং করে বোর্ডিং পাশ নিয়ে দ্বিতীয়বার সিকিউরিটি চেকিং এর জন্য অন্য একটা কাউন্টারে যেতে বলল। প্লেনে যখন উঠল তখন বিকেল সাড়ে চারটে পেরিয়েছে। প্লেনের প্রায় সবাই কাশ্মীরেরই লোক। এই সময় কেউ কাশ্মীরে বেড়াতে আসে না বোঝাই যায়।

বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। তার মাথায় অনেক কিছু ঘুরছিল। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না তার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। বাবা মা বা বোনের ভয় দেখিয়ে লোকটা ঠিক কী করিয়ে নিচ্ছে তাকে দিয়ে সে সম্পর্কে বীরেন কোন ক্লু পাচ্ছিল না।

কাশ্মীরে সে এর আগে আসে নি। মীর্জার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল সে হয়ত ভারতে নেই। কোন কোন জায়গায় দেওয়াল লিখে রেখেছে “গো টু হেল ইন্ডিয়া” কিংবা “উই নিড ইন্ডিপেন্ডেন্স”, কোথাও কোথাও “পাকিস্তান জিন্দাবাদ”ও লেখা। মীর্জার কথা মনে পড়ল তার, এই ভূখন্ডের লোকেদের নিয়ে দিনের পর দিন যেভাবে রাজনীতি চলছে, একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়েকেও সেনারা যেভাবে তল্লাশি করছে, প্রতিটি কাশ্মীরির বাড়িতে যেভাবে সেনারা অতর্কিতে রাত বিরেতে হানা দিচ্ছে, মেয়েদের লাজ লজ্জা বলে কিছু রাখছে না, তাতে এখন অধিকাংশ কাশ্মীরিই এই দেশে আর থাকতে চাইছে না। অপরদিকে যারা ভেবেছিল পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ভাল, তাদের সে ভুল ধারণাও দিনে দিনে ভাঙছে। ব্যাপারটা অনেকটাই নদীর এপার কহে ছাড়িয়ে নিঃশ্বাস টাইপ ব্যাপার হয়ে গেছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরটা জঙ্গীদের ডেরা হয়ে গেছে। সমস্ত বড় বড় জঙ্গিদের পাকিস্তান সরকার প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছে। কাশ্মীরেও কম বয়সী যুবকদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত টাকা দিয়ে উস্কানো হচ্ছে ধর্মের নামে। দুপাশের সেনার দাপটে সাধারনভাবে বেঁচে থাকতে চাওয়া মানুষগুলোর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

এত সব কিছুর মধ্যে হঠাৎ বীরেনের হুশ ফিরল জানলার বাইরে দেখে।

হিমালয়ের এমন অপূর্ব রূপ! সে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। তাদের বিমান যখন শ্রীনগর ছেড়েছিল তখনও যথেষ্ট মেঘ ছিল আকাশে। এখন একেবারেই মেঘ নেই। “তুষারশুভ্র” হিমালয় এত সুন্দর? সব কিছু ভুলে যাচ্ছিল বীরেন ধীরে ধীরে। জ্ঞান ফিরল পাশের যাত্রীর কথায়, “আপ কাহাসে হো”?

বীরেন এতক্ষণ নিজের মধ্যে ছিল না। মীর্জার কথা মনে পড়ল। কারও সঙ্গে বেশি কথা নয়। সে বাঙলাতেই বলল “আমি অন্য ভাষা জানি না”।

পাশের বয়স্ক কাশ্মীরী ভদ্রলোক কী বুঝলেন কে জানে, চুপ করে গেলেন। বীরেন ঘোরের মধ্যে ছিল। প্লেনের অনেককেই সোয়েটার/জ্যাকেট খুলতে দেখে নিজের সোয়েটার খুলে ফেলল।

মিনিট পনেরো চোখ বন্ধ করে বসে রইল। ঘোষণা হচ্ছে প্লেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি পৌঁছবে। বীরেন ঘড়ি দেখল। ছ'টা দশ পনেরোর মধ্যে দিল্লি পৌছে ফোন অন করার নির্দেশ আছে। তার চোয়াল শক্ত হল। সে ঠিক করল ফোন অন করবে না। দিল্লি গিয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে স্টেশনে পৌছে যে কোন ট্রেনে উঠে বাড়ির দিকে রওনা দেবে। পাড়ায় পৌঁছে দেখা যাবে যা হবার হবে।

প্লেন খানিকক্ষণ পরেই দিল্লির মাটি ছুঁল।

বীরেন গম্ভীর মুখে প্লেন থেকে নেমে কোন দিকে না তাকিয়ে ব্যাগের জন্য ছুটল। কনভেয়ার বেল্টে ব্যাগ এসে গেছিল মিনিট দশেকের মধ্যেই। সে ব্যাগ নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই যাচ্ছিল এমন সময় দেখল টিভির সামনে বেশ কয়েকজন লোক উত্তেজিত স্বরে কথা বার্তা বলছে।

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল টিভিতে ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে শ্রীনগর এয়ারপোর্টের বাইরের আর্মি ক্যাম্পে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে চারজন জওয়ান মৃত।

সে হাঁ করে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল।

১৪।

।।ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো অফিস, নতুন দিল্লি, রাত আটটা।।

মাথুর গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। খান ঘরে ঢুকেই মাথুরকে বললেন "ক্যাজুয়ালটি আর বেড়েছে?"

মাথুর মাথা নাড়লেন।

খান বললেন "কে ছিল বলে তোমার মনে হয়?"

মাথুর বললেন "মীর্জার গাড়ি ছিল"।

খান চমকে মাথুরের দিকে তাকালেন। মাথুর বললেন "মীর্জা ছিল?"

মাথুর খানের চোখে চোখ রাখলেন "স্টিল নট কনফার্মড"।

খান বললেন "মিনিস্ট্রি কী বলছে?"

মাথুর খানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন "যা বলে"।

খান মাথা নাড়লেন "এভাবে কিন্তু চলতে পারে না। কিছুতেই পারে না"।

মাথুর বললেন "সে তো পারেই না। কিন্তু এর সলিউশন কী?"

খান বললেন "এক কাজ করতে পারে তো। সব কাশ্মীরিদেরই একদিন গুলি করে উড়িয়ে দিক। সব প্রবলেম সলভড"।

মাথুর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "দিল্লিতে বসে থেকে আজকাল আমারও এটাই মনে হয়। এর থেকে ভাল সলিউশন বোধহয় আর কিছু হয় না। লোকগুলো কী করবে? কিছু তো করার নেই আর। এপারে থাকলে আমরা মারছি, ওপারে গেলে পাকিস্তান। বাই দ্য ওয়ে, এখনও এ ঘটনার দায় কেউ স্বীকার করে নি"।

খান বললেন "করবে। এত তাড়া কীসের?"

মাথুর বললেন "হু। শ্রীনগরে রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে। তা সত্ত্বেও লাল চকে মিছিল বেরিয়েছিল। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পোড়ানো হয়েছে। আর্মি টিয়ার শেল ছুঁড়েছিল, তাতেই পালিয়েছে। গুলি চালাবার মত অবস্থা ছিল। তবে চালানো হয় নি"।

খান বললেন "ইসলামাবাদ শুনলাম আবার অসভ্যতা শুরু করেছে"।

মাথুর চোখ ছোট করলেন "কীরকম অসভ্যতা?"

খান বললেন “যা করে। আম কাশ্মীরীর লাইফ হেল করছে ইন্ডিয়ান আর্মি, এসব বলছে”।

মাথুর আবছা স্বরে বললেন “ব্লাডি সোয়াইন”।

খান বললেন “কী টাইপের মেটিরিয়াল ইউজ করেছে কিছু জানা গেল?”

মাথুর ফ্যাকাসে মুখে বললেন “না”।

খান কয়েক সেকেন্ড মাথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন “পাঠানকোট?”

মাথুর মাথা নাড়লেন “কনফার্ম নই। হতে পারে”।

খান বললেন “পাঠানকোটের মিসিং অফিসারদের লিস্ট তোমার মুখস্ত ছিল না?”

মাথুর বললেন “হু”।

খান বললেন “ক’জনকে ট্র্যাক করা গেছে?”

মাথুর বললেন “একজনকেও না”।

খান বললেন “ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট”?

মাথুর বললেন “না”।

ঘরে নক হল। মাথুর গলা তুললেন “কাম ইন”।

তুষার রঙ্গনাথন ঘরে ঢুকলেন। তুষার ছোট খাটো লোক। তবে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় একজন মানুষ। মাথুর এবং খানের সিনিয়র।

দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তুষার বললেন “ডিপার্টমেন্ট রেখে কী হবে? বন্ধ করে দিলেই তো হয়”!

মাথুর বললেন “কোন লিড ছিল না স্যার আজকে”।

তুষার চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন “সমস্যা হল বাস্তবটা সিনেমা নয়। তাহলে একজন টাইগারকে পাঠানো যেত শ্রীনগরে। সিনেমার নাম হত টাইগার ফির ভি জিন্দা হ্যায়”।

মাথুর হাসলেন। খান হাসলেন না। বললেন “কাশ্মীর হাতের বাইরে চলে গেছে স্যার”।

তুষার খানের চোখে চোখ রাখলেন “তোমার কী মনে হয় খান? কোনটা হাতের মধ্যে আছে? কাশ্মীর ছাড়া সব ওকে? তুমি এখানে শিওর করে বলতে পারবে বাংলাদেশ কিংবা বার্মা থেকে যারা ইন্ডিয়াতে ট্রেসপাসিং করছে তার মধ্যে লস্কর বা আই এস আই এস আছে কি না? কিংবা অরুণাচল”?

খান মাথুরের দিকে তাকালেন। মাথুর বললেন “বি এস এফ এখন অনেক বেশি অ্যালার্ট স্যার”।

তুষার বললেন “স্টিল ল্যাগিং। স্টিল। বর্ডার ইজ নট সিকিউরড। সব থেকে বড় কথা, কাশ্মীরে বারবার নজর কাড়ছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না বাকি সব জায়গা সেফ”।

খান বললেন “কাশ্মীর নিয়ে আমাদের বোধ হয় আরও বেশি ভাবতে হবে। অনেক নরম, অনেক ভালভাবে অ্যাপ্রোচ করার জায়গা আছে, আমি এখনও বিশ্বাস করি”।

তুষার খানের দিকে তাকিয়ে বললেন “খুব ভালভাবে বুঝেছি তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ। মিনিস্টারের সামনে বলতে পারবে?”

খান বললেন “না পারার কিছু নেই স্যার”।

তুষার মাথুরের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন “মীর্জা একসময় আমাদের সব থেকে বিশ্বস্ত অফিসার ছিল”।

মাথুর কিছু বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন।

১৫।

এগারোটা নাগাদ জ্যেঠু বেরোল। কাকিমা রান্না করছিল। মিনি রান্নাঘরে ঢুকল “এই কাকিমা, চল”।

কাকিমা বলল “তুই যা। আমি পারছি না। উফ, কত কাজ জানিস?”

মিনি ঠোঁট ফুলাল “তুমি যাবে না?”

কাকিমা বলল “আজ বিশুর মা আসবে না। আমার কত কাজ জানিস?”

মিনি কাঁধ ঝাঁকাল “ওকে। আমাকে চাবিটা দাও”।

কাকিমা চোখ বড় করল “দাদার ঘরের”?

মিনি বলল “হ্যাঁ। দাও”।

কাকিমা বলল “আমি কিন্তু জানি না মিনি, যেখানকার জিনিস সেখানেই থাকা চাই”।

মিনি বলল “এই তুমি দাও তো”।

জ্যেঠু ঘরের চাবি কাকিমাকে দিয়ে গেছিল। খানিকটা ইতস্তত করে কাকিমা সেই চাবিটা মিনিকে দিল। মিনি চাবিটা নিয়ে দোতলায় উঠল। ঘরের দরজাটা খুলতে তার একটু বুক দুরুদুরু করছিল বটে কিন্তু প্রবল কৌতূহল সেই ভাবটাকে কমিয়ে দিচ্ছিল।

দরজা খুলে ঘরের আলো জ্বালল মিনি। জ্যেঠুর ঘর বরাবরই ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মিনির মনে পড়ে ছোটবেলায় অনেকটা সময় জ্যেঠুর ঘরেই কাটাত সে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্যেঠু কেমন দূর হয়ে গেল। নিজের মতই থাকে, বিয়ে থা করে নি। একটু খ্যাপাটেও হল বটে।

সবার ঘরেই একটা গন্ধ থাকে। যে গন্ধটা থাকলে মনে হয় তার ঘরে এলাম। জ্যেঠুর ঘরে চিরকালই একটা চন্দনের গন্ধ থাকে। জ্যেঠু না থাকলেও সে গন্ধটা যেন আবছাভাবে ছিল।

বেশ বড় ঘর। বইয়ের একটা বড় আলমারি। একটা ডবল বেড খাট। খাটের সামনেই টিভি।

মিনি আলমারির দিকে এগোল। বেশ খানিকক্ষণ আলমারির বইগুলো দেখল। জ্যেঠু বরাবরই বই পত্র পড়তে ভালোবাসে। শেয়ার বাজারেরও বেশ কিছু বই আছে। বিশ্ব সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, সুনীল, শীর্ষেন্দুর সঙ্গে নতুন সংযোজন বেশ কয়েকটা ধর্মের বই। মিনি দেখল কোরান ছাড়াও বাইবেল, গীতাও আছে। জ্যেঠুর পড়াশোনার পরিধি বরাবরই অনেকটা বেশি। ক্লাস নাইনে জ্যেঠু কয়েকদিন বাংলা ব্যাকরণ দেখিয়েছিল। আলমারিতে তেমন কিছু পেল না।

মনে পড়ল ওষুধের বাক্সের কথা। খাটের পাশেই সেটা রাখা। মিনি ভাল করে খুঁজল। কালকের লিফলেটটা পেল না। তবে কি লুকিয়ে ফেলল জ্যেঠু?

কী এমন গুরুত্বপূর্ণ লিফলেটটা যে লুকিয়ে ফেলতে হবে? মিনি বেশ খানিকক্ষণ ঘরের চারদিকে তাকাল। কোথাও লিফলেটটা নেই। কী মনে হতে খাটের তোষকটা তুলতেই মুখে হাসি ফুটে উঠল তার। একগাদা বিলের সঙ্গে লিফলেটটাও আছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না লিফলেট দেখে। মিনি পায়চারি শুরু করল। লিফলেটটা নিয়ে যাওয়া চলবে না। জ্যেঠু বুঝে যাবে। কয়েক মিনিট হাঁটাহাঁটি করে সে তড়িঘড়ি নিচে নেমে গেল।

কাকিমা দেখে বলল “কী হে ফেলুদি, তল্লাশি হল?”

মিনি কাকিমার কথার উত্তর দিল না। জোর পায়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। মোবাইলটা নিয়ে আবার দোতলায় গেল।

মোবাইলটা নিয়ে লিফলেটের ফটো তুলে তোষকটা আগের মত সাজিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে নিচে নেমে গেল।

জ্যেঠুর এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা না তবু তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল।

রান্নাঘরে ঢুকে টুল পেতে বসল।

কাকিমা বলল “কীরে কী হল?”

মিনি বলল “জল দাও তো। কেন জানিনা খুব টেনশন হচ্ছে”।

কাকিমা কোন কথা না বলে জলের বোতলটা এগিয়ে দিল তাকে। মিনি এক ঢোকে অনেকটা জল খেয়ে মোবাইলটা বের করে গ্যালারি খুলে কাকিমাকে দেখাল "এই দেখ"।

কাকিমা লিফলেটের ছবিটা দেখে অবাক হয়ে বলল "কী এটা?"

মিনি বলল "তোমাকে বলেছিলাম না জ্যেঠুর ঘরে এই লিফলেটটা কাল আমি দেখেছিলাম। এখন গিয়ে দেখি নেই। তারপর দেখলাম তোষকের তলায় লুকনো"।

কাকিমা গালে হাত দিল "তুই তোষকের তলাও সার্চ করেছিস?"

মিনি বলল "দেখো না দেখো না, কিছু বুঝতে পারছ কী লেখা আছে?"

কাকিমা বলল "ধুস, আমি কী করে বুঝব কী লেখা আছে? আমি এসব ভাষা বুঝি নাকি?"

মিনি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে হাসি মুখে বলল "আইডিয়া"।

কাকিমা বলল "কী?"

মিনি বলল "আমাদের ক্লাসের মেহেজাবিন আরবী জানে। ওকে জিজ্ঞেস করি কী

লেখা আছে। করি?"

কাকিমা মিনির দিকে তাকাল "মেহেজাবিন কাউকে বলে দেয় যদি?"

মিনি বলল "না না, বলবে না। আমরা খুব ভাল বন্ধু। দাঁড়াও এক মিনিট"।

মিনি মেহজাবিনকে হোয়াটস অ্যাপে ছবিটা পাঠাল। মেহেজাবিন অনলাইনই ছিল। ছবিটা দেখে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তাকে কলব্যাক করল, মিনি হুড়মুড় করে ফোনটা ধরল "হ্যারে, দেখলি যেটা পাঠালাম?"

মেহেজাবিন ভয়ার্ত গলায় বলল "এসব কোত্থেকে পেলি তুই?"

মিনি একটু থমকে গেল। বুঝল লিফলেটটায় কিছু একটা চাপের ব্যাপার আছে। বলল "আরে এই তো আজ খবরের কাগজের সঙ্গে এসেছে। ভাবলাম কিছুই তো বুঝতে পারছি না ভাষা তোকে পাঠাই। কেন রে কী লেখা আছে?"

মেহেজাবিন বলল "আরে এ তো ডেঞ্জারাস জিনিস। কাশ্মীর কী আজাদি, ভারত কী বরবাদি এসব লেখা। এসব জিনিস আজকাল কাগজের সঙ্গে দিচ্ছে? কী সর্বনাশ?!"

মিনি বড় বড় চোখ করে কাকিমার দিকে তাকাল। কাকিমা ইশারায় জিজ্ঞেস করল "কী?"

মিনি মেহজাবিনকে বলল "ওকে ওকে তুই ওটা ডিলিট করে দে শিগগিরি আমি লিফলেটটা ছিঁড়ে দিচ্ছি এখনই, কাউকে কিছু বলবি না কিন্তু"।

মেহজাবিন বলল "কী যে করিস, আচ্ছা শোন, আমি আজ কলেজ ডুব মেরেছি"।

মিনি হি হি করে হেসে বলল "আমিও"।

মেহজাবিন বলল "কী করছিস?"

মিনি বলল "পরে বলছি রাখছি এখন"।

মেহজাবিন কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে দিল মিনি।

কাকিমা বলল "কী রে কী হয়েছে?"

মিনি কাকিমার দিকে তাকিয়ে হাসির ভাব করল "কিছু না কিছু না, এমনি টুথপেস্টের অ্যাড ওটা"।

১৬।

দিল্লি এয়ারপোর্টেই বসে ছিল বীরেন। তার মাথা কাজ করছিল না। সে ভাবতেই পারছিল না যে জায়গা ছেড়ে খানিকক্ষণ আগেই সে এসেছে সেখানে এত বড় একটা কান্ড হয়ে যাবে।

টিভিতে যে গাড়িটা দেখাচ্ছিল, কেন জানে না তার মনে হচ্ছিল ওই একই গাড়িতে তাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে এসেছেন মীর্জা। যদি তদন্ত হয়, যদি সিসিটিভি ফুটেজে তার ছবি থাকে তবে?

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এয়ারপোর্টের ভেতরেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হচ্ছিল তার কপালে। ঘন্টাখানেক চুপচাপ বসে থেকে ফোনটা অন করল বীরেন। বেশ কয়েকটা মেসেজ এসেছে মোবাইলে। সবক'টাই জ্যোতির্ময়ের।

"কোথায়?"

"স্টিল নট রিচড?"

"কল শার্প"। ইত্যাদি।

সে ফোনটা নাড়াচাড়া করতে করতে জ্যোতির্ময়কে ফোন করল। একটা রিং হতেই ফোনটা তুললেন জ্যোতির্ময় "এতক্ষণ কী হয়েছিল? ফ্লাইট তো ঘন্টা খানেকেরও বেশি হয়ে গেল পৌঁছেছে"। গলায় ধমকের ভাব স্পষ্ট।

বীরেন বলল "চার্জ চলে গিয়েছিল। এয়ারপোর্টেই চার্জ দিলাম। আমি কি কলকাতা ফিরব এবার?"

জ্যোতির্ময় বললেন "কেন? আমি বলেছি তোমায় ফিরতে?"

বীরেনের মাথাটা গরম হল খানিকটা "কোথায় যেতে হবে তবে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "তোমার কাছাকাছি টিভি আছে? কাশ্মীরে কী হয়েছে দেখেছ?"

বীরেন থতমত খেয়ে মিথ্যা করেই বলল "না, আমি জানি না তো! কী হয়েছে কাশ্মীরে?"

জ্যোতির্ময় কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন "যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে। যা হবে ভালর জন্যই হবে। শোন, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাও, বাইরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, নাম্বার ডিল এল ১৪২৪। হোটেল সেন্টিনেলে তিনশো পাঁচ নাম্বার রুম বুক করা আছে সায়ক বড়ালের নামে। রাতটা ওখানেই কাটাও। আর যে প্রিপেড সিমটা আছে কলকাতার, ঐ সিমটাই মোবাইলে ভরে নাও। এই সিমটা কোথাও ডাস্টবিন দেখে নষ্ট করে ফেলে দাও"।

বীরেন বলল "যদি আমি আপনার কথা না শুনে বাড়ি চলে যাই এখন?"

জ্যোতির্ময় ঠান্ডা গলায় বললেন "যেতে পারো, কোন চাপ নেই। তবে তোমার বোন এখন শান্ত স্যারের কোচিঙে গেছেন, তাই না?"

বীরেনের হঠাৎ করে খুব ঠান্ডা লাগতে লাগল। সেই পুরনো অস্বস্তিটা ফিরে আসছিল যেটা জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কথা বললেই তার হয়। সে বলল "যাচ্ছি। রাখছি এখন"।

ফোনটা রেখে মুখ ঢেকে খানিকক্ষণ বসে থেকে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোল সে। এয়ারপোর্টের বাইরে থেকে একটা ট্যাক্সিকে বলতেই যেতে রাজি হয়ে গেল ট্যাক্সিওয়ালা। ব্যাগটা সিটের পাশে রেখে চোখ বুজল সে। পাশে চলে যাওয়া কর্মব্যস্ত দিল্লি শহরের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করছিল না। বাড়িতে ফোন করল কিছুক্ষণ পরে। বাবা ধরল, গলায় উত্তেজনা "কীরে তোর খবর কী?"

বীরেন বলল "একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম না, হঠাৎ করে ডাক এসে গেছে দিল্লি থেকে। চলে এলাম"।

বাবা অবাক গলায় বলল "টাকা পেলি কোথায়? কীসে গেলি?"

বীরেন বলল "বন্ধুদের থেকে ধার করলাম। প্লেনেই চলে এলাম। কাল সকালে ইন্টারভিউ"।

বাবা গম্ভীর গলায় বলল "সে কথাটা একবার আমাকে ফোন করে বলে দিলে কী হত? আমরা কী চিন্তা করি না নাকি? যখনই ফোন করি বলে ফোন অফ। তোর মাকে তো জানিস, খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।"

বীরেন বলল "আর বোল না, ফোনের চার্জার নিয়ে আসি নি তো, চার্জারের ঝামেলায়..."

বাবা ধমক লাগাল "থাম, অন্য কারো একটা ফোন জোগাড় করে ফোন করা যায় না? এসব অজুহাত দিতে হবে না। শোন এখন মাকে দিচ্ছি না, ফোন ধরলেই তো চিৎকার জুড়বে। তুই মন দিয়ে ইন্টারভিউটা দে। বেরিয়ে ফোন করবি, তখন মার সঙ্গে কথা বলাব"।

বীরেন "আচ্ছা বাবা" বলে ফোনটা রাখল। তার কান্না পাচ্ছিল খুব।

অরিত্রি ফোন করছে। বীরেন ধরল "হ্যাঁ বল"।

অরিত্রি বলল "তুই কোথায়?"
বীরেন বলল "আছি এক জায়গায়। কী হয়েছে বল"।
অরিত্রি বলল "তোকে তো বলাই হয় নি কাল কী হয়েছে। যা তা কান্ড ঘটেছে"।
বীরেন বলল "আমার এখন শোনার সময় নেই। রাখছি"।
অরিত্রি অবাক হয়ে গেল "কেন? কী এমন রাজ কাজ করছিস যে তোর শোনার সময় নেই? কোথায় আছিস তুই?"
বীরেন বলল "পরে বলছি। রাখলাম এখন"।
বীরেন ফোনটা কেটে দিল। অরিত্রি আবার ফোন করছিল বীরেন ধরল না।
ট্যাক্সি ড্রাইভার হঠাৎ স্পষ্ট বাংলায় বলে উঠল "ভাইজান কি কলকাতার?"
বীরেন অবাক হয়ে বলল "হ্যাঁ, আপনিও?"
ট্যাক্সি ড্রাইভার হে হে করে খানিকটা হেসে বলল "না না ভাই, আমি কলকাতার না"।
বীরেন বলল "তবে?"
ড্রাইভার বলল "আপনাগো কাছেই থাকি। তবে পাসপোর্ট লাগে। আমার বাড়ি নোয়াখালি"।
বীরেনের অবাক হবার পরিমাণ বাড়ল, "তবে? এখানে কী করে এলে?"
ড্রাইভার বলল "সে ভাইজান অনেক কথা"।
বীরেন কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে গেল। ড্রাইভার বলল "আর কিছু করি না করি হিন্দিটা ভাল শিইখ্যা লইছি। কাম হয় প্রচুর। তবে বাঙালি দেখলে খুশি হই। কেমন একটা টান আসে ভাইজান"।
বীরেন বলল "তোমার নাম কী?"
ড্রাইভার বলল "সুমন। হিন্দু"।
বীরেন বলল "ওপারে কোন অত্যাচার..."
ড্রাইভার মাথা নাড়ল "না না সেসব না ভাই। ওপারে আসলে কিছু ছিল না আমাগো। মা আর বাবা ভিটা আগলাইয়া ছিল। মামা মাসী, কাকা কাকীরা সবাই বারাসাত মধ্যমগ্রামে বাড়ি করসে। আমরাই যাই না। মা চইল্যা যাবার পর একদিন বাবা কইল চ, আর এই দেশে মন টেকে না। চইল্যা আইলাম"।
বীরেন বলল "চলে এলে মানে? কোন অসুবিধা হল না?"
সুমন দাঁত বের করল "না ভাই, বনগাঁ বর্ডারে লোক আসে। সে শাহেনশা লোক। বিডি আর বি এস এফ এদিক থিক্যা ওদিক গেলেই পার কইর‍্যা দেবে। আইসা কিছুদিন বারাসাত ছিলাম, তারপর এক এজেন্সী ধইর‍্যা দিল্লি চইল্যা আইসি"।
বীরেন ট্যাক্সির সিটে ক্লান্ত মাথা রাখল "তা ভালই করেছ যা করেছ"।
সুমন বকবক করতে লাগল। বীরেন চুপচাপ বাইরের দিল্লি দেখছিল। সুমন একটা ঘিঞ্জি গলির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল "রিক্সা লইয়া চইল্যা যান ভাই। গলির ভেতরে। আপনার আমারে দরকার হইলে ফোন নাম্বার রাইখা দিন। ফোন কইর‍্যা লইবেন। লেহেন"।
সুমনের নাম্বার মোবাইলে নিয়ে নিল বীরেন। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে এগোল।

১৭।

মিনি ঘরে চুপচাপ বসেছিল। ঠিক কী করতে হবে, কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না। কাকিমা যখন জিজ্ঞেস করল তখন কেন যে সে মিথ্যা বলল তা নিজেও বুঝতে পারছিল না। ভীষণভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল সে।
মা ফোন করছিল, ধরবে না ধরবে না করেও ধরল, "বল মা"।

ওপাশ থেকে মার রাগী গলা ভেসে এল "কীরে, তুই কী শুরু করেছিস? কলেজ না গিয়ে বাড়িতেই ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিস?"

অন্যান্য দিন হলে কিছু না কিছু একটা ঠিক বুঝিয়ে দিত মাকে। আজ পারল না।

মিনি বলল "ওই ইচ্ছা করছিল না"।

"ইচ্ছা করছিল না মানে? কী বলছিস তুই?"

মিনি বলল "মা শোন না, তুমি কবে আসবে? আজ আসতে পারবে?"

মা অবাক হল "কেন? কী হয়েছে? কী করলি আবার?"

মিনি বলল "ভাল লাগছে না"।

মা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "ছেলেটা কে?"

মিনি বলল "ছেলে নেই কোন"।

"তবে?"

মিনি বলল "আছে ব্যাপার। ফোনে বোঝাতে পারব না। তুমি এলে তারপরে বলব"।

মা বলল "বেশ। তবে আজকে হবে না। কাল সকাল সকাল পৌঁছে যাব"।

মিনি বলল "ঠিক আছে। রাখছি"।

মা বলল "আচ্ছা, শোন না, একটু বল কী ব্যাপার? নইলে টেনশনে পড়ে যাব। এখানেও কম টেনশন যাচ্ছে না। মামীর শরীর খুব একটা ভাল না। ওভারিতে একটা টিউমার ধরা পড়েছে। মনে হয় ওভারি কেটে বাদ দিতে হবে। তুই আর টেনশন বাড়াস না তো!"

মিনি উঠে দরজা বন্ধ করে খাটে বসল "আচ্ছা, বলছি, শোন না মা, জ্যেঠুর আচরণ না একটু না কেমন কেমন লাগছে"।

মা বলল "কেন কী হয়েছে? তোকে বা তোর কাকীমাকে কিছু বলেছে? জানিসই তো তোর জ্যেঠু একটু..."

মিনি মাকে থামিয়ে দিয়ে বলল "না সেসব কিছু না। আচরণটা একটু অন্যরকম।

তুমি দেখেছ আজকাল জ্যেঠুর কাছে কীরকম টাইপের লোকজন আসছে? কোথাকার কোথাকার কেমন কেমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত লোক। তুমি তো কাল ছিলে না, একটা ছেলে এসে বলল এটা কী সায়ক না কার বাড়ি। আমি আর কাকিমা তো কিছুই বুঝলাম না। জ্যেঠুর কাছে পাঠালাম। জ্যেঠু আবার ছেলেটাকে খাওয়াতে বলল। ছেলেটা কেমন ভয়ে ভয়ে খেল। তারপর কোথায় যেন চলে গেল। পাড়ার কেমন কেমন সব ছেলেরা আমাদের বাড়িতে আসে আজকাল। তাছাড়া..."

মা বলল "তাছাড়া আবার কী?"

মিনি বলল "জ্যেঠু একটা লিফলেট লুকিয়ে রেখেছিল তোষকের তলায়। তাতে কীসব দেশবিরোধী কথা লেখা আছে। আমার সবকিছু একটু অদ্ভুত লাগছে মা"।

মা হাসল "ধুস পাগলী, তুই একটা পাগলীই থেকে গেলি। আরে তুই জানিস না তোর জ্যেঠুর একটু মাথাখারাপ আছে? অকারণ ভয় পাস না তো! ছুটি যখন নিয়েছিস তখন মন দিয়ে পড় না ঘুমিয়ে। আমি রাখলাম এখন, কাল আসছি"।

দরজাটা কেউ নক করছিল। মিনি বলল "ফোনটা রাখি মা, কেউ এসেছে মনে হয়"।

মা বলল "ঠিক আছে। রাখি এখন"।

ফোনটা কেটে মিনি দরজা খুলে দেখল জ্যেঠু দাঁড়িয়ে আছে। নিজের অজান্তেই তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জ্যেঠু ঠান্ডা গলায় বলল "আমার ঘরে গেছিলি?

১৮।

ঘিঞ্জি জায়গা হলেও হোটেলটা ভাল। পরিচ্ছন্ন। বীরেন ঘরে ঢুকে জামা কাপড় না ছেড়েই খাটে শুয়ে পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার পরে টিভি চালাল। টিভিতে বার বার নিউজ চ্যানেলে কাশ্মীরের ঘটনাটাই দেখাচ্ছে। জানা গেছে এই আত্মঘাতী হামলায় গাড়ির ভেতরে যে ছিল সেও বাঁচে নি। তাকে সনাক্তকরণই করা যায় নি এত বড় মাপের বিস্ফোরণ হয়েছে।

সে বাংলা নিউজ চ্যানেল দিল। যে চারজন জওয়ান মারা গেছে তার মধ্যে একজন পশ্চিমবঙ্গের। মা আর বউয়ের কান্না দেখাচ্ছে। বাবা ভাঙা গলায় বলছে ছেলে কিছুদিন আগেই বিয়ে করেছে। ভাল করে সংসার করার আগেই চলে গেল। বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে। সংসারটা ভেসে গেল। দেশের জন্য ছেলেটা না হয় শহীদ হল কিন্তু বাকি জীবনটা তার বাবা মা কী নিয়ে থাকবে আর?

বীরেনের বমি পেয়ে গেল। সে টিভি বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে বমি করে কল চালিয়ে তার তলায় মাথা দিয়ে বসে থাকল। টাওয়েল জড়িয়ে ঘরে এসে কয়েক মিনিট স্থির হয়ে বসেছিল এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

বীরেন ব্যাগটা হাতড়ে ব্যাগ থেকে একটা টি শার্ট আর হাফ প্যান্ট তাড়াতাড়ি পরে দরজা খুলল। বাইরে একজন ফর্সা মত ছেলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। বীরেন জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল। ছেলেটা বাংলাতেই বলল "আমি রাকেশ। খামটা দিন"।

বীরেন ব্যাগ থেকে খামটা বের করে দিল।

রাকেশ বলল "মীর্জা বেঁচে আছেন। চিন্তা করবেন না"।

বীরেন চমকে ছেলেটার দিকে তাকাল। রাকেশ রুমের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল "বসুন। চিন্তার কিছু নেই। আমিও বাঙালি"।

বীরেন বুঝল ছেলেটাকে জ্যোতির্ময়ই পাঠিয়েছেন। সে সোফায় বসে রাকেশের দিকে তাকাল।

রাকেশ বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল "হোটেলের রুম সার্ভিসে ফোন করলেই আপনি যা চান তাই অর্ডার করতে পারবেন। চিন্তা করার কিছু নেই। টাকা দিতে হবে না"।

বীরেন রাকেশের দিকে তাকাল। এরা কি তবে জঙ্গী? তাকেও ধীরে ধীরে নিজেদের সবকিছুতে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে?

সে বলল "মীর্জা বেঁচে আছেন আপনি কী করে জানলেন?"

রাকেশ সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল "ভোর চারটে পঞ্চান্ন। ইন্ডিগোর ফ্লাইট"।

বীরেন অবাক হয়ে বলল "মানে?"

ছেলেটা পকেট থেকে একটা ব্যাগ থেকে একটা প্রিন্ট আউট বের করে তার হাতে দিয়ে বলল "ই টিকিট আছে। আই কার্ড নিয়ে রাত দুটোর সময় এয়ারপোর্টে ঢুকে যাবেন। একটা নাগাদ হোটেলের নিচে রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকবে। সে বড় রাস্তায় নিয়ে যাবে। সুমনকেই বলা আছে। ও আপনাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দেবে। চেক ইন করে বোর্ডিং পাস নিয়ে নেবেন"।

বীরেন কয়েক সেকেন্ড ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল "কোলকাতা যাব তো?"

রাকেশ হাসল "নাহ, মুম্বই। যে ব্যাগ আছে সেটা নিয়েই যাবেন। আর ব্যাগ চেঞ্জ করতে হবে না। সুমন আপনাকে একটা রেন কোট দিয়ে দেবে। ওটা ব্যাগে ভরে নেবেন। মুম্বইতে এখন মারাত্মক বৃষ্টি হচ্ছে"।

বীরেন রেগে গেল "ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি? আমি যেতে বাধ্য নই"।

রাকেশ বলল "কেন বলুন তো অকারণ রেগে যাচ্ছেন? কিছু করতে পারবেন রেগে গিয়ে? ঘুরছেন যখন ঘুরুন না। অত চিন্তা করার তো কিছু নেই"।

বীরেন বলল "এভাবে আমাকে নিয়ে কী করতে চান আপনারা? গিনিপিগ পেয়েছেন? আমাকে... মীর্জার সঙ্গে কথা বলান। আমি জানতে চাই উনি সত্যিই বেঁচে আছেন কী না"।

রাকেশ বলল "মুম্বইতে পৌঁছে বলে নেবেন। চিন্তার কিছু নেই"।

বীরেন বলল "আপনারা... টেরোরিস্ট?"

রাকেশ বীরেনের কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট ব্যাগ বের করে সামনের টেবিলে রেখে বলল "একটা ছোট কাজ আছে। হোটেল থেকে বেরনোর সময় আপনার পাশের রুমের দরজায় এই ব্যাগটা নামিয়ে দিয়ে চলে যাবেন"।

বীরেনের ইচ্ছা হচ্ছিল রাকেশকে মেরেই ফেলে। শুধু বার বার মার মুখটা মনে পড়ছিল বলে সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। রাকেশ উঠল, "এই হোটেলে কলকাতার শেফ আছে, দারুণ বিরিয়ানি বানায়, খেয়ে নিন, মিস করবেন না"।

বীরেন বলল "মুম্বই থেকে আবার কোথায় পাঠাবেন আমাকে? চেন্নাই?"

রাকেশ বলল "জানি না, স্যার যেভাবে বলবেন গোটা ব্যাপারটাই সেভাবে হবে"।

বীরেন বলল "আপনার বাড়িতে কেউ নেই? বাবা মা ভাই বোন? আপনার মনে হয় না কাউকে ব্ল্যাকমেল করে এভাবে কাজ করানো যায় না?"

রাকেশ বলল "আপনাকে কোন কাজ দেওয়া হয় নি তো এখনও"।

বীরেন বলল "এই যে ব্যাগটা নামাতে বললেন?"

রাকেশ বলল "ধুস, এটা কোন কাজ হল নাকি! যাক গে, ভুলবেন না। খেয়ে দেয়ে এখনই ঘুমিয়ে নিন। মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে নিন"।

বীরেন কয়েক সেকেন্ড রাকেশের দিকে তাকিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল "গো টু হেল"।

রাকেশ হাসতে হাসতে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

১৯।

একটা স্টেশনে সে ওভারব্রিজে উঠতে যাচ্ছিল, খানিকটা ওঠার পর দেখল সেটা বাতিল ওভারব্রিজ। ওভারব্রিজের মেঝেটা যে কোন সময় ভেঙে পড়বে। সে তড়িঘড়ি নেমে স্টেশন থেকে বেরোতে চাইছে, খেয়াল হল প্রতিটা এক্সিটে টিকিট চেকার দাঁড়িয়ে আছে আর তার কাছে কোন টিকিট নেই। চারদিকের সব লোক তাকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখছে, কেউ একজন পুলিশকে খবর দিয়েছে। সবাই তাকে ঘিরে ধরছে।

স্বপ্নটা দেখে ধড় মড় করে উঠে বসল বীরেন। রুমে এসি চলছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ঘেমে যাচ্ছিল।

আলো জ্বেলেই ঘুমিয়েছিল সে। মোবাইলে দেখল রাত বারোটা বাজে। দশটায় ঘুমিয়েছিল। বুঝতে পারছিল ঠিক ঠাক ঘুম হয়ত আর এ জন্মে হবে না তার। উঠে মুখ ধুয়ে খানিকক্ষণ বসে গীজার চালিয়ে গরম জল করে স্নান করে তৈরী হল সে। চোখের তলায় কালি জমছে আয়নায় দেখা যাচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে ঘরে এসে ব্যাগ খুলল। সায়ক বড়াল। আধার কার্ড আর প্যান কার্ড। কার বাপের সাধ্যি বলবে এটা তার না? সুন্দরভাবে তার ছবি লাগানো আছে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ সে হোটেলের রুম লক করল। ছোট ব্যাগটা পাশের রুমের দরজায় রাখল।

রিসেপশনের ভদ্রলোক টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। তাকে ঘুম থেকে তুলে চাবিটা দিয়ে হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। ধরল সে "হ্যালো"।

"আপনি তো দেখছি বাঙালির কলঙ্ক"।

"কেন?"

"আধঘন্টা আগে তৈরী হয়ে নিচে নেমে গেছেন। বাই দ্য ওয়ে, ব্যাগটা..."

"রেখেছি"।

"গুড। দেখুন হোটেলের সামনে দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। একজনের নাম সেলিম। দুজনেই ঘুমাচ্ছে অবশ্য। যার দাড়ি আছে তার নাম সেলিম। ওর ঘুম সহজে ভাঙে না। স্ট্রেট গিয়ে ওর পেটে একটা খোঁচা

দিন। উঠে যাবে। সুমন দাঁড়িয়েই আছে। হ্যাপি জার্নি"।

ফোনটা কেটে গেল।

বীরেন ফোনটা পকেটে রেখে দেখল হোটেলের সামনেই দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। সেলিমকে দেখেই বুঝতে পারল। এগিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে বলল "সেলিম"।

সেলিম শুনল না। সম্ভবত আগের জন্মের আনারকলির স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল। বীরেন সেলিমের পেটে জোরে একটা খোঁচা দিল।

সেলিম ধড়মড় করে উঠল "কউন মাদার..."

বলতে বলতে তার দিকে তাকিয়েই আর কোন দিকে না তাকিয়ে রিক্সার যাত্রীর জায়গা থেকে নেমে চালকের সিটে উঠে বসল। বীরেন রিক্সায় উঠল। সেলিম কোন কথা না বলে রিক্সা এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

সারাদিনের ঘিঞ্জি চাঁদনি চক রাত পৌনে একটাতেও ঘুমায় নি। অনেক দোকানই খোলা। কাবাবের দোকানগুলোতে এখনও ভিড়।

কোন কোন দোকানে কাজ চলছে। পুরনো দিল্লির একটা অদ্ভুত আমেজ আছে ছোটবেলায় শুনেছিল বীরেন। সে আমেজের খানিকটা দেখতে পেলেও উপভোগ করার মত জায়গায় সে ছিল না।

খানিকক্ষণ পরেই বড় রাস্তায় রিক্সা এসে দাঁড়াল। বীরেন রিক্সা থেকে নামতেই সেলিম একটা কথাও না বলে রিক্সা ঘুরিয়ে চলে গেল। সুমন তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল "আসেন ভাইজান। জলদি"।

বীরেন রাস্তা পেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। দেখল সিটের ওপর যত্ন করে একটা রেইনকোট রাখা। বীরেন বলল "এটা..."

সুমন বলল "ব্যাগে ভইরা নেন। বোম্বে তে হেবি বৃষ্টি হইত্যাসে। গাঁড় সেইক্যা যাওয়া বৃষ্টি"।

বীরেন আর কথা না বলে রেইনকোটটা তার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল।

সুমন গাড়ি স্টার্ট করে বলল "সাহিল ভাই যে কী করে বুঝি না। আপনের হোটেলে যাওয়ার দরকার ছিল না কোন। এয়ারপোর্টে রাখলেই তো পারত"।

বীরেন বলল "সাহিল কে?"

সুমন জিভ কাটল "ওহ, রাকেশ ভাই"।

বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। মধ্যরাতের দিল্লি।

দেশের রাজধানী। ভেবেছিল বাড়ির সবাইকে নিয়ে ঘুরতে আসবে। এভাবে, বিনা নোটিশে, কোন কিছু না জেনে যে এভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নি সে।

সুমন একাই বক বক করছিল। বাকি রাস্তা বীরেন কোন কথা বলল না আর।

চোখ বন্ধ করে বসে থাকল।

রাস্তা ফাঁকা ছিল। এয়ারপোর্ট পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। সুমন বলল "যান ভাই, সাবধানে যান"।

ট্যাক্সি থেকে নামল বীরেন।

এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

২০।

খুব টেনশন হলে মিনির মাইগ্রেনের ব্যথাটা আবার বেড়ে যায়। জ্যেঠুর প্রশ্নটা শুনে তার ঠিক সেটাই হল।

অন্য সময় হলে ব্যথাটা নিয়ে ছটফট করত, এবারে ব্যথাটাই তাকে বাঁচিয়ে দিল। জ্যেঠুর প্রশ্নর উত্তরে ফ্যাকাসে হেসে কোনমতে বলল "হ্যাঁ, স্যারিডন খুঁজতে গেছিলাম"।

জ্যেঠু তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল "ওহ, ঠিক আছে। তবে এভাবে জলের মত স্যারিডন খাওয়া কিন্তু মোটেই ভাল নয় মিনি। তোর মা ফিরুক, আমি বলে দিচ্ছি ডাক্তার রায়কে একবার দেখিয়ে

নে"।

মিনির দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে কিছুতেই জ্যেঠুর সামনে স্বাভাবিক হতে পারছিল না। বলল "আচ্ছা, সে দেখা যাবে, আমি একটু ঘুমাই জ্যেঠু"।

জ্যোতির্ময় যেতে যেতে বললেন "ঠিক আছে। তবে আমি এবার স্যারিডনের স্ট্রিপটা লুকিয়ে রাখব। তুই আর পাবি না"।

মিনি দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে বসল।

মেহজাবিন ফোন করছে। মিনি ধরল, "বল"।

মেহজাবিন বলল "শোন না, এই জাস্ট মনে পড়ল, তিন চারদিন আগে, এরকম সেম লিফলেট আমি কোথাও একটা দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না"।

মিনি হাসার চেষ্টা করল "ধুস, তুই এখনও লিফলেটটা নিয়ে চাপ নিয়ে আছিস। অত ভাবিস না তো!"

মেহজাবিন বলল "চাপ নেবো না? তুই জানিস, এই দেশে থেকেও আসলে আমাদের কতরকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়? একটুখানি টেনশন হলেই, কিংবা কোথাও সমস্যা তৈরী হলেই ঠারে ঠোরে বোঝানো শুরু হয়ে যায় এই দেশটা আসলে আমাদের না। পাকিস্তানে চলে গেলেই তো পারি। আজকে ভাব তো, এই লিফলেটটা তোর জায়গায় যদি আমি তোকে পাঠাতাম, আর তাতে এসব কথা লেখা থাকত, তাহলে কী হত? তোরা তো ভেবেই নিস, বাই ডিফল্ট এই দেশে থেকে আমরা দেশবিরোধী কাজ করে বেড়াই"।

মিনি রেগে গেল "ধুর পাগলী, তুই থাম তো, কী যা তা বলে যাচ্ছিস, এদেশ ওদেশ আবার কী, এসব তোর মাথায় কে ঢোকায়?"

মেহজাবিন বলল "কে আবার ঢোকাবে, প্রতিটা সময়, প্রতিটা মুহূর্তেই বুঝতে পারি। এখন সহ্য করে নিতে শিখছি"।

মিনি বলল "শোন, আর কে কী বলল জানি না, তবে আমি অন্তত কোনদিন এসব ভেবে তোর সঙ্গে কথা বলি নি। তুই দয়া করে এসব নিয়ে বেশি ভাবিস না"।

মেহজাবিন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "আমি জানি তুই ভাবিস না। কিন্তু আমি বুঝতে পারি অনেকেই ভাবি। ক্লাসের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে সেদিন ইন্ডিয়া পাকিস্তান খেলার দিন দেখলি তো অর্ঘ্য কেমন হঠাৎ করে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কাকে সাপোর্ট করছি। আমি যখন উলটে জিজ্ঞেস করলাম তুই কাকে সাপোর্ট করছিস তখন চুপ করে গেল। হ্যাঁ, আমি জানি, অনেকেই আছে যারা এদেশে থেকেও পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে, ইনফ্যাক্ট আমি নিজের চোখেও দেখেছি তাদের, কিন্তু সেসব অশিক্ষিত অ্যান্টি সোশ্যালদের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলবে কেন বল তো? আমি তো তোদেরই বন্ধু। আর পাঁচ জনের সঙ্গে আমাকে সব সময় আলাদা করে আইডেন্টিফাই করে রাখা হবে কেন?"

মিনি বলল "শোন, মা, তুই চিল মার। ফ্রিজ থেকে একটা কোল্ড ড্রিংক বের করে খেয়ে তোর ঘুমিয়ে পড়। যত্তসব ভুল ভাল কথা ভেবে চলেছে পাগলীটা। কাল কলেজ আয়, তোর কান দুখান মুলে দি। শোন, কিছু লোক আছে যারা সব সময় দুটো দলের মধ্যে টেনশন তৈরী করেই যায়। যেখানে হিন্দু মুসলিম আছে, সেখানে ভারত পাকিস্তান, যেখানে দুজন হিন্দু আছে সেখানে বাঙাল ঘটি। আমরা তো বাঙাল, কত লোকের থেকে শুনেছি কেন আমরা এই দেশে আছি, আমাদের তো আসলে বাংলাদেশেই থাকা উচিত ছিল। কোই, আমি তো তাদের কখনই পাত্তা দিই নি। আমি জানি, তাদের কাজই হল এই জিনিসগুলো করা। সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুকে পার্থক্য করা। আমরা ট্যাক্স দিয়ে থাকি, নিজেদের যোগ্যতায় আমাদের বাবা কাকারা চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। কোন সিচুয়েশনে, কেন একটা দেশ ছেড়ে মানুষজনকে চলে আসতে হয়েছিল, সেই সেনসিটিভ ইস্যুটা নিয়ে ক'টা লোক ঠিক ঠাক ভাবে ভেবে দেখে? মানুষের মনের গভীরতাই বা কতটুকু? একটা বউদির ক্লিভেজ নিয়ে নাল পড়া লোক রবীন্দ্রনাথকে বউদিবাজ বলে দেগে দিলে

রবীন্দ্রনাথের গায়ে কি এতটুকুও কালির দাগ পড়ে? তুই খামোখাই সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছিস। এসব ছাড়। দেশ কার হয়? যে সময় মানুষ এই পৃথিবীতেও আসে নি তখনই বা কোন দেশ কাদের ছিল? কেউ কিছু বললে জাস্ট একটা কথাই ভাব। কে কী বলল, তাতে আমার ছেঁড়া যায়।"

মেহজাবিন হেসে ফেলল "ভাল লাগল তোর কথাগুলো। তবে শোন, লিফলেটটায় কিছু একটা স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা লেখা ছিল, তখন খুব একটা আমল দিই নি, কারণ কথাগুলো ছোট ছোট করে লেখা ছিল। এই তোর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মনে পড়ল"।

মিনি অবাক হয়ে বলল "স্বাধীনতা সংগ্রাম? সে আবার কী?"

মেহজাবিন বলল "আমি বুঝলাম না তেমন কিছু। ক্লিয়ার না ব্যাপারটা"।

মিনি একটু চুপ করে বলল "হবে কিছু একটা আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না তেমন"।

মেহজাবিন বলল "তার আগে আমি একটু ভাবার চেষ্টা করি লিফলেটটা আমি দেখেছি কোথায়। চল এখন রাখছি পরে কথা বলছি"।

ফোনটা কেটে গেল। মিনি তার মোবাইল গ্যালারি খুলে লিফলেটটার দিকে ভাল করে তাকাল।

জ্যেঠুর কাছে এই লিফলেট কী করছে?

২১।

শেষ কবে ভোর রাতে এরকম দৌড়াদৌড়ি করেছিল মনে করতে পারছিল না বীরেন। বিমানবন্দরে সুমন নামিয়ে দিয়ে যাবার পরে সিকিউরিটি চেকিং করে প্লেনে উঠে বসল সে।

রাত হলেও চতুর্দিকে আলোর প্রাচুর্যে কোন সমস্যা হচ্ছিল না।

এয়ার হোস্টেসদের না জিজ্ঞেস করেই নিজের জানলার ধারের সিটটায় বসে পড়ল সে। এত ভোরে হলেও প্লেনে যাত্রী ভর্তি। একবার চোখ বুলিয়ে বীরেন বুঝতে পারল অধিকাংশই ব্যবসায়ী বা উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী।

নিজেকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল তার। এমন কেউ, যার কিছুই করার নেই, শুধু যা হচ্ছে, সেই স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া।

এয়ার হোস্টেসরা জানাতে শুরু করল আপতকালীন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। পাশের ভদ্রলোক কোন কারণে উশখুশ করছিলেন। বীরেন সেদিকে না তাকিয়ে জানলার বাইরে তাকাল। একটু পরেই দিল্লি ছাড়বে সে। একটা সময় ছিল যখন ম্যাপ পয়েন্টিং করতে করতে ভাবত কবে দেশের এই শহরগুলোয় যাবে। কলকাতা হয়ে পুরী বা দার্জিলিং প্লেনে যাওয়া মানেই বিরাট ব্যাপার ছিল তার কাছে। আর এই দুদিনে প্লেনে করে দেশের এক প্রান্ত থেকে ওপর প্রান্ত দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে। অথচ পুরো ব্যাপারটাই ধোঁয়াশা হয়ে আছে। বীরেন শান্ত থাকার চেষ্টা করছিল পারছিল না।

পাশের ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে বললেন "আপনি স্মোক করেন?"

বীরেন মাথা নাড়ল।

ভদ্রলোক অসহায় ভঙ্গিতে বললেন "আমি করি। চেইন স্মোকার। এই আড়াই ঘন্টা মহা সমস্যা হবে"।

বীরেন কিছু বলল না। অন্য দিকে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন "আপনি মারাঠি?"

বীরেন ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল।

ভদ্রলোক বললেন "মারাঠি নন?"

বীরেন বলল "বাঙালি"।

ভদ্রলোক বললেন "ওহ, বাহ বাহ। টেগোর, আই লাভ মিস্টি দই এন্ড অল"।

বীরেন উত্তর দিল না। ভদ্রলোক সম্ভবত মজা করতে চাইছেন।

প্লেন রানওয়ে ধরে চলতে শুরু করেছে।

ভদ্রলোক বললেন "আমি কখনও কলকাতা যাই নি। আপনি কলকাতা থাকেন?"

বীরেন বলতে যাচ্ছিল সে কলকাতা থাকে না, পরক্ষণেই মনে পড়ল সায়ক বড়ালের ঠিকানা আসলে কলকাতার। সে আমতা আমতা করে বলল "হ্যাঁ"।

প্লেন গতি বাড়াচ্ছে, এই সময়টা অন্য কোন সময় হলে ভয় লাগত বীরেনের, এবার আর লাগল না, এরকম অনিশ্চিত জীবনে বেঁচে থাকাটাও কেমন বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে দুদিন ধরে।

শরীর হালকা হতে শুরু করল, ঠিক ঠাক টেক অফ হবার পরে প্লেনের সব কিছু স্বাভাবিক হল। পাশের ভদ্রলোক বললেন "আমি আশরফ। আপনি?"

বীরেন বলল "সায়ক"।

আশরফ বললেন "ওহ। গুড নেম"।

বীরেন বিরক্ত হচ্ছিল। এই সময় একটু চোখ বুজে নিলে ভাল হত। মুম্বইতে তার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে কিছুই জানে না সে। রাতে ঘুম হল না সেভাবে। এ ভদ্রলোকের বকবকানির ঠ্যালায় প্লেনেও আর ঘুম হবে বলেও মনে হচ্ছে না।

আশরফ বললেন "স্মোকিং করতে না পারলেই আমার খিদে পায়। কিন্তু ফ্লাইটে কুড়ি টাকার স্যান্ডউইচ দুশো টাকা নেয়। মাল্টিপ্লেক্সেও দেখেছেন তো! এদিকে আমাদের মত পাবলিক সে সবই সোনামুখ করে টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে। জাস্ট ভাবুন। বাঙালিরা কিন্তু খুব ইন্টেলেকচুয়াল হয়। আপনি নিশ্চয়ই এটা নিয়ে ভেবেছেন?"

বীরেন মুখে হে হে টাইপ হাসি এনে কাটাবার চেষ্টা করল। আশরফ বকবক করে যেতে লাগলেন "আমার এক বাঙালি বন্ধু ছিল। মুম্বইতেই থাকত ছেলেটা। খুব এই ইন্টেলেকচুয়ালটাইপ কথা বলত। এটা কেন হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে। বাঙালি ছাড়া মনে হয় আর কোন ইন্ডিয়ান এত প্রশ্ন করেন না বলুন?"

বীরেনের এবার অসহ্য লাগছিল। এ লোক তো বকেই চলেছে নিজের মনে। খ্যাপা ট্যাপা নাকি?

সে ঘুমাবার ভান করল। আশরফ তার ডান পাশের লোককে নিয়ে পড়লেন। বীরেন চোখ খুলল না গোটা রাস্তাটা। শেষের দিকটা ঘুম চলেও এসেছিল। ঘুম ভাঙল আশরফের ঠ্যালাতেই "উঠিয়ে উঠিয়ে, প্লেনেই কাটিয়ে দেবেন নাকি?"

বীরেন চোখ খুলল। চোখ খুলতেও কষ্ট হচ্ছিল। মুম্বই পৌঁছে গেছে প্লেন রানওয়েতে দাঁড়িয়েছে। এমন ঘুম যে সে কিছুই বুঝতে পারে নি। সবাই একে একে বেরোচ্ছে। বীরেন বসে ছিল। ঠিক করল সবাই বেরোলে তবেই বেরোবে।

সবাই বেরোলে ধীরে ধীরে প্লেন থেকে বেরোল সে। আশরফও তার পেছন পেছনই বেরোচ্ছিলেন।

প্লেন থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে নামার মুখে আশরফ হঠাৎ করে বলে উঠলেন "মুম্বইতে আমার বাঙালি ইন্টেলেকচুয়াল বন্ধুর নাম কী ছিল জানেন? সায়ক বড়াল।"

বীরেন চমকে আশরফের দিকে তাকাল।

২২।

সোমেন ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বসে ছিলেন। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। একবার মনে হল মিনিকে ডেকে দেবেন, তারপর ঠিক করলেন থাক, মেয়েটা ঘুমোক। বড় অনিয়ম করে আজকাল মিনি, মোবাইলটা আসার পরে এই এক রোগ শুরু হয়েছে। অফিসে আলোচনা করে জেনেছিলেন সব বাড়িতেই এক সমস্যা। যে সব বাড়িতে একসময় দশটার সময় আলো নিভে যেত, সে সব বাড়ির ছেলে মেয়েরাও সারা রাত জেগে থাকে, মোবাইলের সৌজন্যে।

প্রথমে ভাবতেন মিনিকে বকবেন, পরে দেখলেন রেজাল্টে এর ফলে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না, নিজে থেকে আর কিছু বলবেন না ঠিক করে ফেললেন। মেয়ে বড় আদরের। মা যাই বলুক, বাবা কিছু বললেই

ঠোঁট ফুলিয়ে ফেলে, আর মেয়ের ঠোঁট ফুললে নিজেরও মন খারাপ হয়ে যায়। মা নেই বলে মেয়েটা দিন দুয়েক সাপের পাঁচ পা দেখেছে, আজ বিকেলে মা চলে এলে তখন নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে, আলাদা করে আর সাম্যাবস্থাটাকে নষ্ট করে লাভ নেই। ভাইয়ের বউ প্রতিমার কাছে শুনেছেন মেয়ে সারাদিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে হেসেছেন। মেয়েটা বাইরের থেকে ঘরে থাকতেই বেশি পছন্দ করে বরাবর। ঘরকুনো ভীষণ।

কাগজওয়ালা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে গেল। সোমেন কাগজটা টেবিলে পেতে পড়া শুরু করতে যাবেন এমন সময় দেখলেন জ্যোতির্ময় নিচে নেমে এসেছেন তৈরী হয়ে, হাতে একটা ব্রিফকেস।

সোমেন অবাক হয়ে দাদার দিকে তাকালেন "কীরে, কোথায় যাবি? তাও এত সকালে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আরে তোকে তো বলা হয় নি, আমার বন্ধু অবনীশের মেয়ের বিয়ে কেরালায়। সকালের ফ্লাইটেই বেরিয়ে যেতে হবে"।

সোমেন বললেন "সেকী! কালকেও তো রাতে দেখা হল, কিছু তো বললি না"।

জ্যোতির্ময় হাসলেন "ভুলে যাচ্ছি আজকাল। এটাও ভুলে গেছিলাম। কাল রাত সাড়ে এগারোটায় অবনীশ ফোন করে মনে করাল। তারপরেই তো প্যাকিং শুরু করলাম। বৌমাকেও বলা হয় নি"।

সোমেন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "এত দূর কেরালা, তুই একা একা যাবি? যেতে পারবি? শরীর কেমন আছে তোর?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আরে, অত চিন্তা করতে হবে না। কোলকাতা থেকে অনেকেই যাবে। একটা টিম যাবে ইনফ্যাক্ট, ওদের সঙ্গেই চলে যাব"।

সোমেন বললেন "আর ফিরবি কবে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "দেখি। কেরালা ভাল লেগে গেলে দু চারদিন থেকে আসতে পারি। কিছু ঠিক নেই তেমন"।

তাপস বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে। তিনিও জ্যোতির্ময়কে দেখে বিস্মিত গলায় বললেন "কীরে দাদা, কোথায় বেরোচ্ছিস?"

জ্যোতির্ময় সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "ছোটকে বলে দিস। আমি বেরলাম এখন। পৌঁছে ফোন করে নেব"।

জ্যোতির্ময় আর কোন দিকে না তাকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাপস আর সোমেন কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তাপস বললেন "কীরে, কোথায় গেল বড়দা?"

সোমেন বললেন "কেরালা। অবীনাশ না কে, তার মেয়ের বিয়ে"।

তাপস অবাক গলায় বললেন "আমায় তো কিছু বলে নি!"

সোমেন বললেন "আমাকেও তো এখনই বলল"।

তাপস চেয়ারে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বসে বললেন "বড়দার মাথাটা গেছে। কী যে করছে আজকাল কিছুই বুঝতে পারছি না"।

সোমেন বললেন "বাদ দে। ফোন করে খবর নিয়ে নেব। আসলে সারাদিন ঘরে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে গেছে হয়ত"।

তাপস বললেন "তা বটে। কী যে করে সারাদিন ঘরের মধ্যে কে জানে। এত শেয়ার বাজার পাগল লোক, বিয়ে থা করল না। টাকাগুলো নিয়ে কী করবে কে জানে"।

সোমেন হাসলেন "আসলে এগুলো সবটাই নিজেকে কোন একটা কিছুতে এনগেজ রাখার চেষ্টা। ব্যস্ত থাকতে চায় হয়ত। কী করবে, কিছু তো করার নেই। পড়াশুনায় এত ব্রিলিয়ান্ট একটা লোক। চাকরি বাকরি ছেড়ে হঠাৎ করে ঘরে বসে গেল। একটু ছিটিয়াল তো হবেই"।

মিনি উঠে পড়েছিল। বারান্দায় এসে দেখল বাবা আর কাকা বসে আছে। সোমেন অবাক গলায় বললেন "কীরে আজ এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিস? কী ব্যাপার?"

মিনি উস্কো খুসকো চুলে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল "ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম"।

সোমেন তাপসের দিকে তাকালেন "বাড়িটা পাগলের বাড়ি হয়ে যাচ্ছি বুঝলি ছোট? একজন সকাল সকাল কেরল চললেন, আরেকজন, যে কীনা ঘুম ছাড়া একটা মুহূর্ত থাকতে পারে না, সে এত সকালে উঠে বলছে ঘুম ভাঙছে না"।

তাপস আর সোমেন দুজনেই হেসে উঠলেন।

মিনি অবাক গলায় সোমেনের দিকে তাকাল "কে কেরল গেল বাবা?"

সোমেন বললেন "তোর জ্যেঠু আবার কে? কোন বন্ধুর মেয়ের বিয়ে না কী"!

মিনি বাবার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল "একটু জ্যেঠুর ঘরে চল তো বাবা"।

সোমেন বিস্মিত মুখে মিনির দিকে তাকালেন "কেন?"

তাপস বললেন "তোর আবার কী হল রে মিনি?"

মিনি বাবা কাকা দুজনের হাত ধরেই টানল "আগে চল তারপর বলছি"।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোমেন আর তাপস উঠলেন। মিনি রান্নাঘর থেকে জ্যেঠুর ঘরের চাবি নিতে গিয়ে দেখল চাবি নেই।

বাবাকে বলল "বাবা দরজা ভাংতে হবে"।

সোমেন অবাক চোখে মিনির দিকে তাকালেন "তুই কি পাগল হয়ে গেলি?"

মিনির অস্থির অস্থির লাগছিল। বাবা আর কাকা দুজনেই তার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছেন।

মিনি বলল "জ্যেঠুর ঘরের কোন ডুপ্লিকেট চাবি আছে?"

সোমেন বললেন "কী দরকার আগে সেটা আমাকে বল। এভাবে দরজা ভাঙা যায় নাকি? তুই ক্ষেপেছিস?"

প্রতিমা ঘুম চোখে রান্নাঘরে এসে গেছিলেন। সবাইকে দেখে অবাক হয়ে বললেন "কী হচ্ছে এখানে?"

মিনি বলল "তোমাকে জ্যেঠু ঘরের চাবি দিয়ে গেছে কাকিমা?"

কাকিমা বলল "কোথায় যাবে?"

মিনি হতাশ গলায় বলল "জ্যেঠু কেরল গেছে বলছে। অথচ আমার ঘরটায় ঢোকার দরকার এক্ষুণি"।

সোমেন মেয়ের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। এতক্ষণ হতভম্ব ভাব কাজ করছিল তার মধ্যে। এবার রেগে গেলেন "তুই কী শুরু করেছিস বলবি? নইলে কিন্তু তোর কপালে দুঃখ আছে মিনি"!

মিনি একটা চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে হেলান দিয়ে বসে বলল "জ্যেঠু কেমন যেন হয়ে গেছে বাবা"।

সোমেন তাপস মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বললেন "সেটা তো আমরাও জানি, তার জন্য তালা ভাঙার কী দরকার?"

একটু ইতস্তত করে বলল "কিছু না। পরে বলব"।

সোমেন কড়া গলায় বললেন "পরে না। এখনই বলবি তুই। কী হয়েছে?"

মিনি বাবার দিকে তাকিয়ে বলল "বুঝতে পারছি না। কিছু একটা হবে। বা হয়েছে। সাংঘাতিক কিছু একটা"।

২৩।

একটা ঘরে বসতে দেওয়া হয়েছে বীরেনকে। হীমশীতল এসি চলছে। ঘরটা বড় নয়।

মুখোমুখি দুটো চেয়ার রাখা। মাঝে একটা টেবিল। আপাতত বীরেনের সামনের চেয়ারটা ফাঁকা। ঘরে খুব কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। বাকি আলোগুলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে।

আশরফ তাকে বলেছিলেন চুপচাপ তার সঙ্গে যেতে। বীরেন সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। এয়ারপোর্টেরই একটা ঘরে ঢোকার তাকে বসতে বলা হয়। একজন এসে তার হাতের ছাপ নিয়ে গেছে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

আধঘন্টাখানেক বসে থাকার পর ঘরে আশরফ ঢুকলেন। তার সামনের চেয়ারে বসে বললেন "কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একটু বসতে হল"।

বীরেন কিছু বলল না।

আশরফ বললেন "আপনার কিছু বলার আছে?"

বীরেন হাসার চেষ্টা করল "বললে আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন?"

আশরফ ঝুঁকে বসলেন "নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। আপনি সায়ক বড়াল, র এর এত বড় একজন এজেন্ট, আপনার কথা বিশ্বাস না করলে কার কথা বিশ্বাস করব বলুন?"

বীরেন বলল "আমার নাম সায়ক বড়াল নয়"।

আশরফ হাসলেন "সে তো জানি। সায়ক বড়াল আপনি কেন হতে যাবেন, তাকে তো জাস্ট সাত দিন আগেই মুজাফফরাবাদে গুম খুন করা হয়েছে। ওঁর লাশই খুঁজে পাওয়া যায় নি এখনও"।

বীরেন খানিকটা চমকাল।

আশরফ বললেন "মুজাফফরাবাদ জায়গাটা কোথায় জানেন তো? পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। খুব সুন্দর জায়গা। লস্কর থেকে শুরু করে পাকিস্তানের বড় বড় শুয়োরের পালগুলো ওখানে ট্রানজিট ক্যাম্প বানিয়ে থাকে। আপনার তো জানার কথা। আপনি জানেন না? গেছেন কোন দিন?"

বীরেন অসহায়ের মত মাথা ঝাঁকাল "আমি দুদিন ধরে শুধু একজনের নির্দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কলকাতার এক ঠিকানায় এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি আমাকে হুমকি দিয়েছেন তার কথা মত না শুনলে আমার ফ্যামিলিকে মেরে ফেলা হবে। তার পর থেকে এই করে যাচ্ছি"।

আশরফ বীরেনের দিকে তাকালেন "জানি। ডিফেন্স ট্রায়ালের সব ইনফোও আছে ওদের কাছে। আপনাকে আরেকটা ইনফো দি। চাঁদনী চকের হোটেল সেন্টিনেলে গত রাতে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে। সাতজন নিহত, বারোজনকে হসপিটালাইজড করতে হয়েছে। ক্রিকেট বলের সাইজের একটা বোমা। ওদের নতুন আবিষ্কার"।

বীরেন শিউরে উঠল।

আশরফ পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে বললেন "কিছু বলবেন না?"

বীরেন বলল "আমার ফ্যামিলিকে মেরে ফেলবে ওরা"।

আশরফ বললেন "মারবে না, কারণ এখনও ওরা কিছু বুঝতে পারে নি। আর চিন্তা করবেন না। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি। সাদা পোশাকে গোয়েন্দারা নজর রাখবে আপনার ফ্যামিলির ওপরে। সেরকম কিছু বেচাল দেখতে পাওয়া গেলে স্টেপ নেওয়ার অর্ডার দেওয়া থাকবে"।

বীরেন আশরফের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

আশরফ বললেন "আপনার কথায় আমরা বিশ্বাস করছি। আপনাকে ওদের দেওয়া ফোনটা হ্যান্ড ওভার করছি। ফোনটা অন করুন"।

বীরেন বলল "আমার হাত বাঁধা"।

আশরফ একটা শিষ দিয়ে বললেন "এ হে হে হে, ভুলেই গেছিলাম। এক মিনিট"।

আশরফ উঠে বীরেনের হাতের দড়িটা খুলে দিলেন। বীরেন নড়ল না। চুপ করেই বসে রইল।

আশরফ পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে অন করলেন।

বললেন "কন্ট্যাক্ট করুন"।

বীরেনের হাত কাঁপছিল। এই ঠান্ডা ঘরেও ঘামে জামাটা জবজব করছিল। আশরফ ধমকালেন "ফোনটা করুন"।

বীরেন কোন মতে জ্যোতির্ময়ের নাম্বারটা রি ডায়াল করল। আশরফকে বলল "ফোনটা সুইচ অফ বলছে"।

আশরফ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে দুজন এসে বীরেনের জামা চেঞ্জ করে দিল।

আশরফ বললেন "আপনার মোবাইলে একটা এস এম এস আছে। সকাল দশটার মধ্যে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে যেতে বলেছে। আপনি বেরিয়ে যান। এখন বেরোলেও সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন। সম্ভবত ওদের ট্যাক্সি থাকার কথা ছিল এয়ারপোর্টে। আপনাকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি এয়ারপোর্টে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন"।

বীরেন ঘাড় নাড়ল। আশরফ বললেন "আপনাকে ওরা ক্যারিয়র হিসেবে ব্যবহার করছিল। কাশ্মীরে আপনি ব্যাগের মধ্যে করে যে অত্যাধুনিক বস্তুটি নিয়ে গেছিলেন সেটি সম্ভবত এই বিশ্বে প্রথম ব্যবহৃত হল। এয়ারপোর্টের কোন সিকিউরিটি চেকিং এই সেটা ধরা পড়ে নি। আপনাকে যিনি রিমোট কন্ট্রোল হাতে চালাচ্ছেন, জিনিসটি তারই আবিষ্কার। দিল্লির ছোট্ট বোমটিও। জানি না কীভাবে ওদের কাছে দেশের আধার ইনফরমেশন চলে গেছে, ওরা ছিনিমিনি খেলছে এখন দেশের সিকিউরিটি নিয়ে। সম্ভবত যে ভয়টা আমরা পাচ্ছিলাম, সেটা সত্যি হতে চলেছে। পৃথিবীর সব থেকে বড় জঙ্গি সংগঠন এদেশে তাদের অপারেশন শুরু করে দিয়েছে, the shit is getting real"।

বীরেন বিস্ফারিত চোখে আশরফের দিকে তাকাল।

আশরাফ হাত বাড়ালেন "আমি আশরফ খান, আমার সম্পর্কে পরে জানবেন। আপাতত আপনি একটা দৌড় লাগান, ট্যাক্সি ধরতে হবে যত তাড়াতাড়ি পারেন"।

২৪।

সরু গলিটা দিয়ে অনেকটা হাঁটার পরে জ্যোতির্ময় একটা বাড়ির দরজায় তিনবার নক করলেন।

কুড়ি সেকেন্ডের মাথায় দরজাটা খুলে গেল। জ্যোতির্ময় বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। বাড়ি বলতে একটা এক কামরার ঘর, একটা ছোট হল, সঙ্গে রান্নাঘর, অ্যাটাচড বাথ।

ইয়াসমিন দরজাটা বন্ধ করে বললেন "কিছু খাও নি নিশ্চয়ই?"

জ্যোতির্ময় মাথা নাড়লেন।

ইয়াসমিন বললেন "চেঞ্জ করে নাও। খেতে দিচ্ছি"।

জ্যোতির্ময় চেঞ্জ করলেন না। সটান বেডরুমে ঢুকে ডেস্কটপ কম্পিউটারটা অন করলেন।

ইয়াসমিন কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। জ্যোতির্ময় নিস্পলক চোখে কম্পিউটারের মণিটরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কম্পিউটার বুট হল। জ্যোতির্ময় কম্পিউটারে কাজ করা শুরু করলেন।

ইয়াসমিন একটা প্লেটে রুটি তরকারি এনে দিলেন "খেয়ে নাও"।

জ্যোতির্ময় প্লেটটা হাতে নিয়ে বললেন "তিন চার দিন এখানেই থাকতে হবে। তার বেশিও থাকতে হতে পারে"।

ইয়াসমিন বললেন "আমি তো সেটাই চাই"।

জ্যোতির্ময় রুটি খেতে খেতে ইয়াসমিনের দিকে তাকালেন "সুমন ফোন করেছিল?"

ইয়াসমিন বললেন "হ্যাঁ। সকালে নাকি চাঁদনি চকে..."

জ্যোতির্ময় বললেন "হু"।

ইয়াসমিন বললেন "ছেলেটাকে এভাবে বাইরে বাইরে রেখে... কাজটা কি ভাল হচ্ছে?"

জ্যোতির্ময় ঠান্ডা গলায় বললেন "নিজেদের লোকেদের জন্য কাজ করলে তার ভাল খারাপ বিচার করার দায় আমাদের কারও হয় না। উপরওয়ালা আছেন, উনি বিচার করবেন"।

ইয়াসমিন চুপ করে রইলেন।

জ্যোতির্ময় ধীরে ধীরে খাচ্ছিলেন। খাওয়া হয়ে গেলে ইয়াসমিন হাত বাড়িয়ে জ্যোতির্ময়ের থেকে খালি প্লেটটা নিলেন। জ্যোতির্ময় উঠে বেসিনে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে টাওয়ালে হাত মুছে কম্পিউটারের সামনে বসলেন।

ইয়াসমিন প্লেট রান্নাঘরের সিংকে রেখে এলেন।

জ্যোতির্ময় বললেন "তোমার ফোনটা দাও। আমার ফোনটা থেকে এখন ফোন করা যাবে না"।

ইয়াসমিন বললেন "তোমার সামনেই আছে, ওই টেবিলেই"।

জ্যোতির্ময় হাত বাড়িয়ে ইয়াসমিনের ফোনটা নিয়ে ফোন করলেন, একটা নাম্বারে ফোনটা রিং হতেই ওপাশ থেকে একজন ফোন তুলল "বলছি"।

"টার্গেট এসেছে?"

"না। এখনও আসে নি। আধঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি"।

জ্যোতির্ময় ঘড়ির দিকে তাকালেন, দশটা পনেরো বাজে, বললেন "আমি দেখছি, আসবে নিশ্চয়ই। ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট রেইনকোট"।

"এখন বৃষ্টি হচ্ছে না"।

"বৃষ্টির জন্য ওয়েট করতে হবে। ওয়েদার ফোরকাস্ট তো বলছে বৃষ্টি হবে"।

"তা হবে। মেঘ আছে"।

"গুড। রাখছি"।

"খোদা হাফেজ"।

"খোদা হাফেজ"।

ফোনটা কেটে জ্যোতির্ময় বীরেনের ফোনে রিং করলেন। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর বীরেন ধরল "হ্যালো"।

"এখনও পৌঁছওনি?" জ্যোতির্ময় শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

বীরেন বলল "না রাস্তায় আছি, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কিছু পাচ্ছিলাম না"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ওকে, ট্যাক্সিওয়ালা বাঙালি?"

বীরেন বলল "না। মারাঠি"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ওকে। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছেই দেখবে একজন আইসক্রিম বিক্রি করছে, ডান গালে কাটা দাগ আছে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে"।

ওপাশ থেকে বীরেনের ইতস্তত গলা ভেসে এল "আমার আসলে ঘুম পাচ্ছিল। হোটেলে গেলে..."

জ্যোতির্ময় বললেন "ঘুমাবে ঘুমাবে। সারাজীবনই পড়ে আছে ঘুমাবার জন্য"।

ফোনটা কেটে দিলেন জ্যোতির্ময়। কম্পিউটারটা শাট ডাউন করে বাথরুমে ঢুকলেন। আধঘন্টা পর বাথরুম থেকে চেঞ্জ করে বেরোলেন। একটা নীল টিশার্ট আর একটা থ্রি কোয়ার্টার পরে।

ইয়াসমিনকে বললেন "ঠিক আধঘন্টা পর আমায় ডেকে দিও। এখন ঘুমাব"।

ইয়াসমিন ঘাড় নেড়ে আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আধঘন্টা পরে দরজা খুলে আলো জ্বাললেন।

জ্যোতির্ময় ঘুমাচ্ছিলেন। ইয়াসমিন ডাকলেন। জ্যোতির্ময় উঠে ইয়াসমিনের ফোনটা নিয়ে বীরেনকে ফোন করলেন, বীরেন ধরল "হ্যাঁ বলছি"।

"কোথায় তুমি?"

"এই তো লোকাল ট্রেনে উঠেছি। বলল বান্দ্রায় নেমে ধারাভিতে পৌঁছতে"।

"বৃষ্টি হচ্ছে?"

"না"।

জ্যোতির্ময় শ্বাস ছাড়লেন একটা।

"ঠিক আছে। ধারাভিতে পৌঁছে যেভাবে বলা আছে সেভাবে কাজটা করে এয়ারপোর্ট ফিরে এসো"।

"আচ্ছা। আমি আজকেই বাড়ি ফিরতে পারব তো?"

"পারবে"।

"রাখছি"।

"খোদা... রাখো"।

২৫।

সোমেন অবাক হয়ে মিনির দিকে তাকিয়ে বললেন "তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে"।

মিনি রান্নাঘরে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। মিটশেফের ওপরে একটা হাতুড়ি ছিল। মিনি সেটা হাতে নিল।

তাপস সোমেন প্রতিমা তিনজনেই হা হা করে উঠলেন। সোমেন বললেন "কী শুরু করেছিস?"

মিনি হাঁফাচ্ছিল "জ্যেঠুর ঘরের তালা ভাংতে হবে বাবা"।

সোমেন তাপসকে বললেন "কী শুরু করল বলত মেয়েটা? বড়দা যদি জানতে পারে বুঝতে পারছিস কী হবে?"

তাপস মিনির বেপরোয়া চেহারাটা দেখে বললেন "শোন দাদা, আমার মনে হয় মিনি কিছু একটা আঁচ করেছে। ও যখন বলছে তখন তালা ভাঙি। পরে কিছু একটা বলে ম্যানেজ দেওয়া যাবে"।

প্রতিমা সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "হ্যাঁ মেজদা, তাই করি। মিনি যা বলছে তাই শুনি"।

সোমেন এগিয়ে গিয়ে মিনির হাতের হাতুড়িটা নিয়ে বললেন "চ তবে"।

মিনির উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সবাই মিলে দোতলায় উঠলেন। তালাটা বেশ শক্ত পোক্ত তালা। হাতুড়ি দিয়ে বেশ কয়েকবার বাড়ি মেরে তারপরে ভাঙা গেল।

মিনি হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

সোমেন বিরক্ত গলায় বললেন "আহ মিনি, এত তাড়াহুড়োর কী হল?"

ঘরের জানলা বন্ধ ছিল। মিনি আলো জ্বালল। ঘর যেমন থাকে তেমনই আছে।

প্রতিমা চারদিকে তাকিয়ে বললেন "একই রকম তো আছে রে মা। কিছুই তো পালটায় নি"।

তাপস ঘরের চারদিকে একবার দেখে নিয়ে মিনিকে বললেন "কীরে পাগলী। এবার খুশি?"

মিনি খাটের ওপর বসে পড়ল। জোরে জোরে শ্বাস ছাড়তে লাগল।

সোমেন মিনির মাথায় হাত দিয়ে বললেন "আমাকে বলবি কী হয়েছে? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই এরকম পাগলের মত করছিস কেন?"

মিনি তোষকটা তুলল। লিফলেটটা নেই। ফিসফিস করে বলল "জানতাম"।

সোমেন এবার ধমক দিলেন "আমায় বলবি কী হয়েছে?"

মিনি বাবার দিকে তাকিয়ে বলল "বাবা, শোন, এ খাটের তোষকের তলায় আমি একটা লিফলেট পেয়েছিলাম। লিফলেটটা আরবী ভাষায় লেখা"।

তাপস অবাক গলায় বললেন "তুই আবার আরবী শিখলি কবে?"

প্রতিমাও অবাক হলেন "তুই যে সেদিন আমাকে বলেছিলি কীসের যেন একটা অ্যাড?"

মিনি বলল "আমি শিওর ছিলাম না। তাছাড়া হতেই পারে ওরকম লিফলেট কোন কাগজের সঙ্গে বা জ্যেঠু কিছু কিনেছিল তার সঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলাম জ্যেঠু লিফলেটটা ওষুধের বাক্সে না রেখে তোষকের তলায় লুকিয়েছিল তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। লিফলেটটা কী এমন মহার্ঘ্য জিনিস যে তোষকের তলায়

লুকোতে হবে? আমি আমার এক বন্ধু আছে যে আরবী জানে, তাকে লিফলেটটা পাঠিয়েছিলাম, সে জানাল লিফলেটটায় নাকি কী সব স্বাধীনতার যুদ্ধ টুদ্ধ লেখা আছে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কাশ্মীর কী আজাদি এসবও লেখা!"

সোমেন, প্রতিমা, তাপস সবাই চোখ বড় বড় করে মিনির কথা শুনছিলেন। বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর তাপস বললেন "ভাইঝিটা মনে হয় পাগল হয়ে গেছেরে মেজদা"।

মিনি বলল "পাগল হয়ে গেছি? দাঁড়াও। এক্ষণি আসছি"।

মিনি জোরে জোরে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সোমেন তখনও বিস্মিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাপস বললেন "কী রে দাদা কিছু বল"।

সোমেন একটু ইতস্তত করে বললেন "তুমি একটু নিচে যাও বউমা। তাপসকে একটা কথা বলার আছে"।

প্রতিমা কয়েক সেকেন্ড সোমেনের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরোলেন।

তাপস বললেন "কীরে, কী হল?"

সোমেন বললেন "তোকে একটা কথা বলি ছোট। আমি কাউকে বলি নি কথাটা। বছর তিনেক আগের কথা। আমি অফিসের কাজে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে গেছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল বড়দা এক বোরখা পরা মহিলাকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। ভীষণ অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু ডাকিনি। ভেবেছিলাম বেশি বয়সের প্রেম হয়ত। পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে কী করছিলি। আমাকে পুরো অবাক করে দিয়ে বড়দা বলেছিল কী যে বলিস, আমি তো আজকে কলেজ স্ট্রীট গেছিলাম। কাকে দেখতে না কাকে দেখেছিস। আমিও ভেবেছিলাম তাই হবে হয়ত, কিন্তু এও মনে হচ্ছিল এতটা ভুল দেখলাম?..."

সোমেনের কথার ফাঁকেই মিনি ঘরের ভিতরে ঢুকল। হাতে মোবাইল। সোমেনের হাতে গ্যালারি থেকে ছবিটা বের করে দিয়ে বলল "দেখো, এ দেখো সেই লিফলেট আমি ফটো তুলে রেখেছিলাম"।

তাপস একটা চেয়ার টেনে বসলেন। সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমি তো কিছুই..."

সোমেন মোবাইলটা খাটের ওপর রেখে মিনির দিকে তাকিয়ে বললেন "তুই কী করতে চাইছিস?"

মিনি বলল "ঘরটা সার্চ করব ভালো করে"।

সোমেন বললেন "কর, তোর কাকিমাকেও ডেকে নে"।

মিনি কাকিমাকে ডেকে পাগলের মত ঘর সার্চ করা শুরু করল, খাটের তলা, ওয়ার্ডরোব, ওষুধের বাক্স। কয়েক মিনিট পর সোমেন এবং তাপসও হাত লাগালেন। প্রতিমা বললেন "কী হচ্ছে জানতে পারি কিছু?"

মিনি অস্থির গলায় বলল "খোঁজ প্লিজ, লিফলেট থেকে শুরু করে যা যা চোখে পড়ে বের করে এই খাটের ওপরে রাখো"।

সবাই মিলে বেশ খানিকক্ষণ খুঁজল। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। তাপস চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে হতাশ গলায় বলল "তোর নির্ঘাত পাওয়ার বেড়েছিল মেজদা। কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস"।

সোমেন হতাশ হয়ে বললেন "তাই হবে মনে হচ্ছে। বড়দাই ঠিক হবে"।

মিনি মেঝের ওপর বসে পড়ল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "কিচ্ছু নেই!!! হতে পারে!!!"

সোমেন বললেন "শোন, তোর চোখের ভুল আসলে সবটাই। কী দেখতে কী দেখেছিস!"

তাপস বললেন "আমি ভাবছি প্রতিমার কাজ বেড়ে গেল। ঘরটা আবার আগের মত করে রাখতে হবে..."

প্রতিমা বললেন "তার আগে ভাবো যে তালা ভাঙলে তার কী সদুত্তর দেবে"।

মিনির চোখ পড়ল জ্যোতির্ময়ের বুক শেলফে। সে মেঝে থেকে উঠে বুক শেলফটা খুলল।

প্রতিমা বললেন "হয়ে গেল। আমাদের সবার। দাদার সাধের বুক শেলফ..."

মিনি সব বই একটার পর একটা মেঝেতে নামাতে থাকল। প্রতিটা বই খুলে খুলে দেখতে লাগল।

তাপস বললেন "কী দেখছিস?"

বেশ কয়েকটা বই ঘেঁটেঘুটে দেখার পরে অবশেষে মিনি লাফিয়ে উঠল। সবাই হাঁ করে মিনির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

২৬।

বীরেন বুঝতে পারছিল না তার টেনশন করা উচিত হবে কী না।

এয়ারপোর্টে আশরফ খানের সঙ্গে দেখা না হলে হয়ত সে টেনশন করত না।

সে স্পষ্টতই বুঝতে পারছে সে কোন একটা গভীর জালে জড়িয়ে পড়ছে কিন্তু মানসিকভাবে সে সব কিছুর উপরে চলে যাচ্ছিল। যতবার তার মনে পড়ছিল কাশ্মীরে কিংবা দিল্লিতে তার জন্য এতগুলো মানুষের প্রাণ চলে গেছে ততবারই নিজের প্রতি ঘেন্না হচ্ছিল। জেনেই হোক কিংবা অজান্তে, আদতে সে তো তার নিজের দেশেরই কয়েকজন নাগরিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে থাকল। বার বার মনে হচ্ছে কী কুক্ষণেই সে এটিএম থেকে টাকাটা তুলতে গেছিল। নাকি ওখানে না হলেও ওরা কোন না কোন ওকে ভাবে ঠিকই তুলে নিত? কে জানে!

ধারাভি বস্তির মধ্যে অনেকটা হাঁটিয়ে তাকে একটা ঘরে বিশ্রাম করতে বলে একজন চলে গেছে। ঘরটায় কোন ফার্নিচার নেই। দেওয়ালে কোন ছবি নেই।

লোকটা হিন্দিতেই কথা বলছিল। একজন মহিলা এসে তিনটে রুটি আর দু পিস মাংস দিয়ে গেছিল। বীরেন সেটাই খেয়ে মেঝেতে পেতে রাখা মাদুরে শুয়ে ছিল। মোবাইলে বাড়ি থেকে বাবা ফোন করেছিল। দিল্লির ঘটনা শুনে স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন। বীরেন বলে দিয়েছে সে চাঁদনী চকের থেকে অনেক দূরে আছে। চিন্তা করার মত কিছু হয় নি। শুনে বাবা খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছে।

বীরেনের কষ্ট হচ্ছিল বাবার সঙ্গে কথাগুলো বলার সময়। এভাবে পরপর মিথ্যে কথা সে কোন দিন বলে নি।

দুপুর একটা নাগাদ তার দরজায় কেউ একজন নক করল। বীরেন উঠে দরজাটা খুলল।

যার সঙ্গে বীরেনের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় দেখা হয়েছিল, সে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল। হাঁফাচ্ছিল সে।

বীরেন বলল "কী হল?"

লোকটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে বলল "কিছু হয় নি। আপনি বসুন"।

বীরেন খানিকটা অধৈর্য হয়েই বলল "আমার তো আজকে ফেরার কথা। উনি বলেছিলেন আমাকে"।

লোকটা বিরক্ত গলায় বলল "বসুন না। এত তাড়া কীসের?"

বীরেন বলল "তাড়া হবে না? দু দিন ধরে পাগলের মত এ জায়গা সে জায়গা করে যাচ্ছি, আপনি আমার জায়গায় থাকলে কী করতেন"।

লোকটা এবার সুর নরম করল "আচ্ছা, বসুন আমি ব্যবস্থা করছি। আমার নাম আসলাম। আপনাকে বোধ হয় বলা হয় নি"।

বীরেন বসল।

আসলাম বলল "খেয়েছেন?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ"।

আসলাম বলল "কয়েক জন গেস্ট এসেছিল। আজ চলে যাবে। ওদের ছাড়তে দেরী হয়ে গেল একটু"।

বীরেন কোন প্রশ্ন করল না।

আসলাম ফোনটা বের করে অজানা ভাষায় বেশ কয়েকটা ফোন করল। মিনিট পনেরো পরে তাকে বলল "আপনার জন্য সুখবর আছে। এখন আর বেশি কোন কাজ নেই। এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে একটু আগে, রেইনকোটটা পরে নিন, খানিকটা হেঁটে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পাবেন। ওয়ান টু থ্রি জিরো

নাম্বারের ট্যাক্সিতে উঠে এয়ারপোর্ট চলে যাবেন। ভাড়া দিতে হবে না। ট্যাক্সিওয়ালা আপনাকে কলকাতার টিকেট দিয়ে দেবে"।

বীরেন বলল "আমি বেরিয়ে যাব?"

আসলাম বলল "হ্যাঁ, বেরিয়ে যান, রেইনকোটটা পরে নিন"।

বীরেন উঠল। ব্যাগ থেকে রেইনকোটটা পরল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ব্যাগটা হাতে নিল।

আসলাম বলল "খোদা হাফেজ"।

বীরেন বলল "এলাম"।

দরজাটা খুলে বীরেন জোরে পা চালাল।

এরকম বস্তি সে কোন দিন দেখে নি। রাস্তা কোথাও কোথাও অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। বস্তিটাই রাস্তায় নেমে এসেছে বলা চলে। রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নোংরা খাল। পচা গন্ধ ভেসে আসছে কোত্থেকে। এরকম একটা জায়গায় মানুষ থাকে কী করে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। রেইনকোটটা না থাকলে সত্যিই ভিজে যেত সে।

মনে মনে আসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল বীরেন।

অনেকটা রাস্তা হেঁটে আসলামের নির্দেশমত ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছল সে।

চারটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বীরেন দেখল ওয়ান টু থ্রি জিরো নম্বর ট্যাক্সিটাই সবার আগে দাঁড়িয়ে।

বীরেন তড়িঘড়ি ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

ট্যাক্সিচালক ভাবলেশহীন মুখে ট্যাক্সি স্টার্ট দিল।

বীরেন কাঁচ তুলে দিল। বৃষ্টির ছাট গাড়ির ভেতরে আসছে।

খানিকক্ষণ পরে দেখল গরম লাগছে। রেইনকোটটা খুলল।

বস্তি অঞ্চল পেরিয়ে ট্যাক্সিটা এগোচ্ছে। বীরেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে ট্যাক্সিতে হেলান দিল।

বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সিটা রাস্তার বা দিকে দাঁড় করাল।

বীরেন বলল "কী হল?"

ট্যাক্সিচালক উত্তর না দিয়ে নেমে গেল।

২৭।

"নৈরাজ্য। শব্দটার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। একটা অন্যরকম নেশা আছে।

নেই রাজা, নেই শাসন, নেই কারও ভয়।

রাজা যখন মাথায় চড়ে বসে, তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকতে ঠেকতে একটা সময় প্রজাকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। এই নিজের সব কিছু ক্ষমতা কিংবা টাকার বিনিময়ে বিকিয়ে দেওয়ার সময়ে দাঁড়িয়ে একজন এমন কাউকে দরকার হয়, যাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস বলে এ নৈরাজ্য একটা সময়ে চেয়েছিলেন দেশের তরুণ তুর্কী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। তারা চেয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে, ব্রিটিশদের সঙ্গে সরাসরি অস্ত্রের লড়াইয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস বলে সময় যত অগ্রগতি হয়েছে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোতে নৈরাজ্য তত কমেছে। কিন্তু সভ্য বলতে আমরা কী বুঝি, সভ্যতার ডেফিনিশনই বা কী? একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নৈরাজ্য এসেছে, এসেছে আই এস আই এসের মত সংগঠন। বলা বাহুল্য, এ নৈরাজ্য মোটেও সুখকর হয় নি।

জেহাদ আদতে কী, কিছু অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী আদতে কোন জেহাদের কথা বলে, তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক বারেবারেই চলেছে। কিন্তু যত এ বিষয়ের গভীরে যাওয়া যাবে, তত বোঝা যাবে, এই জেহাদের নামে কিন্তু একশ্রেণী আসলে সেই নৈরাজ্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

আরও গভীরে গেলে জানা যাবে, এই জেহাদী সংগঠনগুলো স্থাপন করার মূল অর্থ জোগান দিয়েছিল উন্নত বিশ্বের দেশগুলিই। আফ্রিকার সোমালিয়ার মত দেশে যেখানে কোন আইন নেই, শাসন নেই, আছে শুধু নৈরাজ্যের পর নৈরাজ্য, সেখানে জীবন কেমন? সেদেশে কোনটা আগে এসেছে? জেহাদ না নৈরাজ্য?

আই এস আই এস কিংবা তালিবানেরাই বা জেহাদের নামে কী প্রতিষ্ঠা করেছে? এরা আদতে ধর্মের নামে ব্যবহার করেছে নিজেদের পুরুষতান্ত্রিকতাকে।

যে পুরুষতন্ত্র অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করবে নারীর স্বাধীনতাকে, যে পুরুষতন্ত্র বলে দেবে, না, নারী, তোমার পোশাকে তোমার চোখ ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না, কিন্তু সেই নারীই আদতে আর কিছুই না, শুধুমাত্র একটি যোনিমাত্র, যার জন্ম হয়েছে পুরুষকে আনন্দ দেবার জন্য, যে সংগঠনগুলো আদতে বলে জেহাদের কথা, কিন্তু তাদের লক্ষ্য নৈরাজ্য। কেমন নৈরাজ্য?

যে নৈরাজ্য নারীকে দেবে না শিক্ষার অধিকার, যে নৈরাজ্য নারীকে দাসী ছাড়া আর কিছু ভাববে না, সে নৈরাজ্য কি আদৌ সুখকর হতে পারে? শুধু ইসলামি সংগঠনই বা কেন, আমরা চোখ ঘুরাতে পারি প্রাচীন দেবদাসী কিংবা নান করে রাখার প্রথাগুলোর দিকেও। মানুষের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যেখানে মেয়েদের মানুষ ভাবা হয় নি।

কোন সমাজ যদি তার অর্ধেক প্রতিনিধিকে যোনির বাইরে কিছু ভাবতে না পারে, ভোগ্যপণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবতে না পারে, তবে সে সমাজ কি খুব সুখকর সমাজ হতে পারে? এই এগিয়ে যাওয়ার সময়ে আমরা কী করে পিছনের দিকে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি?

ভারতেরই কোন কোন রাজ্য আছে যেখানে কন্যাসন্তান আসবে শুনেই ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। সেসব রাজ্যে কি আদৌ কোন গণতন্ত্র আছে বলে আপনাদের মনে হয়?

আমাদের বুঝতে হবে, নৈরাজ্য কখনই কোন কিছুর সমাধান হয় না। হতে পারে না। জিহাদের নামে এই সমস্ত নৈরাজ্যের আমাদের বিরোধিতা করতে হবে। নইলে বাকি বিশ্ব আমাদের যে দৃষ্টিতে দেখছে, সেই দৃষ্টিকে আমরা কোনদিন পরিবর্তন করতে পারব না"।

ইউটিউবে আফসানা সাইদের বক্তব্য হেডফোনে শুনছিলেন জ্যোতির্ময়। ইয়াসমিন ঘুমিয়েছে দুপুরে খাওয়ার পরে। তিন চারবার বক্তব্যগুলি বার বার প্রথম থেকে শুনে গেলেন জ্যোতির্ময়।

খানিকক্ষণ পরে ইউটিউব বন্ধ করে স্যাটেলাইট ফোনে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। একবার রিঙয়েই ওপাশ থেকে কেউ একজন ফোন তুলল। জ্যোতির্ময় একটা কোড শব্দ বললেন। কয়েক মিনিট পরে একজন বললেন "সালাম।

আপনার প্রোগ্রাম ফিক্সড?"

"হ্যাঁ জনাব। আফসানা সাইদ আজ সন্ধ্যে ছ'টা কুড়ির কলকাতা ফ্লাইটে উঠছেন"।

"কাজ হলে জানাবেন। রাখছি"।

"ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে গেল"।

জ্যোতির্ময় ইয়াসমিনের দিকে তাকালেন। ইয়াসমিনকে কি তিনি শুধু যোনি হিসেবেই দেখেছেন? তাহলে তার সন্তানের মা হলেন কীভাবে ইয়াসমিন? কীভাবেই বা সবার অলক্ষ্যে নিজের সংসার সযত্নে পালন করে এসেছেন, যাতে সমাজ না মানে, বিরুদ্ধাচরণ না করে, তার জন্যেই তো ইয়াসমিনকে এভাবে আলাদা রেখেছেন। একজন এসে, বুদ্ধিজীবি সেজে যা ইচ্ছা তাই বলবে, আর তাই মেনে নিতে হবে?

জ্যোতির্ময় নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। একটা সুরা মনে করার চেষ্টা করছেন কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে পায়চারি শুরু করলেন।

নিজের মনেই পায়চারি করছিলেন সম্বিত ফিরল দরজায় টোকার শব্দে। হালকা শব্দেই টোকা দিচ্ছে কেউ। ইয়াসমিনের ঘুম ভেঙে গেল এই শব্দেই। বললেন "দরজাটা খুলে দাও, মনে হয় দুধ দিতে এসেছে"।

জ্যোতির্ময় হেঁটে গিয়ে দরজাটা খুললেন এবং খুলেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন।

দরজার বাইরে সোমেন, তাপস এবং মিনি দাঁড়িয়ে!

২৮।

বিকেল চারটে নাগাদ বীরেন এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসে হাঁফাতে লাগল। গত এক ঘন্টা ধরে যা হল তা সে কোনদিন ভুলতে পারবে না।

ট্যাক্সিচালক তাকে গাড়ির ভেতর বসিয়ে বাইরে গেছিল বৃষ্টির মধ্যেই। বীরেন জানলার কাঁচ খুলে চেঁচাল কী হয়েছে জানার জন্য। ট্যাক্সিচালক বলল জল কিনতে যাচ্ছে। রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল লোকটা, একটা গাড়ি এসে সরাসরি ধাক্কা মারল লোকটাকে। ছিটকে গিয়ে দেহটা একটা ল্যাম্পপোস্টে লেগে সেখানেই স্থির হয়ে গেল। ঘটনাটা এতটাই আকস্মিকভাবে ঘটল যে আতঙ্কে বীরেনের চোখ দুটো বেরিয়ে আসছিল।

লোক জমে ওঠার আগেই একটা অল্টো গাড়ি এসে দাঁড়াল তার ট্যাক্সির পাশে।

বীরেন হতচকিত হয়ে তাকাল সেদিকে। গাড়ির চালক কাঁচ নামিয়ে বলল "খান সাব নে ভেজা হে। জলদি চলিয়ে"।

বীরেন ব্যাগটা নিয়েই গাড়িতে উঠে পড়ল। বাকি রাস্তায় অনেক প্রশ্ন করলেও গাড়ির চালক তার সঙ্গে একটা কথাও বলল না। বীরেনকে এয়ারপোর্টের সামনে নামিয়ে দিয়ে হাতে একটা টিকিট ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বীরেনের ঘোর কাটছিল না। কোনমতে এয়ারপোর্টের ভেতরে গিয়ে বোর্ডিং পাশ নিয়ে বসল। মিনিট পাঁচেক পরে তার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। সে বুঝে উঠতে পারছিল না ট্যাক্সিচালককে কি ইচ্ছা করে মারা হল না আদতে ওটা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর সে বুঝল তাকে টয়লেটে যেতে হবে। সে উঠে টয়লেটে গেল।

টয়লেট সেরে বসার জায়গায় ফিরে দেখল তার পাশের চেয়ারে খান বসে আছেন। তাকে দেখে তাকালেন।

বীরেন বিস্মিত গলায় বললেন "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার, কী হল একটু বলবেন?"

খান মাথা নিচু করে বেশ কয়েক সেকেন্ড কপালে হাত দিয়ে বললেন "ট্যাক্সির ডিকিতে যে বোমটা ছিল তাতে একটা ছোট খাট বাজার উড়ে যেতে পারে। যে ভারি রেইনকোটটা তোমাকে পরতে দিয়েছিল ওটা পরে তোমার কোন কষ্ট হয় নি"?

বীরেন মাথা নাড়ল "না তো?তবে তখন এমন তাড়াহুড়ো ছিল, আমি আর কিছু ভাবতেও পারি নি, ওরা যা যা বলেছে, সেই মতই করে গেছি।"

খান হাসলেন "জিম কর তুমি?"

বীরেন বলল "কেন বলুন তো?"

খান বললেন "রেইনকোটের দুটো লেয়ার ছিল। পিঠের দিকটায় এমন ভাবে একটা সার্কিট রাখা ছিল..." বলতে বলতে খান মাথা নাড়লেন "দে আর জিনিয়াস"।

বীরেন হাঁ করে তাকাল খানের দিকে, "মানে?"

খান উঠলেন "মানে কিছুই না। ওরা আরেকটা ছাব্বিশ এগারো প্ল্যান করেছিল আর কী! শহরে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। যদি এ শহরে ওদের কেউ থেকেও থাকে, আজ পালিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। যাক গে, তোমার এখন বোধ হয় বাড়ি ফেরাটা জরুরি। তুমি আমার সঙ্গে চল"।

বীরেন উঠল। খান হাঁটতে হাঁটতে বললেন "আমি জানি না এর পরে ওদের কী প্ল্যান আছে, তুমি তোমার শহরে পৌঁছে সাবধানে থেকো। তোমাকে দিল্লি আসতে হতে পারে, ফোন করলে দেরী কোর না একটুও"।

বীরেন বলল "স্যার, আমি দিল্লি গিয়ে কী করব?"

খান হাসলেন "এত কিছু হল, তোমার বয়ানটা নিতে হবে তো। তবে তোমাকে অন্তত তিন দিন আমরা বিশ্রাম দেব"।

বীরেন থমকে দাঁড়াল "স্যার ভয়ের কিছু নেই তো?"

খান বীরেনের কাঁধে হাত দিলেন "তুমি এখনও ভয় পাও নাকি? গত দুদিনে তুমি

ঠিক কী কী করেছ সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে?"

বীরেন বলল "কিন্তু জ্যোতির্ময়বাবু?"

খান বললেন "সে সব ভাবনা তোমায় আর ভাবতে হবে না। আপাতত আমাদের লাউঞ্জে বিশ্রাম কর"।

এয়ারপোর্টের ভেতরে অনেকটা হাঁটিয়ে আলাদা একটা লাউঞ্জে বীরেনকে নিয়ে প্রবেশ করলেন খান। বেশ কয়েকজন কম্যান্ডো খানকে দেখেই স্যালুট দিলেন। খান তাদের স্যালুট ফিরিয়ে দিয়ে বললেন "চিন্তা কোর না, এরা তোমার জন্য নেই। ওর জন্য আছেন"।

খানের কথা শেষ হতেই বীরেনের নজর পড়ল ভদ্রমহিলার দিকে। চেনা চেনা লাগছিল, মনে হচ্ছিল আগে কোথাও দেখেছে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

খান বললেন "চিনতে পারলে না তো? ওর নাম আফসানা সাইদ। পাকিস্তানি লেখিকা, সমাজকর্মী। আপাতত লস্কর ওর মাথার দাম রেখেছে কয়েক কোটি টাকা। তোমার সঙ্গেই কলকাতা যাচ্ছেন"।

বীরেন নমস্কার করলেন। খান বীরেনকে দেখিয়ে আফসানাকে বললেন "হি ইজ আ সারভাইভার ম্যাম"।

আফসানা হাসলেন "রিয়েলি?"

খান সংক্ষেপে আফসানাকে বীরেনের সঙ্গে যা যা হয়েছে বললেন। আফসানা গভীর দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "দ্য ওয়ার উইল নেভার এন্ড খান... নেভার এন্ড"...

২৯।

জ্যোতির্ময় কয়েকসেকেন্ড সোমেনদের দিকে তাকিয়ে দরজা ছেড়ে বললেন "ভিতরে আয়"।

সোমেন অবাক গলায় বললেন "এসব কী?"

জ্যোতির্ময় ঠান্ডা গলায় বললেন "ভেতরে আসবি নাকি তোদের ব্রাহ্মণ জাত্যাভিমানে ঘা লাগবে? জাত যাবে? এক কাজ করতে পারিস, বাড়ি ঢোকার আগে গঙ্গা স্নান সেরে মুখে গোবর ছুঁইয়ে না হয় বাড়ি ঢুকবি, তাহলে তো হবে?"

সোমেন ঘরের ভিতর ঢুকে বললেন "তোর কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি, মানে আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না!অফিস পর্যন্ত গেলাম না আজ, এখানে না এলে তো কিছুতেই কিছু বিশ্বাস হচ্ছিল না!"

জ্যোতির্ময় মিনির দিকে তাকালেন "তুই ধরেছিস না সবটা?"

মিনি আমতা আমতা করল "হ্যাঁ, মানে..."

জ্যোতির্ময় হাসলেন "খানিকটা আন্দাজ করেছিলাম। ভেতরে আয়"।

মিনিরা ভেতরে গেল। মিনি কৌতূহলভরে বাড়িটা দেখতে লাগল। দেওয়ালে কাবা শরীফের ছবি। ঘরের মেঝেতে যত্ন করে কোরাণ রাখা একটা কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর, মিনি সেদিকে তাকিয়ে আছে দেখে জ্যোতির্ময় বললেন "ওই জিনিসটাকে রেহাল বলে। তোরা আয় আমি ইয়াসমিনকে ডেকে দি"।

জ্যোতির্ময় ঘরের ভিতরে গিয়ে ইয়াসমিনকে ডাকলেন। ইয়াসমিন ঘুম থেকে তড়িঘড়ি উঠলেন।

জ্যোতির্ময় সোমেন এবং তাপসকে বললেন "তোদের বৌদি। তোরা খাটের ওপরেই বোস, মিনি তুই চেয়ারটা নিয়ে বোস। চা খাবি তো? নাকি জাত যাবে?"

সোমেন ভ্যাবাচ্যাকা মুখে কিছুক্ষণ চারদিকে তাকিয়ে বললেন "খা... খাব"।

ইয়াসমিন রান্নাঘরের গেলেন।

তাপস বললেন "কী... বড়দা... আমি তো..."

জ্যোতির্ময় বললেন “আমার ছেলে আছে। মিনির থেকে বছর পাঁচেকের বড়”।

সোমেন তাপস চাওয়া চাওয়ি করলেন।

মিনি জ্যেঠুর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল। এই জ্যেঠুকে সে চেনে না। এই লোকটা দোতলার ঘরে সারাদিন শেয়ার মার্কেট নিয়ে চর্চা করা, ন্যালাখ্যাপা, সারাজীবন বিয়ে না করা লোকটা না। এই লোকটা অনেক আক্রমণাত্মক, সংসারী একটা লোক, আরও কিছু আছে জ্যেঠুর চোখের মধ্যে যেটা মিনি পড়তে পারছে না, বা পড়তে ভয় পাচ্ছে।

সোমেন একটু গলা খাকড়িয়ে বললেন “একটা বইয়ের ভেতরে এই বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিল মিনি, আমি তো বিশ্বাসই করছিলাম না...”

জ্যোতির্ময় মিনির দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন “আমার ঘর তল্লাশি হয়েছে তবে? কী দেখে সন্দেহ করেছিলি? ওহ... আমারই বোঝা উচিত ছিল আগেই।

আমিই ভুল। লিফলেটটা, তাই তো?”

মিনি মাথা নিচু করল। তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে আসছিল।

সোমেন বললেন “তোর ছেলে... কোথায় দাদা?”

জ্যোতির্ময় বললেন “কাজে গেছে”।

তাপস জানতে চাইলেন “কোথায়? কলকাতাতেই থাকে?”

জ্যোতির্ময় বললেন “না”,বলেই কথাটা ঘোরালেন জ্যোতির্ময় “মা জানত ইয়াসমিনের কথা। শেষের দিকে বলেছিলাম। মানতে পারে নি”।

ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা সৃষ্টি হল।

কয়েক সেকেন্ড পরে জ্যোতির্ময় বললেন “এই যে আমাদের চারপাশটা দেখছিস না, একটা অদ্ভুত মিথ্যা দিয়ে তৈরী হয়েছে। অদ্ভুত মিথ্যা। দুটো ধর্ম পাশাপাশি আছে, অথচ একে অপরকে কী তীব্র ঘৃণাই না করে! মা, আমার গর্ভধারিণী মা, আমাকে ত্যাগ করে দিল শুধু আমি একজন অন্য ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করেছি বলে? নিজের ছেলের থেকে তার একটা ধর্ম বড় হয়ে গেল?”

সোমেন বললেন “আমাদের বলতে পারতি দাদা, আমরা তো...”

জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত চোখে সোমেনের দিকে তাকালেন “ভটচাজবাড়িতে মুসলিম বউ নিয়ে ঢুকব? স্বাভাবিক ঠেকত ব্যাপারটা? কোন কালে স্বাভাবিক ঠেকত বল শুনি? কথায় কথায় কমিউনিজমের বুলি ওড়াত যে বাঙালি, তাদের মধ্যেই তো সব থেকে বেশি কমিউনালিজমের বীজ বোনা আছে। কেন বুঝতে পারিস না আজকাল? রাস্তা ঘাটে যে হারে দেব দেবী বাড়ছে, যে হারে মাথায় ফেজটুপি দেখলে উত্তেজনা বাড়ছে, এগুলো স্বাভাবিক মনে হয় তোদের? বুকে হাত দিয়ে বল তো, ট্রেনে তোর পাশের মুসলিম ফ্যামিলিটা টিফিনকারিতে মাংস নিয়ে এলে তুই ঘেন্না পাস না?

পাস কি না বল!”

সোমেন মরিয়া হয়ে বললেন “কিন্তু দাদা, সেটা আমরা বুঝতাম, কে কী বলত আমরা বুঝতাম। তুই এত বড় একটা সিদ্ধান্ত আমাদের থেকে লুকিয়ে, কেন...”

ইয়াসমিনের ফোনটা বেজে উঠল। জ্যোতির্ময় ফোনটা নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ইয়াসমিন একটা ট্রেতে তিন কাপ চা আর বেশ কিছু বিসকুট এনে খাটের ওপর রাখলেন।

সোমেন একটু ইতস্তত করে বললেন “বউদি, কিছু মনে করবেন না, দাদা তো কোনদিন পরিচয় করায় নি...”

ইয়াসমিন সোমেনের কথার উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সোমেন তাপসের দিকে তাকালেন, “কীরে! কী করবি?”

তাপস বললেন "শোন মেজদা, আমরা বেরিয়ে যাই। আমার কেন জানি না, সবটা ঠিক স্বাভাবিক লাগছে না"।

মিনি গলা নামিয়ে বলল "কম্পিউটারটা অন করতে পারলে ভাল হত বাবা"।

তাপস চাপা গলায় ধমকালেন মিনিকে "ভাবতেও যাস না এসব। বুঝতে পারছিস না বড়দা কেমন একটা হয়ে গেছে। ধরা পড়লে আর দেখতে হবে না। শোন, তাড়াতাড়ি চাটা শেষ কর, পালাই চ"।

মিনি অধৈর্য হয়ে বলল "বুঝতে পারছ না কেন তোমরা, শুধু জ্যেঠুর সঙ্গে এখানে দেখা হওয়াটাই বড় কথা ছিল না"।

তাপস বললেন "অপেক্ষা কর। এখন কিচ্ছু করিস না"।

জ্যোতির্ময় ঘরে ঢুকে বললেন "এখন ক'টা বাজে?"

তাপস ঘড়ি দেখলেন "পাঁচটা"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ভাল তো। বিকেল সবে। তোরা বাড়ি ফিরে যা। আমার আর ফেরা হবে না। গেলে কিছু জিনিস নিয়ে চলে আসব হয়ত"।

মিনি দেখল জ্যোতির্ময় কথাগুলো বলছেন বটে কিন্তু জ্যেঠুর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা আছে যেটা জ্যোতির্ময় লুকাতে পারছিলেন না।

সোমেন বললেন "বউদির সঙ্গে পরিচয় করাবি না?"

জ্যোতির্ময় হাত নেড়ে বললেন "ওসব বেজাত কুজাতের সঙ্গে তোরা কেন পরিচয় করবি? তোরা যা, বাড়ি যা"।

সোমেন তাপসের দিকে তাকালেন।

৩০।

বীরেন লাউঞ্জে বসে ছিল চুপচাপ। লাউঞ্জের অন্য কোণায় আফসানা সাইদ সাক্ষাৎকার দিতে ব্যস্ত ছিলেন। ছ'টা নাগাদ খান এসে তাকে বললেন "অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে, তুমি ম্যামের সঙ্গে চলে যাও"।

বীরেন চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড বসে উঠল। খান তার পিঠে হাত রাখলেন "ইউ আর এ ব্রেভ ম্যান। চিন্তা কোর না, সব ঠিক হয়ে যাবে"।

আফসানা রওনা লাউঞ্জ থেকে বেরোচ্ছিলেন।

খান বীরেনকে বললেন "হ্যাপি জার্নি, সি ইউ এগেইন"।

বীরেন হাঁটতে শুরু করল।

এতক্ষণ হয় নি, এখন হঠাৎ করেই তার চোখ ঝাপসা হল, বাবা মার কথা মনে পড়ল।

সিকিউরিটি চেকিং হতে বেশিক্ষণ লাগল না। প্লেনে যাত্রীদের লাইন শুরু হয়েছিল।

সে লাইন দিতে যাচ্ছিল একজন কম্যান্ডো এসে তাকে বলল লাইন দেবার দরকার নেই। বাকি যাত্রীরা তাকে কৌতূহলী চোখে দেখছিল।

বীরেন মাথা নিচু করে প্লেনের ভেতরে প্রবেশ করল। আফসানা সাইদের পাশের সিট বরাদ্দ হয়েছে তার জন্য। আফসানা তাকে দেখে হাসলেন। বললেন "হ্যাপি জার্নি"।

বীরেন হাসল "সেম টু ইউ ম্যাম"।

লবিতে বসে থাকা অবস্থাতেই বীরেনের মনে পড়েছিল, আফসানা সাইদের নাম সে পড়েছে খবরের কাগজে। পাকিস্তান সহ বিশ্বের অনেক দেশের মৌলবাদীদের নিশানাতেই আছেন আফসানা। মৌলবাদীদের হাতে নারীত্বের অবমাননা নিয়ে বেশ কিছুদিন হল লড়াই চালাচ্ছেন। পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশে তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। কিছুদিন আগে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে এসেছেন। বেশিরভাগ সময়েই

অজ্ঞাতবাসে থাকেন কিন্তু এদেশের বিভিন্ন ধার্মিক সংগঠনের বিষনজরে আসতে বেশি সময় নেয় নি। আলিগড়ে একটা বক্তৃতা দেওয়ার সময় আফসানার মুখে কালি মাখানোর চেষ্টা হয়ে গেছে।

নিজে থেকেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল তার "বার বার বেঁচে ফিরতে কেমন লাগে ম্যাম?"

আফসানা তার দিকে তাকিয়ে বললেন "এই একই প্রশ্ন খানিকক্ষণ আগে যিনি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনিও করলেন। তাকেও আমি একই কথা বললাম, আমি তো নিজেও জানি না আমি কীভাবে ফিরলাম, শুধু মনে হয়, যার নাম ভাঙিয়ে এই পৃথিবীতে এতগুলো সংগঠন মানবতা বিরোধী কাজগুলো করছে, তারই হয়ত আমার প্রতি কোন দয়া আছে, তার জন্যই হয়ত বেঁচে ফিরি প্রতিবার"।

বীরেন মুগ্ধ হল, ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। কথাগুলো মনে থাকবে তার বহুদিন।

এয়ার হোস্টেসরা নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারাবিবরণী শুরু করেছেন, বীরেনের আর আগের দিনগুলোর মত বৈরাগ্য আসছিল না, তার মনে হচ্ছিল এই পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা জীবনটাকে আবার নতুন করে বাঁচতে হবে। সে মন দিয়ে শুনছিল সবটা।

প্লেন রানওয়ে দিয়ে দৌড় শুরু করেছে। বীরেন জানলার বাইরে তাকাল।

সব কিছু আর পানসে লাগছে না, ভাল লাগছে আবার নতুন করে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই প্লেন আকাশ ছুঁল, বীরেন চোখ বন্ধ করল, অনেক দিন পরে একটা ঘুম চাই তার। শান্তির ঘুম।

ঘুমিয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে নি, কোন একজনের ডাকে তার ঘুম ভাঙল।

বীরেন চোখ খুলে দেখল আফসানা সাইদ হাসিমুখে বলছেন "বীরেন তোমাকে আমার বহু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করাই। মিট হিম"।

বীরেন দেখল তার আফসানা সাইদের পাশে হাসি হাসি মুখে মীর্জা বসে আছেন।

৩১।

সন্ধ্যে গড়িয়েছে। সবাই চুপচাপ বসে ছিলেন।

ইয়াসমিন রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন, জ্যোতির্ময় টিভি চালিয়ে শেয়ারের খবর দেখছিলেন। সোমেন, তাপস বেরোবেন বেরোবেন করেও বেরোতে পারছিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে টিভি বন্ধ করে জ্যোতির্ময় নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন "স্কুলের কথা মনে পড়ে তোদের? সেই যে প্রার্থনা হত? প্রার্থনা শেষে পিটি স্যার বলতেন এদেশ আসলে সবার। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান, সবার। সময় যত গড়িয়েছে, তত বুঝতে পেরেছি, ওই সবই আসলে আবেগের কথা। আসলে এই দেশটা সংখ্যাগুরুর। তারা যা বলবে তাই আইন, যারা যা লিখে দেবে তাই ইতিহাস, যে দেশে একটা রাজ্যের লোক বাস ভর্তি স্কুল ছাত্রদের দিকে ঢিল মারলেও তারা বীরের জাত হয়, সেই দেশেই একটা রাজ্যে স্কুল ছাত্ররা তাদের স্কুল মিলিটারিরা নিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করলে তাদের দেশদ্রোহী বলা হয়। সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে নির্লজ্জ তোষণ হয়, আর সংখ্যাগুরুই ঠিক করবে ভাল সংখ্যালঘু কে, আর কে খারাপ সংখ্যালঘু। যে তার অপছন্দের মাংস খাবে না, যে তার পুজোর দিনে তার প্যান্ডেল খাটিয়ে দেবে, সেই ভাল সংখ্যালঘু। তার পরিবর্তে কী হবে? তুমি তাকে তার খাদ্যাভ্যাস পালন করতে দেবে না, তুমি তাকে তার ধর্মমত পোশাক পরলে রাস্তাঘাটে হেনস্থা করবে, মব লিঞ্চিং করবে..."

জ্যোতির্ময় কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলেন, সোমেন বাধা দিলেন "কথাগুলো তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার কথা না দাদা তুই ঠিকই বলেছিস।

এও মানছি তুই যা করেছিস ঠিক করেছিল, এবার কী চলছে আমাদের একটু স্পষ্ট করে বলবি প্লিজ?"

জ্যোতির্ময় বললেন "ক'টা বাজে এবার?"

সোমেন বললেন "সাড়ে ছ'টা বাজে"।

জ্যোতির্ময়ের মুখে হাসি ফিরে এল, "বাহ, দাঁড়া নিউজ চ্যানেলটা দি, খবর শুনি। তোরা রাতে খেয়ে যেতে পারিস, ইয়াসমিনের রান্নার হাত চমৎকার"।

জ্যোতির্ময়ের হঠাৎ এতটা পরিবর্তনে সোমেন অবাক হলেন। এতক্ষণ জ্যোতির্ময় সব কথাতেই কেমন তেড়ে তেড়ে আসছিলেন, এখন হঠাৎ খেয়ে যেতে বলছেন, সোমেনের হঠাৎ করেই মনে হল দাদার কি তবে সত্যিই মানসিক কোন সমস্যা হচ্ছে?

কলিংবেল বেজে উঠল।

জ্যোতির্ময় গলা তুললেন ইয়াসমিনের উদ্দেশ্যে "দরজাটা খোল তো। ফিরোজ এল বোধ হয়"।

ইয়াসমিন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুললেন। পরক্ষণেই তার আর্তচিৎকার শোনা গেল এই ঘর থেকে। সবাই তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন বেশ কয়েকজন কম্যান্ডো বাড়ির ভেতর প্রবেশ করেছে। ইয়াসমিনের মাথায় একজন রিভলভার তাক করে রেখেছেন পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে।

জ্যোতির্ময়কে দেখেই তুষার রঙ্গনাথন বলে উঠলেন "আপনার কর্মকান্ড আমরা ধরে ফেলেছি মিস্টার ভট্টাচার্য ওরফে বম্ব স্পেশালিস্ট জনাব হাসান মাকসুদ। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট"।

সোমেন তাপস দুজনেই অবাক হয়ে তুষারের দিকে তাকালেন।

জ্যোতির্ময় নিজের মাথার ওপরে হাত দুটো তুলে দিয়ে বললেন "ওদের ছেড়ে দিন ইন্সপেক্টর। ওরাও আপনাদের মত আজকেই জানল। আমার ভাই দুজন। ওরা নির্দোষ"।

তুষার হাসলেন "তা তো জানি, ওরা না থাকলে কি আর এখানে আসতে পারতাম আমরা?"

তুষার মিনির দিকে তাকালেন "থ্যাঙ্কস, মোবাইল লোকেশন শেয়ার করবার জন্য"।

জ্যোতির্ময় আশাহত চোখে প্রথমে মিনি, পরক্ষণে সোমেনের দিকে তাকালেন, বললেন "দেখলি? দেখলি তো তোরা সংখ্যাগুরুরা কেন বিশ্বাসযোগ্য নোস?"

একজন এগিয়ে এসে জ্যোতির্ময়ের হাতে হ্যান্ড কাফ পরিয়ে দিল। ইয়াসমিনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঘরের এক কোণায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তুষার বললেন "আপনার খেল খতম হাসান। বাকি জীবনটা জেলে পচতে হবে"।

জ্যোতির্ময় হো হো করে হেসে বললেন "তাই নাকি? আসুন আসুন, একটু খবর দেখি"।

তুষারের ভ্রু কুঁচকে গেল "মানে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আসুন না, সবাই মিলে খবর দেখার মজাই আলাদা"।

তুষার বললেন "না না, একেবারেই না। চলুন"।

জ্যোতির্ময় হাসলেন "তবে আমিই বলি। আজ সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার মুম্বই কলকাতা ফ্লাইট হাইজ্যাকড হয়েছে জাস্ট নাও। ভুলবেন না, আফসানা সাইদের মত গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী গেস্ট আছে প্লেনে। বুঝতেই পারছেন আশা করি ব্যাপারটার ইন্টারন্যাশনাল ইম্প্যাক্ট কত হতে চলেছে। আর সোমেন তোদের গর্বের সঙ্গে জানাই, ফ্লাইটে আমার একমাত্র ছেলে, সুমনও আছে"।

সোমেন মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতেই বসে পড়লেন।

তুষার রঙ্গনাথন বাকি কম্যান্ডোদের জ্যোতির্ময়কে দেখিয়ে বললেন "ওকে আর ওর স্ত্রী দুজনকেই নিয়ে চল"।

৩২।

অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে শহরে। কাঁচের বাইরে সে বৃষ্টিপাত দেখতে দেখতে তুষার কফি খাচ্ছিলেন।

মাথুর হন্তদন্ত হয়ে এলেন, "স্যার, আপনাকে ইন্টারোগেশন টেবিলে যেতে হবে বলে মনে হচ্ছে। উনি কিছুই বলছেন না। বার বার জিজ্ঞেস করছি আপনাদের দাবী দাওয়া নিয়ে কিছু বলুন, শুধু জোরে জোরে

হেসে যাচ্ছেন। শেষে বললেন আপনাকে ডাকতে। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকেও আপনাকে যোগাযোগ করতে বলছে"।

তুষার কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বললেন "তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ মাথুর? এ দেশের একেকটা শহরে বৃষ্টি একেকরকম। আমি যা দেখছি দিল্লির বৃষ্টির থেকে কলকাতার বৃষ্টি অনেক সুন্দর, তবে বেস্ট বৃষ্টি আমার গ্রামের। কেরল যাই না, কতদিন হয়ে গেল"।

মাথুর বুঝলেন তুষার এখন চাপ হালকা করতে চাইছেন। চাপ যখনই প্রবল হয়ে ওঠে, তুষার অন্য বিষয়ে চলে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির থেকে দূরে চলে যান কিছুক্ষণের জন্য। এর ফলে নাকি যখন আবার বর্তমান পরিস্থিতিতে মনঃসংযোগ করেন, তখন সেটা প্রবলভাবে করতে পারেন।

মাথুর চুপ করে থাকলেন। তুষার বলে চললেন "বাড়ি থেকে স্কুল যাওয়ার রাস্তায় একটা পুকুর পড়ত। বৃষ্টির সময়টা কোন কোন দিন স্কুল পালিয়ে সে পুকুর পারে গিয়ে বসতাম। অদ্ভুত একটা সময় ছিল। আজকাল মনে হয়, হয়ত সেরকম কোন সময়ই ছিল না। সবটাই ভ্রম"।

মাথুরের ফোন ভাইব্রেট করে উঠল। মাথুর দেখলেন খান মেসেজ পাঠিয়েছে "এনি প্রগ্রেস?"

মাথুর লিখলেন "নো"।

তুষার বেশ খানিকক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকলেন, কফিটা শেষ করতেই তার গলার স্বরে কেজো ভাবটা চলে এল, গম্ভীর গলায় বললেন "সমস্যা বাড়ছে মাথুর। প্রতিবারে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। প্রথমে হিন্দু মুসলমান, তারপর জেনারেল এস সি এস টি, পরক্ষণেই কাশ্মীরি পাকিস্তানি..."

মাথুর বললেন "মিনিস্ট্রিতে ফোনটা ধরে দেব স্যার?"

তুষার মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন। মাথুর ফোন ধরে দিলেন, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ডিফেন্স মিনিস্টারের উত্তেজিত গলা ভেসে এল "কিছু জানা গেল?"

তুষার বললেন "যা ফুয়েল আছে তাতে চারঘন্টা পরে কোথাও না কোথাও একটা ল্যান্ডিং ওদের করতেই হবে স্যার"।

"সেসব তো আমি জানি, আমাকে বল ওদের ডিম্যান্ডটা ঠিক কী? ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার ফোনে তো অস্থির হয়ে যাচ্ছি! আফসানা সাইদ আছেন বুঝতে পারছ তো! কোন অরগানাইজেশন এরা?"

"নো আইডিয়া স্যার"।

"কিছু একটা কর প্লিজ। রাখছি এখন। আপডেট দিও যা আসবে। আমার কোলকাতা আসার প্রয়োজন আছে?"

"না স্যার। আমি জানাব কোন আপডেট হলে"।

ফোনটা কেটে গেল। তুষার বললেন "চল"।

দুজনে বেরলেন। একটা অন্ধকার ঘরে জ্যোতির্ময়কে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

মাথায় কালো কাপড় পরানো। হাতদুটো পিছমোরা করে বাঁধা। ইয়াসমিনকে তার পাশেই একইভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

তুষার ঠান্ডা গলায় বললেন "ডিম্যান্ড কী আপনাদের?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আপাতত মাথার কাপড়টা সরান। আমার স্ত্রীকে অন্য কোন সেলে নিয়ে যান। এসব ব্যাপারে ও তেমন কিছুই জানে না"।

মাথুর বললেন "সেটা সম্ভব নয়"।

তুষার মাথুরকে বললেন "যা চাইছে কর"।

মাথুর ঘর থেকে বেরিয়ে একজন লেডি অফিসারকে ডাকলেন। লেডি অফিসার ইয়াসমিনকে নিয়ে গেলেন।

মাথার কাপড় সরিয়ে দেওয়া হল জ্যোতির্ময়ের।

তুষার জ্যোতির্ময়ের চোখের দিকে তাকালেন "বলুন"।

জ্যোতির্ময় চোখ ছোট করে কয়েকসেকেন্ড তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "দিন পনেরো আগের কথা। অনন্তনাগে একটা সাত বছরের মেয়ে, নাম আলিমা, বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। ঠিক সেই সময় একটা বিক্ষোভ শুরু হয় চার মাথার মোড়ে। আপনাদের আর্মি পেলেট গানে গুলি ছুড়তে শুরু করে। মেয়েটার দুটো চোখ নষ্ট হয়ে গেছে"।

তুষার বললেন "সরি টু নো। খুব দুঃখজনক ঘটনা"।

জ্যোতির্ময় বললেন "এর একমাস আগে শ্রীনগরে এক বাড়ির পনেরো বছরের ছেলে ফারহান স্কুল থেকে ফিরছিল। একই পরিস্থিতি, ওই সময়টা একটা বিক্ষোভ চলছিল। আপনাদের আর্মি বিনা কারণে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে দিল। ছেলেটার পেটে এমন একটা ঘা হল, ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না। বাঁচানো যেত হয়ত ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে, কিন্তু যেখানে হাসপাতালের রাস্তা অবধি কারফিউ লেগে আছে সেখানে কী করে পৌঁছনো যাবে! জানেন?"

তুষার মাথা নাড়লেন, "জানি না। তবে আপনি যদি এখন আপনার কী চাই সেটা বলেন, তাহলে বোধ হয় আমাদের সুবিধা হয়। আশা করি বুঝতে পারছেন এবার ভাল কথায় বলছি, এরপরে সেটা..."

জ্যোতির্ময় তুষারের চোখে চোখ রাখলেন "আপনাদের দেশের যে শিল্পপতি দেশের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল, তার সঙ্গে আপনারা দেখা হলে কোন দিন খারাপ ভাষায় কথা বলতে পারবেন মিস্টার রঙ্গনাথন?"

তুষার সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন "আপনারা ফান্ডিং কোত্থেকে পাচ্ছেন? লস্কর?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আপনাদের ফান্ডিং কে করে? সি আই এ?"

তুষার জ্যোতির্ময়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি কাশ্মীরে যে ব্লাস্টটা করিয়েছেন তাতে কোন নেতা মন্ত্রী মারা যায় নি, মারা গেছে গরীব জওয়ান। দিল্লিতেও তাই। মুম্বইতে সফল হলেও ক'টা শিল্পপতি মন্ত্রী মরত বলে আপনার মনে হয়?"

জ্যোতির্ময় কাঁধ ঝাঁকালেন "পার্ট অফ দ্য সিস্টেম। একটা কোথাও পৌঁছতে হলে জার্নিটা গ্রাউন্ড লেভেল থেকেই শুরু করতে হয়। বাই দ্য ওয়ে, চারজন জওয়ান মরেছে। জাস্ট দুদিন আগে তারা শহরে কারফিউ চলাকালীন বেধড়ক লাঠি চার্জ করেছিল। আই হ্যাভ নো সিমপ্যাথি ফর দেম"।

তুষার বিদ্রুপের হাসি হাসলেন "গ্রেট। আপনাদের ফান্ডিং এর সোর্সগুলো সম্পর্কে বলি তবে? পাকিস্তান, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কোরাপ্টেড কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড।

পাকিস্তানে হিন্দু বা শিখদের অবস্থা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা বলুন তো? পাক অকুপায়েড কাশ্মীরে যে সংগঠনগুলোকে খোলা কুকুরের মত ছেড়ে রেখেছে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট, তারা সেখানকার মহিলাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে সে সম্পর্কে আপনি জানেন? যদিও আপনাদের ফান্ডিং পুরোটাই পাকিস্তান থেকে আসছে তাও না। আরও যে সব সংগঠন আপনাদের টাকা দেয় তাদের ওখানে শিশু বা মহিলারা কাশ্মীরের থেকে ভাল আছেন তো? আপনি তাদের হাত ধরে ইন্ডিয়ার সিস্টেম ঠিক করবেন ভেবেছেন বুঝি?"

জ্যোতির্ময় বললেন "ঘরটা তো আগে। স্বয়ং সুভাষ চন্দ্র বোসকে ব্রিটিশ তাড়াতে হিটলারের মত কষাইয়ের হাত ধরতে হয়েছিল"।

তুষার জ্যোতির্ময়ের দিকে ঝুকলেন "হেল উইথ ইওর আইডিয়ালিজম। কী ডিম্যান্ড বলুন"।

জ্যোতির্ময় হাসলেন "একটা সিগারেট খাওয়ান"।

তুষার রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

৩৩।

মিনির মা যে বিকেলেই এসেছিলেন মিনি জানত না। বাড়ি ফিরে জানতে পারল।

সোমেন এসেই বারান্দার চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়েছেন। মিনির মা অনিন্দিতা খানিকটা ফোনে শুনেছিলেন। মিনিকে দেখেই বললেন "কী রে কী হল?"

মিনি মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

গোটা দিনটা যে এভাবে যাবে সে কোন দিন দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

তাপস গুছিয়ে বললেন পুরোটাই। প্রতিমা অনিন্দিতাকে বললেন "দিদি আমরা কি কোনদিন কল্পনাতেও আনতে পেরেছিলাম বড়দা ভেতরে ভেতরে এত কিছু করে ফেলছেন?"

অনিন্দিতা সোমেনের পাশের চেয়ারে বসে বললেন "এরপরে কি লোকেরা আমাদের বাড়িটাকে টেররিস্টের বাড়ি বলবে? মেয়েটার বিয়ে দেব কী কর?"

মিনি এত কিছুর মধ্যেও মার তার বিয়ে নিয়ে কথা বলায় বিরক্ত হয়ে মাকে একটা চিমটি কাটল।

সোমেন বললেন "চিন্তা কোর না বাড়ির বাইরে এখন থেকেই সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন হয়ে গেছে, তল্লাশি দল এল বলে"।

অনিন্দিতা ভয়ার্ত চোখে সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমাদেরও টেররিস্ট ভাবছে নাকি?"

মিনি বলল "তা কেন, আমি না বললে ওরা জানতেন কী করে? তুমি একদম টেনশন কোর না তো মা, বাবা তোমায় ভয় দেখাচ্ছে"।

অনিন্দিতা রাগী চোখে তাকালেন সোমেনের দিকে।

তাপস একটু গলা খাকড়িয়ে বললেন "যাই হোক, কথা হল বড়দার মধ্যে এত চেঞ্জ এল আর বুঝতেই পারলাম না"!

সোমেন বললেন "আসলে আমরা সব সময় নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে, বাড়িতে একটা লোক আছে, সেটাই ভুলে যেতাম"।

প্রতিমা বললেন "তোমরা বড়দার ছেলের যা বয়েস বললে তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে গোটা ব্যাপারটা একদিন কিংবা দুদিনে হয় নি। কোন কোন মানুষ থাকে, যারা এত অনায়াসে মিথ্যে কথা বলে যে তাদের চোখের পলক পর্যন্ত পড়ে না। চেঞ্জটা আমাদের কারও চোখে পড়বেই বা কী করে?"

সোমেন বললেন "তোমরা শুধু সংসার নিয়েই পড়ে আছো, আসল জিনিসটা নিয়ে কেউ কোন কথাই বলছ না। বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারছ? সেই যে আই এস আই এসে একজন বাঙালি ধর্মান্তরিত হয়ে তাদের নেতৃত্ব দিত, মনে আছে খবরের কাগজ ক'দিন কতটা এক্সাইটেড ছিল? সবার মুখে একই আলোচনা। আর এবার তো খোদ কলকাতার বুকে এই ঘটনা ঘটল। যা বুঝছি বাড়ি ঘর দোর ছেড়ে আবার রিফিউজি হয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। টিকতে পারব না নইলে। মানুষের প্রশ্নে প্রশ্নেই পাগল হয়ে যেতে হবে। আর, কতগুলো নিরীহ লোককে খুন করেছে... ভাবতেই তো! বড়দাই নাকি মাস্টারমাইন্ড এসবের পিছনে। যে লোকটা একটা পিপড়ে মারে নি কোন দিন সে নাকি এসব করেছে! নেহাত ওরা আমাদের বাড়ির ঠিকানা মিডিয়াকে দেয় নি, নইলে তো গোটা শহরের লোক এ বাড়ি মাটিতেই মিশিয়ে দেবে"। সোমেন তেতো মুখে মাথা নাড়ালেন।

তাপস অস্বস্তির সঙ্গে বললেন "বাড়ি ভাবছিস তুই? আমি তো ভাবছি এ রাজ্য ছেড়েই চলে যেতে হবে। সবাই চিনে যাবে। আত্মীয়স্বজন..."

প্রতিমা বললেন "আচ্ছা, তোমরা সবাই বলছ বড়দার জন্য তোমাদের প্রেস্টিজ নষ্ট হচ্ছে, তোমরা কেন ভুলে যাচ্ছ বলত মিনি না থাকলে এত কিছু জানাও যেত না। মানুষ তো সেটাও দেখবে!"

মিনি কাকীমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

তাপস উঠে টিভি চালালেন।

সংবাদ পাঠক উত্তেজিত ভঙ্গীতে হাইজ্যাকিং এর বর্ণনা দিচ্ছে

"এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর, মুম্বই কোলকাতা আই এন এস ফ্লাইট হাইজ্যাকারদের কবলে পড়েছে। সরকার থেকে প্রতিমুহূর্তে চোখ রেখে চলেছে ফ্লাইট থেকে কোন খবর পাওয়া যায় নাকি, কিন্তু ঘটনা হল হাইজ্যাকাররা এখনও অবধি কোন দাবী পেশ করে নি। কোন টেররিস্ট অরগানাইজেশন এখনও পর্যন্ত এই হাইজ্যাকিং এর দায় স্বীকার করে নি। প্লেনের মধ্যে আছেন বিতর্কিত লেখিকা আফসানা সাইদ সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সন্দেহ করা হচ্ছে পাকিস্তানের সরাসরি হস্তক্ষেপেই এই হাইজ্যাকিংটি ঘটেছে। যদিও পাকিস্তান এর দায় স্বাভাবিকভাবেই নিতে অস্বীকার করেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে। হাইজ্যাকাররা কারা? তারা কী চায়? দেখতে থাকুন..."

সোমেন হতাশ গলায় বললেন "দেখ, যা করার সেটা করেই ছাড়ল"।

কলিং বেল বেজে উঠল। সোমেন বললেন "দেখ তাপস, সম্ভবত ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো থেকে লোক এসেছে, বড়দার ঘর সার্চের জন্য"।

তাপস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে "হে ভগবান" বলে দরজা খুলতে রওনা হলেন।

৩৪।

জ্যোতির্ময়ের ঘর তল্লাশি হচ্ছে। বইয়ের র‍্যাক থেকে শুরু করে সব কিছু ওলোট পালোট করা হচ্ছে। ঘর ময় ধুলো ভর্তি হয়ে গেছে। মাথুর বেশ খানিকক্ষণ তল্লাশি দেখে নিচে নেমে এলেন। ড্রয়িং রুমে বাড়ির সবাই বসে ছিল। মাথুর বললেন "জল খাওয়াতে পারেন?"

প্রতিমা বললেন "নিশ্চয়ই। চা খাবেন?"

মাথুর বললেন "আপনাদের কষ্ট হবে"।

প্রতিমা উঠলেন "না না। আপনি বসুন প্লিজ"। অনিন্দিতাও গেলেন প্রতিমার সঙ্গে।

মাথুর বসলেন। ঘাম মুছলেন কপালের। সোমেন এবং তাপস মাথা নিচু করে বসে ছিলেন।

মাথুর মিনির দিকে তাকিয়ে হাসলেন "এই যে বাহাদুর গার্ল, তুমি আর কিছু পাও নি তোমার আঙ্কেলের ঘর থেকে?"

মিনি ঘাবড়াল না, একটু ভেবে বলল "আমি তো বুক শেলফ বাদে আর তেমন কিছু দেখি নি। ওখানেই ওই বাড়ির অ্যাড্রেসটা পেয়েছিলাম"।

মাথুর চিন্তিত মুখে বললেন "স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার হল তেমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। ইভেন ওই বাড়ির কম্পিউটার ঘেঁটেও তেমন কিছুই পাচ্ছি না। এরকম ট্রিকি সিচুয়েশনে আমরা কখনও পড়ি নি"।

সোমেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন অফিসার? আজ সকালের আগে, মানে আমার মেয়ে যদি আমাকে বার বার এটা নিয়ে নক না করত, আমরা কিছুই জানতাম না। এমন কি কোন দিন ভাবতেও পারি নি"।

মাথুর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "ইওর ব্রাদার ইজ আ জিনিয়াস স্যার। ওদের অর্গানাইজেশনটা যেভাবে অপারেট করল, আমাদের ইন্টেলিজেন্স কোন কিছু আঁচ পর্যন্ত করতে পারে নি"।

সোমেন আগ্রহী হলেন "কী... কী বললেন? অর্গানাইজেশন? কী নাম অর্গানাইজেশনের"?

মাথুর বললেন "নো আইডিয়া। কিচ্ছু বের করা যায় নি"।

মিনি কী একটা মনে হতে বলল "লাস্ট মার্চে জ্যেঠু দিন পনেরো বাড়ি ছিল না"।

মাথুর চোখ ছোট করলেন "ডেটটা প্রিসাইসলি বলতে পারবে?"

মিনি বাবার দিকে তাকাল "ডেটটা মনে আছে বাবা?"

সোমেন বললেন "টেন্থ থেকে হবে। ওই সময় আমাদের অফিসের ক্লোজিংএর কাজ শুরু হয়েছিল মনে আছে। দাদা দশ নাগাদ হঠাৎ একদিন সকালে বেরোল"।

মাথুর ফোনটা বের করে উত্তেজিতভাবে ফোনের অরগানাইজার বের করলেন। বেশ খানিকক্ষণ ফোন ঘাটার পরে উঠলেন "এক্সকিউজ মি"।

ঘরের বাইরে গেলেন। তাপস ধরা গলায় বললেন "কী যে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তাও ভাল ওরা সাধারন গাড়িতে এসেছেন। পুলিশের গাড়িতে এলে পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যেত এতক্ষণে"।

সোমেন হতাশভাবে মাথা নাড়লেন।

মাথুর তুষারকে ফোন করছিলেন বাইরে গিয়ে, একটা রিং হতেই তুষার ধরলেন "বল মাথুর, এনি আপডেট?"

মাথুর বললেন "কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না স্যার"।

তুষার তেতো গলায় বললেন "তাহলে ফোন করছ কেন?"

মাথুর বললেন "দ্যাট গার্ল, মানে যে আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছিল, একটা ইম্পরট্যান্ট ক্লু দিয়েছে, মানে আমার মনে হচ্ছে স্যার ক্লুটা ইম্পরট্যান্ট"।

তুষার বললেন "কী?"

মাথুর বললেন "মার্চের দশ থেকে দিন পনেরো উনি বাড়ি ছিলেন না"।

তুষার বললেন "সো?"

মাথুর উত্তেজিত গলায় বললেন "স্যার আপনি ভুলে যাচ্ছেন মার্চের তেরোতে লালচকে ওদের একটা সিক্রেট মিটিং হয়েছিল। আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম। লস্কর রিপ্রেজেন্টেটিভও ছিল"।

তুষার কয়েক সেকেন্ড থমকে বললেন "মাই গড! মাই গড। ইউ আর রাইট! সায়ক সে সময়টা কোথায় ছিল?"

মাথুর বললেন "কাবুলে স্যার"।

তুষার বললেন "হু। অনেকগুলো পাজল এদিক ওদিক হয়ে গেছে। কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। তুমি কিছু মেলাতে পারছ মাথুর?"

মাথুর বললেন "না স্যার। আপনি বুড়োটাকেই জিজ্ঞেস করুন"।

তুষার একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বললেন "অনেক হয়েছে, আমি এবার থার্ড ডিগ্রি অ্যাপ্লাই করব ভাবছি। অত জনের লাইফ আর দেশের সম্মান নিয়ে আমি আর রিস্ক নিতে পারছি না"।

মাথুর বললেন "ওর ওয়াইফের ইন্টারোগেশন হয়ে গেছে স্যার?"

তুষার বললেন "হু। শি নোজ নাথিং। শুধু ছেলের কথা বললে খানিকটা ইমোশনাল হচ্ছেন। বাট দিস ম্যান ইজ..."

মাথুর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন একজন অফিসার দোতলা থেকে একটা পাসপোর্ট নিয়ে নেমে এলেন।

৩৫।

জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে চুপচাপ অন্ধকারে বসেছিলেন।

তুষার আলো জ্বেলে ঘরে ঢুকলেন।

জ্যোতির্ময় জাগলেন না। একইভাবে বসে থাকলেন।

তুষার জ্যোতির্ময়ের সামনের চেয়ারে বসে বললেন "ওদের শ্রীনগর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে দেওয়া হয়েছে"।

জ্যোতির্ময় চোখ খুললেন।

তুষার বললেন "বলুন এবার কী দাবী দাওয়া আপনাদের"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ওরাই বলুক। আমার বয়স হয়েছে। যতটুকু করার ছিল করেছি"।

তুষার বললেন "মেয়ে এবং বাচ্চাদের ছেড়ে দিতে বলুন"।

জ্যোতির্ময় চোখ ছোট ছোট করে তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "কেন? কাশ্মীরের কোন ঘরে আপনাদের মিলিটারি মেয়ে এবং বাচ্চাদের ছেড়ে দেন?

আমরা খামোখা ছাড়তে যাব কেন?"

তুষার কাঁধ ঝাঁকালেন "ওকে। অ্যাস ইউ উইশ। একটা গেম খেলা যাক মিস্টার ভট্টাচার্য ওরফে হাসান মাকসুদ। খেলবেন?"

জ্যোতির্ময় কিছু বললেন না। ঠান্ডা চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তুষার বললেন "এই ঘরের পাশেই দুটো পাশাপাশি কাঁচের ঘর আছে। কিন্তু একটা ঘরের শব্দ আরেকটা ঘরে পৌঁছয় না। আমরা একটা ঘরে আপনার স্ত্রীকে রাখব, পাশের ঘরে আপনাকে। চলুন যাওয়া যাক"।

জ্যোতির্ময় এবারেও কিছু বললেন না।

তুষার উঠে দরজার বাইরে থাকা একজনকে নির্দেশ দিলেন জ্যোতির্ময়কে পাশের ঘরে নিয়ে যেতে। নির্দেশ মানলেন অফিসার। জ্যোতির্ময়কে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

জ্যোতির্ময় দেখতে পেলেন ইয়াসমিনকে। চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে ইয়াসমিনকে। ইয়াসমিন তার দিকে তাকালেন।

জ্যোতির্ময় কিছু বললেন না। চুপ করে থাকলেন।

তুষার বললেন "খেলাটা শুরু করি মিস্টার মাকসুদ?"

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "কী খেলা?"

তুষার বললেন "আমরা আপনার স্ত্রীর একটা আঙুল কেটে দেব। যদিও এই দুটো ঘরই সাউন্ড প্রুফ তবে আমরা ওই ঘরের সাউন্ডটা অন করে দেব যাতে ওর আর্তনাদ আপনি শুনতে পান। আর ইউ রেডি?"

জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "এ কী ধরণের অসভ্যতা?"

তুষার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন "এই যে আমাদের দেশ মিস্টার ভট্টাচার্য বা মাকসুদ, এই যে আমাদের দেশ, একটা বিরাট উদারনৈতিক দেশ। এই দেশ অনেক কিছু অ্যালাউ করে জানেন তো! ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি তো! হিউম্যান রাইটস আছে মানুষের। যদিও অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ, একেক জনের জন্য একেক রকম আইন এবং সেটা আমরাও মানি, কিন্তু সমস্যা হল এত দুর্নীতি থাকলেও আমাদের দেশে কিছু মানুষ আছে যারা আইন কানুন মেনে চলে। ভদ্রতা মেনে চলে। কারণ তাদের মানতে বাধ্য করা হয়। এর উলটো দিকে আছেন যেমন আপনি। জওয়ানদের খুন করলেন, যে দেশের সব থেকে এফিশিয়েন্ট অফিসারকেই খুন করালেন, চাঁদনি চকের মত জায়গায় ব্লাস্ট করালেন। এবার আপনার জন্য হিউম্যান রাইটস কী বলবে, তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না। আপনার বাপেরা মিডল ইস্টে ঘর ঘর থেকে মেয়েদের টেনে এনে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়, আর আপনাদের মত লোকেদের থেকে, আপনাদের মত শুয়োরদের থেকে আমাদের শিখতে হবে কোনটা অসভ্যতা আর কোনটা অসভ্যতা নয়? আনিস!"

তুষার গলা তুললেন। আনিস একটা যন্ত্র নিয়ে ইয়াসমিনের ঘরে প্রবেশ করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ইয়াসমিনের তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল এ ঘর থেকে। ইয়াসমিনের পায়ের একটা আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে। ঘরের সাদা মার্বেলের মেঝে ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তুষার মন দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে বললেন "আপনাদের ক্যাম্পগুলোতে এগুলো শেখানো হয় না? যন্ত্রণা সহ্য করা?"

জ্যোতির্ময় বললেন "এর বেশি আপনারা আর কী পারেন? এটাই তো পারেন!

ইয়াসমিন কোন দিন কোন ক্যাম্পে যায় নি,ওকে ছেড়ে দিন! নইলে কিন্তু এর ফল ভাল হবে না!"

তুষার বললেন "ইসলাম আপনাদের শিখিয়েছে মানুষ খুন করতে? কোন ইসলাম বলেছে একটু বলুন তো! দেশের নিরীহ মানুষদের মেরে আপনারা জিহাদ করবেন?"

বাইরে থেকে একজন দরজা নক করল। তুষার ঘর থেকে বেরোলেন।

ডিফেন্স মিনিস্টার ফোন করেছেন, গলায় উত্তেজনা "কী আপডেট কিছু জানালেন না তো!"

তুষার বললেন "ওরা শ্রীনগর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে চেয়েছিল, করানো হয়েছে। মহিলা এবং শিশুদের ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল, রাজি হয় নি"!

"রাজি হয় নি মানে কী? ইয়ার্কি নাকি?"

তুষার বললেন "দাবী দাওয়া না জানালে আমি ঠিক কী করব বলতে পারবেন স্যার?"

"রেসকিউ টিমকে বলুন ইমিডিয়েটলি অপারেশনে নামতে!"

"এর মধ্যে যদি ওরা আফসানা সাইদকে মেরে ফেলে!"

"উফ! তাহলে কী করবেন?"

"ওরা নার্ভ গেম খেলতে চাইছে স্যার, আমাদেরও খেলতে দিন"।

"কী বলছেন আপনি? মাথা ঠিক আছে আপনার? এখন খেলার সময়?"

"তাহলে কী করব আপনারা ডিসিশন দিন স্যার!"

"রাখুন এখন, পরে ফোন করছি"।

ফোনটা কেটে গেল। তুষার ফোনটা ছুড়ে মারলেন। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে জোর পায়ে জ্যোতির্ময়ের ঘরে ঢুকে জ্যোতির্ময়ের মুখে প্রবল জোরে একটা ঘুষি মেরে বললেন "পৃথিবীর প্রত্যেকটা ধর্মীয় ছাগলকে জাস্ট খোলা বন্দুকের সামনে গুলি করে মারা উচিত"।

জ্যোতির্ময়ের নাক থেকে গলগল করে রক্ত বেরনো শুরু করল।

তুষার চেয়ারটা টেনে পায়ের ওপর পা তুলে রাগী গলায় ফিসফিস করে বললেন "নো সিমপ্যাথি ফর ইউ... সিম্পলি নো সিমপ্যাথি ফর ইউ..."

৩৬।

রাত বারোটা। শ্রীনগর এয়ারপোর্টে প্লেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্লেনের ভেতরে সবাইকে একটা জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। মীর্জা একটা অত্যাধুনিক রাইফেল নিয়ে ঘুরছেন প্লেনের ভেতরে। এয়ারবাসের ভেতরটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে। ইঞ্জিন বন্ধ প্লেনের। একটা বিশ্রী গন্ধ ভাসছে বিমানের ভেতরে। কারও কারও নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। এয়ারপোর্টে বাকি বিমানদের অবতরণ আপাতত বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

বীরেনকে পাইলট কেবিনে নিয়ে রাখা হয়েছে আফসানার সঙ্গে। বীরেন প্রথম দিকটায় প্রবলভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। শ্রীনগরে নামার পর থেকে তার বারে বারে মনে হচ্ছে সম্ভবত আর বেঁচে ফেরা হবে না তার।

মীর্জা কেবিনের ভিতরে এসে আফসানাকে বললেন "দাবী জানতে চাইছে গভর্নমেন্ট"।

আফসানা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে লাগাতে বললেন "বল হাসান সাহেবের সঙ্গে কথা বলাবার ব্যবস্থা করুন"।

মীর্জা বলল "জি ম্যাডাম"।

আফসানা বললেন "আশা করি যাত্রীরা কেউ বুঝে উঠতে পারে নি আমি তোমাদের সঙ্গে মিলে আছি"।

মীর্জা হেসে বীরেনের দিকে তাকালেন "একমাত্র ও ছাড়া..."

আফসানা হাসলেন "ও তো আমাদেরই সিক্রেট এজেন্ট। কাশ্মীর ব্লাস্ট, চাঁদনী চক ব্লাস্টের মূল পান্ডা তো ওই। ও জানলে কী ক্ষতি?"

বীরেন চমকে আফসানার দিকে তাকাল।

আফসানা বললেন "চমকে ওঠার কী আছে? তুমি জাস্ট ভাবো তো, এই দুই দেশের ঝামেলার সুযোগ নিয়ে আমাদের মত কত লোক করে কম্মে খাচ্ছে! তুমি জানো কি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের কত টাকা শুধু ডিফেন্সের জিনিস কিনতে খরচ হয়? আর কী ভাবো তুমি? এইসব কেনা কাটায় তোমাদের পলিটিশিয়ানরা সেইন্ট সেজে বসে থাকে?"

বীরেন বলল "আপনাকে পাকিস্তান মারতে চেয়েছে, তারপরেও আপনি..."

আফসানা এবং মীর্জা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন। আফসানা বললেন "ওসব তো নাটক। ওগুলো না করলে ইন্ডিয়া আমাকে শেল্টার দিত? ইন্ডিয়া পাকিস্তান লড়াই তো আজব সার্কাস আসলে। এখানে পাকিস্তানের এগেইন্সটে কিছু বললে, স্বাভাবিকভাবেই আমাকে ইন্ডিয়ানরা পুজো করতে চলে আসবে। নিজেদের থেকেও বেশি ভরসা করবে। এ তো ন্যাচারাল তাই না?"

বীরেনের মাথা কাজ করছিল না। সে চুপ করে বসে থাকল।

মীর্জা বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে।

বীরেন বলল "আপনারা আমাকে কেন টার্গেট করেছেন জানতে পারি?"

আফসানা বীরেনের দিকে তাকালেন "নিশ্চয়ই কারণ আছে। কারণ ছাড়া আমরা কিছু করি না। দেখো না, সব কিছু মিটে গেলে আমি যখন আবার তোমাদের দেশের আতিথেয়তা গ্রহণ করব, বিভিন্ন বলিউডের শোতে চিফ গেস্ট হয়ে যাবে তখন কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে আসলে এই দেশে থেকে আমি ঠিক কী করছি? সব কিছুরই কারণ থাকে বীরেন, নাথিং হ্যাপেনস উইদাউট আ রিজন"।

বীরেন বলল "আর মীর্জা, সুমন ওদের কী হবে?"

আফসানা বীরেনের কথার উত্তর না দিয়ে আবার ঠোঁটে লিপস্টিক মাখতে শুরু করলেন।

বীরেন সামনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বেশ খানিকটা দূর থেকে গোটা চত্বরটা আলোয় ছয়লাপ করে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় আর্মি ঘিরে রেখেছে গোটা জায়গাটা।

বৃষ্টি নেমেছে বাইরেটা। বীরেন ভাবতে চেষ্টা করল ঠিক এই সময়টায় তাদের বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের বাড়ির বাবলুদা মদের ঠেক থেকে এসে বাড়ির সামনে চেঁচিয়ে গান জুড়েছে। বাবলুদার বউ বাড়ির ভেতর থেকেই জোরে জোরে চিৎকার করতে শুরু করেছে। বাবা ঘুম ঘোরে মাকে বলছে "রোজ রোজ একই কীর্তন আর ভাল্লাগছে না"।

বোনের ঘরের আলো নিভেছে কিন্তু আসলে বোন ঘুমায় নি। লুকিয়ে লুকিয়ে ফেসবুক করছে। গেম খেলছে।

নিজের অজান্তেই চোখের কোণ ভিজে উঠল বীরেনের। দু তিন দিনের মধ্যে তার জীবনের সব কিছু এভাবে ওলোট পালট হয়ে যাবে সে কি কোন দিন স্বপ্নেও ভেবেছিল?

সুমন একটা প্লেট নিয়ে কেবিনে ঢুকল, আফসানাকে বলল "এখানে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আছে। খেয়ে নিন ম্যাম"।

আফসানা বীরেনের দিকে তাকালেন "নাও, একটা স্যান্ডউইচ নাও"।

বীরেন বলল "আমার খিদে নেই"।

সুমন রিভলভার দিয়ে বীরেনের মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলল "নাটকবাজি মারিও না, যা করতে বলা হচ্ছে করে যা"।

বীরেন সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল "তোমার লজ্জা লাগে না, এই দেশে থেকে এই দেশেরই ক্ষতি করছ?"

সুমন বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে বীরেনের সামনে। রাগী গলায় বলল "যাদের প্রতিদিন শুনতে হয় তুমি বাঙালি না মুসলমান, ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচের দিন শুনতে হয় কাকে সাপোর্ট করছিস, মুসলিম হলেও হিন্দু সেজে নাম ভাড়িয়ে ঘর ভাড়া নিতে হয়, এই দেশটা তাদের কোন দিন ছিল না"।

বীরেন চুপ করে গেল। আর কিছু বলল না। শুধু লক্ষ্য করল সুমন আর আগের মতন বাঙাল অ্যাক্সেন্টে কথা বলছে না।

৩৭।

রাত সাড়ে বারোটা।

খান কলকাতায় এসেছেন। মাথুর, তুষার এবং খান বসেছেন।

তুষার ইলেক্ট্রিক কেটলিতে জল গরম করতে দিয়েছেন। সব সময় সঙ্গে করে টি ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন। জল গরম হলে চা নিয়ে বসলেন। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে।

মাথুর উত্তেজিত অবস্থায় বললেন "স্যার, হাসানের বাংলাদেশের পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। এবং সেটা দেখে যা বোঝা যাচ্ছে, উনি বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান এবং একবার ইরাক গেছেন। মানে বাংলাদেশ থেকে উনি ইজিলি বেরিয়ে যেতেন। ওখানকার ঠিকানা দেওয়া আছে নোয়াখালির। বাঙলাদেশে আমাদের ইন্টেলিজেন্সকে জানানো হয়েছে"।

তুষার টি ব্যাগ জলে মেশাতে মেশাতে বললেন "তোমাদের বি এস এফ কী বলছে? এতবার বর্ডার পার করে গেছে এসছে, একবারও ধরতে পারল না?"

মাথুর খানের দিকে তাকালেন। খান পেপারওয়েট নিয়ে খেলছিলেন। বললেন "ভারত বাংলাদেশ বর্ডার নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভাল। এখনও প্রচুর লুপ হোলস আছে"।

তুষার বললেন "এক চক্ষু হরিণের গল্প জানা আছে? সেই যে হরিণের একটাই চোখ। আর হরিণ সে চোখটা বনের দিকে রেখে জল খাচ্ছিল, ভেবেছিল বাঘ বন থেকে আসবে। আসলে দেখা গেল বাঘটা জলে সাঁতার কেটে এসেছিল। আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। পাকিস্তান বর্ডার নিয়ে সব মাথা খারাপ করে ফেলছি, অথচ একবারও আমরা বুঝতে পারছি না বাংলাদেশ থেকে কীভাবে অনুপ্রবেশ হয়ে যাচ্ছে"।

খান বললেন "অ্যান্ড কোরাপ্ট পলিটিশিয়ানস। চলে আসছে, দেখা যাচ্ছে দু মাসের মধ্যে বার্থ সার্টিফিকেট বের হয়ে যাচ্ছে"।

তুষার হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বললেন "ভোটের জন্য দেশের ইন্টারনাল সিকিউরিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা হচ্ছে, বা হয়েছে এর আগেই, মানি ইনভলভড সবই মানছি কিন্তু অ্যাবাভ অল, সবার আগে বল তো, ওদিক দিয়ে আসছে কী করে? বা এদিক দিয়েই বা যাচ্ছে কী করে"?

খান বা মাথুর কেউ কিছু বললেন না।

তুষার বললেন "ডিজগাস্টিং। এই লোকের ছেলেও টেররিস্ট। ফ্যামিলির লোক জানতই না এ লোকের বিয়ে হয়েছে, ভাবত ন্যালাখ্যাপা লোক, বিয়ে থা করবে না, ঘরের কোণে শেয়ার বাজার ডিলিং করে জীবন কাটিয়ে দেবে। এদিকে স্লিপার সেল চালিয়ে গেছে মনের আনন্দে। বাপ ছেলে মিলে আমাদের ইন্টেলিজেন্সকে ফাঁকি দিয়ে আধার ডেটা হ্যাক করেছে, ইন্টারন্যাল সিকিউরিটিকে বোকা বানিয়ে সায়কের আই কার্ড নিয়ে একটা ছেলেকে ক্যারিয়র হিসেবে ইউজ করে কাশ্মীরে, দিল্লিতে ব্লাস্ট করিয়েছে, মুম্বইতেও করাত, কানের পাশ দিয়ে বেরিয়েছে, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আপাতত প্লেন হাইজ্যাক করিয়েছে। জাস্ট... জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না। কী ডিম্যান্ড আছে কে জানে"।

মাথুর বললেন "স্যার, ওই ছেলেটা, মানে যাকে ক্যারিয়র হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, ইজ হি রিয়েলি ক্লিন?"

খান বললেন "ইয়েস, হি ইজ ক্লিন। আমি কথা বলেছি। ছেলেটার বাড়ির ঠিকুজি কুষ্টী সার্চ হয়ে গেছে। নির্বিবাদ ছেলে, এখনও বেকার, পাড়ার মোড়ে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কোন দোষ নেই"।

তুষার বললেন "ওরা এই ছেলেটাকেই টার্গেট করল কেন?"

খান কাঁধ ঝাঁকালেন “সর্ষের মধ্যেই ভূত। ডিফেন্সের একজামে ওকে আমাদের লোকজন ছেঁটেছিল। ওরা ওকে পছন্দ করেছিল। সিম্পল”।

তুষার মাথায় হাত দিলেন, “মাই গড! তার মানে আমাদের ভেতরেই ওদের ইনফর্মার আছে”!

মাথুর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তুষারের ফোন বেজে উঠল। তুষার ফোনের স্ক্রিণটা দেখে বললেন “রেহান”।

ধরলেন তুষার, ফোনটা স্পিকার মোডে রাখলেন “বল রেহান। আপডেট দাও”।

“স্যার, ওরা হাসান মাকসুদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। ভিডিও কলিং করাতে বলছে। আধ ঘন্টা সময় দিয়েছে, নইলে বলছে একজন একজন করে মারতে শুরু করবে। বলছে দশজন শিশু আছে, আগে তাদের মারবে”।

মাথুর খানের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন “ব্লাডি সান অফ... ওকে। ওদের কাছে কাল ভোর অবধি সময় চাও। বল হাসানের বয়স হয়েছে। উনি টায়ার্ড ফিল করছিলেন। এখন শুয়েছেন”।

ওপাশে কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পরে উত্তর এল “স্যার এদিকে আরও প্রবলেম হয়েছে”।

“বলে ফেল”।

“শ্রীনগরে একটা আর্মি ক্যাম্পে হামলার চেষ্টা হয়েছিল। দুজন ছিল, দুজনই স্পট”।

তুষারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করল। মাথুরের দিকে তাকালেন।

কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন “আর্মি বুঝে নেবে ওদের। আপাতত এয়ারপোর্টেই নজর দাও। দে আর ডেঞ্জারাস।তুমি সময় চাও। কাল ভোর ছ’টা অবধি”।

ফোনটা কাটলেন তুষার। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি থেকে ফোন আসতে শুরু করল, ধরলেন তুষার “বলুন স্যার”।

“কী আপডেট তুষার?”

“স্যার ওরা হাসানের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে”।

“তো বলাও। প্রবলেম কী আছে?”

“স্যার, আমরা কাল ভোর অবধি টাইম চেয়েছি”।

“কেন? এখন কী প্রবলেম?”

তুষার একটু গলা খাকড়িয়ে বললেন “থার্ড ডিগ্রি দিতে হয়েছিল স্যার। এখন...”

“হোয়াট! কার পারমিশনে এটা করতে গেলে তুমি!”

তুষার কিছু বললেন না। ওপাশ থেকে মন্ত্রীর রাগী গলা ভেসে আসল “আমি কিছু জানি না, ওরা যা চায় এক্ষুণি মেটাও। কোন রিস্ক নিতে চাই না আমি। পি এম সাহাব বার বার ফোন করছেন আমায়। স্টেটস থেকে আপডেট জানতে চাইছে। তোমার কাছে ফিফটিন মিনিটস আছে তুষার, ক্লিন দিস মেস আপ। আর না পারলে বল, আমি অন্য পথ দেখছি”।

ফোনটা কেটে গেল।

তুষার ফিসফিস করে একটা গালাগাল দিয়ে বললেন “যতসব। ঘরে বসে বসে জ্ঞান মেরে হিরো সাজবে”!

খান বললেন “হাসানের মুখে রক্ত ছিল ক্লিন করে মেডিসিন দেওয়া হয়েছে তো স্যার। আপনি কথা বলিয়ে দিন। যা হয় হবে”।

তুষার উত্তর দিলেন না। চায়ে চুমুক দিয়ে দেখলেন চা ঠান্ডা হয়ে গেছে।

৩৮।

জ্যোতির্ময় কাঁচের ফাঁক দিয়ে ইয়াসমিনকে দেখছিলেন। পায়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেছে। ওষুধও পড়েছে। এখন মেঝেতে শুয়ে আছেন ইয়াসমিন। জ্যোতির্ময়ের ফার্স্ট এইড করা হয়েছে। ঘর ভর্তি ওষুধের গন্ধ।

"কেমন আছেন আপনি?"

খান ঢুকলেন ঘরে।

জ্যোতির্ময় স্বগতোক্তি করলেন "এসে গেল ছোট টিকটিকি"।

খান বললেন "কিছু বললেন?"

জ্যোতির্ময় বললেন "না, আপনিও কি মারধোর করতে এসেছেন?"

খান চেয়ারে বসলেন "আমার নাম আশরফ খান"।

জ্যোতির্ময় বললেন "হ্যাঁ, দিল্লি চাণক্যপুরী বসন্ত বিহারে রিসেন্টলি একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। স্ত্রী আর বোন থাকে। মা গ্রামের বাড়ি সেকেন্দ্রাবাদে থাকেন। আপনার এক ভাই স্কুলে পড়ান, নামটা... ফিরদৌস খান। ঠিক তো?"

খান কয়েক সেকেন্ড জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন "একদম ঠিক। আর এই ডিটেলগুলো দিয়ে আপনি আমাকে যা বোঝাতে চেয়েছেন তাও বুঝেছি"।

জ্যোতির্ময় বললেন "একজন মুসলমান হয়ে আপনি এ দেশের হয়ে কাজ করছেন? লজ্জা করে না আপনার?"

খান বললেন "একজন হিন্দু হয়ে আপনি মুসলমান হয়েছেন আপনার লজ্জা লাগে না তো আমার কেন লাগবে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আমি যা ইচ্ছা হতে পারি, আমার সে ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে"।

খান শিস দিয়ে উঠলেন "সে তো এই দেশে। মিডল ইস্টের কোন কান্ট্রিতে মুসলমান ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়ে একবার খ্রীস্টান হয়ে দেখবেন তো! তখন না হয় আপনার ব্যক্তিস্বাধীনতার গল্প শুনব"।

জ্যোতির্ময় খানের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললেন "এই দেশ মুসলিমদের তাদের মত করে বাঁচতে দিচ্ছে না। আপনার মনে হয় না প্রতিমুহূর্তে দমন পীড়ন চলছে আমাদের ওপর?"

খান বললেন "তো? আপনার কী? আপনি কে? হাতিম তাই? আপনি তো ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে, কনভার্টেড মুসলিম"।

জ্যোতির্ময় বললেন "এই উপমহাদেশের কোণায় কোণায় কনভারসান আছে। আপনার ফ্যামিলি ইতিহাস দেখুন, হয়ত আপনার ফ্যামিলিও আগে হিন্দু ছিল"।

খান মাথা নাড়লেন "সরি বস। আমাকে বর্তমান নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকতে হয় যে অতীতে কী হয়েছিল, বাবর কী করেছিল, ইব্রাহিম লোদীর হারেমে কত মেয়েমানুষ ছিল তা নিয়ে আমি একটুও চিন্তিত নই"।

জ্যোতির্ময় বললেন "আপনি চিন্তিত না হতে পারেন। ওরা তো চিন্তিত"।

খান বললেন "ওরা কারা?"

জ্যোতির্ময় বললেন "যারা মসজিদ ভেঙে মন্দির করতে চায়"।

খান বললেন "দেখুন জ্যোতির্ময়বাবু কিংবা হাসান, আপনাকে আমি খুব ভাল করে একটা কথা বোঝাই। আমার মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা করবেন না। আমাকে আমার চাকরিটা করতে দিন। আর বাই দ্য ওয়ে, আমি বিশ্বাস করি না, কোন একটা দুটো পলিটিক্যাল পার্টির জন্য এ দেশটা আর আমার থাকবে না। আপনি টেগোরের দেশের লোক, আপনার অন্তত টেগোরে ভরসা রাখা উচিত ছিল"।

জ্যোতির্ময় বললেন "কী করব? ভরসা? বাহ্‌, ভাল কথা বলেছেন তো! গুজরাটে যখন গর্ভবতী মেয়ের পেটে ওরা তলোয়ার চালিয়েছিল আপনি কোথায় ছিলেন? কাশ্মীরে যখন বাড়ি থেকে মেয়েদের বের করে নিয়ে ধর্ষণ করা হত আপনি কোথায় ছিলেন?"

খান বললেন "কিংবা ডাইনোসররা যখন অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল তখন আমি কোথায় ছিলাম, তাই না?"

জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত চোখে খানের দিকে তাকালেন।

খান বললেন "মগজধোলাইটা কীভাবে হল আপনার? কে করেছে? এত ইন্সপিরেশন পেলেন কোথেকে?"

জ্যোতির্ময় চুপ করে থাকলেন।

খান বললেন "কী লাভ হয় এসব করে বলুন তো? হিরো হওয়া যায়? সত্যিই কি হওয়া যায়? এই যে লাদেন, বিরাট আনন্দে টুইন টাওয়ারটা ভাঙল। কী লাভ হল? সেই তো কুকুরের মত মরতেই হল! যাক গে, কাজের কথায় আসি। বলুন কী চান?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আমি চাই না। কাশ্মীর চায়"।

খান বললেন "পাকিস্তানে যাবেন? কী দেবে পাকিস্তান কাশ্মীরকে? ওপারের কাশ্মীরের সঙ্গে কখনও এপারের কাশ্মীরের তুলনা করেছেন?"

জ্যোতির্ময় খানের দিকে তাকিয়ে বললেন "আজাদি চাই। আজাদ কাশ্মীর চাই।

আর্মির পাহারা চাই না, স্বাধীনতা চাই। মায়েদের ইজ্জত ফেরত চাই"।

খান মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "ওকে। চান। চেয়ে বেশ করেন। তা কতদিন আজাদি রাখতে পারবেন? লস্করের জানোয়ারগুলো যখন আম কাশ্মীরিদের ঘর থেকে মেয়েদের টেনে নিয়ে যাবে তখন বাঁচাতে আসবেন তো?"

জ্যোতির্ময়ের চোখদুটো একবার জ্বলেই নিভে গেল। বললেন "সেটা আমরা বুঝে নেব"।

খান বললেন "বেশ। তাই হোক। বুঝে নেবেন। কিন্তু আপনি তো মশাই বাঙালি ব্রাহ্মণ। আপনার হঠাৎ কাশ্মীরের জন্য অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল কেন?"

জ্যোতির্ময় উত্তর দিলেন না। খান পকেট থেকে মোবাইল বের করে রেহানকে ফোন করলেন। রেহান ফোন ধরলেন।

খান বললেন "কানেক্ট কর। কথা বলুক"। খানিকক্ষণ পরেই খানের মোবাইলে মীর্জার মুখ ভেসে উঠল।

মীর্জা বললেন "কেমন আছেন স্যার?"

জ্যোতির্ময় বললেন "বাচ্চা ও মহিলাদের ছেড়ে দাও"।

মীর্জা বললেন "কিন্তু..."

জ্যোতির্ময় বললেন "সকালে ফোন করব। ঘুমাব এখন"।

খানের দিকে তাকালেন জ্যোতির্ময়। ফোনটা কাটলেন খান।

জ্যোতির্ময় খানের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন "আপনাদের তুষার স্যারকে বলে দিন, আর পনেরো মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বের করে নিয়ে আমার ওয়াইফকে হসপিটালাইজড না করলে হেলি রোডের ফ্ল্যাটে ওর ফ্যামিলির লোকজনের একজনও বেঁচে থাকবে না। এটা আমার শপথ। আপনি এখন আমাকে ঘুমাতে দিন। খুদা হাফেজ"।

খান চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৩৯।

আফসানা রাগী চোখে মীর্জার দিকে তাকিয়ে বললেন "ব্যস! হয়ে গেল"।

মীর্জা বললেন "কী হয়ে গেল?"

আফসানা বললেন "আমি তো এই ভয়গুলোই পাই। আমাদের কী কথা ছিল? হোস্টেজদের ছেড়ে দেওয়ার কথা একবারও হয়েছিল? তারমানে উনি ভাঙছেন"।

মীর্জা গম্ভীর মুখে বললেন "হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে উনি যা বলবেন আমি তা করব"।

আফসানা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন "এই দেখো, কীভাবে আর্মি চারদিকে এসে জড়ো হয়েছে। আমাদের উলটোটা করা উচিত। মহিলা শিশুদের রেখে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া। এতজন

পুরুষের মধ্যে কেউ উলটো বাহাদুরি দেখিয়ে দিলে বিপদটা বেশি"।

মীর্জা চিন্তিত মুখে আফসানার দিকে তাকালেন "আর যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে?"

আফসানা বললেন "ছেড়ে দাও"।

মীর্জা উঠে কেবিনের বাইরে গেলেন। বীরেন বলল "আমাকে ছেড়ে দিন ম্যাম। আমি আর পারছি না বিশ্বাস করুন"।

আফসানা হাসতে হাসতে বললেন "তাই নাকি? তোমাকে ছেড়ে দেব? আর তুমি বাইরে বেরিয়ে বলবে আফসানা এদের সঙ্গে যুক্ত আছে? তা হয় নাকি?"

বীরেন বলল "আপনি সব পুরুষ যাত্রীদের ছেড়ে দেবেন, আর আমাকে রেখে দেবেন তাহলেও ওদের সন্দেহ হবে না?"

আফসানা বললেন "হবে না। বরং ওরা বুঝবে তুমি আমাদেরই লোক"।

বীরেন একটু চুপ করে থেকে বলল "আপনাদের লোক হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। যারা টেররিজম ছাড়া আর কিছু করতে পারে না, মানুষ মারা ছাড়া যাদের জীবনে আর কোন কাজ নেই, তাদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না। আর আপনি... যত কম বলা যায় ততই ভাল। আপনার মত মানুষেরা মানবতার শত্রু"।

আফসানা বললেন "দেশের জন্য যাদের লড়তে হয় তারা মানবতার শত্রুই হয়। যে আমেরিকানদের তোমরা পুজো কর, সেই আমেরিকানরা যখন হিরোশিমা নাগাসাকি করল তখন তো কেউ কিছু বলল না! কারণ যে শক্তিশালী, সেই ঠিক। বাকি সবাই ভুল। ইন্ডিয়া এখন শক্তিশালী, বাকি বিশ্বের আড়ালে থেকে কাশ্মীরীদের ওপরে অত্যাচার করছে। ইন্ডিয়া ঠিক। এভাবে তো চলতে পারে না"।

বীরেন বলল "আর পাকিস্তান ঠিক? জন্তুর মত লুকিয়ে এসে নিরীহ মানুষদের মেরে বাহাদুরি নেওয়া খুব বীরত্বের কাজ বুঝি? আর যে এত বড় বড় কথা বলছেন, ভেবেছেন আমরা কিছুই জানি না? আপনাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ না খেতে পেয়ে থাকে। আপনাদের নেতারা ব্যস্ত থাকে অস্ত্র কিনতে, ইন্ডিয়ার এগেইন্সটে কন্সপিরেসি করতে"।

আফসানা বললেন "সে তোমাদের দেশের নেতারাও তাই করে। ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনে আর তা থেকে কাটমানি খায়। পাবলিককে বোকা বানিয়ে রাখার জন্য ইন্ডিয়া পাকিস্তান তাস তুলে ধরে। ভোটের আগে একটা কার্গিল, একটা ছাব্বিশ এগারো করে দিতে পারলেই বেরোজগারি, না খেতে পাওয়া, গ্রাম কে গ্রাম বিনা ইলেক্ট্রিসিটিতে চলা, সব ঢাকা পড়ে যায়। মেইন ইস্যু হয়ে যায় পাকিস্তান, মেইন ইস্যু হয়ে যায় হিন্দু মুসলমান, কিংবা কিছু পলিটিশিয়ানদের জন্য গরু খাওয়া, শুয়োর খাওয়া। ভেবো না এগুলো আমি জানি না। আমরা সব জানি। কিন্তু আমাদের জন্য কান্ট্রি ফার্স্ট। দেশের ইন্টারেস্টের জন্য যতদূর যাওয়া দরকার, আমি যেতে রাজি"।

দরজা খুলে সুমন ঢুকল। বোঝাই যাচ্ছে বেশ রেগে আছে। আফসানাকে বলল "এটা কী হচ্ছে? এটা তো কথা ছিল না!"

আফসানা অবাক হয়ে বললেন "কী হচ্ছে? কী কথা ছিল না?"

সুমন বলল "আমার বাবা যা বলেছে তা হচ্ছে না কেন? শিশু আর মহিলাদের কেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না?"

আফসানা ঠান্ডা গলায় বললেন "কারণ এই সিচুয়েশনে আমি যা বলব তাই হবে। তোমার বাবার মত ইন্ডিয়ান পুলিশের আতিথেয়তা নিচ্ছি না বলে!"

সুমন হাতের রাইফেলটা আফসানার মাথায় ঠেকাল। পরক্ষণেই নামিয়ে নিল।

আফসানা হাততালি দিলেন জোরে জোরে, "বাহ বাহ। গুলিটা একবারে চালিয়েই দাও। আমার কিছু হলে তোমাদের আর এখান থেকে বেরোতে হবে না"।

সুমন নিস্ফল আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল "বাবা যা বলেছে তাই হবে"।

আফসানা সুমনের চোখে চোখ রেখে বললেন "না, আমি যা বলব তাই হবে"।

৪০।

মিনি শুয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। একটা দুঃস্বপ্নের মত দিনটা যাচ্ছে।

যে জ্যেঠুকে সে ছোটবেলা থেকে একভাবে দেখে এসেছে, যে লোকটার কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে, তারই সম্পূর্ণ অন্য রূপ তাকে একেবারে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

একটা লোক এতটা অভিনয় করে একটা বাড়িতে থাকতে পারে? এত নির্লিপ্তভাবে থাকতে পারে? মাঝে মাঝেই জ্যেঠু থাকত না, তাদের বলে যেত ঘুরতে যাচ্ছে, বাবা কাকা আক্ষেপ করে বলত দাদার লাইফটা কত ভাল, একা মানুষ কোন পিছুটান নেই, যেদিকে ইচ্ছা চলে যেতে পারে। সে লোকটা আসলে কোথায় যেত?

মিনির মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। মোবাইলে চার্জ ছিল না। তার ফেসবুক খুলতে ইচ্ছা করল।

বিছানা থেকে উঠে মিনি কম্পিউটার খুলল।

ফেসবুক ছেয়ে গেছে প্লেন হাইজ্যাকিঙের খবরে। কেউ প্রার্থনা করছে, কেউ সন্ত্রাসবাদীদের গালাগালি করছে। বিভিন্ন তরজা চলছে নানা লোকের ওয়ালে। মিনির খুব লজ্জা লাগছিল। মনে হচ্ছিল সেও আসলে ওই সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেই কেউ একজন, যার বাড়ির লোক সন্ত্রাসবাদী, সেও তো আসলে সন্ত্রাসবাদীই হয়।

আফসানা সাইদের জন্য নানা রকম প্রার্থনা শুরু হয়েছে। আফসানা সাইদের বিভিন্ন পোস্ট শেয়ার হচ্ছে। একজন নারী, যিনি ধর্মীয় বন্ধন ঠেলে , রাষ্ট্রকে দূরে সরিয়ে রেখে মেয়েদের কষ্ট নিয়ে কলম ধরেছেন, তার এরকম অপহরণের ঘটনায় স্বভাবতই ইন্টারনেট উত্তাল হয়ে উঠেছে।

মিনি স্ক্রল করতে করতে দেখে যাচ্ছিল শুধু। মেহজাবিন অনলাইন ছিল। তাকে দেখে পিং করল "এই"।

মিনি লিখল "বল"।

"কী রে! সেই লিফলেটের ব্যাপারটাই সত্যি হল তবে!"

"তাই তো দেখছি"।

"আমি কাউকে কিছু বলি নি, তুই কিছু বলিস নি তো কাউকে"?

"না না, টপ সিক্রেট। খেপেছিস"?

"কী বাজে ব্যাপার বল?"

"হ্যাঁ"।

"আফসানা সাইদের যদি কিছু হয় খুব খারাপ লাগবে রে। উনি আমার আইডল"।

"হু। আমারও"।

"তিন তালাক নিয়ে আফসানার একটা রিসেন্ট উপন্যাস বেরিয়েছিল। পড়েছিস?"

"কোনটা বলত?"

"তালাক, তালাক, তালাক। আমার কাছে আছে, পড়িস। জাস্ট ফাটাফাটি"।

"আচ্ছা পড়ব। তুই এখনো জেগে আছিস কেন ব্যাটা?"

"হি হি। সাদিক অনলাইন"।

"ওওও। আচ্ছা। কথা বল। আমি কাটি"।

"বাই। গুড নাইট"।

"গুড নাইট"।

ব্রাউসারটা বন্ধ করে মিনি কম্পিউটারটা শাট ডাউন করল। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে মেশিনটা শাট ডাউন হতেই হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত তার একটা কথা মনে পড়ল।

সে আবার মেশিনটা অন করল। বুট হচ্ছিল মেশিনটা, মিনি ধৈর্য ধরে রাখতে পারছিল না। যতক্ষণ মেশিনটা অন হচ্ছিল, মিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করা শুরু করে দিল। বুট হতেই সে লাফিয়ে গিয়ে ব্রাউসার অন করে জিমেল খুলল। যেটা খুঁজছিল সেটা পেতেই নিজের ঘর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। বাবা মা ঘুমাচ্ছিল, মিনি বলল "তোমরা ওঠো শিগগিরি ওঠো"।

সোমেন, অনিন্দিতা সবে ঘুমিয়েছিলেন, মিনির কথায় ধড়মড় করে উঠে বললেন "কী হল? কী হয়েছে?"

মিনি হাঁফাচ্ছিল। অনিন্দিতা বললেন "দম নিয়ে নে"।

মিনি বলল "দম নিলে হবে না, শোন, আগের মাসের ঘটনা, জ্যেঠু হঠাৎ করে আমার ঘরে এসে বলল একটা ইমেল করতে হবে। আমার জিমেলটা খোলাই ছিল। জ্যেঠু তাড়াতাড়ি বসে ইমেলটা করেই উঠে গেছিল। এই জাস্ট মনে পড়ল। আমি ভেবেছিলাম জ্যেঠু হয়ত মেইলটা ডিলিট করে দিয়েছে, এখন দেখলাম করে নি। ভাবতেই পারে নি হয়ত এরকম দিন আসতে পারে। অসাবধানে..."

সোমেন উত্তেজিত গলায় বললেন "কী লেখা মেইলে? দেখলি?"

মিনি বলল "লেখা আছে টিউলিপ ফোটার সময় হয়ে গেছে। গেছে ব্লুফ্লাওয়ার অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল অ্যাড্রেসে"।

সোমেন বললেন "ওরা তো ফোন নাম্বার দিয়ে গেছে, আমার ফোনটা দে, এক্ষুণি ফোন করে জানাই"।

সোমেন ফোন করলেন। কয়েক সেকেন্ড কথা বলে ফোনটা রেখে বললেন "ওরা একটা ইমেল অ্যাড্রেস পাঠাচ্ছে। মেইলের স্ক্রিণশট নিয়ে সেন্ড কর"।

সোমেনের ফোনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইমেল অ্যাড্রেসের এস এম এসটা ঢুকল।

মিনি ফোনটা নিয়ে নিজের ঘরে দৌড়ে গেল।

মেইলটা স্ক্রিণশট নিয়ে পাঠিয়ে কী মনে হল ব্লু ফ্লাওয়ার লিখে গুগল সার্চ করল।

ব্লু ফ্লাওয়ার আফসানা সাইদের প্রথম বইয়ের নাম।

৪১।

ইয়াসমিনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রেচার এসে গেছিল। কয়েকজন নার্সও এসেছিলেন। জ্যোতির্ময় পাশের ঘর থেকে সেটা দেখছিলেন। হঠাৎ দেখলেন তুষার এসে কিছু বলছেন নার্সদের। নার্সরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

তুষার পাশের ঘর থেকে তার ঘরে এসে জ্যোতির্ময়কে বললেন "আমরা দুঃখিত হাসান, আপনার স্ত্রীকে হসপিটালাইজড করা গেল না"।

জ্যোতির্ময় রাগী গলায় বললেন "আমি কি জানতে পারি, কেন?"

তুষার বললেন "আপনার সঙ্গীরা আপনার কথা শোনে নি, পুরুষদের ছেড়ে দিয়েছে, মেয়েদের ছাড়ে নি, যেখানে উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল। নিরীহ নারী আর শিশুদের আপনারা হোস্টেজ করে রেখে দিলেন। সুতরাং..."

জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তুষার জ্যোতির্ময়ের সামনের চেয়ারে বসলেন "দ্রোণাচার্য আর একলব্যের গল্পটা জানেন তো? মানুষের বুড়ো আঙুলটা খুব ইম্পরট্যান্ট হাসান। এই যে আপনি এত ভাল ভাল ইনোভেটিভ বোমগুলো বানাচ্ছেন, জাস্ট ভাবুন তো, আপনার বুড়ো আঙুলটাই নেই! আপনি বানাতে পারতেন সেগুলো? তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে বা হাতের বুড়ো আঙুলটা না থাকা খুব একটা ভাল ব্যাপার হবে না। will it be easy to clean your ass with four fingers Mr. Hassan?"

জ্যোতির্ময় কিছু বললেন না।

তুষার উঠে বেরোলেন ঘর থেকে। কন্ট্রোল রুমে ঢুকতেই মাথুর উত্তেজিত গলায় বলল “স্যার মেয়েটা ফোন করেছিল”।

তুষার ভ্রু কুচকালেন “কোন মেয়েটা?”

মাথুর বললেন “দ্যাট রিলেটিভ অফ হাসান”।

তুষারের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, “দ্যাট ইন্টেলিজেন্ট ব্রেভ গার্ল। কী বলছে?”

মাথুর কম্পিউটারের মণিটরটার দিকে আঙুল দেখালেন “দেখুন স্যার, এই মেইলটা করেছিল হাসান। সম্ভবত ভাবতেও পারে নি কস্মিনকালেও কেউ সন্দেহ করবে। ভাইঝিও দেখে নি। এখন কী মনে হতে দেখতেই এটা পেয়েছে। আমাদের স্ক্রিণশট তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেইলটাও ফরোয়ার্ড করেছে”।

তুষার অস্ফূটে বললেন “শাবাশ। দিস ইজ গ্রেট। টিউলিপ... টিউলিপ ইজ আ কাশ্মীরী ফ্লাওয়ার মাথুর। খান, কী মনে হচ্ছে তোমার?”

খানের ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল বলে খান ব্ল্যাক কফি খাচ্ছিলেন। ঘুমচোখে বললেন “স্যার হ্যাকার লাগবে”।

তুষার অবাক হয়ে বললেন “মানে”?

খান বললেন “হাসান যাকে মেইলটা পাঠিয়েছে তার আইডিটা হ্যাক করতে হবে”।

মাথুর খানের দিকে তাকিয়ে বললেন “মাথা গেছে?”

খান বললেন “এছাড়া কোন উপায় আছে? ব্লুফ্লাওয়ার কার আইডি, খায় না মাথায় দেয় কী করে বুঝব?”

তুষার কয়েক সেকেন্ড খানের দিকে তাকিয়ে বললেন “রাইট। আইটির কে আছে কলকাতায়?”

খান বললেন “পীযূষ গোয়েল। বাড়িতে ঘুমাচ্ছে এখন”।

তুষার বললেন “গাড়ি পাঠিয়ে দাও। ফোন কর। আধ ঘন্টার মধ্যে এখানে হাজির কর”।

খান উঠে ঘরের বাইরে গেলেন। মাথুর বললেন “দ্য থিং ইজ গেটিং কমপ্লিকেটেড স্যার”।

তুষার বললেন “কেন?”

মাথুর বললেন “পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। কাশ্মীরিদের ওপর ভারতের প্রচুর অন্যায় অবিচার হচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘে ওরা নাকি এই নিয়ে ঝড় তুলবে। আফসানা সাইদ পাকিস্তানের সম্পদ, তার কিছু হলে পাকিস্তান ছেড়ে কথা বলবে না এটসেট্রা”।

তুষার বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন “এমনই সম্পদ যে মহিলাকে দেশের ধর্মীয় ছাগুগুলোর জন্য দেশ বিদেশে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। রাস্কেল কান্ট্রি একটা। টেররিজম ছাড়া কিছু শেখায় না। তুমি জানো না মাথুর, ব্যাটাদের কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না”।

মাথুর বললেন “সায়ক ডাউন হবার আগে খানিকটা আঁচ আমরা পেয়েছিলাম স্যার। যে দেশের আর্মিই সে দেশের পলিটিশায়নদের কন্ট্রোলে থাকে না, তাদের থেকে আর কী এক্সপেক্ট করা যায়? মুজফফরাবাদে রীতিমত টেররিজমের চাষ হয়”।

তুষার মাথা নাড়ালেন “সায়ক ওয়াজ অ্যান অ্যাসেট। দোজ বাস্টার্ডস কিলড...”

তুষারের ফোন বাজছিল। রেহান ফোন করছেন। তুষার ধরলেন “বল রেহান”।

“স্যার কয়েকটা ইম্পরট্যান্ট ইনপুটস দেওয়ার জন্য ফোন করছি”।

“বল”।

“ওরা তিনজন আছে। তিনজনই ঘোরা ফেরা করছে। আফসানাকে পাইলট কেবিনে রাখা হয়েছে। সঙ্গে ওই ছেলেটিও আছে”।

“ওকে”।

“কোন ইন্সট্রাকশন স্যার?”

তুষার একটু চুপ করে থেকে বললেন “শার্প শ্যুটার রেডি রাখো রেহান”।

রেহান অবাক হলেও সেটাকে বুঝতে না দিয়ে বললেন “ওকে স্যার। আপনাকে আপডেট দিয়ে যাব”।

তুষার বললেন "ইজ শ্রীনগর ওকে?"

রেহান বললেন "ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। কালকেও বৃষ্টি হবে। লালচকে প্রোটেস্ট র‍্যালি হতে পারে কাল। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলছে অনন্তনাগে বড় সড় ঝামেলা বাধাবে কাল। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পোড়াতে পারে..."

তুষার বললেন "ওকে। আপাতত এসব নিয়ে তুমি ভেবো না। আমি কাল যেতে পারি। না গেলেও, তোমার ওপর অনেকগুলো দায়িত্ব থাকবে। আশা করি নিরাশ করবে না"।

রেহান বললেন "বাচ্চাগুলোকে রেখে দিয়েছে স্যার। এরা মানুষ না"।

তুষার বললেন "জানি। রাখছি এখন। পরে কোন আপডেট এলে ফোন কোর"।

"জয় হিন্দ স্যার"।

"জয় হিন্দ"।

তুষার ফোনটা কাটলেন।

খান হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন, "পীযূষ ইজ হিয়ার স্যার"।

তুষার ঘড়ি দেখে বললেন "হাফ অ্যান আওয়ার বলেছিলাম। ইউ টুক টুয়েন্টি ফাইভ মিনিটস। ইম্প্রেসিভ"।

পীযূষ ঢুকলেন ঘরে। তুষার দেখলেন পীযূষকে ঘরের থ্রি কোয়ার্টার আর টি শার্টেই তুলে নিয়ে এসেছেন খান।

৪২।

রাত দেড়টা।

মেজর জেনারেল অবন্তী গম্ভীর মুখে টহল দিচ্ছিলেন শ্রীনগর এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে। রেহান খানকে দেখেই ডাকলেন "কোন আপডেট রেহান?"

রেহান বললেন "স্যার, তুষার স্যার ফোন করে বললেন শার্প শ্যুটার রেডি করতে"।

অবন্তী রেহানের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন "ওকে, আর কিছু? লালচকের ঝামেলার কথা জানিয়েছ?"

রেহান বললেন "হ্যাঁ স্যার, এখানেই কনসেন্ট্রেট করতে বললেন"। পরক্ষণেই হেসে ফেলল "আর বললেন শ্রীনগরটা আপাতত আর্মি দেখুক"।

অবন্তীর বিরক্তির সঙ্গে বললেন "তা তো হবেই। আর্মি তো এই করবে। মার খাবে, মরবে, আত্মরক্ষা করতে গেলে শুনতে হবে আর্মি খারাপ! ড্যাম উইথ দ্য সিস্টেম!

আর কী যে করছে রঙ্গনাথন কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা মাথা তো ধরা পড়েছে! এখনও ডিসিশন নিতে পারছে না কেন?"

রেহান বললেন "দিস কেস ইজ লাইক ক্যান্সার স্যার। কতটা ছড়িয়েছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না তো! কী করবেন বলুন? এই মুহূর্তে অপারেশনে গেলে... মানে যাওয়ার তো কোন চান্সই নেই"।

অবন্তী গম্ভীর গলায় বললেন "হু। যাদের ছাড়া হয়েছে তাদের সবাই এয়ারপোর্ট লিভ করেছে?"

রেহান বললেন "না বেরোতে দেওয়া হয় নি সিকিউরিটি রিজনসের জন্য। ভোরবেলা ছাড়া হবে। তাছাড়া, কয়েক জনের ফ্যামিলিও আছে। তারা তো এমনিতেও কোথাও যাবে না।"

অবন্তী বললেন "পাইলট আর এয়ার হোস্টেসদের রেখে দিয়েছে? তার মানে আবার কোন প্ল্যান আছে নাকি?"

রেহান মাথা নাড়লেন "বলতে পারব না স্যার। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না"।

অবন্তী বললেন "প্যাসেঞ্জার লিস্টটা চেয়েছিলাম তখন। আনিয়ে নাও"।

রেহান পকেট থেকে ওয়াকি টকিতে ফোন করে প্যাসেঞ্জার লিস্টটা দিয়ে যেতে বললেন।

অবন্তী রেহানের দিকে তাকালেন "তুমি কাশ্মীরি না?"

রেহান বললেন "হ্যাঁ স্যার"।

অবন্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "তোমার ভয় করে না? ওরা তো তোমাদেরই বেশি টার্গেট করে এখন"।

রেহান বললেন "সেটাই করছে স্যার এখন প্রতিমুহূর্তে। আম কাশ্মীরিদের মধ্যে যারা ইন্ডিয়ান আর্মিতে আছে তাদের টার্গেট করছে। ওরা চায় না আমাদের মধ্যে কেউ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের চাকরি করুক"।

অবন্তী হাসলেন "হ্যাঁ, তার পরিবর্তে কতগুলো রাইফেলধারী জেহাদী হোক। দিস হোল থিং ইজ এ জোক রেহান, তুমি বুঝতে পারো? ওরা কন্টিনিউয়াসলি প্রভোক করে যাবে, আর আমাদের দেশের একেকটা সরকার তাতে একেকরকম রিঅ্যাক্ট করবে। অথচ কাজের কাজ কিছু হবে না। গোটা রাজ্যটা বারুদের স্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে"। অবন্তী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

রেহান বললেন "জানি স্যার, তাই তো আমি এখনও নিজেকে ইন্ডিয়ান বলেই মনে করি, যতই পলিটিক্যাল প্রভোকেশন থাকুক না কেন ওপারে কিংবা এপারে"।

অবন্তী রেহানের কাঁধে হাত রাখলেন "জানি রেহান, ডেমোক্র্যাসিতে সবই মেনে নিতে হয়। পার্সোনালি আমিও কাশ্মীরে যে দমন নীতি চলছে তা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারি না। কাশ্মীর হল একটা ফুলের মত, আমরা সে ফুলটাকে দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে ফেলছি"।

রেহান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন একজন প্যাসেঞ্জার লিস্টটা দিয়ে গেলেন তাকে। রেহান লিস্টটা অবন্তীকে দিলেন।

অবন্তী লিস্টটা মন দিয়ে দেখলেন। মিনিট পাঁচেক পর বললেন "রেহান, লিস্টটা তুষারকে পাঠাও। ওর হয়ত এত কিছুর মধ্যে এটা মাথায় নাও থাকতে পারে"।

রেহান বললেন "ওকে স্যার"।

মোবাইল বের করে ফটো তুলে রেহান ফটোগুলো তুষারকে পাঠিয়ে দিলেন। অবন্তী বললেন "হাই সিকিউরিটি লোকজনদের নিয়ে এই সমস্যা। একজনের জন্য গোটা প্লেনটাকেই..."

রেহান বললেন "আফসানা সাইদকে তো ওরা টার্গেট করবেই স্যার। কাশ্মীর কিংবা পাকিস্তানে মেয়েদের ওপরে হয়ে চলা সমস্ত রকম অত্যাচারের প্রতিবাদী মুখ যখন"।

অবন্তী বললেন "তুমি আফসানার লেখা পড়েছ?"

রেহান মাথা নাড়লেন "সময় কোথায় স্যার"?

অবন্তী বললেন "আমি পড়েছি, লেখার কোয়ালিটি কিন্তু ট্র্যাশ। বিরাট কিছু না। তবে সাবজেক্টগুলো যেহেতু অ্যান্টি পাকিস্তান, আমাদের দেশের লোক তাতেই খুশি"।

রেহান বললেন "গাটস থাকা দরকার কিন্তু স্যার, ডেমোক্রাসি ইন পাকিস্তান ইজ অ্যান ইম্পসিবল টার্ম"।

অবন্তী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন "সেম ইন কাশ্মীর রেহান। এখানেও আমরা ডেমোক্রাসি দিতে ব্যর্থ"।

রেহান হাসলেন "দ্য গুড থিং ইজ স্যার, এই কনফেশনটা আমরা এদেশে খুলে আম করতে পারব। পাকিস্তানে সেটাও পারব না"।

অবন্তী হাসলেন "রাইট"।

৪৩।

রাত আড়াইটা।

"চা খাবেন? আমার কাছে টি ব্যাগ আছে। আপনি চাইলে খাওয়াতে পারি"।

জ্যোতির্ময়ের ঘরে ঢুকলেন তুষার। জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। চোখ খুললেন না।

তুষার জ্যোতির্ময়ের সামনের চেয়ারে বসলেন। টেবিলে তবলা বাজাতে শুরু করলেন। শব্দ শুনে জ্যোতির্ময় চোখ খুললেন। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ইয়াসমিনকে দেখলেন। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে শুয়ে পড়েছেন ইয়াসমিন।

তুষার বললেন "চা খাবেন?"

জ্যোতির্ময় ক্লান্ত গলায় বললেন "এখানে কি আমাকে পিকনিক করতে নিয়ে এসেছেন অফিসার?"

তুষার বললেন "না, একবারেই সে দাবী আমি করছি না, কিন্তু এখানে যেহেতু আপনি আমার গেস্ট, তাই আপনি পিকনিক করবেন না কাবাডি খেলবেন সেটা আমিই ঠিক করব, তাই না?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আমি কিছু খাব না"।

তুষার বললেন "আপনার ওয়াইফের উন্ড ইন্সপেকশন করা হয়েছে, কাল সকালে হসপিটালাইজড করা হবে। ইন্ডিয়ায় ডেমোক্রাসি আছে, আমরা চেষ্টা করলেও জেহাদীদের মত হতে পারি না। বুঝেছেন?"

জ্যোতির্ময় বললেন "তা বটে, ক্যামেরার সামনে একজন সংখ্যালঘুকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারেন, গরুর মাংস খাচ্ছে অভিযোগে ট্রেন থেকে নামিয়ে গণপ্রহারে

মেরে ফেলতে পারেন, ডেমোক্রাসি আছে বটে। ঠিকই বলেছেন"।

তুষার বললেন "কয়েকজন সাইকোর জন্য গোটা দেশবাসীকে দায়ী করাটা কি ঠিক হবে? আমি নিজে তো বিফ খাই, আমার তো কোন প্রবলেম হয় না"!

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন জোরে জোরে চেঁচিয়ে, আমি বিফ খাই?"

তুষার বললেন "তার কোন প্রয়োজন আছে কি? আপনিই বলুন না, আছে কি? আমি কি খাব না খাব, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা যেমন কেউ এসে বলে দেবে না, একই ভাবে আমি আমার অন্দরমহল খুলে দেখাব কি না সেটাও আমার ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করছে। বাদ দিন মিস্টার মাকসুদ, আমি খানিকটা আপনার মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছি। কয়েকটা পয়েন্ট যোগ করেছি নিজের থেকেই, আমি ভুল হতে পারি। বলে ফেলি?"

জ্যোতির্ময় চুপ করে থাকলেন।

তুষার বললেন "আচ্ছা ধরেই নিলাম আপনার চুপ করে থাকাটা সম্মতির লক্ষণ। শুনুন তবে, প্রথমত আপনি বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছেন। বাঙালি ব্রাহ্মণরা দক্ষিণ ভারতীয় বা উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মত অতোটা গোঁড়া না হলেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্টই গোঁড়া। আপনার ভালোবাসা হল একজন মুসলিম মহিলার সঙ্গে ,আপনি আলাদা সংসার করলেন বাড়িতে লুকিয়ে। সে সংসারের কথা বাড়িতে বললেন কিন্তু আপনার মা মানলেন না কিছুতেই। মারা গেলেন দুঃখে। ফ্রাস্ট্রেশনে। আপনি ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করলেন এবং একসময়ে এসে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু ক্যাসিয়াস ক্লে যে শান্তির খোঁজে মহম্মদ আলী হয়েছিলেন আপনি সেই খোঁজে মোটেও আসেন নি। আপনার ছিল রাষ্ট্রের প্রতি, নিজের পরিবারের প্রতি এক সীমাহীন রাগ। সেই রাগ আপনাকে ধীরে ধীরে একটা চক্রের মধ্যে প্রবেশ করাল..."

জ্যোতির্ময় বিরক্ত গলায় বললেন "আহ, চুপ করুন তো, কিছু না জেনে নিজের মত করে একগাদা কথা বলেই চলেছেন আপনি। আপনি কিচ্ছু জানেন না"।

তুষার বললেন "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বুঝেছি আপনি আমাকে অনেক কিছুই বলতে চাইছেন না জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ওরফে হাসান মাকসুদ ওরফে মোজাম্মেল করিম"।

জ্যোতির্ময় স্থির চোখে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বলে চললেন "ইয়াসমিন বেগম, নোয়াখালী, তাই তো? নিজের বাড়ি দেখতে যাওয়ার অ্যাডভেঞ্চারে গিয়ে ওদেশেই ইয়াসমিন বেগমকে প্রেম করে বিয়ে করলেন, প্রথম সন্তানকে নিয়ে এদেশে অবৈধভাবে ঢোকার সময় বি এস এফের গুলিতে প্রথম সন্তানকে হারালেন, এমনই ভাগ্যের পরিহাস বাচ্চাটার সৎকারও করতে পারলেন না, গুলি খাবার পর ওই পেট্রাপোল নো ম্যান্স ল্যান্ডের বাদাবনেই ছেলের লাশ ফেলে রেখে এদেশে চলে আসতে হয়েছিল। অতঃপর কলকাতার এক মুসলিম মহল্লায় ঘর নেওয়া এবং সুমনের জন্ম... একই সঙ্গে জন্ম ভারতবর্ষের প্রতি তীব্র ঘৃণার। বাড়িতে ছিলেন ঠিকই কিন্তু এমনভাবে থাকতেন কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি আসলে আপনি কী করে বেড়াচ্ছেন। এবারে ঠিক বলছি তো আমি শ্রী জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য?"

জ্যোতির্ময় দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন।

তুষার টেবিলে কয়েকটা টোকা মেরে বললেন "ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স মিস্টার হাসান মাকসুদ কিংবা নোয়াখালীর মোজাম্মেল করিম, দেড় ঘন্টার মধ্যে আপনার ঠিকুজি কুষ্ঠী বার করে নিয়েছে। এবার বলুন, আফসানা সাইদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কী করে? কবে থেকে আপনারা একসঙ্গে কাজ করছেন এবং আমাদের সব ইন্টেলিজেন্সকে চুতিয়া বানিয়ে যাচ্ছেন?"

জ্যোতির্ময়ের শোক পলকের মধ্যে বিস্ময়ে পরিণত হল, তিনি বিস্ফারিত চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৪৪।

রাত সাড়ে তিনটে।

মীর্জা এসে বীরেনকে বললেন "বাইরে যান, আমাদের কথা আছে"।

বীরেন কেবিনের দরজা খুলে বাইরে গেল।

মীর্জা বললেন "বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিলে ভাল হত। ভীষণ কান্নাকাটি করছে। এভাবে ঝামেলা বেড়ে গেল"।

আফসানা বললেন "বাচ্চারা কান্নাকাটি করবেই। কিন্তু এটা তুমি ভুলে যাচ্ছ, গভর্নমেন্ট এই বাচ্চাদের জন্যই অনেক বেশি আমাদের দাবী মেনে নেবে"।

মীর্জা অধৈর্য গলায় বললেন "আমরা তো এখনও আমাদের দাবী জানাতেই পারলাম না"।

আফসানা বললেন "জানিয়ে দাও। বলে দাও শ্রীনগর জেল থেকে ওমর শেখকে ছেড়ে দিতে। খবর পেলে সেফ প্যাসেজ চেয়ে নাও। তুমি সুমন আর সাহিল বেরিয়ে যাও। আমি থেকে যাব মেয়ে আর বাচ্চাদের সঙ্গে। একগাদা ইন্টারভিউ দিতে হবে এই যা"।

মীর্জা হতাশ গলায় বললেন "শুধু ওমর শেখকে ছেড়ে দিতে বলব? হাসান মাকসুদকে না?"

আফসানা ঠান্ডা গলায় বললেন "অবাস্তব কথা বলবে না মীর্জা। তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। উনি ফ্যামিলি শুদ্ধ ধরা পড়েছেন। উনি তো বলেইছিলেন ওকে নিয়ে চিন্তা না করতে। আমাদের মধ্যে ডিল হয়েছিল উনি হাইজ্যাকিংটা করাবেন, আমি ওমর শেখকে ছাড়িয়ে নেব। ডিল কমপ্লিট।এখন আর এত প্রশ্ন আসছে কেন?"

মীর্জা বললেন "উনি কিন্তু বাচ্চা আর মেয়েদের ছেড়ে দিতে বলেছিলেন"।

আফসানা কাঁধ ঝাঁকালেন "সিচুয়েশন ওয়াইজ ডিসিশন চেঞ্জ হতেই পারে। কী বল? হতে পারে না?"

মীর্জা বললেন "ওকে। আমি জানিয়ে দিচ্ছি। আর ওই ছেলেটার কি হবে?"

আফসানা বললেন “এত বড় হাইজ্যাকিং হবে একটাও লাশ পড়বে না তা কি হয়? একমাত্র ওই আমার স্বরূপ জানে। আশা করি আর বলতে হবে না কী করতে হবে!”

মীর্জা কয়েক সেকেন্ড আফসানার দিকে তাকিয়ে বললেন “জি”।

আফসানা বললেন “আর ওই কী যেন নাম, মাকসুদের ছেলে! ওকে বলে দিও বেশি বাড়াবাড়ি না করতে। নইলে এর পরে যখন পাকিস্তান যাবে, তখন স্রেফ জ্যান্ত কবর দিয়ে দেব”।

আফসানার চোখদুটো জ্বলে উঠল।

#

“আর ইউ সিরিয়াস রেহান?” অবন্তী অবাক চোখে রেহানের দিকে তাকালেন।

রেহান বললেন “ইয়েস স্যার। অনলি ওমর শেখ”।

মেজর জেনারেল অবন্তী আরও কিছুক্ষণ রেহানের দিকে তাকিয়ে বললেন “হু ইজ দিস ওমর শেখ?”

রেহান বললেন “লাস্ট ফেব্রুয়ারিতে কাশ্মীর টাইমসের এডিটর হুসেনকে মার্ডার করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল।“

অবন্তী বললেন “হু”।

অবন্তী ফোন বের করে তুষারকে ফোন করলেন। কয়েকটা রিং হতে ধরলেন তুষার, বললেন “বলুন অবন্তী”।

অবন্তী বললেন “শুধু একজন ক্রিমিনালের জন্য এত বড় অরগানাইজড হাইজ্যাকিং। ইজ ইট বিলিভেবল তুষার?”

তুষার হাসলেন “হি হ্যাজ আ হিস্ট্রি অবন্তী। আফসানা সাইদের এককালের হাসব্যান্ড ওমর শেখ। মহিলা এক কাজে দু কাজ করছেন”।

অবন্তী বললেন “মাই গড! জাস্ট বাচ্চা আর মেয়েদের জন্য মুভ করতে পারছি না তুষার। আপনি বুঝতে পারছেন না আমরা কী হেল্পলেস সিচুয়েশনে আছি। বাই দ্য ওয়ে, প্যাসেঞ্জার লিস্টটা দেখেছেন?”

তুষার বললেন “ওসব দেখে কী হবে, ছেড়ে দিয়েছে তো সবাইকে”।

অবন্তী বললেন “হু। আজব কান্ড। পুরুষদের ছেড়ে দিয়েছে, মেয়েদের আটকে দিয়েছে”।

তুষার বললেন “আজবের কিছু নেই। হাইজ্যাকাররা খুব বেশি জন নেই তো। ওরা পুরুষদের নিয়ে কোন রিস্ক নিতে পারে নি”।

অবন্তী বললেন “আচ্ছা রাখছি। আপডেট দিতে থেকো। জয় হিন্দ”।

তুষার বললেন “জয় হিন্দ”।

ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ তুষার বসে রইলেন। মাথুর চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবিলে মাথা রেখে শুয়েছেন খান। পীযূষকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে।

কী মনে হতে মোবাইলটা হাতে নিয়ে তুষার প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখা শুরু করলেন। কয়েক মিনিট দেখার পর ফিসফিস করে বললেন, “টিউলিপ ফোটার সময় হয়ে এসেছে”। এর পরেই জোরে জোরে বললেন “শিট। শিট শিট”।

তুষার জোরে জোরে পা ফেলে জ্যোতির্ময়কে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সে ঘরে এলেন। জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। তুষার এসেই জ্যোতির্ময়কে এমন জোরে ঠেললেন যে জ্যোতির্ময় চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন।

তুষার ঝুকে পড়ে জ্যোতির্ময়ের কাঁধ জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন “টিউলিপ ফোটার সময় মানে কী! বলুন বলুন?”

জ্যোতির্ময় হাসতে শুরু করলেন “মেরে ফেলুন আমাকে অফিসার, আমার কাজ হয়ে গেছে, আর বেঁচে থেকে কী হবে”।

তুষার জ্যোতির্ময়ের মুখে জোরে একটা ঘুষি মারলেন। জ্যোতির্ময় মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

জামার হাতা গোটাতে গোটাতে তুষার ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে অবন্তীকে ফোন করলেন, রিং হতেই ফোনটা তুললেন অবন্তী, “আপডেট এল?”

তুষার হাফাতে হাফাতে বললেন “যাদের প্লেন থেকে নামিয়েছে তারা এখনও বেরোয় নি তো?”

অবন্তী অবাক গলায় বললেন “না কেন বলুন তো?”

তুষার বললেন “প্রত্যেকের বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন করার লোক পাঠাচ্ছি। তার আগে মেক শিওর যেন কেউ এয়ারপোর্ট লিভ করতে না পারে”।

৪৫।

ভোর চারটে পনেরো। মাথুর এবং খান দুজনেই ঘুমোচ্ছেন। মাথুর বেশ জোরে নাক ডাকছেন।

তুষার বসে ছিলেন। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক ধরণের প্রাণায়ম করবেন ভাবছিলেন, কিন্তু হার্ট বিট এতটাই বেড়ে যাচ্ছিল যে সেটুকুও করতে পারছিলেন না।

ফোন বাজতে শুরু করল, তুষার দেখলেন দিল্লি থেকে কেউ ফোন করছেন, ধরলেন “ইয়েস স্যার”।

“প্রাইম মিনিস্টার স্পিকিং”।

তুষার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন “ইয়েস স্যার”।

“আফসানা সাইদ সম্পর্কে আপনারা শিওর?”

“হান্ড্রেড পারসেন্ট স্যার”।

“হু। ওমর শেখকে ছেড়ে দেবার ডিসিশন নিয়েছ শুনলাম”।

“ইয়েস স্যার। ওদের সেফ প্যাসেজ দেওয়া হবে”।

“স্টিল দ্য হোল থিং ইজ লুকিং ইললজিকাল। আপনি বুঝতে পারছেন তুষার আমি কী বলতে চাইছি?”

“বুঝতে পারছি স্যার। দ্য হোল থিং ইজ নট ইললজিক্যাল। দে হ্যাভ ইভেন আ বিগার প্ল্যান”।

“হোয়াট প্ল্যান?”

“সেটা স্যার কনফার্ম হবার পরেই আপনাকে বলতে পারব, এখনই বলতে পারছি না, এক্সট্রিমলি সরি স্যার”।

“ওকে, আই শ্যাল নট ডিস্টার্ব ইউ। বাট আই অ্যাম অ্যাওয়েক। কিপ মি পোস্টেড”।

“শিওর স্যার। জয় হিন্দ”।

“জয় হিন্দ”।

ফোনটা রেখে তুষার কাঠের টেবিলে ঠক ঠক করে শব্দ করতে লাগলেন। খানের ঘুম ভেঙে গেল। মাথুর নাক ডেকে যাচ্ছিলেন। খান উঠে বললেন “সরি স্যার। আর পারা যাচ্ছিল না”।

তুষার বললেন “নো প্রবলেম। টেক রেস্ট। প্রয়োজন পড়লে আমি ডেকে দেব”।

খান বললেন “স্যার আপনি মনে হচ্ছে কোন কিছুর অপেক্ষা করছেন”।

তুষার বললেন “হ্যাঁ খান, টিউলিপ ফোটার। টিউলিপ গার্ডেন গেছো কোনদিন?”

খান বললেন “না স্যার। কোন দিন যাওয়া হয় নি”।

তুষার বললেন “যেও ফ্যামিলি নিয়ে কোন দিন। পৃথিবীর সুন্দরতম বাগানগুলোর মধ্যে একটা। যখন সব ঝড় থেমে যাবে, তখন, যেও”।

খান হেসে ফেললেন।

তুষার বললেন “হাসছ কেন?”

খান বললেন “আপনি তো কবি হয়ে গেলেন স্যার”!

তুষার বললেন “আই ইউজড টু রাইট পোয়েম হোয়েন আই ওয়াজ ইয়ং। গ্রামে এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম, খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখতাম”।

খান চোখ বড় বড় করলেন “রিয়েলি স্যার?”

তুষার বললেন “রিয়েলি। হাইপোথেটিক্যাল সেসব কবিতা। চাঁদ নেমে আসবে মাটিতে, সূর্য তোমার খোঁপায় বসবে, সে কী সব ভাষা! বড় হয়ে নিজেই সে সব নষ্ট করে ফেলেছিলাম। দ্যাট অকওয়ার্ড মোমেন্ট”। তুষার হেসে ফেললেন।

খানও হাসলেন।

তুষার বললেন “কবিতা এক অদ্ভুত জিনিস তুষার। প্রতিটা লাইনে কত আবেগ মাখা থাকে! সবাই লিখতে পারে না। এই, বাঙালিরা খুব ভাল কবিতা লিখতে পারে। তুমি গীতাঞ্জলী পড়েছ খান?”

খান ঘাড় নাড়লেন “ইয়েস স্যার”।

তুষার বললেন “সোনার খনি। টেগোরের দেশের লোক মানুষ মারবে, কী আনফরচুনেট না?”

খান বললেন “দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জিং স্যার। কোরাপ্ট পলিটিশিয়ান্স, কোরাপ্ট পলিসির জন্য দিনে দিনে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। আমার বাবা...” খান ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন।

তুষার বললেন “কী বলছিলে বল”।

খান বললেন “লাস্ট উইক, আমার বাবা মসজিদ থেকে ফিরছিলেন, তিন চারটে ছেলে বাইকে করে যাচ্ছিল, বাবার টুপিটা ছিনিয়ে নিল, বুড্ডা পাকিস্তান চলে যা, এসব বলে চলে গেল। আমি ওয়াইফের থেকে শুনলাম, রাগ হচ্ছিল, তার থেকেও বেশি হচ্ছিল দুঃখ। আমরা সাতপুরুষের ইন্ডিয়ান। এরকম কথা ভাবতেও পারি নি কোন দিন। আমাদের চেনা দেশটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত”।

তুষার দুঃখিত মুখে খানের দিকে তাকিয়ে বললেন “এর কারণ কী জানো খান? ল্যাক অফ এডুকেশন। যে দেশে বিজ্ঞান সেকেন্ড অপশন হয়ে যায়, সেদেশে এসব অবশ্যম্ভাবী। হবেই। আর যত মেরুকরণ হবে, একটা ধর্মকে যত কোণঠাসা করে দেওয়া হবে, তত বাড়তে থাকবে টেরোরিজম। কাঁহাতক তারা এত কষ্ট সহ্য করতে করতে টিকে থাকবে? স্টেটের এগেইন্সটে সে রুখে দাঁড়াবেই। দিস হোল সিস্টেম নিডস টু বি রেক্টিফায়েড ইমিডিয়েটলি। নইলে সামনে আরও ভয়ংকর দিন আসছে”।

খান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তুষারের ফোন বেজে উঠল।

তুষার তুললেন “বল রেহান”।

“স্যার, পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। এদের কারও আই কার্ডের সঙ্গে বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন মেলেনি। ফটো পাঠাচ্ছি এদের”। ওপাশ থেকে রেহানের উত্তেজিত গলা ভেসে এল।

তুষার বললেন “রেহান, কাল সরি, দিন তো পড়েই গেছে, আজকের দিনের বৈশিষ্ট্য কী?”

রেহান কিছু একটা বললেন ওপাশ থেকে।

তুষার জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন “শিট!!! শিট!!! আমার এতক্ষণ লাগল এটা বের করতে?”

তুষারের জোরে চেঁচানোতে মাথুর ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছতে মুছতে বললেন “কী হল কী হল? পাকিস্তান ইন্ডিয়া অ্যাটাক করে ফেলল নাকি?”

তুষার উত্তেজিত গলায় বললেন “এতক্ষনে গোটা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হল! উফ! আমার মাথাতেই আসে নি আসল কথাটা! তোমরা ঠিকই বল। আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। কাল হাসমত গিলানীর মৃত্যুবার্ষিকী। ছয় আগস্ট। গত বছর এই দিনেই আর্মি ওকে মেরেছিল। ওরা তার বদলা নেবে বলেই এত প্রস্তুতি করেছে। কোন এক অজানা কারণে গিলানীর ডাকনাম ছিল ব্লু টিউলিপ”।

মাথুর আর খান অবাক হয়ে তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

৪৬।

সুমন কেবিনে ঢুকে বলল “কী প্ল্যান হল শেষ পর্যন্ত?”

মীর্জা একবার আফসানার দিকে তাকিয়ে বললেন “ওমর শেখকে শ্রীনগর জেল থেকে পাঠানো হচ্ছে চপারে করে। আমি তুমি আর সাহিল ওকে নিয়ে মুজফফরাবাদ রওনা দেব। সেফ প্যাসেজ দেওয়া হবে”।

সুমন উত্তেজিত ভাবে বলল “উনি যাবেন না?”

মীর্জা মাথা নাড়লেন।

সুমন বলল “কেন জানতে পারি?”

আফসানা বললেন “কারণ আমি তোমাদের মত টেররিস্ট নই। আমিও একজন হোস্টেজ। ওমর শেখকে পেয়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ। সিম্পল”।

সুমন মীর্জার দিকে তাকালেন “একদম নয়। আমরা ওকে নিয়ে যাব। আমি এই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে বিশ্বাস করি না। সেফ প্যাসেজ কেন দিতে যাবে আমাদের? চপার শুদ্ধ উড়িয়ে দেবে। পাকিস্তানও তো সেম জিনিস করতে পারে। আগে পৌঁছব তারপর ওখানে ওকে ছাড়ব”।

আফসানা জ্বলন্ত চোখে সুমনের দিকে তাকালেন।

মীর্জা আফসানার দিকে ঘুরলেন “আই ফাইন্ড লজিক...”

আফসানা বললেন “এটা কিন্তু ডিল ছিল না মীর্জা”।

সুমন বলল “ডিল সব কিছু থাকে না তো! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান চেঞ্জ হয়। আপনার কথা অনুযায়ী তো মেয়েদের ছাড়া হল না। এটাও সেরকমই ভেবে নিন”।

আফসানা সুমনের দিকে আঙুল তুলে বললেন “আই অ্যাম নট টকিং টু ইউ। জাস্ট শাট দ্য ফাক আপ”।

সুমন রেগে গেল “এই শালী, কী রে, তখন থেকে বড় বড় বুকনি ঝেড়ে যাচ্ছিস, কে তুই? তোর আউকাতই বা কী তোর? বেঁচেই তো আছিস মিথ্যার ওপর বেস করে। একদম গলা নামিয়ে কথা বল নইলে তোর আসলিয়ত গোটা পৃথিবীকে বলে দেব মনে রাখবি”।

সুমন কথা বলতে বলতে আফসানার দিকে তেড়ে যাচ্ছিল।

মীর্জা সুমনকে আটকালেন। আফসানা কড়া চোখে মীর্জার দিকে তাকিয়ে বললেন “মীর্জা এই অসভ্যতা কিন্তু আমি বরদাস্ত করব না। টেল হিম। টেল হিম নাও”।

মীর্জা সুমনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে তর্জনী ঠেকালেন। আফসানার দিকে ফিরে বললেন “করবে না, বুঝতে পারছেন না, আপনি তো শিক্ষিত মানুষ! এতক্ষণ নার্ভ ধরে থাকা যায়?”

আফসানা বললেন “সব যায়, জলে নামলে গা ভেজাতেই হবে, এখন নার্ভ ঠান্ডা রাখবে না গরম রাখবে সেটা আমার জানার দরকার নেই। টেল হিম টু রেসপেক্ট মি”।

সুমন চেঁচিয়ে বলল “রেসপেক্টের গাঁড় মারি। ইয়ার্কি হচ্ছে এখানে? উনি বড় বড় বাতেলা মারবেন, টিভিতে বাইট দেবেন, আর আমরা কুত্তার মত এখানে সেখানে লুকিয়ে মরব? আমার বাবা পুলিশের মার খেয়ে মরবে? শোন মীর্জা, ওই মাগীকে বলে দাও, আমাদের সঙ্গে এল ও সি পর্যন্ত গিয়ে তারপরে ওর ছুটি, নইলে কোন ডিল হবে না”।

আফসানা ভীষণ রেগে গেলেন, “মীর্জা, শ্যুট হিম”।

মীর্জা অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন “কী বলছেন ম্যাম?”

আফসানা বললেন “আই সেইড শ্যুট হিম!”

সুমন প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে তাক করল আফসানার দিকে। মীর্জা সুমনকে জোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বললেন “কী হচ্ছে কী? জাস্ট গেট আউট অফ দ্য কেবিন। গো”।

সুমন কয়েক সেকেন্ড আফসানার দিকে আগুনে চোখে তাকিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

আফসানা বললেন “ব্লাডি আনকালচারড সোয়াইন”।

মীর্জা ঠান্ডা গলায় বললেন “তবে ওর কথায় যুক্তি আছে। আপনি আমাদের সঙ্গে মুজফফরাবাদ যাচ্ছেন”।

আফসানা মেঝেতে জোরে পা ঠুকে বললেন “জাহান্নুম মে যাও!”

#

বীরেন প্লেনের সিটে বসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর্মি ঘিরে ফেলেছে গোটা জায়গাটা। প্লেনের ভেতরে কয়েকটা বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ এখনও কাঁদছে। সব মিলিয়ে একটা দম বন্ধকরা পরিস্থিতি।

সুমন কেবিন থেকে উত্তেজিত অবস্থায় বেরিয়ে তার পাশে এসে বসে গড়গড়িয়ে বাংলায় খিস্তি মারতে শুরু করল।

বীরেন বুঝতে পারছিল সুমন উত্তেজিত হয়ে আছে। সে কাঁটা হয়ে বস রইল।

৪৭।

ভোর পাঁচটা-

১) ফকরুদ্দিন আহমেদ,

২) জামাল খান

৩) মিনহাজুদ্দিন আনসারি

৪) ইসমাইল আব্বাস

৫) পঙ্কজ বানশাল ওরফে পারভেজ হাসান।

এয়ারফোরসের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এদের। একটা বন্ধ ঘরে হাত পা বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

অবন্তী লিস্টে চোখ বুলিয়ে বললেন “ব্রিফ ইন্ট্রো প্লিজ”।

রেহান বললেন “ফকরুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশী। চট্টগ্রামে বাড়ি। জামাত ইসলামী থেকে হাতেখড়ি। পরে মুজফফরাবাদ থেকে আর্মস ট্রেনিং নেয়। হি ইজ আ টেরিফিক এক্সপার্ট অফ মেকিং বম্বস। ছোট জিনিস বানাতে পারে, বড় ধমাকা করার ইন বর্ণ ট্যালেন্ট আছে। জামাল খান, সেম পিঞ্চ। বাংলাদেশী। তবে এর স্পেশালিটি গ্রেনেডে। মিনহাজুদ্দিন আনসারির বাড়ি ইউ পিতে। আইটি স্পেশালিস্ট। হ্যাকার। একই সঙ্গে টাইমবোম মেকিং এ এই মুহূর্তে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। ইসমাইল আব্বাস করাচীর ছেলে। লস্করের সঙ্গে এই টিমের লিংক ম্যান।

পঙ্কজ বানশাল একসময়ে কট্টর হিন্দু ছিল। হঠাৎ করে কনভার্ট হয়ে যায়, কী কারণে হয় এখনও আমাদের ইন্টেলিজেন্সের কাছে খবর নেই। এই টিমের উইকেস্ট মেম্বার বলতে পারেন”।

অবন্তী বললেন “উইকেস্ট মেম্বার ভাল সুইসাইড বোম্বার হয় রেহান”।

রেহান মাথা নাড়লেন।

অবন্তী বললেন “তাহলে এই প্ল্যান ছিল। এক ঢিলে দুই পাখি। একদিকে ওমর শেখ ছাড়া পাবে গিলানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে, আর অন্যদিকে সেই একই দিনে এই দাগী জঙ্গীগুলো শ্রীনগরে ঢুকে আর্মি ক্যাম্পে হামলা করবে, কিংবা আরও বড় কিছু”।

রেহান বললেন “হ্যাঁ স্যার। অ্যাবসোলিউটলি। এরা ধারাভিতে লুকিয়ে ছিল মাস খানেক। আই কার্ড যেগুলো পাওয়া গেছে, সব ফেক”।

অবন্তী বললেন “এরা তো আলাদা হয়েও আসতে পারত। একসঙ্গে এল কেন?”

রেহান বললেন “দে আর প্ল্যানিং সামথিং বিগ ফর দ্য ফোর্থকামিং ডেজ”।

অবন্তী বললেন “এসব প্ল্যানিং কারা করে? অরগানাইজেশনের নাম জানা গেল?”

রেহান বললেন “আফসানা আর হাসান মাকসুদেরই হবে। অরগানাইজেশন নেম সম্পর্কে এখনও ধোঁয়াশা আছে। তবে ও দেশের ইনভলভমেন্ট আছে তো বুঝতেই পারছেন”।

অবন্তী বললেন “তা তো থাকবেই? ওই শুয়োরদের কাজই বা কী? সেটা বড় কথা না, আমাদের ইন্টেলিজেন্সের কাছে কোন খবর ছিল না?”

রেহান অবন্তীর দিকে তাকালেন “খবর নিতে গিয়েই তো সায়ক...”

অবন্তী মাথা নাড়লেন “দ্যাট ব্রিলিয়ান্ট ইয়ং ম্যান”।

রেহান অন্যমনস্কভাবে বললেন “উই ওয়্যার বেস্ট ফ্রেন্ডস। লিভ ইট স্যার, আপনি বলুন কালকে আপনার প্ল্যান কী আছে”।

অবন্তী বললেন “জাস্ট টু স্টে অ্যালার্ট। হোয়াট এলস আই ক্যান ডু রেহান?”

রেহান বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন “নিজের দেশের লোক যদি আমাদের বিপক্ষে চলে যায় তবে কী করতে পারি বলুন?”

অবন্তী শ্বাস ছাড়লেন “এখন আর আমাদের পিছনে ফেরার কোন উপায় নেইরেহান। উই হ্যাভ টু অ্যাক্ট। ব্যাপারটা যতই নির্দয় হোক না কেন!”

রেহান চুপ করে বসে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পর বললেন “শার্প শ্যুটার রেডি স্যার?”

অবন্তী বললেন “ইয়েস ম্যান”।

রেহান বললেন “শ্রীকান্ত ভাস্করণ তো?”

অবন্তী বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়লেন “শ্রীকান্ত নেই রেহান। ছুটিতে বাড়ি গেছে”।

রেহানের মুখ অন্ধকার হল “তবে?”

অবন্তী বললেন “রামেশ্বর। রামেশ্বর কল। কাশ্মীরি পণ্ডিত। ওয়ান্স আপন আ টাইম...”

রেহান উদ্বিগ্ন গলায় বললেন “ইজ হি এক্সপার্ট?”

অবন্তী মাথা নাড়লেন “নট লাইক শ্রীকান্ত, বাট উই হ্যাভ টু টেক চান্স”।

রেহান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন “লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট স্যার”।

রেহানের ওয়াকি টকি সাড়া দিয়ে উঠল। রেহান কয়েক সেকেন্ড কথা বলে অবন্তীকে বললেন “স্যার, ওমর শেখকে নিয়ে চপার রওনা দিয়েছে। ওদের দাবী অনুযায়ী চপার পাইলট ওমরকে পাইলট সিটে বসিয়ে চলে যাবে”।

অবন্তী বললেন “আজ সান রাইজ ক’টায়?”

রেহান বললেন “ফাইফ ফিফটি ফাইভ স্যার”।

অবন্তী রেহানের দিকে তাকালেন “লেটস টক টু রামেশ্বর। চল”।

৪৮।

“জাতীয় সঙ্গীত তোমায় কি এফেক্ট করে আশরফ?”

তুষার হালকা গলায় প্রশ্ন করলেন।

খান বললেন “সব সময় স্যার। আপনি বিশ্বাস করবেন না স্যার, আমার যখনই বাড়ির জন্য মন খারাপ হয় আমি জাতীয় সঙ্গীত শুনি। এই একটা গান সব কিছু ভুলিয়ে দেয় স্যার। হিন্দু-মুসলিম, কাশ্মীর-গুজরাট-অপারেশন ব্লু স্টার সব”।

তুষার বললেন “আমাদের বাড়িতে ফিফটিন্থ অগাস্ট কীভাবে পালন করা হত জানো? আমার গ্র্যান্ড পা ছিলেন নেতাজী সাপোর্টার। আমি দেখেছি তিনি ওই অশক্ত শরীরে যত দিন বেঁচে ছিলেন, আমাদের পাড়ার

ক্লাবে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ওড়াতেন। বলতেন যে লোকটা দেশের জন্য সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারেন, তার মত বড় আর কেউ হতে পারেন না। আমরা সবাই মিলে জাতীয় সঙ্গীত গাইতাম। ভাবো খান, কাশ্মীরি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠি, সিন্ধি, বাঙালি, ওড়িয়া, বিহারী, তামিল, ঝাড়খন্ডী, আসামী, সিকিমিজ, হায়দ্রাবাদী, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান, জৈন, বৌদ্ধ... সবার একটা দেশ। একটাই ফৌজ তাদের। এগিয়ে চলেছে ভারত স্বাধীন করতে। তারা ফেইল করল কী পাশ করল, কার কী যায় আসে খান? ওই একটা লোক সব ভুলিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের"।

খান বললেন "নেতাজী থাকলে দেশভাগ মানতেন স্যার?"

তুষার হাসলেন "পাশাপাশি থাকল তারা বহুদিন, কিন্তু ব্রিটিশ এসে তাদের ভাগ করে চলে গেল খান। মারামারি, কাটাকাটি, প্রতিটা সময়। রাজনীতির পাশা হয়ে গেল ধর্ম। আমি জানি না নেতাজী থাকলে মানতেন কী না কিন্তু ইন দিস প্রেজেন্ট সিনারিও, রিলিজিয়নের থেকে বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে আর কিচ্ছু নেই। পলিটিক্যাল পার্টি আসবে যাবে, কিন্তু মানুষ যতক্ষণ না প্রপারলি এডুকেটেড হবে, ততদিন ঘরে ঘরে হাসান মাকসুদ তৈরী হবে, পঙ্কজ বনশাল তৈরী হবে"।

খান বললেন "অলডাক্স হাক্সলে মনে পড়িয়ে দিলেন স্যার। আপনি কি নাস্তিক?"

তুষার বললেন "সেটা আমি নিজেও জানি না, কিন্তু এটা জানি, যে জাত ইতিহাসের থেকে ভবিষ্যতকে বেশি গুরুত্ব দেয়, সেই জাতকে দমিয়ে রাখা কারও সাধ্য নয়। আনফরচুনেটলি, ইট ইজ নট হ্যাপেনিং ইন আওয়ার কান্ট্রি"।

খান বলেছেন "সত্যজিত রে-র একটা ফিল্ম আছে স্যার। একটা ব্রেইন ওয়াশিং মেশিনে সব মানুষের চিন্তা ভাবনা একমুখী করে দেওয়া হত। রিলিজিয়ন হচ্ছে সেই মেশিনটা। যেটা জ্যোতির্ময়কে হাসান মাকসুদ বানিয়ে দেয়, পঙ্কজকে পারভেজ বানিয়ে দেয়, কিংবা খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করার অপরাধে গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনকে পরিবারশুদ্ধ পুড়িয়ে মারতে হয়"।

তুষার বললেন "সব থেকে আনফরচুনেট হল; টেগোর, রায়ের ল্যান্ডে এক্সট্রিমিস্টের সংখ্যা বাড়ছে খান। চোখ বন্ধ করে থাকলে আরও বড় বিপদ আসবে। পাকিস্তান হল এমন একটা দেশ যারা সরাসরি টেরোরিজম স্পনসর করে। অতীতে কিংবা সাম্প্রতিক কালেই দেখ, যতবার আমরা ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেছি, ওরা সুযোগ খুঁজে বেরিয়েছে, কীভাবে ছোবল মারবে। এই সময়ে যদি আমরা ইস্ট আর নর্থ ইস্ট বর্ডার পুরোপুরি সিল না করতে পারি তাহলে আজকের মত আরও অনেক দিন দেখতে হবে আমাদের"।

মাথুরকে ঠেললেন খান। মাথুর বিরক্ত গলায় বললেন "কী হল?"

তুষার গলা তুললেন "মাথুর পরের জন্মে যদি পাকিস্তানে জন্ম হয় তাহলে কী করতে তুমি?"

মাথুর বললেন "সুইসাইড স্যার"।

সবাই হেসে উঠলেন। তুষারের ফোন বাজতে শুরু করল।

তুষার দেখলেন পি এম ফোন করছেন।

৪৯।

মীর্জা প্রার্থনা সেরে উঠলেন। আফসানা গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন।

মীর্জা উঠে দাঁড়াতেই বললেন "ফিনিশ দ্য জব মীর্জা"।

মীর্জা অবাক গলায় বললেন "কোন জব?"

আফসানা বললেন "কিল দ্যাট বয়। হি নোজ এভ্রিথিং অ্যাবাউট মি"।

মীর্জা ঘাড় নাড়লেন। কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখলেন বীরেন চুপচাপ বসে আছে। পাশে সুমন।

তাকে দেখেই সুমন বলল "কী হল? এখন আবার ওনার কী হুকুম হয়েছে?"

মীর্জা পুস্তু ভাষায় বললেন যাতে বীরেন বুঝতে না পারে "দেখো সুমন, এখানে সমস্যা তৈরী কোর না। মনে রেখো, আমরা এখন পাকিস্তানে যাব, এই মুহূর্তে ওর কথা না শুনলে ওখানে গিয়ে কিন্তু তোমার কপালে দুঃখ আছে"।

সুমন বলল "আগে এদেশ থেকে তো ঠিক ঠাক বেরোতে পারি"।

মীর্জা ঠান্ডা গলায় বললেন "প্যানিক কোর না। প্যানিক করার মত কিছু হয় নি। আমি জানি, এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস। কিন্তু এই মুহূর্তে আফসানাকে রাগানো উচিত হবে না"।

সুমন রাগে গজগজ করতে করতে বিমানের পেছনের দিকে রওনা দিল।

মীর্জা প্লেনে থাকা মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন "আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই, আমাদের দাবী সরকার মেনে নিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা ছাড়া পেয়ে যাবেন"।

একটা স্বস্তির শব্দ ভেসে এল।

মীর্জা বীরেনের পাশের সিটে বসলেন "আপনার কাশ্মীর কেমন লেগেছে বীরেন?"

বীরেন মীর্জার কথার উত্তর না দিয়ে বলল "আমি কি জানতে পারি আমি ছাড়া পাব কী না?"

মীর্জা কয়েক সেকেন্ড বীরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনাকে মেরে ফেলার অর্ডার আছে"।

বীরেন মীর্জার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বলল "বেশ তো, তাহলে দেরী করছেন কেন?"

মীর্জা বললেন "মেহেমানদের মারার শিক্ষা কাশ্মীরিরা কোন দিন পায় নি বলে"।

বীরেন কী বলবে বুঝতে না পেরে কিছু বলল না।

মীর্জা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে আবার পাইলট কেবিনে ঢুকলেন।

আফসানা বললেন "কাজ হয়ে গেছে?"

মীর্জা বললেন "আমার একটা প্রপোজাল আছে"।

আফসানা বললেন "কী প্রপোজাল"?

মীর্জা বললেন "গোটা অপারেশনটা আমরা বিনা রক্তপাতে করেছি। এই ছেলেটাকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই। পরে দেখা যাবে কী করা যায় ওকে নিয়ে"।

আফসানা রেগে গেলেন "ইয়ার্কি হচ্ছে? যা বলছি তাই কর"।

মীর্জা নিজের কোমর থেকে রিভলভারটা বের করে আফসানার হাতে দিয়ে বললেন "আপনি মেরে দিন তবে। আমি পারব না"।

আফসানা জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন "বাহ! কী দারুণ প্ল্যান! আমি ওকে মারি, আর বাকিরা সবাই আমাকে দেখে নিক! আর তোমার কাশ্মীরি মেহমানদারী হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হল হে মীর্জা? এতদিন তো ছিল না!"

মীর্জা বললেন "ছেলেটা কাজের আছে। মৌলবীসাহেবের হাতে পড়লে উই ক্যান কনভার্ট হিম। তাছাড়া হাসান সাহেবের ওকে নিয়ে কোন ক্লিয়ার অর্ডার ছিল না। হি ক্যান বি ইউজড ফারদার"।

আফসানা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে কাঁধ ঝাঁকালেন "ওয়েল। তাই হোক। তবে মনে রেখো মীর্জা, সুমন কাজটা ঠিক করে নি। এর ফল ওকে ভুগতে হবে"।

বাইরে চপারের শব্দ পাওয়া গেল। পুব আকাশ ধীরে ধীরে লাল হতে শুরু করেছে।

সুমন দরজা ঠেলে কেবিনে ঢুকল। বলল "চল। বেরনো যাক"।

আফসানা বললেন "কালো কাপড় বাঁধো আমার মাথায়। আগে সব মেয়েদের প্লেন থেকে নামাও। ওরা যেন আমাদের ঘিরে থাকে। তারপরে তোমরা তিনজন আমাকে ঘিরে ধরে থাকবে। আমার মাথায় রিভলভার ধরে থাকবে"।

মীর্জা আফসানার কথা মত কাজ করলেন।

আফসানা বললেন "ওমরের পাইলট প্লেন ছেড়ে চলে গেছে?"

মীর্জা বাইনোকুলার দিয়ে দেখে উল্লসিত গলায় বললেন "হ্যাঁ। ওমর পাইলট সিটে বসেছেন। ওয়েটিং ফর আস"।

আফসানা বললেন "সাহিলকে ডাকো। সিঁড়ি প্লেনের সঙ্গেই লাগানো আছে তো?"

মীর্জা বললেন "হ্যাঁ"।

আফসানা বললেন "টেল দোজ ব্লাডি সিকিউরিটি টু স্টে অ্যাওয়ে অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেড মিটারস"।

মীর্জা ফোন বের করে রেহানকে ফোন করে আফসানার কথা মত শর্তটা বললেন।

আফসানা উঠলেন, "ছেলেটাকে ভেতরে নিয়ে এসো। সাহিলকে ডাকো"।

মীর্জা গিয়ে বীরেনকে ডেকে নিলেন। আফসানা বললেন "আমরা এবার বেরোব। কোন চালাকি করার চেষ্টা কোর না বীরেন। আশা করি জানো, কী হতে পারে তবে"।

বীরেন কিছু বলল না। আফসানা মীর্জার দিকে তাকালেন, "মহিলা এবং বাচ্চাদের লাইন দিয়ে বাইরে বের কর"।

৫০।

"রামেশ্বর, ভিজিবিলিটি কেমন?" অবন্তী বাইনোকুলার চোখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তার সঙ্গে ব্লু টুথে কানেক্টেড আছেন তুষার। তুষার চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন ওপাশ থেকে।

রামেশ্বর স্নাইপারে চোখ রেখে বললেন "ক্লিয়ার স্যার"।

রেহান বললেন "ডোর খুলেছে। ওহ, শিট, ওরে হোস্টেজদের বের করছে আগে। ওদের মধ্যেই ঢুকে থাকবে ওরা"।

অবন্তীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। তুষার বললেন "শিট। অবন্তী, আরও তিনজন শ্যুটার চাই"।

অবন্তী রেগে গেলেন "কী বলছ তুমি? খেপে গেছো? আগে বলবে তো!"

তুষার বললেন "আমি জানি অবন্তী, তুমি ইচ্ছা করলে সব পারো। জলদি কর, হাতে সময় নেই"।

অবন্তী রেহানের দিকে তাকালেন "তোমাদের স্যার বলছেন এই সিচুয়েশনে আমাদের আরও তিনজন শ্যুটার চাই"।

রেহান বিস্মিত চোখে অবন্তীর দিকে তাকালেন, "এখন বলছেন? কোথায় পাবেন?"

অবন্তী রাগী গলায় বললেন "দেখছি! ব্যাটা পাজি কলকাতায় বসে আমার সঙ্গে দিল্লাগি করছে!"

তুষার বললেন "ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম অবন্তী! ডু ইট নাও"।

অবন্তী ওয়াকি টকি অন করে নির্দেশ দিলেন। দু মিনিটের মধ্যে তিনজন জওয়ান স্নাইপার নিয়ে হাজির হলেন।

রেহান বললেন "ওরা পারবে?"

অবন্তী বাইনোকুলার নিয়ে প্লেনের দিকে দেখলেন, মহিলারা নামছেন, সঙ্গে শিশুরা। ভয়ার্ত তাদের চোখ।

অবন্তী জওয়ানদের দিকে তাকালেন "টেক ইওর পজিশন্স। রামেশ্বর, ওদের হেল্প কর"।

তুষার বললেন "শাবাশ অবন্তী। ইউ আর এ জেম! দেখা হলে তোমাকে নিজের হাতে ইডলি বানিয়ে খাওয়াব। শোন, রামেশ্বর পর পর দুটো শ্যুট করবে। একটা আফসানা, আরেকটা ওর ঠিক পেছনে যে থাকবে তাকে। বাকি জওয়ানেরা স্ট্যান্ড বাই থাকবে। নাও টেল মি দেয়ার পজিসন্স"।

জওয়ানরা রাইফেল তাক করলেন। অবন্তী বললেন "মেয়েরা নেমে সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েছে"।

তুষার রুদ্ধশ্বাসে বললেন "তারপর?"

মহিলাদের লাইন শেষ হতেই আফসানা দৃশ্যমান হলেন। তার মাথায় রিভলভার তাক করে নামছেন মীর্জা। মীর্জার সঙ্গেই সুমন নামছে। বীরেন তাদের মাঝখানে। সাহিল বীরেনের পিছনে।

তুষার বললেন "সিঁড়ি থেকে চপারের ডিসট্যান্স কত?"

অবন্তী বললেন "লগভগ পঁচিশ ফিট"।

তুষার বললেন "ওয়াচ কেয়ারফুলি। বীরেনকে দেখে নাও। ডোন্ট শ্যুট হিম। দ্য বেস্ট থিং ইজ আফসানা জানে না ওর স্বরূপ আমরা জানি, তাই বুঝতেই পারছ তোমার কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না!"

অবন্তী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন " হ্যাঁ। খুব সহজ কাজ। শোন তুষার, বীরেনের যদি গুলি লেগে যায় তখন কী হবে? আমি গ্যারান্টি দিতে পারছি না কিন্তু"।

তুষার একটু থমকে বললেন "ডু ইওর ডিউটি। কী আর করা যাবে সেক্ষেত্রে!"

অবন্তী তুষারের নির্দেশ সবাইকে শুনিয়ে দিলেন।

প্রত্যেকে নিজের জায়গায় রাইফেল তাক করে বসে রইলেন।

#

আফসানা প্লেনের বাইরে বেরিয়ে গলা নামিয়ে বললেন "বেশি তাড়াহুড়ো কোর না মীর্জা। তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। দ্যাট ব্লাডি ইন্ডিয়ান্স উইল নট শ্যুট, আমি আছি। ইটস সো সুথিং। যে দেশটাকে আমি সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করি, তাদের চোখের সামনে দিয়ে সবাইকে বোকা বানিয়ে চলে যাব, কেউ বুঝতেও পারবে না"।

মীর্জা চারদিকে তাকিয়ে বললেন "দেরী করবেন না, পা চালান"।

আফসানা বললেন "ধুস! মজা লেনে দো ইয়ার। উফ, কতদিন পর নিজের দেশে ফিরব। এখন মনে হচ্ছে তোমাদের ডিশিসনই ঠিক। ক'দিন মুজফফরাবাদে আরাম করে তারপর নতুন কোন ড্রামা করা যাবে"।

বীরেনের মাথা কাজ করছিল না। তার পিঠে ঠান্ডা ধাতব বন্দুকটা খোঁচা দিচ্ছিল। সে দেখল খানিক দূরে চপারে বসে আছে ওমর শেখ। তারা পৌঁছতেই এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাবার অপেক্ষায়।

#

তুষার বললেন "সিঁড়ির কোন পজিশনে আছে ওরা?"

অবন্তী বললেন "মাঝ বরাবর"।

তুষার বললেন "স্পিকারে দাও"।

অবন্তী ফোনটা স্পিকারে দিলেন"।

তুষার বললেন "রামেশ্বর"!

রামেশ্বর বললেন "ইয়েস স্যার"।

তুষার বললেন "আফসানা ভিজিবল?"

রামেশ্বর বললেন "ইয়েস স্যার"।

তুষার বললেন "তার পিছনের জন?"

রামেশ্বর বললেন "ইয়েস স্যার"।

তুষার এক সেকেন্ড থমকালেন। তারপর বললেন "শ্যুট দেম"।

রামেশ্বরের স্নাইপার পর পর দুবার গর্জে উঠল।

#

সিঁড়ির মাঝ বরাবর নেমেছিল, এমন সময় বীরেন দেখল আফসানা আর্তনাদ করে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলেন। মীর্জা কিছু বোঝার আগে তিনিও।

বীরেন কোন দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ির বাদিক থেকে সরাসরি মাটিতে ঝাঁপ দিল। মাটিতে গড়িয়ে গেল খানিকটা। বা হাতের ওপর পড়ার ফলে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

সুমন এবং সাহিলকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়েছিল কিন্তু সে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে তারা আবার প্লেনের ভিতর দৌড়ে ঢুকতে গেল।

পর পর চারটে গুলি তাদের পিঠে এসে লাগল।

সিঁড়ির মধ্যে গড়াতে গড়াতে লাশগুলি মাটিতে এসে পড়ল।

মহিলারা আতঙ্কে আর্তনাদ করে মাটিতেই বসে পড়েছিলেন।

ওমর চপার আকাশে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেন।

রামেশ্বর ওমরকে তাক করলেন। অবন্তী চেঁচালেন "ডোন্ট শ্যুট হিম, চপার ভেঙে পড়লে মহিলারা মারা পড়তে পারেন। এয়ারফোরস উইল গেট দ্যাট বাস্টার্ড"।

রামেশ্বর বন্দুক নীচে রাখলন।

তুষার ওপ্রান্ত থেকে চেঁচাচ্ছিলেন "কী হল! কী হল বল!"

অবন্তী মেঝেতে বসে পড়ে ক্লান্ত গলায় বললেন "অপারেশন সানশাইন সাকসেসফুল তুষার। তোমার বীরেন ইজ স্টিল অ্যালাইভ"।

৫১।

"রেহান"।

"ইয়েস স্যার"।

"আপডেট দাও"।

"ওমর সারেন্ডার করেছে স্যার। ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন"।

"হা হা। গুড। বীরেনের কী খবর?"

"টাফ বয় স্যার। ঠিক সময়ে ঝাঁপটা না দিলে কী হত কে জানে! যাই হোক, ওকে ফার্স্ট এইড দেওয়া হচ্ছে"।

"গুড। দেখো, মিডিয়াতে যেন ওকে কিছুতেই এক্সপোজ না করা হয়। লাইফ রিস্ক হয়ে যেতে পারে ওর"।

"ডোন্ট ওরি স্যার। কোন চিন্তা নেই"।

"ওকে ওর বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা কর এখনই"।

"কপি দ্যাট স্যার। স্যার অবন্তী স্যার কথা বলবেন"।

"দাও"।

"হ্যালো তুষার?"

"ইয়েস স্যার"।

"ইডলি পার্টি ভুলো না কিন্তু"।

"পাগল নাকি? কিছুতেই ভুলব না। তুমি ছাড়া কে এত স্মুদ অপারেশন করত অবন্তী? আচ্ছা, টেক রেস্ট, আমি এদিকে কাজ করি"।

"ভুল বললে তুষার"।

"কেন? ওহ্ ইয়েস, ইয়েস, ইন্ডিয়ান আর্মি ইজ নেভার অন হলিডে। রাইট। সরি স্যার"।

"জয় হিন্দ তুষার"।

"জয় হিন্দ"।

তুষার ফোনটা রাখলেন। পি এম কয়েক মিনিট আগেই ফোন করে কনগ্র্যাচুলেট করেছেন তাকে।

কয়েক মিনিট বসে তুষার রওনা হলেন জ্যোতির্ময়ের ঘরের দিকে।

জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন।

তুষার ঘরে ঢুকে জ্যোতির্ময়ের সামনের চেয়ারে বসলেন।

জ্যোতির্ময় চোখ তুলে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "হাসান আপনি টেগোর পড়েছেন?"

জ্যোতির্ময় বললেন "ফালতু কথা বলার সময় আমার নেই অফিসার"।

তুষার বললেন "জনগণমন পুরোটা জানেন?"

জ্যোতির্ময় তেতো মুখে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "পাক সার জামিন পুরোটা জানেন?"

জ্যোতির্ময় উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "এত ঘৃণা নিয়ে বেঁচে থাকেন কী করে বলবেন?"

জ্যোতির্ময় বললেন "যেভাবে আপনাদের পলিটিশিয়ান বাপেরা জেগে থাকে। যেভাবে একটা ভোটের জন্য তারা মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরী করে। যে দেশে একটা মেথরের পোস্টের জন্য ডক্টরেটেরা ফর্ম ফিল আপ করে, সেদেশের পলিটিশিয়ানদের কাজ হল কোথায় মন্দির হবে, কোন রাস্তা দিয়ে রাম লংকা গেছিল, কোন গরুর মুত খেলে ক্যান্সার সেরে যাবে, সেসব খোঁজা। ওরা বেঁচে থাকলে আমি কেন বেঁচে থাকতে পারব না?"

তুষার কয়েক সেকেন্ড জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন "ইউ নো হাসান, আপনার সঙ্গে আমার চিন্তাধারা অনেকাংশে মেলে। সেম জিনিস আমিও ভাবি। কিন্তু ডিফারেন্সটা হল আমার মনে হয়েছে তফাৎটা শিক্ষায়। আর আপনার মনে হয়েছে আপনি নিরীহ মানুষ মেরে সবাইকে শিক্ষা দেবেন"।

জ্যোতির্ময় বললেন "নিরীহ মানুষ? কোন শুয়োরের বাচ্চা নিরীহ এদেশে? প্রত্যেকটা, আই রিপিট, একশোতে নব্বইটা মানুষ কমিউনাল এই দেশে। গরু শুয়োরের পালে দশ বারোটা মরলে কিচ্ছু হয় না। বরং এতে জনসংখ্যা কমে"।

তুষার বললেন "আপনি টেগোরের দেশের লোক"।

জ্যোতির্ময় বললেন "টেগোর ইজ পাস্ট অফিসার। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও মানুষ এত কমিউনাল ছিল না যতটা এখন"।

তুষার হাসলেন "হু, দাঙ্গাগুলো তো হাওয়ায় হত! তবে হ্যাঁ, পঞ্চাশ বছর আগে এত জেহাদী শুয়োরের বাচ্চাও ছিল না"।

জ্যোতির্ময় চোখ লাল করে তুষারের দিকে তাকালেন "মুখ সামলে অফিসার"।

তুষার বললেন "যারা নিরীহ মানুষদের মারে, অসহায় নিরস্ত্র মানুষকে টার্গেট করে, তাদের জন্য খুব নিরীহ একটা গালাগাল দিলাম মিস্টার মাকসুদ। একটা পচা খাল দিয়ে যেমন শহরের নোংরা জিনিস যায়, আপনারা হলেন এই পৃথিবীর সেই টাইপের বদ রক্ত। আপনাদের মত জানোয়ারদের জন্য দেশের অর্থনীতিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের তুলনায় ডিফেন্সে বেশি টাকা বরাদ্দ করতে হয়। আপনি যে কারণে দেশের ওপরে রাগ করে জেহাদী হলেন, কখনও ভেবে দেখেছেন দোষটা কার ছিল? ঠিক কী কারণে অবৈধভাবে কাঁটাতার পার হবার দরকার পড়ল? কোন জন্নত পাবেন আপনি নিরীহ মানুষদের খুন করে?"

জ্যোতির্ময় চুপ করে রইলেন।

তুষার বললেন "আপনাদের প্ল্যান ফেইল করেছে মিস্টার মাকসুদ। যে পাঁচজনকে শ্রীনগরে ঢোকানোর প্ল্যান করেছিলেন তারা আপনার মতই আমাদের আদর খাবে এন্ড ফর ইওর ইনফরমেশন মিস্টার মাকসুদ,

এই অপারেশনটায় একই সাথে একজন কাশ্মিরী পন্ডিত এবং একজন কাশ্মিরী মুসলিম ছিল। তারা হাতে হাত মিলিয়ে এই গোটা ব্যাপারটা সাকসেসফুল করেছে। দিস ইজ ইন্ডিয়া, নেভার ফরগেট দ্যাট”।

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকালেন। খানিকক্ষণ পর বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন “ইন্ডিয়ার অনেক কিছু দেখার আছে এখনও আপনার মিস্টার তুষার রঙ্গনাথন। অনেক কিছু”।

খান ঘরে ঢুকেছিলেন। তুষার কিছুক্ষণ জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে খানের দিকে তাকিয়ে বললেন “ওকে ওর স্ত্রীর ঘরে দিয়ে দাও। দুজনে মিলে শোক পালন করুক। দুপুর নাগাদ জেরা শুরু করব। সব ক’টা শুয়োরের বাসা খুঁজে বার করতে হবে”।

৫২।

বীরেন যখন বাড়ির কলিং বেল বাজাল তখন সন্ধ্যে সাতটা। বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ। বাবা দরজা খুলে তাকে দেখে রাগী গলায় বললেন “এই তোর আসার সময় হল? একটা ফোন না কিছু না! ইন্টারভিউ দিয়ে তো এক্কেবারে উলটে দিলি তুই!”

মা তাকে দেখেই এসে চেঁচিয়ে উঠলেন “হাতে কী হল তোর! কী করলি এসব?”

বীরেন বলল “বাসে পড়ে গেছিলাম”।

মা বললেন “চল চল, চুন হলুদ গরম করে দি”।

বাবা বললেন “কিচ্ছু দিতে হবে না, পুরুষ মানুষ। সব ঠিক হয়ে যাবে। কীরে ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে?”

বীরেন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

বাবা বললেন “এই দেখো পাগল ছেলে! কী রে কী শুরু করলি? বাইরের পোশাক পরে, এই দ্যাখো কী কান্ড!”

মা রাগ করলেন “হ্যাঁ, এখন তো বাবাকেই আদর করবি, তাই সই। আমি তো বানের জলে ভেসে এসছি, হ্যাঁরে এই ব্যাগটা কোত্থেকে কিনলি?” মার চোখ পড়ল তার ব্যাগের ওপর।

বীরেন বলল “যেখানে ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম, সেখান থেকে দিয়েছে”।

মা বললেন “ঠিক আছে, যা হাত মুখ ধুয়ে আয়। মুড়ি মেখেছি, খেয়ে নে”।

বীরেন ঘরে গিয়ে ব্যাগটা রাখল। দরজা বন্ধ করে ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করল। প্লেনে ওঠার সময় অবন্তী স্যার নিজের হাতে দিয়ে বলেছিলেন “একটা মেসেজ আছে, বাড়ি গিয়ে পড়”।

বীরেন দেখল কাগজটায় একটা ছোট্ট মেসেজ “দুদিন রেস্ট নিয়ে নাও। তারপর কলকাতার অফিসে রিপোর্ট কোর। স্বয়ং পি এম সাহেবের থেকে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার চেয়ে নিয়েছি। থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভ্রিথিং এন্ড আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি দ্যাট ইউ ফেইলড দ্যাট এক্সাম ডেসপাইট ইউ ওয়ার পারফেক্টলি এলিজিবল ফর আস। ওয়েলকাম টু ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ইয়ং ম্যান- তুষার রঙ্গনাথন”।

#

দিল্লির ফ্লাইটে নিজের সিটে বসলেন তুষার।

মাথুর কানে কানে বললেন “স্যার ব্যাড নিউজ”।

তুষার ভ্রু কুঁচকালেন “কী?”

মাথুর বললেন “পাকিস্তানি মিডিয়া আফসানা সাইদের হত্যা নিয়ে তুলকালাম করছে। বলছে স্পাই হলেও আফসানা সাইদকে মেরে ইন্ডিয়া ঠিক করে নি”।

তুষার কয়েক সেকেন্ড জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন।

তারপর মাথুরের দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠে বললেন “মরুক গে যাক”।

পর্ব ২

১।

মাথার পেছনে চাপ চাপ ব্যথা। প্রচন্ড শীত লাগছিল। ঘুম যখন ভাঙল দেখল কেউ একটা জোব্বা পরিয়েছে তাকে।

ডান হাতটায় প্রচন্ড ব্যথা। কোনমতে ঘাড় তুলে জানলার বাইরে দেখার চেষ্টা করল সে। বৃষ্টি হচ্ছে জোরে।

ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। আবার শুয়ে পড়ল।

চোখ বুজে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল। অনেকদিন পর মার মুখটা মনে পড়ছিল।

ঘরে কেউ একজন ঢুকেছে। খস খস শব্দ হচ্ছে।

সে এবার নড়া চড়া করল।

তাকে নড়তে দেখে যে ঘরে ঢুকেছিল সে তার দিকে এগিয়ে এল। তার কপালে হাত রাখল।

প্রবল শীতল হাত। সে শিউরে উঠল। চোখ খুলে দেখল এক মধ্যবয়স্কা। মায়ের মতই।

সে বলল "আমি কোথায়?"

মহিলা বললেন "তুমি অনেকদিন পরে জাগলে বেটা। এখন উঠো না। ওরা তোমার খোঁজে অনেকবার এসেছিল। তোমায় দেখলে মেরে ফেলবে"।

সে বলল "কারা মেরে ফেলবে?"

মহিলা বললেন "যারা আমাদের শত্রু। আমাদের সবার শত্রু যারা। তুমি শুয়ে থাকো। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি"।

পরম মমতায় মহিলাটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে একটা বাটিতে স্যুপ জাতীয় কিছু নিয়ে এসে তার ঠোঁটের কাছে ধরলেন। সে একটু একটু করে চুমুক দিল।

মহিলা বললেন "তোমার যখন জ্ঞান থাকত না, তোমাকে যে খাওয়াতে কত কষ্ট হয়েছে বেটা। এবার আশা করি তোমার অতটা কষ্ট হবে না ইনশা আল্লাহ"।

সে যতটা পারল খেল। তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোক এসে তার বিছানার পাশে এসে বসে ভদ্রমহিলাকে বললেন "জ্ঞান ফিরেছে?"

মহিলা বললেন "হ্যাঁ"।

ভদ্রলোক তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন "বেটা"।

সে চোখ খুলে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন "কী করে যে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছি তা আমরাই জানি। ওরা গ্রামের পর গ্রাম তল্লাশি করে গেছে। নীলম নদী তছনছ করে দিয়েছে যদি তোমার লাশ পাওয়া যায়। কী করে বেঁচে আছো তুমি তা আমরাও জানি না। শুধু উপরওয়ালার অশেষ কৃপা, কোন অজানা পুণ্যের ফল পাচ্ছো হয়ত"।

সে বলল "আমি ভারতীয়। আপনারা জানেন?"

ভদ্রলোক হাসলেন "আন্দাজ করেছিলাম। নইলে ওরা তোমাকে এভাবে খুঁজবে কেন?"

সে বলল "তবে আমাকে বাঁচালেন কেন? ওদের হাতে তুলে দিলেই তো পারতেন!"

ভদ্রলোক বললেন "আমি ভারতীয়, পাকিস্তানি, কাশ্মীরি বুঝি না বাবা। আমি বুঝি পরম করুণাময় আল্লাহ তোমাকে আমাদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন। কতগুলো খুনিদের হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে সে গুণাহ করব এমন বেরহম আল্লাহর সত্যিকারের বান্দারা কোনদিন হতে পারে না।"

সে শুয়ে রইল। ভদ্রলোক বললেন "তুমি শুয়ে থাকো। এখন ওরা আর খুব বেশি এই গ্রামে আসছে না। তবে ঘর থেকে বেরিও না। আমি সবদিক খুঁটিয়ে দেখে তোমাকে এখান থেকে কীভাবে বের করার ব্যবস্থা করা যায় দেখব"।

সে বলল “আমার কাছে কোন টাকা নেই, কিচ্ছু নেই না। তাই না?”

ভদ্রলোক হাসলেন “মানুষ যখন এই পৃথিবীতে আসে তখনও কিছু না নিয়েই এই পৃথিবীতে আসে বেটা। তুমি চিন্তা কোর না, আগে তো বেঁচে থাকা, তুমি যখন বেঁচে গেছো তখন আবার নিশ্চয়ই তুমি ফিরতে পারবে নিজের বাড়িতে”।

সে জেগে থাকতে পারছিল না।

ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে এল।

ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন “আমি কিছু সবজি নিয়ে আসছি”।

ভদ্রমহিলা নীরবে মাথা নাড়লেন।

মড়ার মত বিছানায় শুয়ে রইল সায়ক।

সায়ক বড়াল।

২।

এরোপ্লেনে আগুন লেগে গেছে। আফসানা তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। মীর্জা তাক করে আছেন বন্দুকটা তার দিকে। সে পালাবে ভাবছে কিন্তু কোথাও যেতে পারছে না। কোন প্রচন্ড ক্ষমতাসম্পন্ন চুম্বক তার পা মাটিতে আটকে রেখে দিয়েছে। বীরেন পেছন ফিরে দেখল জ্যোতির্ময় তার দিকে তাকিয়ে বলছেন “কেউ বাঁচাতে পারবে না তোমায়, তোমার বাড়ির লোক পর্যন্ত আমার হাত থেকে ছাড় পাবে না”। বীরেন ঘামছে, আর্তনাদ করছে কিন্তু গলা থেকে শব্দ বেরোচ্ছে না। কোত্থেকে প্রবল জোরে জলপ্রপাত এসে তার মুখে লাগল আর ঘুম ভেঙে গেল।

বীরেন ধড়মড় করে উঠে বসে বুঝল সে স্বপ্ন দেখছিল। সামনে অরিত্রি একটা বোতল থেকে জল নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছে। অরিত্রি একটা হলুদ সালোয়ার পরে আছে। খোঁপায় কোত্থেকে একটা হলদে ফুল জোগাড় করেছে। বীরেন বিরক্ত গলায় বলল “এই কী রে! কী শুরু করলি সকাল সকাল”!

অরিত্রি বলল “সকাল? ব্যাটা মাথাটা গেছে তোর? দশটা বাজে এখন!”

বীরেন ঘাড় ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল। বলল “ওরে বাবা! দাঁড়া আমি আসছি”।

অরিত্রি বলল “সে যেখানেই যা, বড় বাইরে যা, ছোট বাইরে যা, যা করবি তাড়াতাড়ি কর”।

বীরেন অবাক গলায় বলল “কেন? কী হয়েছে তোর?”

অরিত্রি বলল “বারাসাত নিয়ে যাবি”।

বীরেন বলল “কেন বারাসাত নিয়ে যাব কী করতে?”

অরিত্রি বলল “একটা এক্সামের ফর্ম তুলব। আরও একগাদা কাজ আছে”।

বীরেন বলল “পারলাম না। তোর রজতকে বল”।

অরিত্রি বলল “রজত তো চলে গেল কালকেই। আবার পুজোর পরে আসবে”।

বীরেন বলল “তো আমি কী করব? আমি খুব টায়ার্ড, এই কাল সবে দিল্লি থেকে ফিরলাম। আমার দ্বারা ওসব হবে না”।

বীরেনের বোন বুল্টি ঘরে ঢুকল। অরিত্রি বলল “দেখ রে বুল্টি, তোর দাদা এমন ঘ্যাম নিচ্ছে যেন কাল হাইজ্যাক হওয়া প্লেনে ওই সব টেরোরিস্টদের গুলি করে মেরেছে”। বলেই অরিত্রি খিল খিল করে হাসতে শুরু করল।

বুল্টিও হাসল। বলল “ঠিক বলেছিস অরিদি। দাদাটা আজকাল যা শুরু করেছে না, বাড়িতে খবর পর্যন্ত দেয় না। যেখানে যাবি যা না, তোকে কে বারণ করেছে, কিন্তু একটু ফোন তো করতে পারিস! মা নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত ডকে তুলে দিয়েছিল। দেখ না আবার হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। ফুটেজ মাস্টার কোথাকার!”

বীরেন কারও কথায় কান না দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। মুখ হাত ধুয়ে, বড় বাইরে সেরে ফিরে এসে দেখল তার ঘরে অরিত্রি আর বুল্টি তখনও গল্প করে যাচ্ছে। এখন গল্প চলছে রজত আর অরিত্রির বিয়ে নিয়ে। কোত্থেকে গয়না কিনবে, শাড়ি কিনবে, সব ডিটেলসে আলোচনা হচ্ছে।

বীরেন আবার খাটে এসে শুল।

অরিত্রি বলল "কীরে বীরেন, এরকম করছিস কেন, চ না। তুই বুঝতে পারছিস না, মা কিছুতেই আমাকে একা ছাড়বে না। আর আমার বারাসাত না গেলে আসল কাজটাই হবে না"।

বুল্টি বলল "যা না দাদা, এত করে বলছে যখন"।

বীরেন খাটে শুয়ে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে বলল "তুই যা না, কাজ বাজ তো কিছু নেই, শুধু লোকের মাথা খারাপ করবি। ফোট তো এখন"।

বুল্টি বীরেনের পায়ে একটা চিমটি কেটে বলল "একদম ভুলভাল বকবি না দাদা। আমি অনেক কাজ করি। দাঁড়া না, এস এস সিতে চাকরিটা পেতে দে, তারপর যখন আমার কাছে টাকা চাইতে আসবি, তখন দেখাব মজা"।

বীরেন হেসে বলল "এস এস সিতে চাকরি? ও তো তুই পাবি না তোর কঙ্কাল পাবে। শোন, ওসব ঢপবাজি রাখ। এখন ফুটে যা তো। ঘর খালি কর, দুটোই বেরো"।

অরিত্রি কাঁদো কাঁদো মুখে বলল "মাইরি বীরেন, তুই এরকম করবি?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ, করব। আমার পক্ষে তোর খিদমৎ খাটা সম্ভব না। আমার অনেক কাজ আছে"।

অরিত্রি মুখ ভ্যাংচাল "হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজ করে উলটে দিচ্ছেন এক্কেবারে উনি। চ বলছি"।

বীরেন বিরক্ত মুখে উঠে বলল "তুই কি একটু শান্তি দিবি না? দেখছিস আমি কেমন টায়ার্ড হয়ে আছি, বা হাতে এখনও ব্যথা"।

অরিত্রি বলল "ও সব ব্যথা ট্যাথা বনগাঁ লোকালে মানুষের ভিড়ের ঠ্যালা খেলে এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। চ তো"।

বীরেন বুঝল অরিত্রি ছাড়বে না কিছুতেই। সে বলল "ঠিক আছে। কিন্তু তোর বর যদি জানতে পারে তোর মেল বেস্ট ফ্রেন্ড আছে, তখন সন্দেহ করলে আমায় কিছু বলবি না কিন্তু"।

অরিত্রি চোখ বড় বড় করে বুল্টির দিকে তাকিয়ে বলল "দেখলি বুল্টি, তোর দাদা কী সব বলছে! খুব পেকেছিস তুই! যাবি একটু বারাসাত, ভাব দেখাচ্ছিস যেন তোকে ব্যাঙ্গালোর নিয়ে যাচ্ছি"।

বীরেন হাল ছেড়ে দিল। সে রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলল "মা, অরিত্রি জ্বালিয়ে খেল। বারাসাত যাচ্ছি"।

মা বললেন "যা, তবে ফিরিস তাড়াতাড়ি, হাতের দিকে খেয়াল রাখিস। আর কী, আমাদের কপালে কী আর মেয়েটা আছে! তুই চাকরি বাকরিও পেলি না, বলার মত মুখ থাকল কোই"! মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বীরেন বলল "উফ, চুপ কর তো, শুনতে পাবে। যা হয়েছে, খেতে দাও। বেরোই"।

মা বললেন "দিচ্ছি। বস"।

বীরেন নিজের ঘরে গিয়ে অরিত্রিকে বলল "ওয়েট কর। খেয়ে নি। তুই খেয়ে এসেছিস?"

অরিত্রি বলল "হ্যাঁ। দেরী করিস না। তোর তো তিন ঘন্টা ধরে খাওয়া! অত সময় নিস না"!

বীরেন বলল "হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক হয়েছে"।

ফোনটা অফ করে শুয়েছিল সে।

ফোনটা নিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে অন করল সে।

মা খাবার দিচ্ছিলেন।

বীরেন দেখল মোবাইলে মেসেজ এসেছে, তুষার রঙ্গনাথনের; "হাসান/জ্যোতির্ময়ের যে বাড়িতে তুমি প্রথম গেছিলে, সে বাড়িতে আগামীকাল সকাল দশটার মধ্যে পৌঁছবে, দেখা হবে"।

বীরেন অবাক হয়ে মেসেজটা দেখল।

মা রেগে গেলেন "কীরে, খা! এই তো এতক্ষণ খেতে দাও বলছিলি,এখন আবার সেই মোবাইলে মুখ গুঁজে খুট খুট শুরু করে দিয়েছিস? উফ! এই মোবাইলটা কবর দিতে পারলে বাঁচি আমি!"

৩।

ডিফেন্স কাউন্সিলের গোপন মিটিং বসেছে ইসলামাবাদে মেজর জেনারেল নিয়াজির বাড়িতে। আছেন নিয়াজির ঘনিষ্ঠ মেজর রশিদ উল হক, উমর খান এবং ব্রিগেডিয়ার গুলাম মহম্মদ। সুদৃশ্য টেবিলে রাখা চারটে স্কচ ভর্তি গ্লাস। রাখা আছে গোস্ত কাবাব সহ বিভিন্ন খাবার। কিন্তু কেউই খাবারে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। পরিবেশ যথেষ্ট গম্ভীর।

গুলাম মহম্মদই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন "আমার মনে হয় আমাদের এভাবে স্লিপার সেল নির্ভরতা কমাতে হবে। দ্য ডেথ অফ আফসানা সাইদ ইজ আ বিগ সেট ব্যাক ফর আস। গোটা দুনিয়া আমাদের নিয়ে হাসছে। কত আর এরকম আক্রমণাত্মকভাবে ব্যাপারটাকে ডিফেন্ড করব"?

উমর খান বললেন "স্লিপার সেল না থাকলে আমাদের ইন্টেলিজেন্স কীভাবে কাজ করবে? তবে হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমি একমত, আমাদের স্লিপার সেল নির্ভরতা কমানো উচিত"।

নিয়াজি বিরক্ত গলায় বললেন "প্রবলেমটা কী জানেন তো? আমাদের মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের অভাব। এরকম ইম্পরট্যান্ট একটা আলোচনা হচ্ছে অথচ সরফরাজই আসেন নি"।

রশিদ একটু গলা খাকরে বললেন "উনি আসবেন। আমাকে জানিয়েছেন। তবে দেরী হবে। ওঁর একটা স্পেশাল মিটিং আছে সন্ধ্যেয়"।

নিয়াজি গলার বিরক্তিভাবটা বজায় রেখেই বললেন "ঐ যে বললাম, সমস্যাটা ইন্টিগ্রেশনের। আমিই জানি না কী নিয়ে মিটিং, কার সঙ্গে মিটিং। দিস ইজ ডিজগাস্টিং। লিভ ইট, ওমর শেখের কোন আপডেট আছে"?

গুলাম মহম্মদ বললেন "সারেন্ডার করেছে"।

নিয়াজি বললেন "হোপলেস। ওই অবস্থাতেই চপার ভেঙে চারটে লোক মেরে মরতে পারত। কোন কাজে আসবে আমাদের এসব লোক?"

রশিদ বললেন "আপনি মনে হয় একটু বেশিই মাথা গরম করে ফেলছেন স্যার। ওমর শেখের বেঁচে থাকাটা আমাদের জন্য ফায়দার হতে পারে"।

নিয়াজি মুখ তেতো করে বসে থেকে বললেন "হাসান মাকসুদের কী খবর?"

রশিদ বললেন "কাস্টডিতে নিয়েছে রঙ্গনাথন। কিছু না কিছু নিশ্চয়ই বের করার চেষ্টা করবে। হি ইজ আ থ্রেট নাও"।

নিয়াজি বললেন "প্রায়োরিটিগুলো বোঝার চেষ্টা করুন রশিদ। হাসান আমাদের থ্রেট কেন হতে যাবে? লস্করের সঙ্গে ওদের কী সেট আপ ছিল, সেসব ওদের মাথা ব্যথা। সব ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করতে গেলে তো পাগল হয়ে যেতে হয়। এর মধ্যে আবার দেশে ইলেকশনের সময় হয়ে গেছে। আমাদের ভাবতে হবে পাকিস্তানের স্বার্থে দুর্বল মেরুদন্ডহীন কোন লোক যেন তখতে বসতে না পারে। সেক্ষেত্রে সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থানের চিন্তা করতে হবে"।

উমর বললেন "জি স্যার। ইলেকশন নিয়ে আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। পাশা সাহাবই জিতবেন ইনশা আল্লাহ"।

নিয়াজি বললেন "সেরকম ভাবেই ঘুঁটি সাজানো হয়েছে। দ্য গুড নিউজ ইজ, সি আই এও পাশা সাহাবের জিতই চাইছে"।

রশিদ হাসলেন "সে তো ওরা চাইবেই। পাশা সাহাব জিতলে পাকিস্তানে ডিফেন্স মেটিরিয়ালের ইমপোর্ট বাড়বে, ওরাও তো সেটাই চায়"।

নিয়াজি বললেন "আমেরিকাকে আমি বিশ্বাস করি না। ওরাও আমাদের করে না। জাস্ট এই বিজনেস ডিলগুলোর জন্য ওরা এখনও আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে"।

উমর বললেন "হাবিবুল্লাহ রসুল কিন্তু আমাকে আজও খবর পাঠিয়েছেন স্যার। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান"।

নিয়াজি বিরক্ত মুখে বললেন "কিছু একটা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পিছিয়ে দি। তালিবানদের সঙ্গে আমার দেখা হলেই আমেরিকান জাসুসরা খবর পেয়ে যাবে"।

রশিদ বললেন "কিন্তু ওদের আমাদের দরকার। এটা ভুললে চলবে না"।

নিয়াজি বললেন "তাহলে আপনি দেখা করুন। বা অধঃস্তন কোন অফিসারকে বলুন ওর দাবী শুনে নিতে। আমার সঙ্গেই বা কেন বসতে হবে? পাকিস্তান আর্মির নামে এর মধ্যেই একগাদা অভিযোগ জমে আছে। তালিবানের সঙ্গে জুড়ে আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না"।

দরজায় টোকা পড়ল। নিয়াজির খানসামা এসে বললেন "স্যার সরফরাজ সাব এসেছেন"।

নিয়াজি ইশারায় বললেন সরফরাজকে নিয়ে আসতে।

রশিদ খুশি মুখে বললেন "এই তো স্যার, আপনি খুঁজছিলেন, উনি এসে গেছেন"।

সরফরাজ বেশ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে সোফায় এসে বসলেন। নিয়াজি বললেন "কী ব্যাপার? খুব ইম্পরট্যান্ট মিটিং ছিল নাকি?"

সরফরাজ একটা গ্লাস নিয়ে তাতে স্কচ ঢেলে এক চুমুকে সবটা খেয়ে বললেন "ইব্রাহিম আব্বাস এসছিল"।

নিয়াজি বললেন "তো?"

সরফরাজ নিয়াজির দিকে তাকিয়ে বললেন "নীলমের তীরে কাল একটা আনআইডেন্টিফায়েড বডি পাওয়া গেছে। সম্ভবত বড়ালের। মুখ চেনা যাচ্ছে না, পাথরে ধাক্কা খেয়েছিল মে বি, তবে ড্রেসটা বড়ালের ছিল"।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড সরফরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন "শুধু এটা বলার জন্য ইব্রাহিম মুজফফরাবাদ থেকে এতদূর এসেছিল?"

সরফরাজ হেসে ফেললেন "আপনাকে ফাঁকি দিতে পারব না জানতাম"।

নিয়াজি এতক্ষণ পর নিজের গ্লাসটা হাতে নিলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "গিভ মি সাম গুড নিউজ সরফরাজ। কাল থেকে খুব বাজে যাচ্ছে সব কিছু"।

সরফরাজ বললেন "কাশেম সোলেমানি পেশোয়ারে আসছেন স্যার। পরশু"।

নিয়াজি স্থির চোখে সরফরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন "তো? আমরা কী করে দেখা করব? আমেরিকান ইঁদুরেরা খবর পেলে কী হবে বুঝতে পারছেন?"

সরফরাজ মাথা নাড়লেন "সেটা আমি বুঝব স্যার। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে কাশেম সোলেমানির দেখা হওয়াটা দরকার"।

নিয়াজি বললেন "আমি ইলেকশনের আগে এই রিস্কটা নিতে পারব না সরফরাজ"।

সরফরাজ ঘরে বসা বাকি তিনজনের দিকে তাকালেন। বাকিদের নির্বাক দেখে চুপচাপ নিজের গ্লাসটা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

৪।

খান নিজের চেম্বারে কাজ করছিলেন। মাথুর হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে বললেন "কী করছ?"

খান বললেন "কিছু বেসিক ইনফো এসেছে শ্রীনগর থেকে। এক জায়গায় করে রাখছিলাম"।

মাথুর বললেন "কী ইনফো?"

খান কাঁধ ঝাঁকালেন "অ্যাস ইউজুয়াল। ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পোড়ানোর প্ল্যান করছে কয়েকটা জায়গায়। রেড অ্যালার্ট জারি রাখতে বলা হয়েছে অবস্তী স্যারকে। ডাল লেকের একটা হাউজবোট থেকে তিনটে লস্করের ছোট সাইজের কুকুর ধরা পড়েছে। ওদের মেহমানদারি করার জন্য দিল্লি নিয়ে আসা হচ্ছে"।

মাথুর হাই তুললেন "ওহ, এই?"

খান বললেন "কেন? কম মনে হচ্ছে? এক কাজ কর না, মুজফফরাবাদে চলে যাও। তোমার জন্য অনেক নিউজ অপেক্ষা করে আছে"।

মাথুর বললেন "আমি তো সিরিয়াসলি ভাবছিলাম এ ব্যাপারটা নিয়ে"।

খান বললেন "ভুলেও ভেবো না। তোমার যা ঘুম! দেখা গেল লস্করের ডেরায় গিয়ে ঘুমিয়েই পড়লে"।

মাথুর রেগে গেলেন "মোটেও আমার অত ঘুম না। তোমার কাজই হল সব বাড়িয়ে বলা"।

খান হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই গম্ভীর হয়ে বললেন "এই দেখো, সুখে থাকতে দেবে না এরা, অনন্তনাগে পোস্টার পড়ে গেছে, আফসানা সাইদের খুনের বদলা নেওয়া হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব"।

মাথুর বললেন "নিক। এই করে যাক। দিস ইজ অ্যান এন্ডলেস ওয়ার"।

খান বললেন "সিরিয়াসলি"।

খানের ফোন বাজছিল। খান দেখলেন তুষার ফোন করছেন। ধরলেন "ইয়েস স্যার"।

"খান, ডু মি আ ফেভার"।

"বলুন স্যার"।

"কাল আমার কোলকাতা যাবার কথা ছিল। আমি যেতে পারছি না। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে হঠাৎ একটা আর্জেন্ট কল এসেছে। তুমি কাল কলকাতা যেতে পারবে?"

"শিওর স্যার। নো প্রবলেম। মাথুরকে নিয়ে যাব?"

"দেখো, মাথুরের কোন প্রবলেম না থাকলে নিয়ে যাও। হাসানের ঘরে ফার্স্ট সার্চটা তো মাথুরই করেছিল। ওর এক্সপেরিয়েন্সটা লাগবে আমাদের"।

"ওকে স্যার। জয় হিন্দ"।

"জয় হিন্দ"।

ফোনটা রাখলেন খান। মাথুর বললেন "কী হল? নিশ্চয়ই স্যার?"

খান বললেন "হ্যাঁ। কোলকাতা যেতে হবে। বললেন তোমার কোন প্রবলেম না থাকলে তোমাকেও নিয়ে যেতে"।

মাথুর বললেন "আমার কোন প্রবলেম আছে হে? আই লাভ মিষ্টি দই"।

খান হাসলেন। মাথুর বললেন "হাসানের খবরটা মিডিয়াতে না দেওয়াটা কি ঠিক হয়েছে?"

খান বললেন "জানি না, স্যার মিনিস্ট্রি লেভেলে কথা বলেই খবরটা ছড়াতে দেন নি সম্ভবত। তাছাড়া হাসানের ফ্যামিলির লোকেদের কথাটাও ভেবেছেন। ওরা তো আমাদের হেল্পই করেছেন। আমরা যদি খবরটা লিক করে দিতাম, ওরা কলকাতাতে থাকতে পারতেন না"।

মাথুর বললেন "তবু সিকিউরিটিটা জোরদার থাকা দরকার। বলা যায় না, হাসান কী খাজানা কোথায় রেখে গেছে কে জানে"!

খান বললেন "একজ্যাক্টলি"।

মাথুর বললেন "আচ্ছা খান, একটা কথা বল তো। যদি জ্যোতির্ময়ের ফ্যামিলির লোক হিন্দু না হয়ে মুসলিম হত, তাহলেও কি ওরা সেম ট্রিটমেন্ট পেত? এভাবে ওদের সিকিউরিটি দেওয়া হত? আমরা ওদের এরকম চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পারতাম?"

খান কয়েক সেকেন্ড মাথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন "না বোধ হয়"।

মাথুর হাসলেন “তাহলে কীসের সেকুলার কান্ট্রি ভাই?”

খান বললেন “দোষটা আমাদের কান্ট্রির নয়। দোষটা আসলে হিন্দুদেরও নয়। বেসিক্যালি কিছু পারসেন্টেজ লোক ধর্মটার এমন একটা রেপুটেশন করে রেখেছে যে স্বাভাবিকভাবেই এই অস্বস্তিকর ব্যাপারগুলো চলে আসে। তুমি আমি তো কিছু করতে পারব না। ইন্টারপ্রিটেশন আর মিসইন্টারপ্রিটেশনের মধ্যে একটা সুতোর তফাৎ মাথুর। যে লাইনটাকে কেউ শান্তি বলে চিহ্নিত করছে, সে লাইনটাই আরেকজনের কাছে জিহাদ হয়ে যাচ্ছে। আর সমস্যাটা বোধহয় এত উপর উপর দিয়ে দেখলে হয় না। সমস্যাটা অনেকটাই গভীরে। জিহাদ এটসেট্রা কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের টাইমেও এরকমভাবে ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মিডল ইস্টের অয়েল, আমেরিকার বিন লাদেন, আই এস আই এসের মত ফ্রাঙ্কেন্সটাইন তৈরী করা, সব কিছু আসলে এক সুতোয় গাঁথা। এত সহজে একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেলে তো হয়েই যেত”।

মাথুর চিন্তিত মুখে বললেন “তা ঠিক। বাই দ্য ওয়ে, হাসানের পাড়ার একটা বাড়ি থেকে চারটে ছেলেকে ইন্টেলিজেন্স তুলেছে শুনেছ তো?”

খান বললেন “হ্যাঁ। ওদের মধ্যে একজন, নাম ইউসুফ, ওই ছেলেটাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে গেছিল”।

মাথুর বললেন “দ্যাট বয়, ইউসুফ ইজ আ জিনিয়াস, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, চোখের পলকে বানিয়ে দেয়”।

খান চিন্তিত মুখে বললেন “কলকাতায় গিয়ে এই ছেলেটার সঙ্গেও দেখা করতে হবে। বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনও জানা বাকি আমার”।

৫।

রেহান অফিসে ছিলেন। কাশ্মীরে বর্ষাকালটা প্যাচপ্যাচে না হলেও বৃষ্টি পড়লে রাতের দিকে ভালই ঠান্ডা পড়ে।

বেশ কিছু কাজ জমে ছিল। ইনভেস্টিগেশনের ফাইল এসে পড়েছিল টেবিলে। মন দিয়ে সেগুলোই দেখছিলেন এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠল। রেহান ফোন ধরলেন। ওপাশে মা-র ভয়ার্ত কণ্ঠ ভেসে এল “একবার বাড়িতে আয় তো”।

রেহান বললেন “কী হয়েছে, বল না মা”।

মা কাঁদো কাঁদো কন্ঠে বললেন “আয়, এসেই দেখে যা”।

রেহান বুঝলেন কোন সমস্যা হয়েছে। তিনি অফিস থেকে বেরোলেন। অফিসের বাইরে তার জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, নিরাপত্তারক্ষীও থাকেন একজন। রেহান গাড়িতে উঠলেই গাড়ি রওনা দিল।

ডাল লেকের কাছে অন্যান্য সময় পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। এবারে আর্মিতে ছয়লাপ। স্বাধীনতা দিবসে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তারই প্রস্তুতি। ডাল লেকের হাউজবোটগুলো মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ত্রস্ত সময়ে কেই বা আর ঘুরতে আসবে? বাজারের অধিকাংশ দোকান বন্ধ।

রেহান ড্রাইভারকে তাড়া দিলেন “একটু জলদি চল আনোয়ার”।

আনোয়ার বলল “হ্যাঁ স্যার, বুঝতেই পারছেন, স্পিড লিমিট আছে, বেশি জোরে গেলে কেস দিয়ে দেবে”।

রেহান ধমক দিলেন “সে আমি বুঝব। তুমি জলদি চল তো”।

আনোয়ার অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলেন। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে থাকা নিরাপত্তারক্ষী তারেক বলল “কোন প্রবলেম হয়েছে স্যার?”

রেহান বললেন "তাছাড়া আর কী? আমাদের কি আর শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ আছে? গিয়ে দেখি কী হয়েছে"!

রেহানের বাড়ি পুরনো শ্রীনগর অঞ্চলে, গলির ভেতরে। একটা জায়গা অবধি গাড়ি যায়, তারপরে হেঁটে যেতে হয়। গলির মুখে গাড়ি দাঁড়াতেই রেহান গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন।

তারেক রেহানের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে বললেন "স্যার, ধীরে, স্যার, আমি যাচ্ছি তো"।

রেহান তারেকের কথায় কান দিলেন না। দৌড়তে দৌড়তে নিজের বাড়ির সামনে এসে দেখতে পেলেন বাড়ির সামনে কেউ কালি দিয়ে "গদ্দার", "ভারত কি বরবাদী, হামারি জিত", "পাকিস্তান জিন্দাবাদ", "বদলা হাম জরুর লেঙ্গে" ইত্যাদি লিখে গেছে। বাড়ির সামনে পাড়ার লোকেদের ভিড়। রেহানকে পৌঁছতে দেখে মা দৌড়ে এলেন।

তার হাত ধরে বললেন "দেখ বেটা, কী করে গেছে ওরা"।

রেহান দেখল পাড়ার কয়েকজন তার দিকে ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রেহান মাকে জড়িয়ে ধরল "চিন্তা কোর না। কারা করেছে দেখেছ?"

মা বললেন "আমি তো রান্না করছিলাম। ইদ্রিশ আর সোবাহান বলল ছেলেগুলো নাকি পাশের মহল্লাতেই থাকে। মসজিদের পাশের গলিতে যে কার্পেটের ফ্যাক্টরিটা আছে, ওখানেই"।

রেহানে কয়েক সেকেন্ড লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে ইদ্রিশকে বলল "আলি ফ্যাক্টরি?"

ইদ্রিশ রেহানের প্রতিবেশী।

মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, ওখানে বেশ কয়েকটা ছেলে আছে দু দিন ধরে"।

রেহান মায়ের পিঠে হাত রেখে বললেন "ঠিক আছে, তুমি ঘরে যাও। আমি অফিস থেকে রাতে ফিরছি"।

মা বিমর্ষ মুখে রেহানকে বললেন "সাবধানে থাকিস বেটা"।

রেহান বললেন "হ্যাঁ তুমি যাও"।

মা ঘরের ভিতর ঢুকলেন। রেহান ইদ্রিশকে বললেন "চাচা, আপনারা কিছু বললেন না, ছেলেগুলো যখন লিখছিল?"

ইদ্রিশ আমতা আমতা করতে লাগলেন। বাকিরা সরে পড়তে লাগল।

রেহান হাঁটা লাগাল। পেছন পেছন তারেক বকতে লাগল, "কী অবস্থা স্যার, সব থেকে ভাল হয় আপনি ফ্যামিলি নিয়ে অন্য কোথাও শিফট করে যান, এরা থাকতে দেবে না এখানে"।

রেহানের চোয়াল শক্ত হচ্ছিল। গলির মুখে দাঁড়িয়ে কয়েকসেকেন্ড ভাবলেন।

তারপর সটান হাঁটা দিলেন আলি ফ্যাক্টরির দরজায়"।

তারেক চেঁচাতে শুরু করল "আরে স্যার, কী শুরু করলেন। পরে ফোর্স নিয়ে আসব না হয়"।

রেহান তারেকের কোন কথাই কানে নিলেন না। আলি ফ্যাক্টরির গেট বন্ধ ছিল।

রেহান জোরে জোরে দরজায় লাথি মারতে লাগলেন।

তারেক ক্রমাগত অনুনয় বিনয় করে যাচ্ছিল।

আলি ফ্যাক্টরির দুটো দরজা। একটা বড় দরজা আরেকটা ছোট।

লাথির শব্দে কেউ একজন ছোট দরজা খুলল।

রেহান গায়ের যত জোর আছে একত্রিত করে তার কলার ধরে রাস্তায় টেনে হিচড়ে বার করলেন "কোথায় শুয়োরগুলো কোথায়?"

যে ছেলেটাকে টেনে বের করা হয়েছিল সে একেবারেই কমবয়সী। ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল "ওই তো বারান্দাতেই বসে আছে"।

রেহান ছোট দরজাটা দিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকলেন। দেখল পাঁচ ছ জন বসে একটা বড় থালায় খাবার খাচ্ছে। রেহান বললেন "আমার বাড়িতে কালি লেপেছে কে?"

একজন তেড়ে এল “আমি লেপেছি। কী করবি তুই ইন্ডিয়ার কুত্তা?” উপস্থিত বাকিরা এই কথায় হো হো করে হেসে উঠল।

রেহান পকেট থেকে সার্ভিস রিভলভার বের করে পর পর দুবার শ্যুট করলেন লোকটার বুকে। লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগে শেষবারের মত তার দিকে অবিশ্বাসী চোখে তাকালেন। বাকিরা পালাতে শুরু করল। তার মধ্যেই রেহানের রিভলভার গর্জে উঠল। তিনজনের পিঠে গুলি লাগল। বাকিরা পালিয়ে গেল। তারেক ভয়ে “স্যার, পাগল হয়ে গেলেন নাকি?” বলে চেঁচাতে চেঁচাতে রেহানের হাত ধরে টানতে টানতে গাড়িতে নিয়ে বসে ড্রাইভারকে বলল “তাড়াতাড়ি অফিসে চল। জলদি”।

রেহান তখনও ফুঁসছিলেন।

এতক্ষণ বৃষ্টি পড়ছিল না। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল হঠাৎ করেই।

৬।

তুষার নিজের চেম্বারে কম্পিউটারে কাজ করছিলেন এমন সময় দেখলেন অবন্তী ফোন করছেন। ধরলেন তুষার, "গুড মর্নিং অবন্তী, কেমন আছ? সকাল সকাল ইডলি খেতে ইচ্ছা করল নাকি?"

অবন্তী বললেন "গুড মর্নিং বস। ঠিক সে কারণে তোমাকে ফোন করিনি। ফ্রি আছো এখন?"

তুষার বললেন "ফ্রি নেই তবে ফাঁকা আছি। চারদিকে কেউ নেই আপাতত"।

" একটা কান্ড হয়ে গেছে তুষার।"

"কী হল? মানে আবার কী হল? কাশ্মীরে কোন কান্ড না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের।"

"তা বটে, তবে এ ঘটনাটা চাপের। তোমার রেহান একটা কার্পেট ফ্যাক্টরিতে ফ্রি স্পেসে গুলি চালিয়েছে। দুজন স্পট, তিনজন হসপিটালাইজড হয়েছে। এলাকা পুরো আগুন হয়ে আছে"!

তুষার নড়ে চড়ে বসলেন " সে কী! কখন ঘটল?"

অবন্তী বললেন "জাস্ট কিছুক্ষণ আগে। রেহানের বাড়িতে ওরা কালি লেপে গেছিল"।

তুষার মাথায় হাত দিয়ে বললেন " মাই গড। রেহানের মত শান্ত ছেলে এটা কীভাবে করল? কোথায় আছে এখন?"

অবন্তী বললেন "আর কোথায় থাকবে, কান্ড ঘটিয়ে এসে আমার কাছে কনফেস করেছে!"

তুষার বললেন "ওকে। ফোনটা দাও ওকে"।

অবন্তী বললেন " জাস্ট হোল্ড"।

কয়েক সেকেন্ড পরেই রেহানের গলা ভেসে এল "ইয়েস স্যার"।

" এটা তুমি কী করলে রেহান?"

"মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল স্যার। নিজের বাড়িতেই এই নোংরামোটা দেখে জাস্ট নিতে পারি নি। বারবার মনে হচ্ছিল ওরা এত সাহস পায় কী করে?"

"হু। বুঝেছি। কিন্তু এটা তো এক্সপেক্টেডই ছিল। তোমার মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত ছিল। ছেলেগুলো কোথাকার? সবাই এলাকার?"

"যে দুজন স্পট হয়েছে এলাকার নয়। এখনও আইডেন্টিফাই করা যায় নি"!

" দ্যাটস আ গুড সাইন। তোমার মাকে আপাতত অন্য কোথাও নিয়ে যাও। তুমিও বাড়ি ফিরো না আজ।"

"কেন স্যার? নিজের বাড়ি নিজেই ফিরতে পারব না? এ কেমন কথা?"

"যা বলছি সেটা শোন। ইটস অ্যান অর্ডার"।

" ওকে স্যার"

"ফোনটা অবন্তীকে দাও"।

" ওকে স্যার"!

অবন্তী ফোন ধরলেন "হু, বল"!

" অবন্তী, এলাকার হাল কেমন?"

"যা হয়, রাস্তায় নেমেছে লোকজন। যে ক'টা লোক আমাদের ফরে ছিল, ঘটনাটার পরে প্রোটেস্ট করছে"!

" স্বাভাবিক। এক্সপেক্টেড। শোন অবন্তী, রেহান আমাদের খুব ইম্পরট্যান্ট একজন অফিসার"।

"জানি তো। এটাও বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছ"।

" থ্যাংক ইউ!"

"হিউম্যান রাইটস এন্ড মিডিয়া..."

"কাশ্মীরে ইস্যুর অভাব নেই অবন্তী, দরকার হলে ইস্যু ক্রিয়েট কর। ওদের নজর ঘোরাও"।

" আই আন্ডারস্ট্যান্ড। তুমি চিন্তা কোর না, রেহানকে আমি সামলে নিচ্ছি"।

ফোনটা কাটলেন তুষার। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন।

ফোনটা আবার বাজছিল তার। রাখী আগরওয়াল। তুষার ধরলেন না প্রথমটা। আবার বাজতে শুরু করল ফোনটা। তুষার কয়েক সেকেন্ড বিরক্ত মুখে ফোনের দিকে তাকিয়ে ফোনটা ধরলেন "ইয়েস"!

" স্যার, কাশ্মীরে..."

"আমি একটা মিটিং এ আছি ম্যাম। পরে ফোন করি?"

" স্যার স্যার, জাস্ট কনফার্ম করার জন্য ফোন করছিলাম"!

"কী?"

"আপনারা দুজন লস্কর টেরোরিস্টকে শ্যুট করেছেন আজকে?"

"নো কমেন্টস। মিটিং এ আছি।"

"স্যার প্লিজ স্যার!"

ফোনটা কেটে হেসে ফেললেন তুষার। কোনো নিউজ মিডিয়া কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়!

উঠলেন তুষার।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে মিটিং শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। ফোন আবার বাজছিল। আবার মিডিয়া। তুষার ফোনটা কেটে দিলেন।

গাড়িতে উঠতেই গাড়ি স্টার্ট দিল। মোবাইলের নোটপ্যাডে আগে থেকে লিখে রাখা পয়েন্টগুলো ঝালিয়ে নিলেন।

কাশ্মীর যেমন দেশের মাথার ওপরে, সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনাও কোন কিছু নিয়ে ভাবতে হলে অনিবার্যভাবেই কাশ্মীর চলে আসবে।

আধঘন্টার মধ্যে মিনিস্টারের চেম্বারে প্রবেশ করলেন তিনি। তাকে দেখে মন্ত্রী গম্ভীর মুখে বললেন "খবরটা পেয়েছেন?"

তুষার আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বললেন "কোন ব্যাপারে স্যার?"

মন্ত্রী বললেন "কাশ্মীরে, উইদাউট এনি অর্ডার ফায়ারিং হয়েছে। হিউম্যান রাইটস, পাকিস্তানি মিডিয়া আমাদের ছিড়ে খাচ্ছে"।

তুষার বললেন "এক কাজ করি স্যার আমরা। কাশ্মীর থেকে আর্মি তুলে নি। কী বলেন?"

মন্ত্রী কয়েক সেকেন্ড তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি কি আমার সাথে ইয়ার্কি করছেন?"

তুষার হাসলেন "একেবারেই না স্যার। তবে মিডিয়া আর মানবাধিকার মাথায় রাখলে সবার আগে মনে হয় সেটাই করা উচিত"।

মন্ত্রী বললেন " হু। আর কোন রিসেন্ট থ্রেট ডিটেক্ট করতে পেরেছেন?"

তুষার বললেন "অনুপ্রবেশ বন্ধ করার ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিসিশন নেওয়া হোক। থ্রেট ব্যাপারটাই কমে যাবে"।

মন্ত্রী তুষারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন "ইউ আর ইম্পসিবল রঙ্গনাথন। চলুন, পি এম সাহেব ডাকছেন"!
তুষার উঠলেন।

৭।

মিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়েছিল। বাড়ির আবহাওয়া থমথমে হয়ে আছে। বাবা, কাকা কেউই অফিস যায় নি। কাকা কাকিমাকে নিয়ে একটু বেরিয়েছে। অন্যান্যদিন মিনি চুপ করে শুয়ে থাকলে মা এসে বকে ঝকে যেত, এ ক'দিন সব কিছুই চেঞ্জ হয়ে গেছে।

বাবা, কাকা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি জ্যেঠুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন কী না। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো থেকে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বাড়ির ওপরে ছদ্মবেশে গোয়েন্দারা এবং নিরাপত্তারক্ষীরা নজর রাখছেন তবু বাড়ির সবার মধ্যেই একটা চাপা শঙ্কা কাজ করছে।

দরজায় কেউ একজন নক করল। মিনি গলা তুলে বলল "কে?"

মা বাইরে থেকে বলল "দরজা খোল"।

মিনি উঠে দরজা খুলল।

অনিন্দিতা বললেন "দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছিস কেন?"

মিনি বলল "এমনি। ভাল লাগছিল না"।

অনিন্দিতা ঘরে ঢুকে মিনির খাটের ওপর বসে বললেন "দেখ, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি"।

মিনি বলল "কী?"

অনিন্দিতা বললেন "এভাবে তো চলতে পারে না। সবাই সব সময় আতঙ্কের মধ্যে, লজ্জার মধ্যে এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তুই কলেজে যা আজ থেকে"।

মিনি বলল "বাবা-ই তো আমাকে কলেজে যেতে বারণ করেছিল"।

অনিন্দিতা বললেন "জানি তো। কিন্তু তুই বাড়িতে থাকলে, মানে এই পরিবেশে থাকলে ব্যাপারটা তোর জন্য মোটেও ভাল হচ্ছে না। আমি বুঝতে পারছি, আমরা নিজেরাও জানি না আমাদের এই মুহূর্তে ঠিক কী করণীয়, কিন্তু আমার মনে হয়, আপাতত তুই কলেজে যা। তারপরে যা হবে, দেখা যাবে"।

মিনি মাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকল কয়েক মিনিট। বলল "তোমার মনে আছে মা, আমি যখন ড্রয়িং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হতাম, জ্যেঠু আমার জন্য কত কত গিফট নিয়ে আসত? আবার কত বইও পড়াত?"

অনিন্দিতা বললেন "মনে আছে"।

মিনি বলল "আর আমরা জানতেও পারলাম না, জ্যেঠুর নাকি একটা ছেলেও আছে! ভাবতে পারছ বল তো?"

অনিন্দিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "কোন কিছুই কি আর ভাবতে পারার মত ঘটেছে, তুই বল? একটা লোক কীভাবে, এরকম বছরের পর বছর সব কিছু এত স্বাভাবিকভাবে জনসমাজে ঘুরে বেড়াল, আমাদের বাড়িতে থাকল, এর থেকে বড় রহস্য আর কী হতে পারে? একে তো অসম্ভব বললেও কম বলা হবে"।

মিনি বলল "আচ্ছা মা, জ্যেঠু তার মানে দাউদ ইব্রাহিম বা লাদেনের মতই একটা লোক?"

অনিন্দিতা শিউরে উঠে বললেন "বলিস না, বলিস না, এসব কথা বলিস না। ভাবলেই আমার কেমন একটা লাগছে। আমাদের ভাগ্য ভাল এখনও সব কিছু মিডিয়াতে আসে নি। সব কিছু লোক জানাজানি হলে কী হতে পারে ভাবলেই আমার কেমন কেমন করছে"।

কলিং বেল বাজল।

অনিন্দিতা বললেন "দেখি কে এসেছে"।

মিনি বলল "তুমি বস, আমি দেখছি"।

মিনি উঠে দরজা খুলল। দেখল বীরেন দাঁড়িয়ে আছে। বলল "আপনি?"

বীরেন বলল "আমাকে তুষার স্যার আজকে এই বাড়িতে আসতে বলেছেন"।

মিনি দরজা ছেড়ে দাঁড়াল "ভেতরে আসুন"।

বীরেন খানিকটা ইতস্তত করে ঘরের ভিতরে ঢুকল। মিনি বীরেনকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বলল "মা সেই লোকটা এসেছে, যাকে জ্যেঠু..."

অনিন্দিতা অবাক হয়ে বললেন "সেকী? কেন?"

মিনি বলল "ওঁকে নাকি তুষার স্যার আসতে বলেছেন"।

অনিন্দিতা বিরক্ত মুখে বললেন "সত্যি, কী যে শুরু হয়েছে, আমাদের বাড়িটা ঘিরে যে কত অচেনা অজানা লোক আসবে কে জানে। সেরকম বুঝলে তোকে নিয়ে ক'দিন আমার বাপের বাড়ি চলে যাব"।

মিনি হাসল "এই তো বললে সব কিছু স্বাভাবিক করতে, কলেজ যেতে, আবার বলছ বাপের বাড়ি চলে যাবে? তোমার কি মাথা ঠিক নেই?"

অনিন্দিতা বললেন "তাই হবে। মাথা কি আর কাজ করে? আচ্ছা, আমি গিয়ে দেখি ছেলেটা কী বলছে। তোর বাবাকেও ডাকি"।

অনিন্দিতা উঠে পাশের ঘরে গেলেন। সোমেন কাগজ পড়ছিলেন। অনিন্দিতাকে দেখে বললেন "কেউ এল নাকি?"

অনিন্দিতা বললেন "সেই ছেলেটা যাকে দাদা কী সব ক্যারিয়র না কী হিসেবে ইউজ করেছিলেন, সে এসেছে। তুষারবাবু নাকি এখানে আসতে বলেছেন একে"।

সোমেন অবাক হয়ে বললেন "সে আবার কী? চল তো দেখি"।

সোমেন উঠলেন। অনিন্দিতাও সোমেনের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তাদের দেখে বীরেন উঠে দাঁড়াল।

সোমেন বললেন "কী ব্যাপার ভাই? ঠিক কী কারণে এসেছেন জানতে পারি?"

বীরেন তুষারের চিঠিটা জেরক্স করে এনেছিল। সোমেনের দিকে এগিয়ে দিল।

সোমেন চিঠিটা পড়ে বললেন "ওহ। ঠিক আছে। আপনি কিছু খেয়ে এসেছেন?"

বীরেন কিছু বলার আগেই আবার কলিং বেলে বেজে উঠল। অনিন্দিতা দরজা খুলে দেখলেন খান এবং মাথুর দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে খান বললেন "সরি ম্যাডাম, একটু ডিস্টার্ব করতে এলাম। বীরেন এসে গেছে?"

অনিন্দিতা বললেন "হ্যাঁ, আসুন"।

মাথুর এবং খানকে নিয়ে অনিন্দিতা ড্রয়িং রুমে এলেন। বীরেন দুজনকে দেখেই দাঁড়াল।

খান হাসিমুখে বললেন "এই তো, দ্যাট ব্রেভ বেঙ্গলি বয়। আচ্ছা আপনাদের বাড়ির টাইগ্রেসটিকে তো দেখতে পারছি না! একটু ডাকবেন?"

অনিন্দিতা সোমেনের দিকে তাকালেন। সোমেন বললেন "কেন বলুন তো?"

খান বললেন "আহা ডাকুনই না"।

সোমেন মিনিকে ডাকলেন। মিনি জড়োসড়ো হয়ে ড্রয়িং রুমে এল। খান একটা বড় খাম মিনির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "পড়ুন ম্যাডাম, কী লেখা"।

মিনি দেখল একটা খাম। খানিকটা অবাক হয়ে সে মার দিকে তাকাল।

অনিন্দিতা বললেন "খোল না"।

মিনি খামটা খুলল। দেখল চিঠি লিখে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার সাহসিকতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

খান বললেন "তুষার স্যার নিজেই আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটা জরুরি মিটিঙে আটকে গেলেন"।

মিনির চোখে জল চলে এসেছিল নিজের অজান্তেই।

খান বললেন “কাঁদবেন না ম্যাডাম, আপনি যেটা করেছেন নিজের দেশকে বাঁচাতে, যে উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আমরা সবাই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ”।

সোমেন বললেন “আর কৃতজ্ঞ! আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন কি? কীভাবে আমরা জীবন কাটাচ্ছি। সারাক্ষণ ভয় লাগছে এই বোধ হয় লোকে দেখিয়ে দেয়, এই দেখ টেরোরিস্টের বাড়ি”।

খান সোফায় বসে পড়লেন “একটু চা দিতে পারেন ম্যাম”।

অনিন্দিতা বললেন “নিশ্চয়ই”।

অনিন্দিতা বীরেনের দিকে তাকালেন “আপনি চা খাবেন?”

বীরেন মাথা নাড়ল “না, আমি চা খাই না”।

অনিন্দিতা রান্নাঘরে গেলেন। মাথুর খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে ইতস্তত করে সোমেনকে বললেন “জ্যোতির্ময়বাবুর ঘরটা আমরা আরেকবার সার্চ করে দেখতে চাই। আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো?”

সোমেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন “কীসের আপত্তি আর। দেখুন। কী আর বলব”।

খান বীরেনের দিকে তাকালেন “বীরেন, মাথুরের সঙ্গে ঘর তল্লাশিতে যাও। তোমাকে অবশ্য তুষার স্যার এখানে আসতে বলেছিলেন কারণ এখানে উনি এয়ারপোর্ট থেকেই সরাসরি আসতেন। তোমার কাজ অন্যত্র। আপাতত তোমাকে আজকেই আমার সঙ্গে শ্রীনগর যেতে হবে। আপত্তি নেই তো?”

বীরেন খানের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল “নাহ। নেই”।

খান হাত বাড়ালেন “ওয়েলকাম টু আওয়ার গ্যাং”।

বীরেন হাত বাড়িয়ে বলল “আমি কিন্তু কোন জামাকাপড় আনি নি”।

৮।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল সায়কের। বৃষ্টি থেমেছে।

অশক্ত শরীরে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। চারিদিকটা সবুজে সবুজ হয়ে আছে। কাশ্মীর কিছুক্ষণের জন্য হলেও সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে। সে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল।

“এখন কি একটু ভাল লাগছে বেটা?” ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন।

সায়ক বলল “হ্যাঁ। আচ্ছা আমাকে বলতে পারবেন এখান থেকে মুজফফরাবাদ কতদূর?”

ভদ্রলোক বললেন “অন্তত ঘন্টা দুয়েকের রাস্তা। কিন্তু তুমি এখন ভুলেও ওদিকে যেও না”।

সায়ক বলল “কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে একদিন। কতদিন থাকবে এখানে?”

ভদ্রলোক তার খাটে এসে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন “আমাদের ছেলে নাফিস তোমারই বয়সী ছিল বেটা। মাঝে মাঝে কাজের নাম করে কোথায় যেন চলে যেত। যখন আসত হাতে অনেকগুলো টাকা। একদিন আর ফিরল না। পরে জানতে পারলাম, ওদের দলে ভিড়েছিল। ইন্ডিয়া বর্ডারে ঢুকতে গিয়ে গুলি খেয়ে...”

সায়ক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন “এখানকার বেশিরভাগ বাড়ির ছেলেদেরই কি ওরা এভাবে নিয়ে যায়?”

ভদ্রলোক বললেন “হ্যাঁ। এখানে ওরা ছেলেদেরকে নিয়ে গিয়ে টিভিতে দেখায় গুজরাটে, কাশ্মীরে কীভাবে মুসলিমদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। ওদের ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে উস্কানো হয়। কাম কাজ নেই, শুধু ছেলেগুলোকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর নামে গুণাহ করিয়ে যাচ্ছে বেটা”।

সায়ক ভদ্রলোকের বিচারবুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে বলল “আপনি আমায় অবাক করলেন। সবাই এতটা তলিয়ে ভাবে না। এমনকী ইন্ডিয়াতেও আপনার মত লোক কমে আসছে”।

ভদ্রলোক বললেন “ওদের রাজনীতিটাই যে টিকবে না কাশ্মীর না থাকলে। ইন্ডিয়া পাকিস্তান সর্বত্র এক দৃশ্য। রাস্তা নেই, কাজ নেই, শুধু জিহাদ। জিহাদে যে পেট ভরে না সেটা এদের কে বোঝাবে বল?”

সায়ক একটু উশখুশ করে বলল "আমাকে কিছু না কিছু করে ইন্ডিয়ায় একটা কনট্যাক্ট করতেই হবে। কিছুই কি করা যায় না এখন?"

ভদ্রলোক করুণ চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন "আর কিছুদিন কি অপেক্ষা করতে পারবে না? তুমি এই শরীর নিয়ে কী করবে বলত? মুজফফরাবাদে ওরা তোমাকে দেখলে আর বাঁচিয়ে রাখবে না এইবারে।"

সায়কের চোয়াল শক্ত হল "না। আমাকে যেতে হবেই। মুজফফরাবাদে না হোক, ইসলামাবাদে গেলেও হবে"।

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন "বেশ। আমি ব্যবস্থা করে দেব। আমাদের গ্রাম থেকে একটা ভেড়ার ট্রাক ইসলামাবাদ যাবে আজ। তোমাকে খড়ের মধ্যে লুকিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তুমি কি এই শরীর নিয়ে এত ধকল সহ্য করতে পারবে?"

সায়ক বলল "আমাকে পারতেই হবে। যে করেই হোক, আমাকে যেতেই হবে"।

ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে বসে রইলেন।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা এলেন। ভদ্রলোক বললেন "ও আজ চলে যাবে"।

ভদ্রমহিলা শূন্য চোখে তার দিকে তাকিয়ে তার কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন "তোমাকে একদম আমার ছেলের মত দেখতে জানো"।

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। ভদ্রলোক বললেন "এই দুনিয়া তৈরী হয়েছিল মানুষ থাকার জন্য। মানুষই আজ দুনিয়াটাকে জাহান্নাম করে ফেলল। তোমাকে দেখে কেন জানি না মনে হয় তুমি কারও ক্ষতি করতে পারবে না। তোমার চোখের মধ্যে সেই সততাটা আমি দেখতে পাই বেটা। তুমি অন্য ধর্মের হতে পারো, অন্য দেশের হতে পারো, কিন্তু তুমি আল্লাহর খাস বান্দা। আমি বুঝতে পারি।"

সায়কের মনে হল ছোটবেলায় তার যখন জ্বর হত মা সারারাত জেগে বসে থাকত। তথাকথিত শত্রু দেশের এই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য দিন রাত এক করে খেটেছেন। লুকিয়ে রেখেছেন। কূটনীতি, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের রাজনীতি, একে কুপিয়ে মারা, তাকে পুড়িয়ে মারার সময়ের মধ্যেও কেউ কেউ এখনও আছেন যারা সব কিছুর পরেও পৃথিবীতে মানুষ হিসেবেই বেঁচে আছেন। নোয়ার নৌকার কথা মনে পড়ে গেল তার। প্রলয়ের সময়ে যখন সবাই ভেসে যাবে, তখন হয়ত এরকম কিছু মানুষই বেঁচে থাকবেন নতুন পৃথিবী গড়বার জন্য।

কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নুয়ে এল।

৯।

"সিটবেল্ট বেঁধে নাও" ; খান বললেন।

বীরেন খানের কথা শুনল। খান বললেন "তোমার ফোবিয়াটাইপ কিছু হয়েছে? এ দুদিনে হাইজ্যাকিঙের স্বপ্ন ক'বার দেখেছ?"

বীরেন হাসল "যতবার ঘুমিয়েছি, ততবারই মনে হয়"।

খান বললেন "আমার একটা ফোবিয়া ছিল। প্লেনে উঠলেই আমার মনে হত প্লেন ক্র্যাশ করবে"।

মাথুর জানলার ধারে বসেছিলেন। বললেন "অলুক্ষুণে কথা শুরু হয়ে গেল তোমার?"

খান হাসলেন "আমার ভয় কেটে গেছে সেটাই তো বলছি"।

মাথুর বললেন "তোমার ভয় কেটে গেছে বলে লোক জনকে তুমি ভয় খাইয়ে যাবে, এটাই বা কেমন ভদ্রতা হে?"

খান বললেন "তা বটে। তোমার আবার কবে থেকে এই ফোবিয়া হল?"

মাথুর বললেন “বরাবর। আমার এসবে চিরকালই অ্যালার্জি। একটা এত বড় জিনিস আকাশে উঠে পুরো উপরওয়ালার ভরসায় চলে, ভাবলেই কেমন যেন লাগে”।

খান বললেন “উপরওয়ালা কেন হবে? টেকনোলজি এখন অনেক উন্নত”।

মাথুর বললেন “বাকোয়াস। জিনিসটা যখন ভেঙে পড়ে কারও বাবার ক্ষমতা আছে কিছু করার? হ্যাঁ, বলতে পারো, প্রোবাবিলিটি কমেছে। কিন্তু সিস্টেম ফেইলিওর হবার পর সেটাকে প্রিভেন্ট করার সিস্টেম যদ্দিন না তৈরী হচ্ছে ততদিন আমার আর নাস্তিক হওয়া হল না ভাই”।

খান হাসতে লাগলেন। বীরেনের সবটাই স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। সে বলল “স্যার একটা প্রশ্ন ছিল”।

খান বললেন “করে ফেলো”।

বীরেন বলল “আমার কোন ট্রেনিং টাইপ কিছু হবে না”?

খান গলা নামিয়ে বললেন “দ্য কান্ট্রি ইজ ইন আ ওয়ার সিচুয়েশন বীরেন। পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হলে তোমার জন্য অন্য প্ল্যান ভেবে রেখেছি আমরা”।

বীরেন অবাক হয়ে বলল “বুঝলাম না স্যার। ওয়ার সিচুয়েশন মানে?”

খান বললেন “দেখবে একটু পরে যখন প্লেনটা আকাশ ছোঁবে তখন কখনও এয়ার পকেটে পড়লে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। এটা একটা সিগন্যাল যে দেখো ভাই, আমরা এখন সঙ্কটে আছি, সাবধানে বেল্ট ইত্যাদি পরে থাকো। খানিকক্ষণ পরে আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমাদের ডিফেন্স সিস্টেমটা অনেকটা এরকম। ডিফেন্সে অনেকবারই আমাদের সিচুয়েশন আসে যখন আমাদের কাছে সিগন্যাল চলে আসে, আমরা সেই মতন ব্যবস্থাও নি কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গোটা দেশের মানুষ জানতেও পারে না ঠিক কী সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে দেশ যাচ্ছে। তারা কে এফ সি যায়, ম্যাকডোনাল্ড যায়, আমেরিকা, জাপানের জিডিপি নিয়ে বড় বড় বাতেলা মারে, কারণ তারা জানেই না, কখনও কখনও এরকম সিচুয়েশনও এসেছিল, যে টেবিলে বসে তারা আমেরিকা জাপান করছিল, আমাদের ইন্টেলিজেন্স কাজ না করলে হয়ত ওই টেবিল শুদ্ধ সবটাই উড়ে যেত। তাদের অস্তিত্বটাই থাকত না। এই মুহূর্তে আমরা অনেকটা সেরকম সিচুয়েশনে আছি বলতে পারো”।

নাক ডাকার শব্দে বীরেন চমকে পাশে ফিরে দেখল মাথুর ঘুমিয়ে পড়েছেন। খান হেসে বললেন “মাথুরের মত হও বুঝলে? এটাই তোমার ট্রেনিঙের প্রথম টিপস। যে কোন সময়, যে কোন পরিস্থিতিতে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে”।

মাথুর নাক ডাকা থামিয়ে বললেন “আমি কিন্তু সব শুনতে পারছি”।

খান বললেন “আবার অ্যালার্টও থাকবে”।

মাথুর এবং খান দুজনেই হেসে ফেললেন। বীরেনও হাসল।

এয়ারবাস নড়ে উঠল।

খান বললেন “এই দেখো মাথুর, পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম এয়ার ক্র্যাশ কিন্তু টেক অফের সময়েই হয়েছিল”।

মাথুর বললেন “আমি তোমায় খুন করে ফেলব আশরফ। জাস্ট শাট ইউর ফাকিং মাউথ”।

খান বললেন “ঠিক টেক অফ হবার সময় ধর ইঞ্জিন অফ হয়ে গেল”।

মাথুর বললেন “তুমি থামবে?”

বীরেনের মজা লাগছিল। এত সিনিয়র দুজন অফিসার এরকম খুনসুটিতে মেতে আছেন ভাবতেই পারছিল না সে। প্লেন ঠিকঠাক টেক অফ করল। মাথুর বললেন “নাও, শান্তি”।

খান বললেন “তোমার আর কী। তুমি তো দিল্লি গিয়ে ঘুমোবে। আমাকে আবার শ্রীনগর যেতে হবে”।

মাথুর বললেন “যাবে। কাবাব খাবে ভালো তো”।

খান বললেন “ভালই বটে। ওদিকে আরেক কান্ড হয়ে বসে আছে ওখানে”।

মাথুর বললেন “কী?”

খান চারদিকে তাকিয়ে বললেন “রেহানের ব্যাপারটা”।

মাথুর মাথা নাড়লেন “ছেলেটা পেগলে গেছে”।

খান বললেন “পেগলে যায় নি রে ভাই... থাক, এ ব্যাপারে পরে কথা বলব”।

মাথুর বললেন “সেই ভাল”। বলেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার।

খান বললেন “নাও। এই ভাল আছে, সত্যি”।

১০।

রাত বারোটায় যখন সায়ক তাদের থেকে বিদায় নিল, ভদ্রমহিলা সায়কের হাতে একটা তাবিজ বেঁধে দিয়ে বললেন “পরম করুণাময় আল্লাহ তোমায় রক্ষা করবেন বেটা। কোনদিন যদি সম্ভব হয়, তুমি এসো আমাদের গরীব খানায়। জানি হয়ত কোনদিন আর দেখা হবে না তোমার সঙ্গে, কিন্তু যেখানেই থেকো ভালো থেকো”।

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। সায়ক নতজানু হয়ে প্রণাম করল দুজনকেই। দুজনেই অশ্রুসজল চোখে তাকে বিদায় দিলেন। ভদ্রলোক বললেন “ড্রাইভার ইস্তিয়াক আমার ছেলের বন্ধু ছিল। ও আল্লামা ইকবাল কলোনিতে ভেড়া নিয়ে যাবে। ওখানেই তোমাকে নামিয়ে দেবে। তারপরে তুমি কী করবে বেটা?”

সায়ক বলল “আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। খুদা হাফেজ”।

ভদ্রলোক তাকে জড়িয়ে ধরলেন “খুদা হাফেজ”।

ইস্তিয়াক বলল “ভাইজান আপনি আমার পাশে বসুন। আপনাকে খড়ের গাদায় যেতে হবে না। এই নিন, এই টুপিটা পরুন”। ইস্তিয়াক তাকে একটা ফেজ টুপি দিল।

ভদ্রলোক বললেন “তুই পারবি তো নিয়ে যেতে?”

ইস্তিয়াক হাসল “চাচাজান আপনি একটা কাজ দিয়েছেন আমি পারব না, তা কি হয়? আপনি একদম চিন্তা করবেন না”।

সায়ক ইস্তিয়াকের ট্রাকে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল। সুদৃশ্য ট্রাক। অনেকরকম কারুকার্য করা। পাকিস্তানের ট্রাকওয়ালারা তাদের ট্রাকে অনেকরকম জিনিস দিয়ে সাজিয়ে রাখেন। সায়ক বসতে ইস্তিয়াক গাড়ি স্টার্ট দিল।

ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে বিদায় জানাল সায়ক। জানলার লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখতে পেল ভদ্রমহিলা অঝোরে কাঁদছিলেন, ভদ্রলোক ওঁর স্ত্রীকে সামলাচ্ছিলেন।

ইস্তিয়াক বলল “মিয়াঁ আপনার বাড়ি কোথায়?”

সায়ক বলল “করাচী”।

ইস্তিয়াক বলল “আমি কোনদিন করাচী যাই নি। শুনেছি ভারি নোংরা শহর?”

সায়ক বলল “তা বটে। কাশ্মীরের থেকে সুন্দর জায়গা আর কী আছে বল?”

ইস্তিয়াক বলল “হ্যাঁ। আমি শুনেছি ইন্ডিয়ান কাশ্মীরের থেকেও নাকি পাকিস্তানি কাশ্মীর বেশি সুন্দর। আমরা তো ওদের থেকে আসল জায়গাটাই নিয়ে নিয়েছি মিয়াঁ কী বল? মুজফফরাবাদের লেকের মত জায়গা আর আছে নাকি ইন্ডিয়াতে?”

সায়ক জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, “তা বটে”।

ইস্তিয়াক বলল “তোমার কী হয়েছিল?”

সায়ক বলল “খুব শরীর খারাপ হয়েছিল চাচাজানের বাড়ি এসে। কোনমতে বেঁচে ফিরছি বলতে পারো”।

ইস্তিয়াক বলল “তা পুলিশ তোমায় খুঁজছে বলল যে চাচাজান? কী কেস করেছ হ্যাঁ? মেয়েছেলে?”

সায়ক ইঙ্গিতপূর্ণ হাসল।

ইস্তিয়াক বলল “মিয়াঁ তো খতরনাক আদমি আছো! তোমাকে কিনা পুলিশে খুঁজছে! করেছ কি মিয়াঁ?”

সায়ক বুঝল ইস্তিয়াক বকবক করতে ভালোবাসে। সে বলল "শরীর তো ভাল নেই মিয়াঁ, একটু চোখ বন্ধ করব?"

ইস্তিয়াক বলল "জেগে থাকো মিয়াঁ, পাহাড়ী রাস্তায় আল্লার ভরসায় গাড়ি চালাতে হয়, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমিও ঘুমিয়ে পড়ব। জানোই তো চোখ বন্ধ হয়ে গেলে সব গেল। আচ্ছা দাঁড়াও"।

ইস্তিয়াক গাড়ি দাঁড় করাল রাস্তার পাশে।

সায়ক অবাক হল "কী হল?"

ইস্তিয়াক বলল "দাঁড়াও তোমায় সাজিয়ে দি"।

ইস্তিয়াক সায়কের চোখে মোটা করে সুরমা দিল। সায়ককে পাঠানের মত পোশাক পরিয়েই দিয়েছিলেন ওঁরা। ইস্তিয়াক বলল "টুপিটা পরে নাও মিয়াঁ। আর চিন্তা নেই। তোমাকে এক্কেবারে অন্যরকম লাগবে। সামনে একটা চেকপোস্ট আসছে। কোন কথা বলবে না। পাকিস্তানের পুলিশ তো, টাকা নেবে, আমি দিয়ে দেব। চিন্ত নেই কোন"।

সায়ক বলল "ঠিক আছে"।

ইস্তিয়াক গাড়ি স্টার্ট দিল আবার। খানিকক্ষণ পরেই চেক পোস্ট এল। ইস্তিয়াক জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নোট ছুড়ে দিতেই গেট খুলে দিল পুলিশ। সায়ক মনে মনে হাসল। জানলার খেলায় ভারত পাকিস্তান ভাই ভাই। বাকি রাস্তায় আরও দুটো চেক পোস্ট এভাবেই পার হল।

ইসলামাবাদে ঢোকার মুখের চেক পোস্টে অবশ্য পুলিশ গাড়িতে ঢুকে ভাল করে তল্লাশি করে তারপরেই শহরে ঢুকতে দিল। ইস্তিয়াক বলল "দেখলে মিয়াঁ, তোমাকে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখলে হয়ে যেত অবস্থা খারাপ"।

সায়ক হাসল "শুক্রিয়া"।

ইস্তিয়াক বলল "শুক্রিয়ার কথা বোল না মিয়াঁ, খান চাচা আমাদের সব কিছু, উনি বলেছেন আমি শুনতে বাধ্য। তুমি এবার কোথায় যাবে? বাস স্ট্যান্ডে যাবে না স্টেশনে?"

সায়ক বলল "তুমি আল্লামা ইকবাল কলোনিতে যাবে?"

ইস্তিয়াক বলল "হ্যাঁ। ওখানের কসাইখানায় ভেড়া দিয়ে আমি ফিরে যাব"।

সায়ক বলল "তাহলে শহরের মেইন বাস স্টপে নামিয়ে দিয়ে চলে যাও"।

ইস্তিয়াক বলল "তাই হোক। এখন ভোর ভোর আছে, গাড়ি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে না। দুপুরের দিকে আসলে আর দেখতে হত না, বাসস্ট্যান্ডে যাওয়া বেরিয়ে যেত"।

সায়ক কিছু বলল না। খানিকক্ষণ পরে ইস্তিয়াক তাকে বাস স্ট্যান্ডে নামিয়ে চলে গেল।

সায়কের পথশ্রমে ক্লান্ত লাগছিল। ভোরবেলাতেও বাসস্ট্যান্ডে অনেক লোক ঘোরাফেরা করছে। ফজরের আজান শুরু হয়ে গেছে।

সায়ক বাস স্ট্যান্ডে যাত্রীদের বসার জায়গায় ক্লান্ত শরীরে খানিকক্ষণ বসল।

তারপরে উঠে একটা ফোন বুথে এসে একটা লোকাল মোবাইল নাম্বারে ফোন করল। প্রথমবারে কেউ ফোন ধরল না। সায়ক আবার ফোন করল। এবারে রিং হতেই ঘুম জড়ানো গলায় কেউ বলল "কউন কমবখত মেরা নিন্দ হারাম কর রহা হায়?"

সায়ক একটু থেমে বলল "মেরা কুছ সামান তুমহারে পাস পড়া হ্যায়, ইজাজত"।

ওপাশে খানিক নীরবতা। তারপরেই গলার স্বরে পরিবর্তন এল "কাহাঁ হ্যায় আপ আল্লাহ কে বান্দা?"

১১।

তুষার ঘুমোচ্ছিলেন।

রাত দেড়টা অবধি ডিফেন্স কাউন্সিলের মিটিং ছিল। বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি আলোচনা করতে করতে যে অত রাত হয়ে যাবে কেউ বোঝেন নি। বাড়ি ফিরে শুতে শুতে তিনটে বেজেছিল। সবে ঘুমটা জাঁকিয়ে এসেছে তুষারের ফোনটা বেজে উঠল।

তুষার বিরক্ত মুখে ফোনটা তুললেন "হ্যালো"।

"এক এয়সী লড়কী থি, জিসে মে প্যার করতা থা, দিলওয়ালে।"

ওপাশ থেকে পরিচিত গলাটা ভেসে এল।

তুষার উঠে বসলেন বিছানায়, "তুমি?"

"জিন্দা হ্যায় স্যার"।

তুষার উত্তেজিত গলায় বললেন "কোথায় তুমি এখন?"

"ইসলামাবাদে। এখন আর ডিটেলসে কিছু বলতে পারছি না স্যার। পরে কন্ট্যাক্ট করছি"।

ফোনটা কেটে গেল। তুষার প্রবল উত্তেজিত অবস্থায় কিছুক্ষন খাটে বসে থেকে খাট থেকে নামলেন।

স্ত্রী ইরাবতী রান্না করছিলেন। তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন "কী ব্যাপার এখনই উঠে গেলে? এরপর তো দেখছি হাজারটা রোগ বাঁধিয়ে বসবে"।

তুষার হাসতে হাসতে বললেন "আরে যা খবর পেলাম সকাল সকাল তাতে যে ক'টা রোগ ছিল সেগুলোও সেরে যাবে ইরা। তুমি আমাকে ভাল করে এক মাগ কফি বানিয়ে দাও দেখি"।

ইরাবতী বললেন "তুমি বেরোবার প্ল্যান করছ নিশ্চয়ই সকাল সকাল?"

তুষার বললেন "সে তো নিশ্চয়ই। দেরী কোর না প্লিজ। ব্রেকফাস্ট এসে করব"।

ইরাবতী গরম জল বসালেন। তুষার তৈরী হয়ে নিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ডাইনিং টেবিলে এসে বসে বললেন "রেডি?"

ইরাবতী বললেন "জাস্ট আরেকটু। কী ব্যাপার বল তো? এত খুশি তো তোমাকে অনেকদিন দেখিনি"।

তুষার বললেন "একজন খুব কাছের শিষ্য, ভেবেছিলাম মরে গেছে। জাস্ট খবর পেলাম হি ইজ অ্যালাইভ"।

ইরাবতী বললেন "সায়ক?"

তুষার হাসলেন "বুঝে গেলে?"

ইরাবতী বললেন "তোমার কাছের শিষ্য! আর কে হতে পারে? খান আর মাথুর তো বহাল তবিয়তেই আছে। তাই বাকি ক্যালকুলেশনটা করতে কতক্ষণ আর লাগে বল?"

তুষার বললেন "বাহ বাহ। মনে হচ্ছে তোমাকেও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে নিতে হবে"।

ইরাবতী কফি মাগ টেবিলে রেখে বললেন "মেয়েরা যে কোন অংশে কম নয়, আশা করি সকাল সকাল সে বিষয়ে জ্ঞান দিতে হবে না আমাকে"।

তুষার কফি মাগটা ইরাবতীর উদ্দেশ্যে তুলে ধরে বললেন "তোমরা আমাদের থেকে মাইলস অ্যাহেড। নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। বাই দ্য ওয়ে, তোমার আজ কলেজ আছে?"

ইরাবতী বললেন "হ্যাঁ। আজ আমাকে যেতেই হবে"।

তুষার বললেন "ম্যাডাম সাহিবা, আজ আমি ভাবছি আপনার সঙ্গে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করব। কেমন হয়?"

ইরাবতী হাসলেন "বুঝতেই পারছি আজ তুমি খুব খুশি। ওকে, তাই হোক। তবে গতবারের মত আমাকে বসিয়ে রেখে শেষে ফোন করে বোল না যেন আসতে পারবে না"।

তুষার বললেন "একেবারেই না, মিলিয়ে নিও। আজ আমি অবশ্যই আসব"।

ইরাবতী বললেন "দেখা যাক। বাই দ্য ওয়ে, সায়ক এখন কোথায়?"

তুষার বললেন "ইসলামাবাদে"।

ইরাবতী চোখ বড় বড় করে তুষারের দিকে তাকালেন। তুষার বললেন "ব্যাপারটা একটু রিস্কি, তবে ও যে বেঁচে আছে এটাই অনেক"।

ইরাবতী বললেন "তোমার বিশ্বাস ও এখনও বেঁচে থাকবে? আই মিন ইসলামাবাদে থেকেও?"

তুষার কফি মাগে চুমুক দিয়ে বললেন "ইয়েস ম্যাম। ও ইসলামাবাদে ছিল না, আমাদের কাছে খবর ছিল মুজফফরাবাদেই ওকে মার্ডার করা হয়। কীভাবে বাঁচল... মির‍্যাকল"!

তুষার কাঁধ ঝাঁকালেন।

ইরাবতী বললেন "তুমি শিওর তো সায়কই? ওর গলা নকল করে আর কেউ করতে পারে"।

তুষার মাথা নাড়লেন "কোড ম্যাচ করেছে ইরা। আর কেউ নয়"।

ইরা শ্বাস ছাড়লেন "গুড গড। নাও?"

তুষার বললেন "ইসলামাবাদে আমাদের দুটো ঘাটি আছে। জানি না ওর হেলথ কন্ডিশন ঠিক কী আছে এখন। আশা করছি আজকে দুপুরের মধ্যে ও আবার আমাকে ফোন করবে"।

ইরা বললেন "দেন? ওকে ফিরিয়ে আনবে তো এদেশে?"

তুষার ইরার দিকে তাকালেন "নো ওয়ে। স্টিল মাইলস টু গো বিফোর উই স্লিপ ইরা। আমি এলাম"।

তুষার উঠলেন।

১২।

সকাল ন'টা।

গাড়ি চলেছে শ্রীনগর ছেড়ে। বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিকক্ষণ আগে। এখন হচ্ছে না। তবে আকাশের মুখ ভার হয়ে আছে।

খান বললেন "আগেরবার তুমি অনন্তনাগে গিয়েছিলে না?"

বীরেন মাথা নাড়ল "হ্যাঁ"।

খান বললেন "এই মুহূর্তে গোটা কাশ্মীরটাই আগ্নেয়গিরি হয়ে আছে। অনন্তনাগে সেটার মাত্রা আরেকটু বেশি"।

বীরেন বলল "আমরা কি অনন্তনাগে যাচ্ছি?"

খান বললেন "নাহ। আমরা আপাতত সোনমার্গ ক্যাম্পে যাচ্ছি। একদিন থেকে পরের দিন কার্গিল রওনা দেব"।

বীরেন বলল "কার্গিল?"

খান হাসলেন "হ্যাঁ, সেই কার্গিল। তবে ভয়ের কিছু নেই আর, ওখানে এখন শান্তিই শান্তি"।

বীরেন বলল "আমি ঠিক কী কারণে যাচ্ছি জানতে পারি কি?"

খান বললেন "হ্যাঁ। তোমার ট্রেনিঙের প্রাথমিক ধাপ কার্গিল থেকেই শুরু হবে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আর্মির মত কাজ করে না। তোমাকে এই দুটোর ডিফারেন্স বুঝতে হবে। আমাদের কাজ অনেকটাই গোপনে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচয় লুকিয়ে করতে হয়"।

খানের ফোন বাজছিল। খান বললেন "এক মিনিট"।

বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রোদ, ঝড়, জলের মধ্যেই আর্মিরা অতন্দ্র পাহারায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন একটু পর পরই।

কাশ্মীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে এটা দেখে সাহস বাড়ার কথা না ভয় পাওয়া উচিত বুঝতে পারল না বীরেন। চারদিকে দেখলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেমন একটা ত্রস্ত ভাব।

খান ফোনটা রেখে বললেন "সেনাদের দেখছ?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ"।

খান বললেন "খুব একটা ভাল চাকরি না, তাই না? এর মধ্যেই কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে বেশ কয়েকজন মারাও গেছেন। এই সৌন্দর্যের মধ্যে যে কত কাঁটা গোপনে লুকিয়ে আছে তা যারা এখানে না থেকেছে তারা বলতে পারবে না"।

বীরেন বলল "এই সব জায়গাই কি খুব টেনশনের জায়গা?"

খান বললেন "তাছাড়া আর কী? শুধু তো পাকিস্তানের সঙ্গেই না, আমাদের এখন গোটা রাজ্যের সঙ্গেই লড়াইটা লড়তে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, খুব কম সংখ্যক কাশ্মীরি এখন আমাদের হয়ে কথা বলছেন"।

বীরেন কিছু বলল না।

খান বললেন "চল চা খাওয়া যাক"।

খান ড্রাইভারকে একটা দোকানে দাঁড়াতে বললেন।

রাস্তার পাশেই বড় দোকান। খান গাড়ি থেকে নেমে বললেন "তোমাকে একটা খবর দি। সুখবর অবশ্যই। সায়ক বেঁচে আছে"।

বীরেন অবাক হয়ে খানের দিকে তাকাল, "কখন জানা গেল?"

খান বললেন "এই তো স্যার ফোন করে খবর দিলেন। গাড়িতে বললাম না ড্রাইভার ছিল বলে। এসব কথা নিজের ছায়াকেও বলা যাবে না"।

বীরেন বলল "তাহলে আমাকে বলছেন কেন?"

খান বললেন "তুমি আমাদের একজন তাই। চল চা খেয়ে আবার রওনা হতে হবে"।

খান হাঁটা লাগালেন।

বীরেনের একটু গর্ব হল। যে স্বপ্ন সে সারাজীবন দেখে এসেছে তা এভাবে সত্যি হলে কার না ভালো লাগে?

খান চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এক চুমুক দিয়ে বললেন "তুমি একটা নতুন শহরে প্রথম গেলে প্রথমে কী কী দেখো?"

বীরেন বলল "আগে হোটেল দেখি। থাকতে হবে তো আগে"।

খান খুশি হলেন। বললেন "গুড। সায়ক এখন ঠিক কোথায় আছে জানো?"

বীরেন বলল "কোথায়?"

খান বললেন "ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে। ওখানে শহরের মধ্যেই আমাদের একটা ডেরা আছে। ছোট্ট একটা ঘরে। বাথরুম পর্যন্ত করতে গেলে অনেকটা হাঁটতে হয়। অথচ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে আছে ছেলেটা। চাকরি না করলেও হত এখন অবধি যা সেভিংস করে ফেলেছে। কী দরকার বল তো ওর চাকরি করে?"

বীরেন বলল "আপনি ইসলামাবাদ গেছেন?"

খান চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন "তিনবার। তিনবারই ওই ডেরায় আমাকে থাকতে হয়েছে"।

বীরেন অবাক হয়ে বলল "কবে গেছিলেন?"

খান বললেন "মাস ছয়েক আগেও। অদ্ভুত সুন্দর জায়গা ইসলামাবাদ। পৃথিবীর সুন্দরতম রাজধানীগুলোর মধ্যে একটা। রুলড বাই পৃথিবীর কিছু কাপুরুষতম লোকজন। তুমি জানো বীরেন, আফগানজাতটার একটা ভাল গুণ আছে। ওরা যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তাদের জন্য জীবন দিয়ে দেয়। আর এই পাকিস্তানিগুলো ঠিক ওদের উলটোটা। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, মুখে বন্ধুত্ব দেখালেও পিছনে ছুরি নিয়ে তৈরী থাকে"।

বীরেন বলল "বাহ, অনেক বাঙালির মতই আর কী"!

খান হো হো করে হেসে উঠলেন।

১৩।

ঘুপচি ঘরটায় ল্যাপটপ অন করল সায়ক। এখনও শরীরে যথেষ্ট শক্তি নেই। গা হাত পায় প্রচন্ড ব্যথা। আব্বাস চা বানিয়ে ঘরে ঢুকল।

সায়ক বলল "আপডেট দাও, যা যা নিউজ আছে সব একসঙ্গে"।

আব্বাস বলল "চা তো খাও মিয়াঁ। আপডেট তো আছেই"।

সায়ক আব্বাসের হাত থেকে কাপটা নিয়ে চুমুক দিল। আব্বাসের হাতে জাদু আছে। অনেকদিন পর বাড়ির কথা মনে পড়িয়ে দিল।

বলল "ওহ, কতদিন পর"।

আব্বাস বলল "হু। তা বটে। তার আগে বল তোমাকে জবাই করার খবরটা রটল কী করে?"

সায়ক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল "আফসানা সাইদ যে আসলে ওদের স্পাই সেটা আমি মুজফফরাবাদে শেষ মুহূর্তে জানতে পেরেছিলাম। তার আগে ওদের একজন হয়ে যেতেও আমার বেশিদিন লাগে নি। হাসান মাকসুদ ওদের না জানালে ওরা জানতেও পারত না। দ্যাট ম্যান ইজ এ জিনিয়াস। আমারই ব্যাড লাক, খবরটা কোনভাবে জানিয়ে দিতে পারলে হাইজ্যাকিংটা আটকানো যেত"।

আব্বাস বলল "তারপর?"

সায়ক বলল "জামাকাপড় খুলিয়ে ব্রিজ থেকে নীলমের জলে ঠান্ডার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। লস্করের এক মেজো মাপের লিডার আছে বখতিয়ার বলে। সে মালটার মাথার মধ্যে এসব উদ্ভট আইডিয়া খেলে। প্ল্যান ছিল জলের মধ্যে ফেলে গুলি করে মারবে। বেশ কয়েকটা গুলিও চালিয়েছিল। কার কৃপায় জানি না, একটাও লাগে নি। যতটা সম্ভব ডুব সাতার দিয়ে অনেকটা যেতে পেরেছিলাম। তারপর জ্ঞান হারাই। আর কিছু মনে নেই"।

আব্বাস বলল "আর কার কৃপায় হবে? উপরওয়ালারই হবে"।

সায়ক বলল "তা বটে। বেঁচে গেছি সেটাই সত্যি। না বাঁচলেই বা কী হত?"

আব্বাস জোরে হেসে ফেলে বলল "ও হো হো, আশিক, সাচ্চা আশিক। সত্যি করে বল তো মিয়াঁ, কোন মেয়ে তোমার দিল ভেঙে দিয়েছে?"

সায়ক চায়ে চুমুক দিয়ে বলল "তাহলে কী করবে? সেই মেয়েকে নিয়ে আসবে?"

আব্বাস বলল "তা কেন? তবে এত বেপরোয়া জীবন তোমার, পাকিস্তান গভর্নমেন্ট তোমার জন্য এক কোটি টাকা ইনাম ঘোষণা করে রেখেছে, তা সত্ত্বেও তুমি তাদের বুকের ওপরে বসেই অপারেশন চালাবার কথা ভাবছ, এত হিম্মত তো সাধারন ঘরের ছেলেদের থাকে না। হয় এক্কেবারে মাথা খারাপ, নইলে আশিক। দিলজালে টাইপ আশিক। ঠিক কিনা?"

সায়ক হাসল "ঠিক ঠিক। তা তুমিও মিয়াঁ কী টাইপের আশিক সেটা তো বল? নইলে হায়দ্রাবাদের বিরিয়ানি ছেড়ে ইসলামাবাদে পাকিস্তানি কাবাব খেতে চলে এসেছ কেন সেটাও তবে জানাও"।

আব্বাস হাসল "আশিক না। দিমাগ খারাপ আছে আমার"।

ঘরের বাইরে কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। আব্বাস সতর্ক হল। সায়ক ল্যাপটপটা লুকিয়ে ফেলল।

পরক্ষণেই স্বস্তি ফিরে এল।

রাঘব ভাটিয়া তাদের দেখে দরাজ গলায় বললেন "শুকিয়ে গেছিল নাকি সব?"

সায়ক করুণ মুখ করে বলল "তা বলতে পারেন ভাটিয়া সাব"।

রাঘব এসে সায়ককে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন "এখানে তোমার থাকা চলবে না বড়াল। ইসলামাবাদ ইজ নট সেফ ফর ইউ"।

সায়ক বলল "সে তো জানি কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কোথায় যাব আপনিই বলুন"।

রাঘব বললেন "ইন্ডিয়া ঘুরে এসো"।

সায়ক হাসল "খেপেছেন?"

রাঘবও বললেন "খেপি নি। তবে আমার মনে হয় পর পর তুমি লাকি নাও হতে পারো। ধরে নাও এবার ওদের গুলি মিস করল না"।

সায়ক বলল "কিংবা এও হতে পারে এটা আমার ভাল সময় চলছে। এই সময়ে কারও গুলি আমাকে টাচ করতে পারবে না। এই সময়েই সব কিছু করে যেতে হবে"।

রাঘব হো হো করে হেসে বললেন "তোমার সঙ্গে কথায় আমি পারব না সায়ক। আমি জানতাম"।

আব্বাস বলল "তাহলে খামোখা চেষ্টা করছেনই বা কেন?"

রাঘব বললেন "তুমি থামো তো ছোকরা। দুদিনের পাবলিক এসেছে আমাকে জ্ঞান দিতে। এদিকে মুঘলাই খাবার খেয়ে খেয়ে আমার পেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। কবে যে মায়ের হাতের খাবার খেতে পারব কে জানে"।

সায়ক বলল "তাহলে তো আপনারই এখন বাড়ি যাওয়া উচিত ভাটিয়া সাব। তা না করে আমাকে বলছেন কেন? কাবাবের দোকান দিয়ে পাঠান সেজে বসে আছেন, কতদিন আর এভাবে চলবে বলুন?"

রাঘব একটু হেসে সিরিয়াস হয়ে বললেন "একটা সিরিয়াস লিড আছে সায়ক। শুনবে?"

১৪।

"কেমন লাগছে জায়গাটা বীরেন?"

খান জিজ্ঞেস করলেন।

তাদের গাড়ি কাশ্মীরি গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। বীরেন কৌতূহলী হয়ে কাশ্মীরিদের দেখছিল। সর্বত্র একই চিত্র। একটা গ্রাম যেমন তেমনই আছে শুধু একটু পর পরই সশস্ত্র সেনা দাঁড়িয়ে আছে।

বীরেন বলল "খুব ভাল"।

খান বললেন "সাধে কি আর দুই দেশ মরছে কাশ্মীর নিয়ে"?

বীরেন বলল "এই প্রবলেমের কি কোন সলিউশন নেই?"

খান হাসলেন "ইচ্ছা হলে একদিনে সলিউশন বেরোয়। আর ইচ্ছা না থাকলে সারাজীবন মাথা খুঁড়ে মরলেও কিছুই বেরোয় না। সব থেকে সমস্যা সেসব কাশ্মীরিদের যারা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের জব করছে। যখনই কোথাও কোন সমস্যা হয়, আম কাশ্মীরিরা আর্মির থেকে লাথি ঝাটা খেয়ে আসে, সমস্ত রাগ পড়ে গিয়ে এদের ওপরে। রেহান যা করেছে তা আমি সবার সামনে স্বীকার না করলেও, ভেতরে ভেতরে আমিও জানি, একটা সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। নিজের কাছের লোকেদের মার খেতে দেখাও যায় না আবার নিজের ডিউটি ঠিক ঠাক পালন করলে যখন সবাই পিছনে লেগে যায়, সেটাও অসহ্য মনে হয়"।

গ্রাম পেরিয়ে তারা একটা খেতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। দু দিকে ঘন সবুজ ঘাস। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বীরেন বলল "আগের বারের আগে আমি কখনও কাশ্মীর আসি নি। আর এখন এমন অবস্থা পর পর দুবার এসে গেলাম"।

খান হাসলেন "আফসানা সাইদের কবরে ফুল দিয়ে এসো। ভদ্রমহিলা উপর থেকে তোমাকে দুয়া দেবেন"।

বীরেনও হেসে ফেলল।

খান বললেন "অ্যাকচুয়ালি সেভাবে দেখতে গেলে আমাদের দেশের এরকম দুয়েকটা আফসানা সাইদে কিছু যায় আসে না। আমরা তো আর ছোটখাট দেশ না। কত কত স্পাই লুকিয়ে আছে আমরা জানতেও

পারি না। সুতরাং দেড়শো কোটির দেশে বুঝতেই পারছ ইন্টেলিজেন্সের গোটা নেটওয়ার্কটা সিনক্রোনাইজ করে চালানোটা কত কঠিন। তুষার স্যারকে হাসতে হাসতে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম স্যার এত কাশ্মীর কাশ্মীর করে ঝামেলা করে পাকিস্তান, আমরা তো কাশ্মীরটাকে আলাদা দেশ করে দিতেই পারি। তুষার স্যার একটা কথাই বলেছিলেন, কাশ্মীর হচ্ছে আমাদের দেশের মাথা। মাথা মানে সম্মান। সেটাই না থাকলে আর সে দেশের কী পড়ে থাকল? কথাটা আমি কোন দিন ভুলব না। অবশ্য আরেকটা ব্যাপারও আছে। বাস্তবটা হল কাশ্মীর আজাদ হলে সেটা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামিক স্টেট হবে। আর জঙ্গিদের অবাধ যাতায়াত শুরু হবে। রেজিস্ট করতে হলে...”

খানের কথা শেষ হয় নি গাড়িটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল।

খান ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন “কী হল?”

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে ঠিক করতে শুরু করল।

খান এবং বীরেন দুজনেই গাড়ি থেকে নামলেন। খান ড্রাইভারকে এবার একটু ধমকেই জিজ্ঞেস করলেন “আরে কী হল বলবে তো?”

ড্রাইভার বলল “বুঝতে পারছি না স্যার। একটু টাইম দিন”।

খান অধৈর্য হলেন, “বোঝ। ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি সোনমার্গ পৌঁছে একটু বিশ্রাম করব”।

গাড়ি যেখানটা দাঁড়িয়েছে তার পাশে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি। দরজা নেই। বীরেন বলল “দেখে আসব বাড়িটার ভিতরে? এরকম রাস্তার মধ্যে বাড়ি, তাতে আবার লোক নেই, ইন্টারেস্টিং লাগছে”।

খান বললেন “যাও। এখন তো সময়ই সময়। আমি একটু হালকা হয়ে নি”।

খান রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

বীরেন বাড়িটার ভিতরে গেল। চারদিকে ক্ষেতের মধ্যে এ বাড়িটা এরকম একলা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বেশ অবাক লাগছিল তার। হয়ত বাড়িতে যিনি থাকতেন তিনি শহরে চলে গেছেন। বাড়ির ভেতরে তেমন কিছুই নেই। বোঝাই যাচ্ছে যাওয়ার আগে বাড়ির মালিক বাড়ি খালি করে চলে গেছিলেন। একটা কাঠের বেঞ্চ রাখা ছিল। বীরেন সেটায় গিয়ে বসল। সব কিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটছে যে সত্যি ঘটছে না স্বপ্ন দেখছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বীরেন ঠিক করল সোনমার্গে গিয়েই বাড়িতে ফোন করবে। বাবা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না সে চাকরি পেয়ে গেছে। বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়েছিলেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দেখে। আসার সময় মা, বোনের কান্নার দৃশ্যটা নস্টালজিক করে দিচ্ছিল তাকে। কাশ্মীরের কোন এক অজানা রাস্তার পাশে একটা পরিত্যক্ত বাড়ির ভেতরটা হঠাৎ করে তাকে অনেক পুরনো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। বীরেনের ইচ্ছা হচ্ছিল সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে।

সে মন খারাপ করে বসে ভাবছিল এখনই বাড়িতে ফোন করবে কি না এমন সময় বাইরে থেকে জোরে গুলির শব্দ ভেসে এল।

বীরেন দৌড়ে রাস্তায় নেমে দেখল একটা গাড়ি দ্রুত চলে যাচ্ছে, আর খান রাস্তায় পড়ে আছেন। চারদিক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। তাদের গাড়ির ড্রাইভার নেই।

১৫।

কুড়ি থেকে তিরিশ ফুট দূরে পড়ে আছেন আশরফ খান। বীরেন চারদিকে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। পরিবেশটা যেমন ছিল তেমনই আছে। দূরে পাহাড়, অপূর্ব নৈসর্গিক পরিবেশ। শুধু সব কিছুর ছন্দ কেটে দিচ্ছে খানের রক্তাক্ত শরীরটা।

দৌড়ে খানের কাছে গেল বীরেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক। বীরেন খানের নাকের কাছে আঙুল নিয়ে গেল। শ্বাস চলছে। জ্ঞান নেই।

পেটটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গুলিটা পেটে চলেছে।

সে দাঁড়িয়ে চ্যাচাল "কোই হ্যায়?"

কেউ কোথাও নেই। নিস্তব্ধ চারদিক। রাস্তায় আসার পথে প্রতিটা জায়গায় সেনা পোস্টিং দেখে এসেছে সে কিন্তু এখানে ধারে কাছে কেউ নেই।

বীরেন কোন মতে খানকে কাঁধে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে টানতে টানতে গাড়ির পেছনের সিটে নিয়ে এল। তার হাতে, জামাতেও অনেকটা রক্ত লেগে গেল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে তুষারকে ফোন করতে গিয়ে দেখল টাওয়ার নেই।

পেছনের দরজা বন্ধ করে বীরেন ড্রাইভারের সিটে বসল। গাড়িতে চাবি দেওয়াই আছে। মনে পড়ে গেল গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে একদিন শিখেই আর শেখা হয় নি তার। তবে স্টার্ট দেওয়া, আর গাড়ি চালাবার পদ্ধতি শিখেছিল সে। ঠাকুরকে ডেকে গাড়ির চাবি ঘোরাল বীরেন। ক্লাচ চেপে ফার্স্ট গিয়ারে দিল গাড়িকে। গাড়ি নড়ে উঠেই থেমে গেল। বুঝল স্টার্ট দিতে ভুল হচ্ছে। আবার চেষ্টা করল সে। একই ব্যাপার।

বীরেনের অধৈর্য লাগছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার খানকে দেখল সে। হঠাৎ করেই মনে হল কী হত যদি সে ওই বাড়িটায় না ঢুকত? এতক্ষণে তাকেও রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে হত। ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

চোখ বন্ধ করে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল সে। অনেক মনঃসংযোগ করে ঠিক সময়ে ক্লাচটা ছাড়ল সে। এবারে গাড়ি এগোল। বীরেন কোন দিকে না তাকিয়ে অ্যাক্সিলারেটরে পা দিল। গাড়ি গো গো করে এগোতে থাকল। সে গিয়ার চেঞ্জ করতে পারে না। ফার্স্ট গিয়ারেই যতটা সম্ভব গাড়িটাকে ছোটাতে শুরু করল। মিনিট দশেক বাদে রাস্তার ধারে এক জওয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বীরেন।

গাড়ি কোনমতে থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ল সে। রক্তাক্ত বীরেনকে দেখে জওয়ান রাইফেল বের করলেন। বীরেন দু হাত উপরে তুলে বলল "ডি আইবি, ডি আইবি"।

জওয়ান চেঁচালেন "কী হয়েছে?"

বীরেন হাত দিয়ে গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলল "অফিসার। গুলি খেয়েছেন"।

জওয়ান দৌড়ে গাড়ির কাছে এলেন। খানকে দেখে বললেন "কে উনি"?

বীরেন বলল "আশরফ খান। সিনিয়র অফিসার, ডি আই বি। আমরা সোনমার্গ ক্যাম্প যাচ্ছিলাম, সেখান থেকে কার্গিল। প্লিজ কিছু করুন"।

জওয়ান ওয়াকি টকি বের করলেন। খানের পালস পরীক্ষা করে বললেন "এখনও বেঁচে আছে। ওয়েট"। জলের বোতল বের করে খানের মাথায় মুখে জল ছিটালেন। খানের জ্ঞান ফিরল না।

ওয়াকি টকিতে জওয়ান কিছু একটা নির্দেশ দিলেন।

তার দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি কে? আপনি বেঁচে গেলেন কী করে? ওরা আপনাকে শ্যুট করেনি?"

বীরেন বলল "আমি রাস্তার পাশের একটা বাড়ি দেখে ওখানে ঢুকেছিলাম"। বীরেন হাফাচ্ছিল। জওয়ান ওয়াকি টকিতে জোরে জোরে কাউকে ধমক দিতে শুরু করলেন। তাকে বললেন "আপনি ঠিক আছেন?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ। ওরা আমাকে দেখে নি। ড্রাইভার ছিল গাড়ির। সে নেই"।

জওয়ান মাথা নাড়লেন। বললেন "থাকবেও না"।

একটা আর্মি ইন্সপেকশন গাড়ি এল বেশ জোরে চালিয়ে। গাড়ি থেকে সাত আটজন জওয়ান নামলেন। জওয়ান খানকে দেখালেন। সবাই মিলে খানকে তাদের গাড়িতে তুলে নিলেন।

জওয়ান বললেন "আপনি ওদের সঙ্গে চলে যান। ওঁকে মেডিকেল ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে"।

বীরেন গাড়িতে উঠে বসল।

তার মাথা কাজ করছিল না কোনভাবেই।

#

তুষার অফিসে মিটিঙে ছিলেন। ফোন বাজায় নাম্বারটা দেখে চিনলেন না প্রথমে। ঠিক এই দুপুরের দিকটায় দৌরাত্ম্য শুরু হয় টেলি কলারদের।

দ্বিতীয়বার বাজায় ঠিক করলেন গালাগালি দেবেন। বিরক্ত গলায় ধরলেন "কে বলছেন?"

ওপাশ থেকে বীরেনের গলা ভেসে এল "স্যার, স্যার"।

তুষার বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। মিটিং রুম থেকে বেরিয়ে বললেন "কে? বলছেন? নামটা বলুন।"

"স্যার আমি বীরেন বলছি। খান স্যারকে গুলি মারা হয়েছে"।

১৬।

কলেজে এসে মিনির মনে হচ্ছিল অনেকদিন পর কোন জেলখানা থেকে বেরিয়েছে। বাড়িতে সব সময় একটা চাপা টেনশন মাথায় পাহাড়ের মত চেপে বসেছিল।

কলেজ তার তুলনায় খোলা মাঠে হাওয়া খাওয়ার সমতুল্য। এমনকি সব থেকে কড়া স্যার এস ডিজির ক্লাসও মনে হচ্ছিল কত ভাল। সবক'টা ক্লাস করল সে। পাশের বন্ধুর সঙ্গে খাতায় কাটাকুটি খেলল, ক্যান্টিনে আড্ডা মারল, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল ভাল করে।

চারটে নাগাদ যখন কলেজ থেকে বেরোতে যাবে তখন দেখা হল মেহজাবিনের সঙ্গে। সে অবাক হয়ে বলল "কী রে, আজ কলেজে এসেছিলি তুই? ক্লাস করলি না যে?"

মেহজাবিন বলল "আমি কলেজ আসি নি রে আজ, নোটস নিতে এসেছিলাম। আমার এক দিদির বিয়ে, সেই নিয়েই ব্যস্ত আছি ক'দিন"।

মিনি বলল "বাহ, তাহলে তো তোরই বাজার রে এখন"।

মেহজাবিন বলল "হ্যাঁ, আমারই বাজার। যতসব! জানিস না তো কত কাজ করতে হচ্ছে এখন! বাদ দে, তোর খবর বল। শুনেছিলাম তুই কলেজে আসছিস না, আজ তো দেখে তোকে অবাকই হলাম"।

মিনি এক মুহূর্ত একটু থমকে বলল "হ্যাঁ, ওই একটু সমস্যা চলছিল আর কী!"

মেহজাবিন বলল "কী সমস্যা? শারীরিক?"

মিনি মাথা নাড়ল "না না, সেসব না"।

মেহজাবিনের মিনির মুখ দেখে একটু সন্দেহ হল। বলল "সত্যি করে বল তো, কী হয়েছিল? সেই লিফলেটটার পর থেকেই কিন্তু তুই কলেজে আসছিস না। কিছু হয় নি তো?"

মিনি হাসার চেষ্টা করল "আরে বাবা না না! তোকে বললাম তো কিছু হয় নি"।

মেহজাবিন ঠোঁট ওল্টাল "তাহলে ভাল। কী জানি বাপু, তোকে দেখেই আমার কেমন কেমন লাগছে"।

মিনি বলল "কী কেমন লাগছে"?

মেহজাবিন বলল "আছে আছে। ঠিক বলতে পারছি না। শোন, ফুচকা খাবি?"

মিনি ফুচকার নামে এক পায়ে খাড়া। দুই বন্ধুতে মিলে অনেক ফুচকা খেল। মিনির বেশ খুশি লাগছিল। মনে হচ্ছিল আজ কলেজে না এলে সে সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যেত।

ফুচকা খাওয়া হয়ে গেলে মেহজাবিন বলল "জানিস তো, আমার দাদা আবু ধাবি চলে যাচ্ছে"।

মিনি অবাক হল "কেন?"

মেহজাবিন বলল "একটা অয়েল কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। এদেশে চাকরির যা অবস্থা তা দেখে বাবাই এখন বলছে চলে যা। আমাদের সবার খুব মন খারাপ"।

মিনি বলল "ভালই তো হল, আবু ধাবি খুব দারুণ দেশ। তোর একটা ঘোরার জায়গা হল"।

মেহজাবিন বলল "আমার যেতে বয়েই গেছে। আমার এই দেশই ঠিক আছে। আরও ঠিকঠাকভাবে বলতে গেলে বলি, আমার আসলে কোলকাতা ছাড়া কোথাও যেতে ইচ্ছাই করে না"।

মিনি বলল "আমার তো উল্টোটা। আমার সব সময় মনে হয় যদি বেশ কয়েকটা দেশ ঘুরে আসতে পারতাম তাহলে কী ভালই না হত"।

মেহজাবিন মিনির থুতনি নেড়ে দিয়ে বলল "তা তো বলবিই। তাহলে একটা এন আর আই বর খোঁজ তবে!"

মিনি রেগে গেল "কেন? সব সময় বর বর করেন করব? নিজে চাকরি করব, নিজেই যাব"।

মেহজাবিন বলল "তাহলে তোকে সেই মিডল ইস্টেই জব খুঁজতে হবে। এখানে কে তোকে চাকরি দেবে?"

মিনি দুঃখী মুখ করে বলল "তা ঠিক। তবে মিডল ইস্টে গিয়ে মেয়েরা কি চাকরি করতে পারবে? আমার তো মনে হয় না"।

মেহজাবিন মাথা নাড়ল "তা করতে পারবি। সর্বক্ষণ হিজাব পরে থাকবি"।

মিনি বলল "কোন দরকার নেই বাপু। আমি এদেশেই ঠিক কিছু না কিছু একটা জুটিয়ে নেব তুই মিলিয়ে নিস"।

মেহজাবিন হাসল। বলল "তা তুই পারবি। তোর মধ্যে সে জিনিস আছে"।

দুজনে কথা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল।

হঠাৎই তাদের চমকে দিয়ে একটা স্করপিও গাড়ি তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। চোখের নিমেষে গাড়ি থেকে একজন নেমে এসে মিনির মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলল "গাড়িতে ওঠ"। মেহজাবিন বাধা দিতে গেল, লোকটা ওর মাথায় রিভলভারের বাট দিয়ে জোরে মারল। মেহজাবিন রাস্তাতে পড়ে গেল।

আশে পাশের লোক কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকগুলো মিনিকে ঠেলে গাড়িতে তুলল। দ্রুত বেগে গাড়িটা সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল।

১৭।

শ্রীনগর আর্মি হসপিটালের আই সি ইউর বাইরে গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন তুষার। আছেন অবন্তী, রেহান, মাথুর এবং বীরেন।

চপারে করে শ্রীনগরে নিয়ে আসা হয়েছে খানকে, অনেকটা রক্ত দিতে হয়েছে কিন্তু ডাক্তাররা কেউই এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারেন নি পেশেন্টকে বাঁচানো যাবে কি না। বাহাত্তর ঘন্টা না কাটলে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

অবন্তী বললেন "তুষার প্লিজ বোস, এত চিন্তা করলে কী করে হবে?"

তুষার বললেন "আমার মাথা কাজ করছে না অবন্তী। ওরা কীভাবে প্রিপারেশন নিয়েছিল বুঝতে পারছ? ঠিক যে জোনটায় আর্মি মুভমেন্ট কম ছিল, সেখানটায় ওরা গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে খানকে মেরে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবতেই পারছি না"।

রেহান বললেন "ড্রাইভার এখনও বাড়ি ফেরে নি স্যার। ইনফ্যাক্ট ওর বাড়িটাও তালাবন্ধ এখন"।

তুষার বললেন "ও আর ফিরবেও না। নির্ঘাত ট্র্যাপড হয়েছিল, কিংবা..."

মাথুর বললেন "নিজে থেকেই ওদের দলে যোগ দিয়েছিল"।

তুষার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেঞ্চে বসে বললেন "নাথিং ইজ ইম্পসিবল। থ্যাংক গড বীরেন ওখানে ছিল। ও না থাকলে কী হত ভাবতেই পারছি না"।

বীরেন জামা চেঞ্জ করেনি এখনও। জামায়, হাতে রক্ত লেগে আছে।

অবন্তী বললেন "বীরেন তুমি একটা কাজ কর, আমার ড্রাইভারকে আমি বলে দিচ্ছি, তুমি গেস্ট হাউসে গিয়ে চেঞ্জ করে নাও"।

বীরেন বলল "না স্যার, আমি ঠিক আছি"।

অবন্তী বীরেনের কাঁধে হাত রাখলেন "আমি বুঝতে পারছি বীরেন তুমি কতটা কনসার্নড এবং শকড। কিন্তু বিলিভ মি মাই বয়, দিস ইজ আওয়ার লাইফ। তোমাকে সুইচ অফ করতেই হবে নিজেকে, কালকের জন্য নিজেকে তৈরী রাখতেই হবে"।

তুষার বললেন "ছেড়ে দাও অবন্তী। বীরেন থাকতে চাইলে থাক"।

মাথুর একটু ইতস্তত করে বললেন "খানের স্ত্রীকে জানাই নি এখনও স্যার"।

তুষার হাত নাড়লেন "জানাবার দরকার নেই। খানের কিচ্ছু হবে না। আমি জানি"।

তুষারের কথায় একটা অদ্ভুত জোর ছিল।

বীরেন চোখ বন্ধ করল। এই কয়েক ঘন্টায় তার যেন বয়স বেড়ে গেল অনেকটাই। আর্মি ক্যাম্পের ডাক্তার হাল ছেড়েই দিয়েছিলেন। তুষার দিল্লি থেকে ফোন করে চপারের ব্যবস্থা করে খানকে শ্রীনগরে আনার ব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তার যদিও বলেছেন বেঁচে যাবার সম্ভাবনা ৪০-৬০, কারণ রক্তপাতের পরিমাণটা প্রচুর হয়েছে, তবু তুষার এখানে আসার পর থেকে একটা কথাই বলে যাচ্ছেন, খানের কিচ্ছু হবে না। হি ইজ এ ফাইটার।

অবন্তী বললেন "এটা কারা করছে তুষার? হাসান তো জেলে, ওদের মাস্টারমাইন্ড আফসানাকে মেরে ফেলা হল। তবে?"

রেহান হাসলেন "স্যার বলেছিলাম না, ব্যাপারটা ক্যান্সারের মত। শুধু একটা জায়গায় ব্যবস্থা নিলেই হবে না? ওদের নেটওয়ার্ক কতটা ছড়িয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না"।

অবন্তী গম্ভীর মুখে বললেন "সব থেকে ভয়ের কারণ ওরা আমাদের খবর পেয়ে যাচ্ছে। কোন জায়গা থেকে নিউজ লিক হচ্ছে"।

তুষার চোয়াল শক্ত করলেন "যদি খানের কিছু হয়, আই উইল কিল দ্যাট বাস্টার্ড হাসান মাকসুদ"।

অবন্তী বললেন "ও তো একটা দাবার ঘুঁটি। ধরে নাও গজ কিংবা ঘোড়া। রাণী কে? রাজা কে? সেটা তো অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিবল বের করতে হবে তুষার"।

তুষার বললেন "আমাদের লাইফলাইন একটাই এখন অবন্তী"।

অবন্তী বললেন "সায়ক?"

তুষার ম্লান হাসলেন "আহত এবং ভীষণভাবে ক্লান্ত"।

অবন্তী বললেন "বাঘ তো! বাঘ আহত হলে আরও খতরনাক হয়"।

তুষার বললেন "মিনিস্ট্রি থেকে চাপ আসছে। আমাদের পাকিস্তানের অপারেশনগুলো আরও গোপনে করতে হবে"।

অবন্তী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে থেকে বেশ জোরে বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল।

সবাই চমকে উঠলেন।

তুষার বললেন "নাও, এবার হসপিটালেও ডিস্টার্বেন্স শুরু করে দিয়েছে ওরা"।

অবন্তী উঠে দাঁড়ালেন "তোমরা এখানেই থাকো, আমি দেখছি"।

অবন্তী দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

তুষার রেহানের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন "রেহান আমরা কি যুদ্ধটা হেরে যাচ্ছি?"

রেহান বললেন "নেভার স্যার। পরিস্থিতি যাই হোক। আমরাই জিতব"।

তুষারের ফোন বাজছিল। তুষার দেখলেন অবন্তী ফোন করছেন। ধরলেন "বল"।

"হসপিটালের বাইরে একটা গাড়ি ভর্তি বিস্ফোরক ছিল। ব্লাস্ট হয়েছে"।

"হু। এবারে ক'জন?"

"বুঝতে পারছি না। তোমরা ওখানেই থাকো। আমি আরও ফোর্সের ব্যবস্থা করছি"।

তুষার ফোন রেখে বললেন "এভাবে হয় না। হয় না"।

১৮।

পেশোয়ার পেরিয়ে আফগান সীমান্ত ধরে এগিয়ে চলেছে একটি ল্যান্ড রোভার গাড়ি। গাড়ির মধ্যে বসে আছেন আই এস আই চিফ সরফরাজ খান। সরফরাজ খানকে দেখে একটুও চিন্তিত মনে হচ্ছে না। আই পডে বলিউডি গান শুনছেন। সামনে পিছনে দুটি জিপ চলছে। জিপে ভর্তি পাকিস্তানি সেনা।

পেশোয়ারকে উপর উপর শান্ত শহর মনে হলেও আদতে পেশোয়ার মোটেও শান্ত জায়গা নয়। মাঝে মাঝেই এখানে গুলি গোলা চলে। বেশ কয়েকটি পাঠান গোষ্ঠী আছে যারা কাউকে তোয়াক্কা করে না। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন অঞ্চল থেকে খুন খারাপির খবর চলেই আসে।

পিচ ঢালা রাস্তা ছেড়ে গাড়িগুলো নেমে গেল বালি ভর্তি রুক্ষ রাস্তায়। ঘন্টা খানেক চলার পরে একটা বিরাট দুর্গের মত বাড়ির দরজায় এসে গাড়িগুলো দাঁড়াল। একজন সিকিউরিটি নেমে সিংহ দরজায় গিয়ে হাঁক দিতে দরজা খুলে গেল। গাড়িগুলো বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাড়িটার গাড়ি বারান্দায় সরফরাজ খান দাঁড়াতে সামনের জিপ থেকে একজন নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল। সরফরাজ নেমে সটান বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলেন।

অপেক্ষা করছিল কয়েক জন খানসামা। সরফরাজ খান তাদের কাছে ইশারায় জানতে চাইলেন কোন ঘরে যেতে হবে। তারা দেখিয়ে দিল।

সরফরাজ খান তাদের দেখানো পথে দোতলায় উঠে একটা ছোট ঘরে ঢুকলেন। সুদৃশ্য সোফা। সামনে একটা বিরাট টিভি। সরফরাজ খান সোফায় বসে টিভি চালালেন। নিউজ দেখছিলেন, এমন সময় "আরে, সরফরাজ সাব, সালাম ওয়ালাইকুম", বলে ঘরে ঢুকলেন কাশেম সোলেমানি। আই এস আই এসের অন্যতম মাথা। আপাতত পাকিস্তান সরকারের গোপন ডেরায় রয়েছেন।

সরফরাজ খান উঠে দাঁড়িয়ে কাশেম সোলেমানিকে বললেন "ওয়ালাইকুম আসসালাম কাশেম সাব। এখানে কোন তকলিফ তো হচ্ছে না?"

কাশেম সোলেমানির বয়স পঁচিশ থেকে ছাব্বিশে মধ্যে। অপূর্ব সুন্দর দেহ সৌষ্ঠব। গাল ভর্তি দাড়ি। গোঁফটা কামানো। সরফরাজ খানকে বললেন "না, তকলিফের কিছু নেই। কিন্তু আজ তো আপনার একা আসার কথা ছিল না"।

সরফরাজ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন "নিয়াজি স্যার এই ইলেকশনের মধ্যে আসতে পারবেন না। তার জন্য উনি গভীরভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছেন"।

কাশেম কয়েক সেকেন্ড তীক্ষ্ণ চোখে সরফরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমেরিকাকে আপনারা এত ভয় পান কেন সরফরাজ সাব?"

সরফরাজ বললেন "আমেরিকাকে আমরা কেন ভয় পাব?"

কাশেম মাথা নাড়লেন "পান পান। আপনি স্বীকার করবেন না, আমরা জানি আপনারা পান। আপনারা জানলেনও না অথচ আমেরিকা আপনাদের বুকের ওপরে বসে লাদেনকে মেরে চলে গেল"।

সরফরাজ একটু গলা খাকড়িয়ে বললেন "আপনি তো জানেন ওদের নেটওয়ার্ক কতটা স্ট্রং। এমনকি আমাকেও অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয়েছে"।

কাশেম বললেন "ঝুঁকি নেবেন। নিতে হবে। এতে আবার বলার কী আছে। দেখুন মিয়াঁ, একটা কথা আমাদের এখন বুঝে নিতে হবে, এই দুনিয়া এখন দুটো ভাগ হয়ে গেছে। ক্লিয়ার দুটো ভাগ। একদিকে

আছে মুসলিম দুনিয়া, অন্যদিকে কাফেরদের। পাকিস্তানকে আমরা সব রকম সমর্থন দিতে রাজি আছি, কিন্তু তার জন্য পাকিস্তানকেও এক কদম এগিয়ে আসতে হবে। আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি?"

সরফরাজ বললেন "আমরা আপনাদের সঙ্গে খোলাখুলি সন্ধিতে যেতে পারব না এটা শুরুতেই বলে রাখা ভাল। এই মুহূর্তে চিনের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক ভাল নয়, কিন্তু আমাদের ভাল। কূটনৈতিকভাবে চিনকে আমরা কিছুতেই দূরে ঠেলে দিতে পারি না। একদিকে আমরা তো ইন্ডিয়াকে প্রেশারাইজ করেই আছি, কিন্তু চিনও আমাদের হেল্প করছে। তাছাড়া পাকিস্তান এখনও আমেরিকাকে রাগিয়ে দেওয়ার মত বিলাসিতা করতে পারে না বলেই আমি মনে করি"।

কাশেম কয়েক সেকেন্ড সরফরাজের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করলেন।

সরফরাজ অবাক গলায় বললেন "কিছু বলবেন?"

কাশেম বললেন "সরফরাজ সাব, আমরা কখনও এক জায়গায় বসে থাকবার জন্য জন্মাইনি। আমরা জন্মেছি এগিয়ে যাওয়ার জন্য। জেহাদ তখনই সফল হবে, যখন এই দুনিয়ার সব ক'টা দেশ শুধু আমাদের কথা শুনবে, আমাদের পায়ের তলায় থাকবে। আর আপনি পড়ে আছেন চিনকে নিয়ে"।

সরফরাজ বললেন "এসব কথা থাক। আসল কথায় আসি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, হিন্দুস্তানে কাশ্মীরের মানুষ কত অসহায় অবস্থায় আছে?"

কাশেম হাসলেন শব্দ করে। বললেন "যেমন একাত্তরের আগে ইস্ট পাকিস্তানে আপনারা বাঙালিদের রেখেছিলেন?"

সরফরাজ একটু থমকে বললেন "হু... মানে অনেকটা তাই বলতে পারেন"।

কাশেম বললেন "কাশ্মীরকে আজাদি দেওয়া আমাদের সবার পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। একজন সাচ্চা জিহাদী..."

দরজায় একজন অর্ধনগ্ন ইরানী মেয়ে এসে দাঁড়াল।

কাশেম উঠলেন "আপনি একটু বিশ্রাম করুন সরফরাজ সাব। আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে আসছি"।

কাশেম তড়িঘড়ি মেয়েটিকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সরফরাজ খান মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

১৯।

মিনি অজ্ঞান হয়ে ছিল। জ্ঞান ফিরতে দেখল একটা সুদৃশ্য বেডরুমে, খাটের ওপর সে ঘুমিয়ে আছে।

মাথা ঝিম ঝিম করছিল। একই সঙ্গে মাইগ্রেনের ব্যথাটা ফিরে এসেছিল। মাথায় প্রচন্ড ব্যথা।

সে কোন মতে উঠে খাট থেকে নামল। জানলার বাইরে গাড়ি চলাচলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। বেরিয়ে দেখল একটা বিরাট হলঘর। ওপেন কিচেন। একজন মহিলা রান্না করছেন। তাকে দেখেই বললেন "এস বেটি, বস"।

মিনি বলল "আমি কোথায়?"

মহিলাটি মিনির প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন "বস"।

মিনি একটা চেয়ার টেনে বসল। বলল "আমি বাড়ি যাব"।

মহিলাটি বললেন "যাবে তো। নিশ্চয়ই যাবে"।

মিনি বলল "এ জায়গাটা কোথায়?"

মহিলা বললেন "ভারতে না। তবে কাছেই। যশোরে"।

মিনি বলল "আমাকে কারা এখানে এনেছেন? কী কারণে? জানতে পারি?"

মহিলা বললেন “তুমি তো মাকসুদভাইয়ের ভাইঝি। তুমি আমাদের পর নাকি বেটি? তোমাকে সরাসরি আসতে বললে তো কোন দিন আসতে না। তাই আমার ছেলে নাজিব একটু জোর খাটিয়ে তোমাকে নিয়ে এসেছে”।

ভদ্রমহিলা অদ্ভুত শান্তভাবে কথা বলে যাচ্ছিলেন। যেন এসব হওয়ারই ছিল। একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মিনি বলল “আমি সবই বুঝতে পারছি, আপনারা জ্যেঠুকে চেনেন। কিন্তু এভাবে কেন?”

ভদ্রমহিলা এবার গ্যাসের সামনে থেকে এসে তার কাছে এলেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন “মাকসুদ সাহেব তোমায় খুব ভালবাসেন মিনি। নাজিবকেও। তিনি চাইতেন তোমার সঙ্গে নাজিবের নিকাহ হোক”।

মিনি অবাক গলায় বলল “মানে?”

ভদ্রমহিলা বললেন “সব কিছুই তো উপরওয়ালারই ঠিক করে রাখা বেটা। আমরা কী করতে পারি বল?”

মিনি উঠল, “আমি বাড়ি যাব। দরজা কোথায়?”

ভদ্রমহিলা কিচ্ছু বললেন না। মিনি অস্থির ভাবে ঘরটার দরজা খুঁজতে আরম্ভ করল। যে ক'টা দরজা খুলল সবই কোন না কোন ঘরের দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সদর দরজা খুঁজে পেল। ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখল বেশ কয়েকজন পুরুষ চেয়ারে বসে আছে। প্রত্যেকের চেহারাই গুন্ডার মত। সে ভয় পেয়ে ঘরের আবার ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

ভদ্রমহিলা বললেন “ভয় পাচ্ছ কেন মেয়ে? এ তো আমাদেরই মহল্লা। হাসান সাহেবকে এখানে সবাই খুব ভালোবাসে”।

টেবিলের ওপরে জলের বোতল রাখা ছিল। মিনি জলের বোতল নিয়ে অনেকটা জল খেয়ে নিল। তারপর ভদ্রমহিলাকে বলল “আমাকে যেতে দিন প্লিজ। আমার বাবা, মা সবাই চিন্তা করছে। আপনিও তো একজন মা, বুঝতেই পারছেন, মেয়ে বাড়িতে না থাকলে মা বাবার মনের মধ্যে কী চলতে পারে”।

ভদ্রমহিলা তার মাথায় আবার হাত বুলিয়ে বললেন “বোকা মেয়ে। এও তো তোমারই বাড়ি। তুমি জানো না, সবই পরমকরুণাময় উপরওয়ালা ঠিক করে রাখেন। আমাদের কাছে হাসান ভাই ঈশ্বরের চেয়ে একটুও কম না। তিনি চেয়েছিলেন নাজিবের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। এভাবেই তো আমরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠব। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। হাসানভাই তো তাই চাইতেন। তুমি জানো না, নাজিব ভীষণ ভাল ছেলে, খুব ভাল বাইক চালাতে পারে”।

মিনি রেগে গিয়ে বলল “এ আবার কী? আমি কেন আপনার ছেলেকে বিয়ে করতে যাব? চিনি না, জানি না, কাউকে একটা ধরে নিয়ে আসলেই হল?”

ভদ্রমহিলা বললেন “এই দেখো, বোকা মেয়ে। তোমাকে বললাম না বল, আমরা কি কেউ জানি, কার সঙ্গে উপরওয়ালা রিস্তা ঠিক করে রেখেছেন? দেখো না, তুমি কি আজ সকালেও জানতে পারতে, আজ রাতে তোমার বিয়ে হবে?”

মিনি চমকে তাকাল ভদ্রমহিলার দিকে। কয়েক মুহূর্ত বসে এবারে সে সটান দরজা খুলে রাস্তায় নামল। তাকে কেউ বাধা দিল না। অপরিচিত জায়গা। অনেকগুলো গলি। মিনি গলির ভেতর দিয়ে অনেকটা হাঁটল।

বেশ খানিকটা হাঁটার পরে সে বুঝতে পারল তার কেউ পিছু নিয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একজন লম্বা চওড়া পুরুষ। গালের কাছটা কাটা। মিনি জোরে চেঁচাল “বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও”।

কয়েক জন কৌতূহলী হয়ে তাকাল কিন্তু কেউ বিশেষ কান দিল না।

মিনি রাস্তার ওপর বসে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা এসে বললেন “চল বেটি, ঘরে চল, কাজি সাহেব কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন, আমাদের বেশিক্ষণ লাগে না। তিনবার কবুল বললেই হবে”।

মিনি নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

#

গভীর রাতে এক অপরিচিত ছেলের সঙ্গে মিনির বিয়ে হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল মাথাব্যথায় যে কোন সময় মাথাটা বিস্ফোরণে ফেটে যাবে। একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়ে তার বিয়ে হল।

২০।

আইসিইউর সামনের বেঞ্চেই শুয়েছিল বীরেন। আরেকটা বেঞ্চে মাথুর শুয়েছিলেন। অবন্তী তুষারকে জোর করে গেস্ট হাউজে পাঠিয়েছিলেন। রাত দেড়টা নাগাদ একজন নার্স এসে বীরেনকে ডাকলেন "স্যার, আশরফ খানের জ্ঞান ফিরেছে"।

বীরেন চমকে উঠে বসল। বেশ খানিকক্ষণ অবিশ্বাসীর মত নার্সের দিকে তাকিয়ে বলল "এখন দেখা করা যাবে?"

নার্স বললেন "না স্যার। তুষার স্যার আমাকে বলেছিলেন খান সাহেবের জ্ঞান ফিরলে আপনাকে বলতে। তাহলে আপনি ওঁকে খবরটা দিয়ে দেবেন"।

বীরেন বলল "আচ্ছা। আচ্ছা"।

সে ফোন বের করে তুষারের নম্বর ডায়াল করল। একবার রিঙেই ধরলেন তুষার "বল বীরেন"।

"স্যার, খান স্যারের জ্ঞান ফিরেছে"।

"গুড। তুমি গেস্ট হাউজে চলে এসো। ওখানে এনাফ সিকিউরিটি আছে। মাথুরও থাকবে। চিন্তা কোর না"।

"স্যার এখানে কোন প্রবলেম হচ্ছে না। মাথুর স্যার তো ঘুমাচ্ছেন"।

"আমি বলছি তো। তুমি চলে এসো। চেঞ্জ করে রেস্ট নাও। চলে এসো।"

"ওকে স্যার"।

ফোন রেখে বীরেন ধীর পায়ে হসপিটাল থেকে বেরোল। বাইরেটা যুদ্ধক্ষেত্রের মত বাঙ্কার করে জওয়ানেরা দাঁড়িয়ে আছেন। বীরেনের জন্য গাড়ি রাখা ছিল। বীরেন ড্রাইভারকে জাগিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

সে ভেবেছিল এত রাতে তুষার ঘুমিয়ে পড়বেন। গেস্ট হাউজে পৌছে দেখল ট্রাকশ্যুট পরিহিত তুষার চিন্তিত মুখে গেস্ট হাউজের লনে পায়চারি করছেন। খানিকক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। শীত শীত ভাব আছে একটা, যদি শীত এমন কিছু নেই। বীরেন বলল "স্যার আপনি ঘুমান নি?"

তুষার গম্ভীর গলায় বললেন "আর ঘুম। ওদিকে আরেক কান্ড ঘটেছে"।

বীরেন বলল "কোথায় স্যার?"

তুষার বললেন "হাসানের ভাইঝি কিডন্যাপড হয়েছে। কোন ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না"।

বীরেন হতভম্ব হয়ে তুষারের দিকে তাকাল।

তুষার বললেন "কালকেই আমাকে কোলকাতা যেতে হবে বীরেন। হাসানের সঙ্গে দেখা করতে হবে। খান সুস্থ হওয়া অবধি তুমি এখানেই থাকবে। রেহানের সঙ্গেও কন্ট্যাক্ট রেখো। বিশ্বস্ত ছেলে। যে কোন অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করবে"।

বীরেন বলল "আচ্ছা স্যার"।

তুষার বললেন "যাও, তুমি একটা স্নান সেরে ঘুমিয়ে পড়। আমার আর রাতে ঘুম হবে না"।

বীরেন ধীর পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগোল।

#

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর এক গোপন অন্ধকূপে শুয়ে ছিলেন জ্যোতির্ময়। একজন অফিসার এসে দরজা খুলতে জ্যোতির্ময়ের মুখে আলো পড়ল।

জ্যোতির্ময় বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে তারপর চোখ খুলে দেখলেন সোমেন এবং অনিন্দিতা এসেছেন। বাঁকা সুরে বললেন "এতদিন পরে তোদের আসার সময় হল?"

সোমেন উদ্বিগ্ন গলায় বললেন "দাদা, সব কৈফিয়ত দেব, কিন্তু শোন, গতকাল থেকে মিনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকজন ছেলে ওকে কাল রিভলভার ঠেকিয়ে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে..." সোমেনের গলা ধরে এল। অনিন্দিতা কাঁদছিলেন।

জ্যোতির্ময় ঠান্ডা গলায় বললেন "এতো ভবিতব্যই ছিল। এতে এত চিন্তা করার তো কিছু নেই"।

সোমেন উত্তেজিত মুখে বলল "তুই কিছু কর দাদা, প্লিজ, মিনি তো আমাদেরই বাড়ির মেয়ে বল। ও তো কোন দোষ করে নি বল?"

জ্যোতির্ময় হেসে দিলেন। বললেন "মিনি কিছু না করলে আমি কি এখানে থাকতাম সোমেন?"

সোমেন কিছু বলতে পারলেন না।

অনিন্দিতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন "প্লিজ দাদা। মেয়েটার জন্য কিছু করুন, প্লিজ"।

জ্যোতির্ময় বললেন "তোমাদের এখানে কোন খোঁচর পাঠিয়েছে?"

সোমেন বললেন "আমরা নিজেরাই আবেদন করে তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম দাদা"।

জ্যোতির্ময় ব্যঙ্গ করে বললেন "উফ!!! কত ভালোবাসা!"

অনিন্দিতা বললেন "কিছুই কি করা যায় না দাদা?"

জ্যোতির্ময় বললেন "ফোন এনেছ তোমরা?"

সোমেন বললেন "না। এখানে আসার আগে মোবাইল নিয়ে নিয়েছিল সিকিউরিটি"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ফোনটা চা। একটা নাম্বার বলছি। ফোন কর"।

সোমেন বললেন "আচ্ছা"।

সেলের বাইরে গেলেন সোমেন। বাইরে দাঁড়ানো নিরাপত্তারক্ষীকে বললেন "আমার ফোনটা দরকার"।

নিরাপত্তারক্ষী বললেন "উনি ফোন করতে চাইছেন?"

সোমেন বললেন "হ্যাঁ"।

নিরাপত্তারক্ষী তুষারকে ফোন করলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পরে সোমেনকে তার ফোনটা দিলেন।

সোমেন সেলের ভিতরে ঢুকে দেখলেন অনিন্দিতা কাকুতি মিনতি করছেন মেয়ের জন্য। জ্যোতির্ময় অন্য দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

সোমেন বললেন "বল, নাম্বারটা"।

জ্যোতির্ময় বললেন। সোমেন তাড়াতাড়ি ডায়াল করলেন সেই নাম্বারটা। আই এস ডি কল হচ্ছে দেখলেন।

একবার রিং হতেই কেউ একজন ধরল।

সোমেন বললেন "কথা বলুন"।

সোমেন ফোনটা জ্যোতির্ময়কে দিলেন। জ্যোতির্ময় কিছুক্ষণ কথা বলে সোমেনকে বললেন "মিনিকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। ভালোই থাকবে"।

সোমেন অবাক হয়ে বললেন "মানে? তুই জানিস এখন কোথায় মিনি?"

জ্যোতির্ময় বললেন "জানি। আমি কী মনে করি জানিস তো, এই জন্মেই মানুষের কৃতকর্মের ফল মানুষ ভুগে যায়"।

সোমেন অধৈর্য হয়ে বললেন "প্লিজ দাদা । বাড়ির মেয়েটাকে..."

জ্যোতির্ময় একটুও উত্তেজিত না হয়ে বললেন "মধ্যযুগে কীভাবে কনভারসান হত জানিস? এখন আমাদের হাতে সময় বড় অল্প। যা করার এভাবেই করতে হবে। নইলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে।

মনে রাখিস, যা হয় ভালোর জন্যই হয়, যা হবে ভালোর জন্যই হবে। আর হ্যাঁ, বাড়ি ফেরার আগে মিষ্টি কিনে বাড়ি যাস। তোর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে"।

সোমেন দাঁড়ানো ছিলেন। জ্যোতির্ময়ের শেষ কথাটা শুনে মেঝেতেই বসে পড়লেন।

২১।

ভোর পাঁচটা। এখনও সূর্যোদয় হয় নি।

একটা ছোট গাড়িতে বেরিয়েছে রাঘব, আব্বাস এবং সায়ক।

গন্তব্য ইসলামাবাদ অ্যাসেম্বলী অ্যাভিনিউ।

রাঘব গাড়ি চালাচ্ছেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "সায়ক, তোমার এই সুইসাইডাল মিশনের মধ্যে কেন যে নিজেকে জড়াতে গেলাম, তাই ভাবছি"।

আব্বাস ক্ষীণস্বরে বলল "যা বলেছেন। সায়কের মাথা খারাপ হয়ে গেছে"।

সায়ক বলল "রিভলভারগুলো একটাও টেস্ট করে দেখা হল না। চলে তো সব?"

রাঘব রাগী গলায় বললেন "জানি না"।

সায়ক হাসল "না, মানে যদি কাজ না হয় তাহলে তো অ্যাটলিস্ট নিজেদের মাথায় চালাতে হবে, তাই বলছি"।

রাঘব বললেন "মিশন ফেইল হলে তা ছাড়া তো কোন উপায় নেই"।

আব্বাস বলল "দোষটা আপনারই রাঘব স্যার। আপনাকে কে বলতে বলেছিল জামাল পাশা উইদাউট সিকিউরিটি মর্নিং ওয়াকে বেরোন? আপনি তো জানেন সায়ক কী ধরণের পাগল"!

রাঘব বললেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন তো সব দোষই আমার। সে তো বলবেই। আমারই তো সব দোষ। আর ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সে যে এরকম পাগল অফিসার রাখা হয়েছে তার কোন দায়িত্ব নেই"।

সায়ক রাঘবের কথার উত্তর না দিয়ে বলল "ইসলামাবাদ ইজ সাচ আ বিউটিফুল প্লেস আব্বাস। ভাবতেই কষ্ট হয় পৃথিবীর সব থেকে শয়তান লোকগুলো এখানে থাকে"।

রাঘব বললেন "ওয়েল, শয়তান শব্দটা রিলেটিভ শব্দ সায়ক। আমাদের দেশেও শয়তানের কমতি নেই। সেই লোকটার কথা মনে আছে তো যে এক মুসলিম শ্রমিককে মেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জান্তব উল্লাস করছিল? কিংবা সেই লোকগুলো, যারা বিফ খাচ্ছিল বলে একটা লোককে মেরেই ফেলল? এই ধরণের শয়তানগুলোরও কিন্তু সাপোর্টার কম নয়। আর এদের জন্যও পাকিস্তান এত সুবিধা পেয়ে যায় ইন্ডিয়ান মাইনরিটিদের প্রভোক করার"।

সায়ক মাথা নাড়ল "তা ঠিক। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি আমি মুসলিম সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে অন্য কোন ধর্মের সন্ত্রাসবাদকে উস্কানি দি, তার থেকে বোকামি আর কিছু হয় না"।

রাঘব বললেন "ইন্ডিয়া চালানো কি এতটাই সহজ রে ভাই? এতগুলো ধর্ম, জাতি, ভাষা। গোটাটাই সুতোর উপরে ব্যালান্স করে চালানোর মত ব্যাপার। এর মধ্যে কোন সুতোয় একটু বেশি টান পড়লেই আর দেখতে হবে না..."

সায়ক বলল "সমস্যা হল ইউ কান্ট কন্ট্রোল পলিটিশিয়ান্স স্যার। দে উইল ডু, হোয়াট দে ওয়ান্ট টু ডু। দে অলসো হ্যাভ প্রোপাগান্ডা। আমাদের মত দেশ, যারা একই সাথে এতগুলো থ্রেটের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে, সেখানে যদি এই ধরণের ক্যালাসনেস চলে তাহলে যা হবার তাই হচ্ছে। দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে টু ডিল উইথ মাইনরিটিস ইন আ কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া"।

আব্বাস বলল "মরার জন্য তো সেনারা আছেই স্যার। ভোটের সময় এরাই আমাদের লাশ নিয়ে বলবে দেখো বর্ডার পে হামারা সেনা খাড়া হ্যায়। যেন নিজেরা কত খাড়া হয়েছে। দিস পলিটিশিয়ান্স সাক"।

রাঘব বললেন “থ্যাঙ্ক গড কথাটা তুমি পাকিস্তানে বসেই বলছ, নইলে এই কথাটা বলার জন্য তোমাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হত”।

সবাই জোরে হেসে উঠল।

রাঘব সতর্ক গলায় বললেন “সায়ক, আমরা এসে গেছি”।

সায়ক ঘড়ি দেখল, “আপনি শিওর জামাল পাশা এই রাস্তা ধরে যায়?”

রাঘব বললেন “হান্ড্রেড পারসেন্ট। নাও টেল মি হোয়াট টু ডু”।

সায়ক আব্বাসের দিকে তাকাল “মাস্ক পরে নাও। ক্লোরোফর্ম রেডি কর”।

রাঘব বললেন “আবার নিজের মুখেই দিও না আব্বাস। তাহলে আর দেখতে হবে না”।

আব্বাস বলল “কী যে বলেন, প্লিজ হাসাবেন না”।

সায়ক বলল “গাড়িটা গাছটার তলায় দাঁড় করান রাঘব”।

রাঘব গাড়িটা পার্ক করলেন। ভোর হচ্ছে। সায়ক বলল “দুটো আর্মি চৌকিই এখান থেকে অনেকটা দূরে। দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস”।

রাঘব বললেন “গাড়ির মধ্যে করে জামাল পাশাকে নিয়ে যাওয়াটা একটু টেনশনের হবে”।

সায়ক বলল “কিচ্ছু হবে না। উই হ্যাভ টু টেক দ্য রিস্ক। নাও এভ্রিওয়ান কিপ কোয়ায়েট এন্ড ওয়েট”।

শ্বাসরুদ্ধ করে বসে থাকল ওরা তিনজন।

মিনিট দশেক পরেই জামাল পাশাকে আসতে দেখা গেল। ছোট খাট গোলগাল চেহারা। ট্রাক শ্যুট পরে জগিং করতে করতে আসছেন।

সায়ক বলল “নাও। আব্বাস, গেট রেডি। পাশা কাছে এলে আমি বললেই সবাই গাড়ি থেকে নামবে”।

জামাল নিকটবর্তী হচ্ছিলেন।

অতর্কিত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সায়করা।

ঠিক এই সময় দ্রুত গতিতে একটা গাড়ি থেকে চার পাঁচজন লোক জামাল পাশাকে পরপর গুলি করে চলে গেল।

রক্তাক্ত জামাল পাশা রাস্তায় পড়ে রইলেন।

সায়ক বলল “শিট! শিট! স্টার্ট দ্য কার। ক্যুইক!!!”

২২।

কলকাতা অফিসে ঢুকেই তুষার দেখতে পেলেন সোমেন এবং অনিন্দিতা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তুষারকে দেখে সোমেন উঠে দাঁড়ালেন।

তুষার মাথা নাড়লেন, “আপনাদের সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষা আমার নেই। আমি কী বলব কিছুই বুঝতে পারছি না”।

সোমেন বললেন “দাদা বলছে ওরা নাকি মিনির বিয়ে দিয়ে দিয়েছে”।

তুষার বিস্মিত হয়ে বললেন “সেকী!”

সোমেন বললেন “হ্যাঁ”।

তুষার বললেন “কোথায় আছে কিছু বলেছে?”

সোমেন মাথা নাড়লেন “না। তবে আমার ফোন থেকে একটা নাম্বারে ফোন করেছিল”।

তুষার বললেন “দেখি নাম্বারটা”।

সোমেন ফোনটা দিলেন।

তুষার তীক্ষ্ণ চোখে নাম্বারটা দেখে বললেন “+৮৮০? এ তো বাংলাদেশের নম্বর। এর মধ্যে বাংলাদেশে পাচার হয়ে গেছে?”

অনিন্দিতা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছিলেন। তুষারের কথা শুনে বললেন "যে লোকটা মেয়েটাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করল, সে কী করে ওর এত বড় সর্বনাশ করতে পারে বলতে পারেন?"

তুষার বললেন "পারে। করতে পারে। অরগানাইজড ব্রেইন ওয়াশ যে কত কিছু করতে পারে তার কোন ধারণা নেই আপনাদের। আমার মনে হয় হাইজ্যাকিং এর ঘটনার পিছনে আপনার মেয়ে আমাদের হেল্প করেছে জেনেই ওরা এই কান্ডটা করেছে। সব থেকে বড় ব্যাপার কী জানেন তো? আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না ওদের নেটওয়ার্কটা। কে কে আছে ওদের অরগানাইজেশনে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আপনাদের মেয়ের কিডন্যাপিংটা আমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ লিড হতে পারে"।

সোমেন তুষারের হাত ধরে বললেন "আমরা কিছুই বুঝি না স্যার, এই কিছুদিন আগেও আর পাঁচটা সাধারন ঘরের মানুষের সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য ছিল না বিশ্বাস করুন। আপনি যেভাবেই হোক, আমাদের মেয়েকে এনে দিন আমার কাছে"।

তুষার হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন না। সোমেনের হাতে চাপ দিয়ে বললেন "চিন্তা করবেন না। আপনারা বাড়ি যান। আমি দেখছি কী করা যায়। কোন ফোন এলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আমিও কোন আপডেট পেলে আপনাদের জানাব। আমি নাম্বারটা নোট করে নিচ্ছি। দেখছি কী করা যায়"।

সোমেন ক্লান্ত শরীরে অনিন্দিতার পাশে বসে পড়লেন।

তুষার হাঁটতে হাঁটতে অফিসের ভিতর ঢুকলেন। পীযূষ বসে ছিলেন। তুষার বললেন "একটা নাম্বার দিচ্ছি, ট্রেস কর। এদেশের না, বাংলাদেশের। দরকার হলে ঢাকায় রাসেলকে ফোন করে হেল্প নাও"।

পীযূষ বললেন "ওকে স্যার"।

তুষার নিজের ফোনটা বের করে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করলেন। একবার রিং হতেই ধরলেন মন্ত্রী "বল তুষার"।

"স্যার, ব্যাড নিউজ আছে"।

"আর নিউজ! কোনটা গুড নিউজ বলতে পারবে? একটাও তো ভাল নিউজ পাচ্ছি না। খানের কিছু হয় নি তো?"

"না স্যার। খানের জ্ঞান ফিরেছে"।

"এই তো ভাল নিউজ দিলে। ব্যাড নিউজটা কী?"

"স্যার, হাসান মাকসুদের ভাইঝিকে কিডন্যাপ করে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঢাকার মিনিস্ট্রির সঙ্গে আমাদের কন্ট্যাক্ট করতে হবে। ওদের হেল্প ছাড়া মেয়েটাকে উদ্ধার করা যাবে না"।

"এর মধ্যে আবার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ঢুকছে কেন? আমি নিজে ঢাকার মিনিস্ট্রিতে কন্ট্যাক্ট করে বলে দিচ্ছি, ওরা যা করার করুক"। মন্ত্রীর গলায় স্পষ্ট বিরক্তি।

"স্যার আপনি বুঝতে পারছেন না। কাশ্মীরে এদের অর্গানাইজেশন সিরিয়াল ব্লাস্ট করছে। ইন্ডিয়ার আর কোন শহরে ওদের কোন লিংক আছে নাকি তাও আমরা কিচ্ছু জানি না। আমরা ভেবেছিলাম হাইজ্যাকিঙের পরে ওদের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আদতে কিছুই শেষ হয় নি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই লিডটা কত ইম্পরট্যান্ট"।

ওপাশে খানিকটা নীরবতা। তারপর ভেসে এল "তুমি কী করতে চাইছ?"

"স্যার আমি চাইছি ওদের ট্র্যাক করে আমাদের এন এস জি ফোর্স দিয়ে বাংলাদেশে একটা অপারেশন করতে"।

"দিমাগ খারাব হো গয়্যা হে তুমহারা? কী বলছ বুঝতে পারছ?"

"স্যার, বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু দেশ। ওরা আমাদের প্রচুর হেল্প করেন। আমরা যদি পি এম লেভেলে ওদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কন্ট্যাক্ট করি, কাজ হয়ে যেতে পারে"।

"সরি তুষার। আমি এ ব্যাপারে তোমায় কোন হেল্প করতে পারব না"।

“স্যার প্লিজ স্যার। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা তো বাংলাদেশের জন্যও থ্রেটের ব্যাপার। এত ভয়ংকর সব টেরোরিস্ট...”

“আমি পরে ফোন করছি। মিটিং আছে একটা”।

ফোনটা কেটে দিলেন মন্ত্রী।

তুষার কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থাকলেন। তুষার পীযূষের ঘরে ঢুকে বললেন “কী হল? কোন আপডেট?”

পীযূষ অবাক গলায় বললেন “এত তাড়াতাড়ি স্যার?”

তুষার বললেন “রাসেলকে ফোন করেছ?”

পীযূষ বললেন “হ্যাঁ স্যার। জানাচ্ছে বলল”।

তুষার অধৈর্য গলায় বললেন “কী জানাচ্ছে! কতক্ষণ লাগে?”

পীযূষ বললেন “স্যার এক ঘন্টা তো দিন”।

তুষার চেয়ারে বসে পড়লেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন “স্কাউন্ড্রেলটার আবার মুখোমুখি হতে হবে ভেবেই বিরক্ত লাগছে আমার।”

২৩।

ঘর ভর্তি ফুলের গন্ধ।

মিনিকে একটা জবরজং শাড়ি পরিয়ে দিয়েছেন ভদ্রমহিলা। মিনির বমি পাচ্ছিল।

বাড়িতে খুব বেশি লোক নেই। তবে পাড়ার কয়েকজন মহিলা আছেন।

নাজিব যখন বাসর ঘরে ঢুকল তখন রাত দেড়টা। মিনি খাটের কোণে সিঁটিয়ে গেল।

নাজিব শেরওয়ানিটা খুলে ফেলল। স্যান্ডো গেঞ্জী পরে খাটে বসে বলল “উফ, আজকে কী গরম! কতটা রাস্তা এলাম বল! সেই কলকাতা থেকে যশোর”।

মিনি উত্তর দিল না।

নাজিব বলল “তোমার নতুন নামটা জানো তো?”

মিনি এরও উত্তর দিল না।

নাজিব বলল “আয়েশা বেগম। সুন্দর না?”

মিনি বলল “আমি বাড়ি যাব”।

নাজিব বলল “সে তো যাবেই। তবে এখন না। কয়েক দিন আমরা সংসার করি, আমাদের দু চারটে ছোট ছোট বেবি হোক। তারপর যাবে। হাসান চাচা তো বলেন, আমাদের কাজই হল যত বেশি সম্ভব বংশবৃদ্ধি করা। গোটা পৃথিবীটাতে আমাদের লোক জনে ভরে দিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব”।

মিনি বলল “আমার মাথা ধরেছে”।

নাজিব বলল “আমার পাশে এসে বস। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি”।

মিনির আরও সিঁটিয়ে গেল।

নাজিব খাটে উঠে মিনিকে জড়িয়ে ধরতে গেল।

মিনি তড়িঘড়ি খাট থেকে নেমে গেল।

নাজিব হাসল “একী! তুমি পালিয়ে যাচ্ছ কেন? জানো না, আজ থেকে আমরা এক দেহ এক প্রাণ?”

মিনি বলল “আমি চ্যাচাব”।

নাজিব বলল “সে তো চেঁচাবেই। চেঁচানো মানে তো ভাল। আম্মাও খুশি হবে তুমি চ্যাচালে। বুঝবে তুমি ভেজাল মাইয়া না। আজকাল তো চারদিকে ভেজাল মাইয়ায় ভরে গেছে। পর্দা বলে কিছু নাই”।

মিনি হতভম্ব হয়ে বলল “এ আপনি কী বলছেন?”

নাজিব বলল “আমি বলব না? আমিই তো বলব? আমি ছাড়া কে বলবে? আমি তোমার স্বামী না? শোন, তুমি তো হিন্দু, মানে হিন্দু ছিলে, অনেক কিছুই জানো না। তোমাকে অনেক কিছু শেখাবো। আমি শেখাবো, আম্মা শেখাবে, চাচা চাচী শেখাবে। আমাদের মেয়েদের সব থেকে বড় কথা কী জানো তো? লজ্জা হায়াত। হিজাব পরা অভ্যাস করবে। পর পুরুষের চোখের দিকে তাকাবে না। সব সময় মাটিতে চোখ থাকবে। মনে রাখবে জন্ম থেকেই মেয়ে মানুষরা ছেলেদের জন্য তৈরী হয়েছে। আমার আবার অত ওয়েস্টার্ন মেয়েছেলে পছন্দ না। তবে তুমি চাইলে ইনার গারমেন্ট ওয়েস্টার্ন ড্রেস এনে দিতে পারি। বাইরে কিন্তু ট্রাডিশনালই পরতে হবে। তুমি বুঝতে পারছ তো আমি কী বলতে চাইছি?”

মিনি দরজার ছিটকিনি খুলে ঘরের বাইরে গেল। বেশ কয়েকজন মহিলা গল্প করছিলেন। মিনিকে দেখে সবাই আগ্রহী চোখে তাকালেন। নাজিবের মা আহ্লাদী গলায় বললেন “ওই দেখো, মেয়ের লাজ হয়েছে। তা তো হবেই, বাসরে একটু আধটু লজ্জা হবেই। যাও মা, স্বামীর কাছে যাও। অনেক কিছু শেখাবো তোমাকে কাল থেকে। হাসানভাইয়ের ইচ্ছাও ছিল তোমাকে সব কিছু শেখাবে”।

মিনি মাথা নিচু করে বলল “আমি ওর সঙ্গে শুতে পারব না। আমার শরীর খারাপ হয়েছে”।

ঘরে যাও বা বাকিরা কথা বলছিল সবাই চুপ করে গেল। নাজিবের মা উঠে মিনির কাছে এসে কড়া গলায় বললেন “তুমি মিথ্যা কথা বলছ”।

মিনি বলল “বিশ্বাস না হলে বাথরুমে চলুন। হাত দিয়ে দেখে নিন রক্ত বেরোচ্ছে কিনা”।

নাজিবের মা কয়েক সেকেন্ড কড়া চোখে মিনির দিকে তাকিয়ে তার হাত ধরে নাজিবের ঘরে ঢুকলেন।

নাজিব বলল “দেখেছ মা, তোমার বউ মা কত লাজুক। শুধু ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আটকে রাখাই যাচ্ছে না”।

নাজিবের মা থমথমে গলায় বললেন “তুই বাইরের ঘরে ঘুমা। ওর সঙ্গে আজ ঘুমাতে হবে না। ওর শরীর এখন অপবিত্র”।

নাজিব হতভম্ব হয়ে একবার মায়ের দিকে, আরেকবার মিনির দিকে তাকিয়ে রইল।

নাজিবের মা বললেন “যা বাইরে যা”।

নাজিব বিশ্বাস করতে না পারার মুখ নিয়ে ঘরের বাইরে গেল।

নাজিবের মা বললেন “বস”।

মিনি খাটে বসল।

নাজিবের মা বললেন “শোন মেয়ে, তোমার কপাল খুব ভাল। আমি ভেবেছিলাম তুমি মিথ্যা বলছ। কিন্তু তুমি যদি ভেবে থাকো এখান থেকে পালাবে, তাহলে তুমি ভুল করবে। মনে থাকে যেন। ঘুমিয়ে পড়। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও”।

নাজিবের মা বেরিয়ে গেলেন।

মিনি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে খাটে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

২৪।

ইসলামাবাদে নিজেদের ডেরায় ফিরে হাঁফাচ্ছিল তিন জনই।

রাঘব মেঝেতেই বসে পড়েছিলেন। বললেন “উই হ্যাভ টু লিভ ইসলামাবাদ অ্যাস আরলি অ্যাস পসিবল। অন্তত সায়ক তোমার এখানে থাকাটা কিছুতেই ঠিক হবে না। খুব সম্ভবত পাকিস্তানে আর্মি নেমে যাবে আজকেই”।

সায়ক বলল “হ্যাঁ তা তো নামবেই”।

রাঘব বিস্মিত গলায় বললেন “কিন্তু সায়ক, পাশাকে তো সবাই চাইছিল। ইভেন পাকিস্তান আর্মিও পাশাকে জেতাতে সব রকম চেষ্টা করছিল। তাহলে এটা কেন হল?”

সায়ক মাথা নাড়ল “পাকিস্তানের মত দেশে অনেক কেনরই উত্তর পাওয়া যায় না ভাটিয়া সাব। এভ্রিথিং ইজ কমপ্লিকেটেড হিয়ার। আর্মির সঙ্গে পলিটিশিয়ানদের সমানে সমানে টক্কর চলে এখানে। দাউদ থেকে শুরু করে লস্কর, আল কায়েদা, হিজবুল, সবাইকেই পুষে রাখতে হয় ইন্ডিয়াকে শিক্ষা দিতে হবে বলে। শেষ মেশ যেটা হয়, এ সব কিছু করতে গিয়ে এদের নিজের দেশটারই বারোটা বেজে যায়”।

আব্বাস বললেন “অথচ গরিবি দেখো। ইসলামাবাদ এমন ঝকঝকে একটা শহর, কিন্তু কতগুলো বস্তি আছে গোটা শহর জুড়ে!”

রাঘব বললেন “গরিবি তো দুই দেশেই আছে ভাই। ইনফ্যাক্ট সাব কন্টিনেন্টের সব খানেই। থার্ড ওয়ার্ল্ড মানেই গরিবি। কিন্তু এখানকার পলিটিশিয়ানদের তো সেটা নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই। সবাই পড়ে আছে রাম রহিমের কাটাকাটি নিয়ে”।

সায়ক পকেট থেকে রিভলভার বের করে মেঝেতে রেখে বলল “ভাটিয়া সাব, আমি একটা তৃতীয় শক্তির গন্ধ পাচ্ছি। মুজফফরাবাদেও খানিকটা আঁচ করেছিলাম। পাকিস্তান বা ইন্ডিয়া এখানে বড় ফ্যাক্টর না। আরও বড় কিছু একটা রাইজ করছে। মারাত্মক কিছু। পাকিস্তান বরাবরই বাঘের পিঠে সওয়ার ছিল। এবার বাঘটা বড় হয়েছে। আর তারা শুধু পাকিস্তান কেন, ছড়িয়ে পড়তে চাইছে সাব কন্টিনেন্টের সব খানেই”।

রাঘব ভ্রু কুঁচকালেন “তুমি কী বলতে চাইছ?”

সায়ক বলল “হাসান মাকসুদ বেশ কয়েকবার মিডল ইস্টে গেছে ভাটিয়া সাব। প্যারিসে মাস ছয়েক আগে যে স্যুইসাইড অ্যাটাকটা হয়েছিল, তার সঙ্গে রিসেন্টলি শ্রীনগরে হওয়া টেররিস্ট অ্যাটাকের একটা অদ্ভুত মিল আছে। ইস্তানবুলের হোটেলে যে বোমা বিস্ফোরণটা হয়েছিল, তার সঙ্গে চাঁদনি চকের সেন্টিনেলে হওয়া বোম বিস্ফোরণেরও মিল আছে। দুটো ক্ষেত্রেই ইউজ হয়েছে ক্রিকেট বল সাইজের টাইমবোম। এগুলো সব ক’টাই সিকিউরিটি চেকিং ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে”।

রাঘব চিন্তিত গলায় বললেন “মাই গড। ইউ মিন...”

সায়ক হাসল “আপনি ঠিকই ধরেছেন ভাটিয়া সাব। নাও দে আর বিকামিং অ্যাগ্রেসিভ”।

আব্বাস চোখ কপালে তুলে বলল “আইসিস?”

সায়ক আব্বাসের দিকে তাকাল। বলল “দে আর টেরিফিকলি ডেঞ্জারাস। একই সঙ্গে অনেকগুলো স্লিপার সেল চালাচ্ছে, একবারে অশিক্ষিত লোকেদের নিয়ে নয়, তাদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত শিক্ষিত এবং প্রবলভাবে ব্রেইন ওয়াশড। এদের হাতে আছে অত্যাধুনিক অস্ত্র, মাথায় আছে মগজের পরিবর্তে ধর্মগুরুদের ফিড করে দেওয়া জেহাদ আর...”

সায়ক রাঘবের দিকে তাকাল। বলল “ভাটিয়া সাব, তুষার স্যারকে ফোন করতে হবে। যেভাবেই হোক ব্যবস্থা করুন”।

রাঘব মাথা নাড়লেন “আমি এখানে কোন ব্যবস্থা করতে পারব না সায়ক। ওরা সব আই এস ডি ট্যাপ করছে এখন। সিকিওর লাইনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব”।

সায়ক বলল “মেইল?”

রাঘব বললেন “কান্ট টেক রিস্ক। জামাল পাশা মার্ডারের কেসটা পাকিস্তান ইন্ডিয়ার ঘাড়ে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কীভাবে এখন বিন্দুমাত্রও রিস্ক নিই বল?”

সায়ক চিন্তামগ্ন হল।

রাঘব বললেন “তুমি যদি বল আমি একটা রুট বলতে পারি”।

সায়ক জিজ্ঞাসু চোখে রাঘবের দিকে তাকাল।

রাঘব বললেন “পেশোয়ার হয়ে আফগানিস্তান চলে যাও”।

সায়ক বলল “তারপর?”

রাঘব বললেন “আফগান গভর্নমেন্ট তোমাকে ইন্ডিয়া পৌঁছে দেবে”।

সায়ক বিরক্ত মুখে বলল “কী যে বলেন না ভাটিয়া সাব। এত কান্ড করে ইন্ডিয়া চলে যাব? তাহলে তো হয়েই গেল”।

রাঘব বললেন “তুমি ইন্ডিয়া না গেলে ওরা তোমায় যেখানে পাবে সেখানে মারবে সায়ক”।

সায়ক বলল “মারুক। মরতে আমি ভয় পাই না। আপাতত আজকে কোথায় যাওয়া যায় সেটা বলুন”।

রাঘব বললেন “রাওয়ালপিন্ডি। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি আর আব্বাস চলে যাও বাসে করে”।

সায়ক বলল “ওখানে গিয়ে কিছু না করে হাতে হাত রেখে বসে থাকব?”

রাঘব বললেন “এছাড়া উপায় নেই কোন”।

সায়ক বলল “আমাকে ইসলামাবাদেই থাকতে হবে ভাটিয়া সাব। আপনি বুঝতে পারছেন না। জামাল পাশাকে মারার রি অ্যাকশনটা দেখতে হবে তো”।

রাঘব বললেন “সেটা তুমি রাওয়ালপিন্ডিতে কাগজ পড়ে শুনে নিও। আমি বলছি শোন, তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাও”।

সায়ক মুখ কালো করে বসে রইল।

২৫।

বীরেন চুপচাপ বসে ছিল আই সি ইউতে। রেহান এসে বীরেনের পাশে বসলেন। বললেন “বীরেন,তুমি জানো তুমি এখন একজন হিরো?”

বীরেন একটু কুঁকড়ে গেল “কী যে বলেন স্যার, আমার জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলে খান স্যারকে এভাবেই বাঁচাত”।

রেহান মাথা নাড়লেন। বললেন “বাঁচাত না বীরেন। আমি জানি। সবাই আগে নিজেকে বাঁচায়”।

বীরেন বলল “খান স্যার না থাকলে যে আমি আগেই মরে যেতাম স্যার। ওনার জন্যই তো আমি এখনও বেঁচে আছি”।

রেহান বললেন “তাতেও। এই দুনিয়ায় কেউ কারও না ভাই। এই যে শহরটা দেখছ, এই শহরে আমি বড় হয়েছি। আমার চাচা, ফুপা, খালু সবাই আমাদের পর করে দিয়েছে শুধুমাত্র আমি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের সার্ভিস করি বলে। পাড়ার লোকেরা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে...” রেহান চুপ করে গেলেন।

বীরেন বলল “কালকের ব্লাস্টটা কারা করালো স্যার?”

রেহান বললেন “কারা আর? এঁরা নিজেরাই করছে। ভাবছে এসব করে ইন্ডিয়ার থেকে আলাদা হতে পারবে। গর্দভগুলো জানেই না, ইন্ডিয়া আছে বলেই এঁরা এখনও বেঁচে আছে। দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দোজ পাকিস্তানি বাস্টার্ডস” ; রেহান ফুঁসছিলেন।

বীরেন বলল “আমি তো শুনেছিলাম এখানের অনেকেরই পাকিস্তানে যাতায়াত আছে”।

রেহান বললেন “আছে তো। অনেকগুলো জায়গা আছে যেখান থেকে এখনও অনুপ্রবেশ ঘটছে”।

বীরেন অবাক গলায় বলল “আর্মি কিছু করতে পারছে না?”

রেহান বললেন “করছে। কয়েকটাকে মারছেও। বাট দে আর লাইক গ্রুপ অফ জম্বিস। গেম অফ থ্রোনস দেখেছ?”

বীরেন হাসল “হ্যাঁ”।

রেহান বললেন “এঁরা হল সেই হোয়াইট ওয়াকারদের মৃত সেনার ঢল। এঁরা নিজেরাও জানে না এঁরা কবে মরে গেছে। কিন্তু অদ্ভুত এক টানে চলে যাচ্ছে নিজেদের দেশটার সর্বনাশ করতে”।

সিস্টার এসে বললেন “আশরফ খানের সঙ্গে দেখা করতে পারেন আপনারা। একজন যান”।

রেহান বললেন “যাও, তুমি দেখা করে এসো”।
বীরেন মাথা নাড়ল “না না স্যার, তা কী করে হয়? আপনি সিনিয়র। আপনি যান। আমি ওয়েট করছি”।
রেহান বললেন “আচ্ছা বেশ। দেন ওয়েট ফর মি”।
রেহান উঠলেন। দরজা ঠেলে ঢুকলেন।
খানের পেটে ব্যান্ডেজ করা। মাথার কাছে রাখা মণিটরে বিভিন্ন শারীরিক তথ্য ফুটে উঠছে।
রেহান হাসলেন “গুড মর্নিং অফিসার। এখন কেমন আছেন?”।
আশরফ প্রত্যুত্তরে হাসলেন। বললেন “বুঝতে পারছি না। এভাবে তো কোনদিন থাকতে হয় নি”।
রেহান বললেন “বীরেন না থাকলে আজ হয়ত আপনাকে বাঁচানো যেত না”।
আশরফ বললেন “ও কোথায়? শুক্রিয়া বলে দিও আমার পক্ষ থেকে”।
রেহান বললেন “পাঠাচ্ছি। আছে বাইরেই। আপনাকে নিয়ে আসার পর থেকে এখানেই ঠায় বসে ছিল”।
আশরফ বললেন “ওরা আমাদের ফলো করছিল রেহান। শ্রীনগর ছাড়ার পরে আমার খানিকটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু মনে হয়েছিল অতটা সাহস হয়ত ওরা পাবে না”।
রেহান বললেন “কারা হতে পারে বলে আপনার মনে হয় আশরফ?”
আশরফ বললেন “জানি না। তুষার স্যার কোথায়?”
রেহান বললেন “কলকাতায়। আরেক ঝামেলা হয়েছে সেখানে”।
আশরফ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।
রেহান বললেন “একটা কিডন্যাপিং এর...”
রেহানের কথা শেষ হবার আগেই সিস্টার এসে বললেন “স্যার, এর বেশি কথা বলাবেন না ওঁকে দিয়ে। প্লিজ”।
আশরফ সিস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন “প্লিজ সিস্টার। লিভ আস অ্যালোন”।
সিস্টার বিরক্ত মুখে বেরিয়ে গেলেন।
আশরফ বললেন “কে কিডন্যাপ হয়েছে?”
রেহান বললেন “হাসান মাকসুদের ভাইঝি”।
আশরফ অবাক চোখে রেহানের দিকে তাকালেন।
সিস্টার ডাক্তারকে নিয়ে ঢুকলেন। ডাক্তারবাবু রেহানকে বললেন “প্লিজ স্যার। ওঁর সঙ্গে”...
রেহান হাত তুললেন। আশরফের দিকে তাকিয়ে বললেন “আমি আসছি অফিসার”।
বীরেন বাইরেই অপেক্ষা করছিল। রেহান বললেন “যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখা করে আসো। সিস্টার আর ডাক্তার দুটোই মহা খরুস”।
বীরেন ঢুকল। সিস্টার বললেন “আর না। আবার বিকেলে। আপনি এখন আসবেন না প্লিজ”।
আশরফ বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল “থ্যাঙ্কস বীরেন। থ্যাংকস ফর সেভিং মাই লাইফ”।
বীরেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সিস্টার তার দিকে কড়া চোখে তাকালেন।
বীরেন বেরিয়ে বাইরে এল।
রেহান হাসলেন “দেখলে? কী বলেছিলাম?”
বীরেনও হেসে ফেলল “সত্যিই তাই”।
রেহান বললেন “চল, আমার বাড়িতে চল”।
বীরেন ইতস্তত করে বলল “না না স্যার, কী যে বলেন, আমি গেস্ট হাউজে যাই বরং”।
রেহান বীরেনের হাত ধরলেন “কাশ্মীরি আতিথেয়তা কী তা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই বাচ্চা, চল চল। কোন কথা শুনব না”।

২৬।

জ্যোতির্ময়কে তার সেল থেকে বের করে এনে ইন্টারোগেশন রুমে আনা হয়েছে।

তুষার তিনটে চেয়ার রাখতে বলেছিলেন। সোমেনরা বেরিয়ে গেছিলেন, তুষার আবার ফোন করে তাদের ডেকেছেন। জ্যোতির্ময়ের সামনে সোমেন, অনিন্দিতা এবং তুষার বসলেন।

জ্যোতির্ময় বাকি দুজনকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তুষারকে বললেন "অনেক দিন পরে দেখা হল, কী বলুন অফিসার?"

তুষার বললেন "বেশিদিন নয়। আপনাদের কর্মকান্ডই এমন। চুপচাপ যে অন্ধকূপে রেস্ট নেবেন, তারও উপায় নেই। নিজের ভাইঝিকেই কিডন্যাপ করালেন"।

জ্যোতির্ময় মাথা নিচু করে নিজের পায়ের নখ দেখতে দেখতে বললেন "আমি মিনিকে কিডন্যাপ করাই নি। আপনাদের কোন একটা ভুল হচ্ছে। আমি তো এখানেই ছিলাম। এখান থেকে কীভাবে অপারেট করব বলতে পারেন?"

সোমেন বললেন "তুই তো চিনিস দাদা ওদের, বল না মিনিকে ছেড়ে দিতে"।

জ্যোতির্ময় সোমেনের দিকে তাকালেন "ওরা আমার কথা শুনবে কেন?"

সোমেন বললেন "তুই ওদের মাথা বলে"।

জ্যোতির্ময় কয়েক সেকেন্ড শান্ত চোখে সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "এদের বল আমাকে ছেড়ে দিতে। আমি সন্ধ্যের মধ্যে মিনিকে বাড়িতে এনে দিচ্ছি"।

অনিন্দিতা বিভ্রান্তের মত তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার জ্যোতির্ময়কে বললেন "তা কোথায় ছাড়তে হবে আপনাকে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আপনি রাজি থাকলে বলুন। বাকিটা বলে দিচ্ছি"।

তুষার বললেন "নিজের ভাইঝিকে কিডন্যাপ করিয়ে দেশকে ব্ল্যাকমেল করাচ্ছেন আপনি। আপনার লজ্জা লাগে না হাসান মাকসুদ?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আপনি আমার ভাই আর ভাইয়ের বউকে নিয়ে এসে আমার সামনে বসিয়েছেন যাতে আমি আবেগে দ্রবীভূত হয়ে আপনাদের সাহায্য করি। আপনার লজ্জা লাগে না তুষার রঙ্গনাথন?"

তুষার স্থির চোখে জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমি আপনার ফ্যামিলিকে হেল্প করতে চেয়েছি, আশা করি আপনি এটা ভুলে যাবেন না"।

জ্যোতির্ময় বললেন "হেল্প করছেন? হুহ"!

তুষার সোমেনের দিকে তাকালেন "আপনারা এবারে বাইরে অপেক্ষা করুন। ওঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে"।

সোমেন এবং অনিন্দিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তুষার বললেন "দেখুন হাসান, এ জিনিসটা বার বার করতে ভাল লাগে না, কিন্তু আপনি সব কাজ করছেন যার জন্য আমাদের হাতে আর কোন অপশনও থাকে না। আপনার হাতে বারো ঘন্টা সময় আছে। এই বারো ঘন্টায় আপনি আমাদের জানাবেন আপনার ভাইঝি মিনিকে কীভাবে এ দেশে ফেরত আনা যায়। নইলে আমাদের পক্ষে আপনার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। ওঁর মৃত্যুটাও আমরা আপনার সামনেই ঘটাব। একটু একটু করে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হবে ওঁকে। আশা করি আপনার এতে কোন কষ্ট হবে না"।

জ্যোতির্ময় বললেন "এই তো পারেন আপনারা। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতেই পারেন। আর কী পারেন?"

তুষার বিদ্রুপের সুরে বললেন "তাই নাকি? এটা শুধু আমরাই করি? আর আপনারা কী করেন শুনি? মিনিকে তুলে নিয়ে গেল যারা তারা ঠিক কী হিসেবে ওকে নিয়ে গেল আমাকে বলবেন প্লিজ?"

জ্যোতির্ময় বললেন "মিনির জন্য আমি উপযুক্ত পাত্র দেখে রেখেছিলাম। ওর সঙ্গেই ওর বিয়ে হয়েছে"।

তুষার বললেন “কেমন উপযুক্ত পাত্র শুনি?”

জ্যোতির্ময় বললেন “ধর্মশিক্ষায় ভাল, নীতি শিক্ষায় ভাল, বনেদি পরিবার। আর কী চাই?”

তুষার বললেন “বাহ। আর মেয়েটার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু থাকবে না?”

জ্যোতির্ময় বললেন “মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছাটা বড় কথা নয়। বংশ বিস্তারটা বড় কথা”।

তুষার তেতো মুখে কয়েক সেকেন্ড জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন “আপনি গত তিন বছরে দুবার ইরাকে গেছেন। সিরিয়ায় গেছেন। কীভাবে গেছেন? কে নিয়ে গেছে আপনাকে?”

জ্যোতির্ময় অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন “আপনারা অনেক বড় ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন। আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? নিজেরাই খুঁজে বার করুন না”।

তুষার বললেন “নিরীহ মানুষদের মেরে আপনারা কী মজা পান মাকসুদ?”

জ্যোতির্ময় বললেন “কাউকে অকারণে মারা হয় না। প্রত্যেকের এ পৃথিবীতে আসা এবং যাওয়া, পূর্ব নির্দিষ্ট”।

তুষার বিদ্রুপের সুরে বললেন “আপনাকে একটা চ্যানেল খুলে দিতে হবে দেখছি। সেখানে বসে বসে মানুষের কুষ্ঠী বিচার করবেন”।

জ্যোতির্ময় চুপ করে বসে রইলেন। তুষার চেয়ার থেকে উঠে ইন্টারোগেশন রুম থেকে বাইরে এলেন।

সোমেন এবং অনিন্দিতা অধীর আগ্রহে তার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকে দেখে সোমেন বললেন “কোন আশা আছে অফিসার?”

তুষার মাথা নাড়লেন, “আপনারা বাড়ি যান। সাবধানে থাকবেন। কোন আপডেট এলে জানাবো”।

কথাটা বলে দাঁড়ালেন না তুষার। পীযূষের রুমে ঢুকলেন। পীযূষ লাঞ্চ করছিল। তুষার বললেন “রাসেলের সঙ্গে যোগাযোগ হল?”

পীযূষ বলল “হয়েছে। এখনও একজ্যাক্ট লোকেশন ট্রেস করা যায় নি স্যার”।

তুষার কয়েক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে ফোন বের করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করলেন। ফোন একবার রিং হতেই কেটে দিলেন মন্ত্রী। তুষার থমথমে মুখে বসে রইলেন।

পীযূষ বললেন “এনি প্রবলেম স্যার?”

তুষার বললেন “প্রবলেম ই প্রবলেম পীযূষ। ভাল খবর কোথায়?”

ফোন বাজছিল। পীযূষ নাম্বারটা দেখে বললেন “এই তো রাসেল ফোন করছে”।

তুষার বললেন “দাও আমাকে দাও”।

পীযূষ ফোনটা এগিয়ে দিল। তুষার ধরে বললেন “রাসেল?”

“বলছি। আপনি কে বলছেন?”

“আমি তুষার রঙ্গনাথন বলছি”।

“ওহ স্যার। বুঝেছি”।

“নাম্বারটা আমিই ট্রেস করতে দিয়েছিলাম রাসেল, এনি আপডেট?”

“আপডেট বলতে নাম্বারটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডারের কাছের কোন গ্রামে আছে, স্পেসিফিকালি বলতে গেলে যশোরের কাছে। কিন্তু এর বেশি সেভাবে ট্রেস করা যাচ্ছে না স্যার”।

“ওকে রাসেল। যশোর বলতে বনগাঁ থেকে কাছে হবে?”

“হ্যাঁ স্যার”।

“নাম্বারটা মুভ করেছে কোথাও না একই জায়গায় আছে?”

“হু... না স্যার। আপাতত মুভ করে নি কোথাও”।

“ওকে। মুভ করলে অবশ্যই জানাবে আমাদের”।

“শিওর স্যার। খুদা হাফেজ”।

"খুদা হাফেজ"।

ফোনটা রাখলেন তুষার। নিজের ফোন বের করে আবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করলেন। এবারে মন্ত্রী কাটলেন না। ফোনটা পুরো রিং হয়ে গিয়ে নিজে থেকেই কেটে গেল।

২৭।

ভোরে দরজা ধাক্কার শব্দে মিনির ঘুম ভাঙল।

চোখ খুলে খাটে উঠে বসল সে। গলা তুলে বলল "কে?"

"আমি নাজিব। দরজা খোল"।

মিনি বলল "পরে আসুন"।

"আরে দরজা খোল, আমাকে বেরোতে হবে। টাকার ব্যাগ ঘরের ভিতর"।

মিনি উঠে দরজা খুলল।

নাজিব প্যান্ট শার্ট পরে ছিল। ঘরে ঢুকে আলমারি খুলল।

মিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

নাজিব মানি ব্যাগ পকেটে রেখে বলল "তোমার শরীর খারাপ কতদিন থাকবে?"

মিনি বলল "আমি জানি না"।

নাজিব খাটে বসল। বলল "দেখো, কাল রাতের জন্য আমি অনেক সরি"।

মিনি বলল "তুলে আনার জন্য সরি না? আমার মত না নিয়ে জোর করে বিয়ে করার জন্য সরি না?"

নাজিব বলল "হাসান সাহেব বলেন হিন্দু ধর্মেও বল পূর্বক বিয়েতে কোন বাঁধা নেই। আর আমাদের ধর্মে তো নেইই"।

মিনি বলল "তা তো বটেই। সব ধর্মেই তো মেয়েরা বল প্রয়োগ করারই মেটিরিয়াল"।

নাজিব বলল "তোমার চাচাজানের ইচ্ছাতেই কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে সেটা জানো তো?"

মিনি এবার ভাল করে নাজিবের দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ নাজিবের দিকে তাকিয়ে বলল "আপনাকে মানুষের মতই দেখতে বটে"।

নাজিব হো হো করে হেসে বলল "কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমি অমানুষের মত দেখতে হব?"

মিনি উত্তর দিল না।

নাজিব হিস হিস করে বলল "তোমার নসীব ভাল। তুমি হাসান মাকসুদের ভাইয়ের মেয়ে। নইলে বেয়াদপির জন্য তোমায় রেপ করে নদীর জলে ফেলে দিতাম"।

মিনি বলল "রোজ ক'টা মেয়েকে রেপ করে নদীতে ফেলেন?"

নাজিব মিনির দিকে আঙ্গুল তুলে বলল "হিসাব চাই তোমার?"

মিনি বলল "কাপুরুষের মত পরের মেয়েকে যারা তুলে নিয়ে আসে তাদের আমি মানুষ বলে মনে করি না। হিসাব চায় তো মানুষের কাছে"।

নাজিব বলল "কাপুরুষের কী দেখলে? শহরের মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে এসেছি। এতে কাপুরুষের কী আছে? তোমাকে নিয়ে বর্ডার অবধি পার হয়েছি। আর শোন মেয়ে বেশি লাফালাফি কোর না। কাল রাতে যে মাংস খেয়েছ তা গরুর মাংস, বুঝেছ?"

বিরাট কোন বাহাদুরির কথা বলেছে এমন করে নাজিব কথাটা বলল।

মিনি হেসে ফেলল।

নাজিব বলল "হাসছ কেন?"

মিনি বলল "গরুর মাংস খেয়েছি তা কি এমন বিরাট ব্যাপার? কলকাতায় তো আমি প্রায়ই আমার বন্ধুর সঙ্গে গরুর মাংস খেতাম। গরুর মাংসে জাত যায় নাকি? কে বলে এসব?"

নাজিব চোখ বড় বড় করে মিনির দিকে তাকাল।

মিনি বলল "আমিও শুনেছি যারা দেশভাগের পরে বাংলাদেশে থেকে গিয়েছিল তাদের গো মাংস জোর করিয়ে খাইয়ে ধর্মান্তরিত করা হত। কিন্তু আপনি বা আপনাদের মত কিছু মাথামোটা ধর্মান্ধ মানুষ যদি ভেবে থাকেন কোন প্রাণীর মাংস খাইয়ে ধর্ম বদল করা যায়, তাহলে আপনারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন"।

নাজিব আরও কিছুক্ষণ মিনির দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনি দরজা বন্ধ করে জানলা খুলল। বাইরে আলো ফুটেছে।

গতকাল গোটা দিন দুঃস্বপ্নের মত গেছে। মাথা কাজ করছিল না।

মিনি মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করল। সে বুঝতে পারছিল হতবুদ্ধি হওয়া মানে সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া। সে জোরে জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল। জ্যেঠুই শিখিয়েছিল খুব টেনশন হলে জোরে জোরে শ্বাস নিতে এবং ছাড়তে হয়।

মিনির হঠাৎ করে মায়ের মুখটা মনে পড়ে গেল।

কান্না পেল।

বহু কষ্টে সে কান্না চাপল।

ছিটকিনি খুলে ঘরের বাইরে গেল। নাজিবের মা রান্না করছেন। তাকে দেখে বললেন "মাথায় কাপড় দাও মেয়ে, তুমি এখন এই বাড়ির মেয়ে"।

মিনি নাজিবের মার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল। বলল "আমার বাবার সঙ্গে কথা বলান"।

নাজিবের মা বললেন "নাজিব আসুক। এলে ফোন করতে বলব"।

মিনি কয়েক সেকেন্ড নাজিবের মার দিকে তাকিয়ে বলল "দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি। আমার জ্যেঠু আমার সঙ্গে নাজিবের বিয়ে ঠিক করেছে কী না, সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ নেই। আমি শুধু একটা কথা জানি। এই বিয়েটা আমার নিজের ইচ্ছায় হয় নি। আর আপনারা আমাকে চেনেন না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আপনাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব করে তুলব"।

নাজিবের মা মিনির কথার উত্তর দিলেন না। মন দিয়ে রান্না করতে লাগলেন।

২৮।

ইসলামাবাদে সেনা অভ্যুত্থান ঘটেছে। দুপুরের মধ্যে জেনারেল নিয়াজি প্রেসিডেন্ট ভবনে ঢুকে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট আলি কাদরীকে হতভম্ব করে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছেন "ঘন্টা খানেক আছে আপনার কাছে আলি সাহাব। ভবন খালি করে চলে যান"।

আলি কাদরী ঘন্টাখানেকও নেন নি। মিনিট কুড়ির মধ্যে প্রেসিডেন্ট ভবন ছেড়ে পালিয়েছেন সেনার গুলির ভয়ে। প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রেস কর্নারে। দেশ বিদেশের নানা সাংবাদিক ভিড় করছেন সেমিনার হলে। নিয়াজি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার জন্য।

এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠল। নিয়াজি দেখলেন সরফরাজ খান ফোন করছেন। ধরলেন "সালাম সরফরাজ। বল কী বলবে"।

"প্রথমেই কনগ্র্যাচুলেশন জানাই জনাব"।

"শুক্রিয়া। বহুত শুক্রিয়া"।

"আমার মনে হয় আল্লাহপাক যা করেন পাকিস্তানের ভালোর জন্যই করেন। আজ সকালে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও পাকিস্তানের স্বার্থে আপনার মত শক্তিশালী কাউকেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে দরকার ছিল।"

নিয়াজি একটু থমকে বললেন “জামাল পাশার পরিবারকে আমি সমবেদনা জানিয়েছি সরফরাজ। এছাড়াও জামাল পাশার বিরুদ্ধে যে ভোটে দাঁড়িয়েছিল, সেই সেলিম আহমেদকে জামাল পাশাকে খুন করার অভিযোগে পত্রপাঠ গ্রেফতার করা হয়েছে”।

ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল “জানি জনাব। সব জানি। আমাদের কাজই তো ইনফরমেশন কালেক্ট করা”।

নিয়াজি বললেন “তবে নিশ্চয়ই এও জানো জামাল পাশাকে কে খুন করেছে?”

সরফরাজ হতভম্ব গলায় বললেন “না জনাব। আমি কী করে জানব?”

নিয়াজি বললেন “আমরা করি নি। কেনই বা করতে যাব? আমাদের ক্যান্ডিডেটকে মারতে যাবই বা কেন?”

সরফরাজ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন “আমাদের দেখা করা দরকার জনাব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব”।

নিয়াজি বললেন “রাতে এসো। দশটার পরে”।

সরফরাজ বললেন “আমেরিকা ফোন করেছিল জনাব?”

নিয়াজি বললেন “ও কমবখতো তো জরুর ফোন করেগা। কাম ক্যা হে উস লোগোকা? দুসরা কান্ট্রিকা হর ম্যাটার মে উনকা ইন্টারেস্ট হ্যায়”।

সরফরাজ বললেন “বি কেয়ারফুল জনাব। ইনশা আল্লাহ রাত্রে দেখা যাচ্ছে”।

নিয়াজি ফোনটা রাখলেন। বেশ খানিকক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখলেন।

আব্বু আম্মির কথা মনে পড়ে গেল। দুজনেই আজ নেই। থাকলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হতেন। দেওয়ালে টাঙানো মহম্মদ আলী জিন্নাহর ফটোতে স্যালুট করলেন নিয়াজি। চোখ বন্ধ করে আল্লাহকে স্মরণ করে দরজা খুলে বেরোলেন।

তার সঙ্গে চারজন কম্যান্ডো ছায়ার মত লেগে থাকল। ব্রিগেডিয়ার গুলাম মহম্মদ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিয়াজির পাশে চলতে থাকলেন।

নিয়াজি বললেন “প্রেস কর্নার ভাল করে দেখে নিয়েছ? সিকিউরিটি চেকিং ওকে?”

গুলাম বললেন “ওকে জনাব”।

নিয়াজি বললেন “সেলিম আহমেদ কনফেস করেছে?”

গুলাম বললেন “না জনাব। বরং উলটোটাই মনে হল। ব্যাপারটা সম্পর্কে ওঁর কোন আইডিয়াই নেই। আরেকটা সমস্যা হল, সেলিম আহমেদকে অকারণে আটকে রাখলে ওঁর সাপোর্টাররা বিক্ষোভ করতে পারেন”।

নিয়াজি একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলেন “টিয়ার শেল চালিয়ে দেবে। দেশের বাকি শহরগুলোতে আর্মি কম্যান্ড নিয়েছে?”

গুলাম বললেন “হ্যাঁ জনাব, নিচ্ছে। অর্ডার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে”।

নিয়াজির মুখে হাসি ফুটল।

দরজা ঠেলে ঢুকলেন কনফারেন্স হলে।

তিনি প্রবেশ করা মাত্র ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে তার চোখ ধাধিয়ে যেতে লাগল। এতক্ষণের গুঞ্জন প্রবল কোলাহলে পরিণত হল। নিয়াজি একটুও না দাঁড়িয়ে নিজের জন্য নির্ধারিত সিটে বসে কড়া গলায় বললেন “প্লিজ কিপ কোয়ায়েট লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। ফ্ল্যাশ বন্ধ করুন সবার আগে। তারপর কথা”।

মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে শব্দ কমে এল। নিয়াজি বললেন “প্রথমে আমি বলব, তারপর আপনাদের প্রশ্ন শুনব। আমি, এই মুহূর্তে ঘোষণা করছি, আজ, এখন থেকে, আমাদের প্রিয় দেশ পাকিস্তানের দখল নিল পাকিস্তান আর্মি। আজ সকাল বেলায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জামাল পাশার অকাল প্রয়াণ ঘটেছে। দেশের সর্বত্র

বিভিন্ন জায়গায় নানা রকম বিশৃঙ্খলার কথা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান আর্মি মনে করেছে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে দেশের হাল ধরা তাদের পবিত্র কর্তব্য। যেহেতু অপর প্রার্থী জনাব সেলিম আহমেদকে এই খুনের প্রধান অপরাধী ভাবা হচ্ছে, তাই পাকিস্তান আর্মি মনে করছে, এই মুহূর্তে নির্বাচন করার কোন যৌক্তিকতা নেই। ফারদার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবার আগে পর্যন্ত আমি পাকিস্তানের দায়ভার গ্রহণ করছি, ইনশা আল্লাহ"।

সামনে বসা এক বিদেশী সাংবাদিক ঘোষণা করলেন "সেলিম আহমেদ যে জামাল পাশাকে খুন করেছে সেটা পাকিস্তান আর্মি এত তাড়াতাড়ি কীভাবে ইনভেস্টিগেট করল স্যার? অ্যাজ পার রিপোর্ট, অ্যাসেম্বলি রোডের ওই এরিয়াটাতে কোন সিসিটিভি ইনস্টলড ছিল না"।

নিয়াজি সাংবাদিকের দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে বললেন "দ্য ম্যাটার ইজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। এই বিষয়ে এখনই আমি কিছু বলতে পারব না। নেক্সট কোয়েশ্চেন প্লিজ"।

এক মহিলা সাংবাদিক বলতে উঠলেন "স্যার, আজকের ঘটনার ফলে গোটা বিশ্ব কি আবার পাকিস্তানের ডেমোক্রেসি নিয়ে হাসাহাসি করবে না?"

নিয়াজি বললেন "পাকিস্তান আর্মি জানে তাদের ডিউটি আসলে পাকিস্তানে ডেমোক্রাসি যথাসাধ্য বজায় রাখা। আমি নিজেকে ডেমোক্রেসির কেয়ার টেকার বলে মনে করি। এর বেশি কিছু না"।

একজন উঠে দাঁড়ালেন "স্যার, কাশ্মীর নিয়ে আমাদের স্ট্যান্ড কী হবে এই মুহূর্তে?"

নিয়াজি বললেন "দেখুন, কাশ্মীরিদের ইন্ডিয়ান আর্মি খুবই কষ্টে রেখেছে। আমরা কাশ্মীরিদের হিউম্যান রাইটস নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যথাসাধ্য বলব"।

বিদেশি সাংবাদিক বললেন "আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আপনাকে কনগ্র্যাচুলেশনস জানিয়েছেন স্যার? চীন বা ইন্ডিয়া থেকে কোন মেসেজ এসেছে?"

নিয়াজি ঠান্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন "জানাবেন। নিশ্চয়ই জানাবেন। আই থিংক আই শ্যুড লিভ নাও"।

নিয়াজি উঠলেন।

চতুর্দিক থেকে ভেসে আসা কোন প্রশ্নেরই উত্তর না দিয়ে সেমিনার রুম ত্যাগ করলেন।

২৯।

পাবলিক বাসে রাওয়াল পিন্ডি যেতে যেতেই সায়ক জানলা দিয়ে দেখতে পেল রাস্তায় সেনা টহল দিচ্ছে।

দেশে সেনা নেমেছে না কী হয়েছে তাতে বাসের যাত্রীদের বিশেষ কিছু যায় আসছে না। একটা বড় পরিবার উঠেছে। ছোট বাচ্চাটা জোরে জোরে কাঁদছে কেবল। মা সেটাকে একবার থাবড়াচ্ছে তো আরেকজন চিৎকার জুড়ে দিচ্ছে। বাস জুড়ে বাচ্চাদের চিৎকারের শব্দ। আব্বাস বিরক্ত গলায় বাচ্চার বাবাকে বলল "কী মিয়াঁ, বাচ্চাদেরকে একটু সামলাতে পারেন তো। সবই তো বিবিজিকে দিয়ে দিয়েছেন?"

বাচ্চার বাবা হেসে জবাব দিল "আমার কাছে এলে আরও কাঁদবে মিয়াঁ। কী যে বলেন। কোথায় যাচ্ছেন আপনি?"

আব্বাস বলল "রাওয়ালপিন্ডির বাস তো রাওয়ালপিন্ডিই যাবে না মিয়াঁ? পেশোয়ার তো যাবে না"।

বাচ্চার বাবা বলল "তা ঠিক। আমিও রাওয়ালপিন্ডিই যাচ্ছি। এই বিবিজির ভাইয়ের বাড়ি। বিরাট বড়লোক ওরা। এই বড় বড় গাড়ি আছে। আমরা তো গরীব আদমি। কিছুই নেই"।

আব্বাস বলল "তা আপনি গরীব আদমি বড়লোক শ্বশুরবাড়ি পেলেন কী করে?"

বাচ্চার বাবা বলল "সবই আল্লাহর মেহেরবানি। আমি তো গরীব আদমি"।

আব্বাস কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সায়ক আব্বাসকে চিমটি কেটে ফিসফিস করে বলল "এত বাচাল হচ্ছ কেন?"

আব্বাস বলল “এমনি। টেনশন লাগছে খুব”।
সায়ক বলল “এত কথা বললে তো টেনশন কমবে না। চুপচাপ বসে থাকো”।
রাওয়ালপিন্ডি ঢোকার মুখে বিরাট জ্যাম। আব্বাস জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে বলল “হয়ে গেল”।
সায়ক অবাক হয়ে বলল “কী হয়েছে?”
আব্বাস বলল “বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সেলিম আহমেদের লোক বোধ হয়”।
সায়ক বলল “বসে থাকো। বাস থেকে নেমো না। ওরা আর্মির সঙ্গে বেশিক্ষণ পারবে না”।
বলা মাত্রই আব্বাস দেখতে পেল আর্মি টিয়ার গ্যাস ছুড়তে শুরু করেছে, তার সঙ্গে শুরু হয়েছে লাঠি চার্জ। জনতা মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।
আর্মি রাস্তা ফাঁকা করে দিয়েছে। তাদের বাস স্টার্ট দিল।
আব্বাস জোরে বলল “পাকিস্তান আর্মি জিন্দাবাদ”।
বাচ্চার বাবাও চেঁচিয়ে উঠল “জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। তা মিয়াঁ আপনি আর্মিদের পছন্দ করেন?”
আব্বাস বলল “নিশ্চয়ই। আর্মিই তো সব মিয়াঁ। দেশের জন্য বর্ডারে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা, কত ভাল বলত?”
বাচ্চার বাবা বলল “তা ভাল। তবে ওরা যখনই ক্ষমতায় আসে, আমাদের মত আম আদমিদের জিনা হারাম হয়ে যায়। যখন তখন রাস্তায় ধরে চড় চাপড় মেরে দেয়। গরীবদের মিয়াঁ বড় সমস্যা হয় আর্মি এলে”।
আব্বাস বলল “ধীরে বল মিয়াঁ। বাকিরা শুনতে পাবে”।
বাচ্চার বাবা বলল “আর মিয়াঁ, ভয় কাকে? কাউকে ভয় পাই না আমি। কী হবে ভয় পেয়ে? এই আর্মি থাকলেই পাকিস্তানে সব থেকে বেশি কোরাপশন হয়, জানো না সেটা?”
সায়ক আবার আব্বাসকে চিমটি কাটল। আব্বাস কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।
বাস শহরে ঢুকে মেইন স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সায়ক আব্বাসকে নিয়ে বাস থেকে নেমে বড় রাস্তা বরাবর হাঁটা শুরু করল।
আব্বাস সায়কের পেছনে দৌড়চ্ছিল “কী হল মিয়াঁ, তোমার আবার কী হল? আমাদের ডেরায় যাবে না?”
সায়ক বলল “না। আমরা পেশোয়ার যাচ্ছি”।
আব্বাস অবাক হয়ে বলল “মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার? পেশোয়ার যেতে হলে তো ইসলামাবাদ থেকেই গেলে হত। আবার রাওয়ালপিন্ডিতে আসার কী দরকার ছিল?”
সায়ক বলল “স্টেশনে চল বেশি কথা না বলে”।
আব্বাস বিরক্ত গলায় বলল “কী যে কর কিছুই বুঝি না”।
সায়ক কোন কথা বলল না। অটো স্ট্যান্ড থেকে একটা অটোতে করে রাওয়ালপিন্ডি স্টেশনে পৌঁছল তারা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল দেড় ঘন্টা পরেই রাতের ট্রেন ছাড়বে। টিকেট কেটে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসল তারা।
আব্বাস বলল “আচ্ছা ভাটিয়া সাবকে বলবে না?”
সায়ক বলল “বলব। পেশোয়ার পৌঁছে বলব”।
স্টেশনে সাধারন মানুষেরা প্রতীক্ষা করছে ট্রেনের। ভারতের আর পাঁচটা স্টেশনে যেভাবে প্রতীক্ষা করে সেভাবেই। মাটিতে চাদর পেতে বসে কেউ আড্ডা মারছে। বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে। মহিলারা টিফিন বের করে সবাইকে ভাগ বাটোয়ারা করে দিচ্ছে।
সায়ক অনেকক্ষণ চারদিক দেখে বিড় বিড় করে বলল “কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান “...

৩০।

ডাল লেকের পাশ দিয়ে তাদের গাড়ি যাচ্ছিল। রেহান বললেন "শিকারা চড়েছ?"

বীরেন মাথা নাড়ল "নাহ। কোন দিন চড়া হয় নি। ইচ্ছে আছে। আচ্ছা এখানে ক'টা হাউজবোট আছে?"

রেহান বললেন "মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বলতে পারবে। আমি পারব না। একটা সময় ছিল, যখন এই হাউজবোটগুলোতে সিজনে থাকার জায়গা পাওয়া যেত না। কাশ্মীরের একেক সময় একেক রকম সৌন্দর্য। বসন্তে একরকম, শরতে আরেক রকম। আর শীতকালটা তো বলাই বাহুল্য, বুঝতেই পারছ এই সমস্ত চত্বর যখন বরফে ঘিরে যায় তখন কেমন লাগতে পারে"।

রেহানের ড্রাইভার আনোয়ার বলল "স্যার শ্রীনগর তো কিছুই না। আপনাকে আমি আমার গ্রামে নিয়ে যাব। পহেলগাঁওয়ের কাছে। শ্রীনগর তো নোংরা হয়ে গেছে। ডাল লেকে মানুষ যায় নাকি, ছিঃ"।

রেহান হাসলেন "তা ঠিক। তবে মুঘল গার্ডেন এখনও ভাল করে মেইন্টেইন করা হয়। তুমি গেলে বলবে, আনোয়ার নিয়ে যাবে"।

বীরেন বলল "না না স্যার, আগে খান স্যার ঠিক হয়ে যান, তারপর না হয়..."

রেহান বললেন "তোমাকে একজনের গল্প বলি বীরেন। এক ফোঁটাও বানিয়ে বলছি না। তিন বছর আগের কথা। শ্রীনগরে হিজবুলের এক চাই ঢুকেছে আমাদের কাছে খবর এসেছে। আবছা নিউজ। ডিটেলস কিছুই জানি না। আমার এক কলিগ আমার বাড়িতে এসে উঠেছে। আমরা টেনশনে মরছি অথচ তার কিন্তু কোন চিন্তা নেই। দিব্যি আমার পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে, আমার বাইক নিয়ে শহর চক্কর কাটতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার ভীষণ রাগ হল। তখনও ওর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হয় নি। একদিন খুব ঝাড়লাম। ডেকে বললাম শোন মিয়াঁ এ তোমার শহর না, এটা কাশ্মীর। এখানে কখন খরচ হয়ে যাবে নিজেও জানো না। সে ব্যাটা শুধু মিটিমিটি হাসে। একদিন রাতে হঠাৎ করে আমাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে বলল চল। আমি তো অবাক, কোথায় যাব? সে ব্যাটা নাছোড়। ফোর্স টোর্স কখন ডেকেছে জানি না। ঘুম থেকে উঠে দেখি বাড়ির সামনে ফুল ব্যাটেলিয়ান হাজির। আমাকে না জানিয়ে নিজেই সব অ্যারেঞ্জ করেছে। আমার খুব ইগো হার্ট হল। রেগে বললাম ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি কাশ্মীরের চার্জে আছি আর তুমি সার্চ অপারেশন অর্ডার দিয়ে দিলে। আবার কিছু বলে না। শুধু হাসে। বললে বিশ্বাস করবে না বীরেন, লালচকের একটা বাড়ি থেকে সে রাতে হিজবুলের একটা না, তিন তিনটে মাথাকে ধরেছিলাম আমরা। দে হ্যাড নো আইডিয়া। ভাবতেই পারে নি আমরা যেতে পারি। এত ক্লিনিক্যাল ফিনিশ ছিল। আমরা যখন ভেবেছি ব্যাটা আরামে শহর ঘুরছে, মজা মারছে, আসলে সে নেটওয়ার্ক রেডি করছিল। নিজের আলাদা সোর্স তৈরী করছিল। যেটুকু সোর্স রিসার্চ ওয়ার্কের থ্রু দিয়ে পেয়েছিল সেগুলোকে আরও বেশি করে ঝালাই করেছিল। আশা করছি বুঝেছ কার কথা বলছি।"

বীরেন বলল "খান স্যার?"

রেহান মাথা নাড়লেন "না। সায়ক"।

বীরেন বলল "ওহ্। ওঁর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না আমি। শুধু জানি ওঁর মানিব্যাগটা না পেলে আজকে এই চাকরি করাটাই হয়ে উঠত না আমার"।

রেহান বললেন "সায়কের সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই জানবে তুমি। কিন্তু সায়কের গল্পটা তোমাকে কেন শোনালাম জানো? তোমাকে বুঝতে হবে আমাদের চাকরিতে সবার আগে যেটা দরকার, তুমি যে জায়গাতেই থাকো না কেন, সে জায়গাটাকে হাতের তালুর মত চিনে নিতে হবে। সেটা যদি তুমি না করতে পারো তাহলে..."

একটা বাইক প্রচন্ড জোরে পিছন থেকে আসছিল। রেহানের নিরাপত্তারক্ষী তারেক রেহানকে বলল "স্যার..."

রেহান ঠান্ডা গলায় বললেন “সামনের আর্মি ক্যাম্পে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দাও। সেম বাইক হসপিটালের বাইরে দেখেছি আমি”।

আনোয়ার খানিকটা এগিয়ে আর্মি চত্বরে গাড়িটা পার্ক করে দিল। বাইকটা প্রচন্ড গতিতে বেরিয়ে গেল।

রেহান বললেন “পালিয়ে যাবে কোথায়? নাম্বার নোট করে নিয়েছি”।

রেহানের গাড়ি চিনতে পেরে ক্যাম্প প্রহরারত একদল জওয়ান এগিয়ে এসে বললেন “এনি প্রবলেম স্যার?”

রেহান গাড়ি থেকে নেমে জওয়ানদের বাইক সম্পর্কিত কথাগুলো বলে গাড়িতে উঠলেন।

এতক্ষণ রেহানের যে খোশমেজাজ ছিল তা অনেকটাই অন্তর্হিত। পরিবর্তে বিরক্তি মিশ্রিত একটা কঠিন মুখ করে বললেন “এদের জন্য একবার ঘর ছেড়ে অন্যত্র থাকতে বাধ্য হয়েছি। এবার কি এদের ভয়ে শহরও ছাড়তে হবে?”

৩১।

রাত সাড়ে ন'টা।

প্রেসিডেন্ট ভবনের বিরাট বেড রুমে জেনারেল নিয়াজি একা বসেছিলেন।

সন্ধ্যে থেকে বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক ফোন এসে গেছে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিয়াজিকে অভিবাদন জানিয়ে বলেছেন পাকিস্তানে যে খুব শিগগিরি গণতন্ত্র ফিরতে চলেছে নিয়াজির নেতৃত্বে সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী। নিয়াজি প্রত্যুত্তরে আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে ইসলামাবাদে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন ইচ্ছা করলে নিজে এসেই দেখে যেতে পারেন, এখানকার মত গণতন্ত্র পৃথিবীর অনেক শহরেই নেই। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ঠাট্টা করে বলেছেন তার নিজের যাওয়ার দরকার নেই। পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় একটা কাক বসলে, কোথায় বসল সেটা কাক জানার আগে তিনি জেনে যান। নিয়াজি বেশি কথা বাড়ান নি এর পরে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ফোন করে বলে দিয়েছেন আমেরিকার থেকে তারা অনেক বেশি অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বানাচ্ছেন। কেনার আগে যেন তার সঙ্গে কথা বলে নেওয়া হয়। চিনের প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন তারা সবরকমভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষায় আগ্রহী। পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে ইন্ডিয়াকে ব্যস্ত রাখলে তাদের উত্তর পূর্ব ভারতে চলাফেরা করতে সুবিধা হয়। সৌদি সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের অভিনন্দন এসে পৌঁছেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফোন করে জানিয়েছেন নিয়াজি ক্ষমতায় আসায় তারা অত্যন্ত খুশি, তিনি ভাবছিলেন পাকিস্তান যাওয়ার কথা কিন্তু পাকিস্তানের নির্বাচনের জন্য যেতে পারছিলেন না। ঠিক করেছিলেন নির্বাচন শেষ হলেই যাবেন। এখন যেহেতু নির্বাচনের কোন ঝামেলা নেই সুতরাং যাওয়া যেতেই পারে। নিয়াজি কূটনীতির শর্ত মেনে সবার সঙ্গেই ভাল করে কথা বলেছেন।

শেষ মেশ বিরক্ত হয়ে স্কচের একটা বড় পেগ নিয়ে বসেছেন। দরজায় কেউ একজন নক করল। নিয়াজি বললেন “কাম ইন”।

একজন নিরাপত্তারক্ষী দরজা খুলে বলল “জনাব সরফরাজ এসেছেন জেনারেল”।

নিয়াজি বললেন “এই ঘরে পাঠিয়ে দাও”।

নিরাপত্তারক্ষী বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

নিয়াজি বললেন “হ্যাঁ, এখানেই পাঠাও। নো প্রবলেম”।

মিনিট পাঁচেক পরে সরফরাজ খান এলেন।

মুগ্ধ গলায় ঘরটা বললেন “অনেক শুক্রিয়া জনাব, এই হাউজের বেডরুমে যে, কোনোদিন আসতে পারব, ভাবতে পারিনি কোন দিন”।

নিয়াজি তেতো গলায় বললেন “আই এস আই চিফের গলায় এসব কথা মানায় না সরফরাজ। যে কোন দিন তুমি আমাকে মেরে এই ঘরে চলে আসতে পারো। হু নোজ?”

সরফরাজ বললেন “এ কেমন কথা জনাব? আমাকে কি কোন দিন আপনার কোন অমর্যাদা করতে দেখেছেন?”

নিয়াজি বললেন “পাকিস্তানে সব সম্ভব সরফরাজ। শুধু পাকিস্তানে কেন, এশিয়া আফ্রিকার এভ্রি মুসলিম কান্ট্রিতে এভ্রিথিং ইজ পসিবল। এরা ডেমোক্রেসি কাকে বলে শেখেনি। ডু ইউ নো অ্যাবাউট মুজিবুর রহমান? কে মেরেছিল জানো মুজিবুরকে?”

সরফরাজ হাসতে হাসতে বললেন “আপনার সঙ্গে কথায় পারব না জনাব”।

নিয়াজি বললেন “কাজের কথায় এসো সরফরাজ। জামাল পাশাকে কে মেরেছে? কোন ইনফরমেশন পেয়েছ?”

সরফরাজ মাথা নিচু করল “না। কিছুই পেলাম না এখনও। স্টিল নো ক্লু”।

নিয়াজি খানিকটা স্কচ গলায় ঢেলে সরফরাজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন “তুমি অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছ না সরফরাজ?”

সরফরাজ বললেন “জি জনাব”।

নিয়াজি বললেন “ওখানে ড্রামা ক্লাস টাস করেছ?”

সরফরাজ মাথা তুলে নিয়াজির দিকে তাকালেন “কেন বলুন তো?”

নিয়াজি বললেন “এখন থেকে ঠিক চব্বিশ ঘন্টা আগে আমার ক্যান্টনমেন্টের রুমে বসে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না আজ কী ঘটতে চলেছে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে আমাকে অনেকগুলো ডিসিশন নিতে হল। এখন আমি এই রুমে। কিছু কোয়ালিটি নিশ্চয়ই আছে আমার মধ্যে, নইলে কী করে এতদূর এলাম?”

সরফরাজ হাসতে চেষ্টা করলেন “এ কী বলছেন স্যার, এ নিয়ে কোন দ্বিমত আছে নাকি?”

নিয়াজি বললেন “তাহলে আমার কেন মনে হচ্ছে তুমি জামাল পাশার ব্যাপারে আমাকে মিথ্যে কথা বলছ?”

সরফরাজ উত্তর দিলেন না।

নিয়াজি স্থির চোখে সরফরাজের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

৩২।

রাতের ট্রেন চলেছে পেশোয়ারের দিকে। আব্বাস আর সায়ক জেনারেল কামরায় উঠেছে। কামরা ভর্তি গরিব মুটে মজুর। অনেকে মাটিতেও বসে আছেন।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। আব্বাস জানলা বন্ধ করে দিয়ে বলল “দেশের বাইরে আছি মনে হচ্ছে না ভাই”।

সায়ক চোখ বন্ধ করে বসে ছিল। বলল “পাকিস্তানে আমার কখনোই সেটা মনে হয় না”।

আব্বাস গলা নামিয়ে বলল “হু, যতক্ষণ না ওদের সঙ্গে তোমার মোলাকাত হয়”।

এক বুড়ো পাঠান শুকনো রুটি চিবাচ্ছিল। আব্বাস করুণ মুখে বলল “কোথায় এখন রাওয়ালপিন্ডির কাবাব খেতাম, ধরে নিয়ে চলে এলে ট্রেনে”!

সায়ক বলল “দুটোর সময় পেশোয়ার পৌছে যাব তো। ফারুক চাচার আড্ডার তন্দুরি কাবাব খাওয়াব। চিন্তা করছ কেন?”

আব্বাস অবাক হয়ে বলল “পেশোয়ারেও ব্রাঞ্চ খুলে রেখছ তুমি?”

সায়ক বলল “তুমিও খোল। কে বারণ করেছে? রাঘব ভাটিয়ার চ্যালা হয়ে থাকলে উন্নতি হবে না জীবনে। তোমার কত ভাগ্য জানো তুমি এই দেশে আসার সুযোগ পেয়েছ? ক’টা ইন্ডিয়ান এই সুযোগ পায়? বালুচিস্তান যাও নি, মহেঞ্জোদারো যাও নি, করাচী বেকারির কেক খাও নি...”

আব্বাস বিড় বিড় করে বলল “টেরোরিস্টের গুলি খাও নি... বলে যাও। বলে যাও...”

সায়ক সিটে হেলান দিয়ে বসে বলল "ওয়ান্স আপন এ টাইম, গোটাটাই ভারতবর্ষ ছিল আব্বাস। তুমি মুজতবা আলী পড় নি, তোমাকে আর কী বোঝাব?"

আব্বাস রেগে গিয়ে বলল "সব সময় পড়ার খোঁটা দেবে না সায়ক, আমি বাংলা জানি না, কী করে পড়ব তোমাদের বাঙালি রাইটারদের বই?"

সায়ক বলল "তা ঠিক। রবীন্দ্রনাথই পড় নি, বেঁচে থেকে কী করবে?"

আব্বাস গোমড়া মুখে বলল "ট্রান্সলেশন পড়েছি"।

সায়ক বলল "রবীন্দ্রনাথ ট্রান্সলেশনে পড়া আর মাংস ছাড়া বিরিয়ানি খাওয়া একই ব্যাপার বুঝলে হে আব্বাস। জীবনে কী করলে তুমি? না ইসলামাবাদে বসে বসে শুধু জাসুসি করে গেলে"।

আব্বাস বলল "আমি জাসুসি করেই খুশি। আমার অত ঘুরে কাজ নেই"।

সায়ক বিদ্রুপের সুরে বলল "তা তুমি ভালই কর। টেররিস্টের ভয়ে খাটের তলায় শুয়ে থেকো এর পরে"।

ট্রেনটা একটা হল্ট স্টেশনে দাঁড়াল। বেশ কয়েকজন সেনা কামরায় উঠে টহল দিয়ে নেমে গেল। খানিকক্ষণ পরে ট্রেন ছাড়ল। আব্বাস শ্বাস রোধ করে বসে ছিল। ট্রেন ছাড়লে বলল "কী ব্যাপার বল তো? এত চাপ কীসের?"

সায়ক একটা হাই তুলল "দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে, এতো রোজকার নৌটঙ্কি। ইসলামাবাদে এতটা আঁচ পাবে না, যতটা দেশের অন্যত্র পাবে। করাচীতে দেখো এতক্ষণে ক'টা লাশ পড়ে গেল"।

আব্বাস বলল "আজব দেশ বটে একটা হ্যাঁ? নিজেরাই নিজেদের মারছে, আজ এখানে ব্লাস্ট করছে, কাল সেখান ব্লাস্ট করছে, আবার শখ কম না। শালাদের কাশ্মীর চাই, হুহ"।

সায়ক বলল "শখই বটে। যার বীজ পুঁতে দেওয়া পলিটিশিয়ানদের। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যে বিদ্বেষের গাছ বেড়ে চলেছে দুই দেশের মানুষের মনে"।

আব্বাস বলল "একটু আস্তে বস। লোকে শুনলে চাপ আছে"।

সায়ক চোখ বুজল।

ট্রেন পনেরো মিনিট লেট করল পেশোয়ার পৌঁছতে।

আব্বাস ঘুমিয়ে পড়েছিল। সায়ক আব্বাসকে ঠেলে তুলল। আব্বাস হাই তুলতে তুলতে বলল "উফ, শান্তি নেই জীবনে। কী করতে যে এই চাকরিতে ঢুকেছিলাম"।

সায়ক বলল "চল চুপচাপ। কথা বোল না"।

স্টেশন পাকিস্তানি আর্মিতে ভর্তি। দুজনে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে স্টেশনের বাইরে গেল।

সায়ক কোন দিকে না তাকিয়ে রাস্তা বরাবর হাঁটতে শুরু করল।

আব্বাস পিছনে পিছনে দৌড়তে দৌড়তে বলল "ও মিয়াঁ, কোথায় যাচ্ছ?"

সায়ক বলল "চুপচাপ চল"।

বেশ খানিকটা দূরে একটা অটো দাঁড়িয়ে ছিল। সায়ক সেটায় উঠে পড়ল।

আব্বাস অবাক চোখে বলল "কী হল?"

সায়ক বলল "উঠে পড়"।

অটোওয়ালা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করেই অটো স্টার্ট করল।

আব্বাস ফিসফিস করে বলল "কী হচ্ছে? একে চেনো? কোথায় যাচ্ছি এত রাতে?"

সায়ক হেসে বলল "ফারুক চাচার তন্দুরি কাবাব! ভুলে গেলে?"

৩৩।

ফারুক কাবাব সেন্টার পেশোয়ার বাজারের এক তস্য গলির ভেতরে। লোক জন না থাকলেও ফারুক শিক কাবাব তৈরী করছিলেন মন দিয়ে।

আব্বাসকে নিয়ে সায়ক যখন পৌঁছল তখন রাত তিনটে বাজে। ফারুক সায়ককে দেখে হাসলেন, বললেন "এতদিন পরে মনে পড়ল চাচাকে? তাও এত রাতে?"

সায়কও প্রত্যুত্তরে হাসল, বলল "চাচা, আব্বা, আম্মি এদের তো দরকারের সময়ই মনে পড়ে চাচা। মনে তো ভরসা ঠিকই থাকে যে তোমরা আছো আমার পিছনে। নইলে বেঁচে থাকতাম কী করে বল?"

ফারুক বললেন "হয়েছে হয়েছে মিয়াঁ। অনেক ঘি দিয়েছ রান্নায়, এবার কী খাবে বল"।

সায়ক বলল "দাওয়াত এ ইশক লাগিয়ে দাও চাচা"।

আব্বাস অবাক চোখে সায়কের দিকে তাকাল।

ফারুক হাসলেন না। বললেন "ভিতরে যাও। আমি আসছি"।

দোকানের মধ্যে একটা দরজায় পর্দা লাগানো। সায়ক আব্বাসকে বলল "এসো"।

দরজা খুলে খানিকটা এগিয়েই একটা কাঠের সিঁড়ি পাওয়া গেল। সায়ক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল। নিচে আব্বাস অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। সায়ক ধমক দিল "কী হল, এসো শিগগিরি"।

দোতলায় একটা ছোট ঘর। সেখানে কম্পিউটার থেকে শুরু করে সব আছে।

আব্বাস সেটা দেখে চোখ বড় বড় করে বলল "ইয়াল্লা!!! এ কী!!! এতো পুরো সাইবার সেল খুলে রেখে দিয়েছে মিয়াঁ"।

সায়ক বলল "তুমি বস। বিশ্রাম কর। কাবাব আসছে"।

সায়ক কম্পিউটারে বসল। কিছুক্ষণ কাজ করে সিকিওর লাইনে তুষারকে ফোন করল।

একবার পুরো রিং হয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার রিং হতেই তুষার ঘুম ঘোরে বললেন "হু"।

"সিকিওর লাইন স্যার। কথা বলা যাবে"।

"ওহ। কোথায় পেলে সিকিওর লাইন?"

"পেশোয়ারে এসেছি। রাঘব ভাটিয়া ইসলামাবাদে অ্যারেঞ্জ করতে পারছিলেন না"।

"মাই গড! পেশোয়ার! সে তো আরও ডেঞ্জারাস জায়গা"।

"চিন্তা করবেন না স্যার। আমি তো মরেই গেছিলাম। ধরে নিন এখন বোনাস সার্ভিস দিচ্ছি। আপনি কোথায় আছেন এখন?"

"কলকাতায়। হাসান মাকসুদকে জামাই আদর করা হচ্ছে। নিজের ভাইঝিকেই কিডন্যাপ করিয়েছে জানোয়ারটা"।

সায়ক হাসল "এসব তো এদের কাছে জলভাত। নিজের দু দিনের বাচ্চাকে যারা সুইসাইড বোম্বার হিসেবে ইউজ করতে পারে তারা সব পারে। কোথায় রেখেছে কিছু ট্রেস করতে পেরেছেন?"

"বাংলাদেশে। আচ্ছা লিভ ইট। আমি এসব দেখছি। তুমি তোমার আপডেট দাও"।

"আজ সকালে জামাল পাশাকে কিডন্যাপ করতে গেছিলাম"।

"শিট! তোমরা মেরেছ?"

"না না। শুনুন আগে পুরোটা"।

"বল। উফ! ঘাম ঝরিয়ে দিলে কথাটা বলে"।

"আমরা টার্গেট ফিক্স করে এগোচ্ছিলাম সেই সময়েই মার্ডারটা হয়"।

ওপাশটা খানিকটা নীরবতা। তারপর তুষার বললেন "কারা ছিল? পাকিস্তানি আর্মি?"

"না"।

"তবে?"

"রেকগনাইজ করা যায় নি স্যার। আমার ধারণা পাকিস্তান আর্মিও এদের খুঁজছে"।

"দিস ইজ ভেরি ডিস্টারবিং সায়ক। এদিকে খানের ওপরেও একটা মার্ডার অ্যাটেম্পট হয়েছিল। কোন মতে বেঁচে গেছে। কবে ফিট হবে ঈশ্বর জানেন। শ্রীনগর ভীষণভাবে ডিস্টার্বড। হাসান মাকসুদ তার আস্তিনের ভেতর কী লুকিয়ে রেখেছে গড নোজ"।

"সামথিং ভেরি ডেঞ্জারাস ইজ কুকিং স্যার। হাসান মাকসুদ মে বি দ্য কি পার্সন"।

"হুহ। কিচ্ছু বলছে না স্কাউন্ড্রেলটা। যত রকম ভাবে সম্ভব জেরা করা হয়েছে। নো ক্লু। যাক, তোমার প্ল্যান বল"।

"স্টিল নো প্ল্যান স্যার। ট্রায়িং টু কালেক্ট ইনফরমেশন"।

"পেশোয়ারে থাকবে ক'দিন?"

"ঠিক নেই স্যার। সব ফারুক চাচার কৃপা"।

"খাও খাও। জিন্দেগী মুবারক হো সায়ক"।

"থ্যাঙ্কস স্যার। জয় হিন্দ"।

"জয় হিন্দ"।

ফোনটা রাখল সায়ক। আব্বাস চোখ বড় বড় করে তার কথা শুনছিল। এবার হায়দ্রাবাদি হিন্দিতে যে কথাটা বলল তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় পাগল করে দে মা কাগজ কুড়িয়ে খাই।

দরজা ঠেলে ঢুকলেন ফারুক। বললেন "নাও, টেংরি কাবাব আর বাখরখানি দিয়ে খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর ভাতিজারা"।

একটাই থালা। মেঝেতে তিনজনে গোল হয়ে বসল। সায়ক বলল "চাচা, আপডেট দাও চাচা। আপডেট চাই"।

ফারুক বললেন "আপডেট বলতে অনন্তনাগে আমার ভাতিজার মেয়ে হয়েছে। বোনঝি পড়াশুনা করতে দিল্লি ইউনিভার্সিটি গেছে। আমার বউ এখনও ভাবে তার স্বামী বাড়ি ফিরে আসবেই একদিন। বাড়ির সামনে যে চিনার গাছটাকে দেখে এসেছিলাম সেটা অনেক বড় হয়ে গেছে"।

আব্বাস বলল "আপনি কাশ্মীরি?"

ফারুক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোকালেন, "আমি যে আসলে কী, তা নিজেই জানি না। আমার পাশের দোকানের ছেলেরা আমায় নিজের বাবার মত দেখে। এই বস্তির দোকানদারেরা আমাকে গুরুর মত মনে করে। আমার কথাতেই সবাই ওঠে বসে। প্রতিটা মানুষের বিপদে আপদে আমিই সবার আগে হাসপাতালে ছুটে যাই। হিন্দুস্তানী হয়ে পাকিস্তানের মানুষের জন্য জান কবুল করি। আমি কী, তোমরাই বল?"

সায়ক হাসল "আপনি একজন প্রকৃত মানুষ ফারুকচাচা"।

ফারুক বললেন "ছাড়ো এসব কথা। তুমি যে খবরটা শুনতে চেয়েছিলে সেটা শোন। সরফরাজ খান পেশোয়ারে এসেছিল দিন দুয়েক আগে"।

সায়ক মুরগীর ঠ্যাঙে একটা জবরদস্ত কামড় দিয়ে বলল "কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ। শানদার, জবরদস্ত, জিন্দাবাদ"।

৩৪।

মিনি গোঁজ হয়ে বসেছিল বেডরুমে। নাজিবের মা কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন "খেয়ে যাও"।

মিনি না করল না। তার খিদে পেয়েছিল। খাওয়ার টেবিলে বসে দেখল ভাত বাড়া হয়েছে।

মিনি হাত ধুয়ে খেতে বসল।

নাজিবের মা চেয়ার নিয়ে তার সামনে বসে বললেন "হাসানভাই এ বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। বনগাঁ পেরিয়ে এক রাত থাকতেন"।

মিনি কিছু বলল না চুপচাপ খেতে লাগল।

নাজিবের মা বললেন "হাসানভাই তোমাকে কোনদিন নাজিবের কথা বলেন নি?"

মিনি বলল "না"।

নাজিবের মা বললেন "পেপের ঝোলটা খাও। আমাদের গাছের"।

মিনি বলল "আমি পেপে খাই না"।

নাজিবের মা বললেন "আগে খেতে না। এখন খাবে"।

মিনি নাজিবের মার দিকে তকাল। ভদ্রমহিলার গলার মধ্যে এক অদ্ভুত জোর এসেছে। সে বলল "না খেলে কী করবেন?"

নাজিবের মা বললেন "আমি মাঝে মাঝে ইন্ডিয়া যাই। বর্ডার পেরিয়েই যাই। অনেক জানাশোনা আছে ওপারে। আনাজপাতির দামও কম। একবার বনগাঁয় গিয়ে দেখেছিলাম একটা গোটা পরিবারকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির বউকে তারা পুড়িয়ে মেরেছিল। তোমাদের ইন্ডিয়াতে আইন কানুন আছে। অনেক নিয়ম আছে। কিন্তু এখন তুমি এই দেশে আছো। থানার শাসন অনেক শিথিল। বেপর্দা বেহায়া মেয়েছেলেকে কীভাবে সহবৎ শেখাতে হয়, তা আমাদের গ্রামের মুরুব্বিরাই বলে দেন। তুমি যদি মনে কর, এখানে থেকে তুমি আমাকে, আমার ছেলেকে শাসানি দেবে, রোয়াব দেখাবে, তোমাকে আমি এইটুকু কথা দিতে পারি, গ্রামের মাঝখানে তোমাকে নিয়ে গিয়ে জামা কাপড় খুলিয়ে যদি গ্রামের মুরুব্বিদের দিয়ে তোমাকে আগাপাস্তালা বেত না মেরেছি, তবে আমার নামও মনোয়ারা বেগম না। অনেক ভাল ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে। খাও, যা দিয়েছি সব খাও"।

নাজিবের মাকে মিনি শান্তশিষ্ট ভদ্রমহিলা ভেবেছিল, যিনি চুপচাপ থেকে কাজ করে যান। হঠাৎ করে নাজিবের মায়ের এই শাসানিসুলভ কথায় সে খানিকটা অবাক হল। না চাইতেও পেপের ঝোল দিয়ে ভাত মাখল।

মনোয়ারা বেগম বললেন "খেয়ে দেয়ে স্নান করবে। খানকতক কাপড় আছে, সব কেচে রোদে দেবে। তোমাকে পড়াবার জন্য আগেই হাসান সাহেব আমাকে একটা বই দিয়ে গেছিলেন। সেটা পড়বে। এর অন্যথা যেন না হয়"।

কথাগুলো বলে মনোয়ারা চেয়ার থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। মিনির সকালে যে আত্মবিশ্বাসটা এসছিল তা অনেকটা ধাক্কা খেল। সে বুঝতে পারল নাজিবের মা মোটেও নরম মেয়েমানুষ নন। বরং যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে কাজ করেন। গতকাল কিংবা আজ সকালে তার কথায় কোন রকম সীন ক্রিয়েট করেন নি। মিনিকে খানিকটা বিশ্রামের সুযোগ দিলেন। তারপরে, খাওয়ার টেবিলে দিব্যি নিজের ক্ষমতাটা বুঝিয়ে দিলেন।

ভাত, ডাল, পেপের ঝোল, মাছ সব একসাথে কোনমতে খেয়ে মিনি উঠল। মনোয়ারা বেগম ঘর থেকে বললেন "কল পাড়ে কাপড়, সাবান সব রাখা আছে"।

বাড়িতে বিশুর মাই জামাকাপড় কাঁচত। মিনিকে করতে হত না। এখানে সে সুযোগ নেই। অনভ্যস্ত হাতে বেশ কিছুক্ষণ কাপড়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে মিনি মিনিট দশেক বাদে রণেভঙ্গ দিল।

মনোয়ারা কল পাড়ে এসে বললেন "কী হল?"

মিনি বলল "আমার অভ্যাস নেই কাপড় কাচার"।

মনোয়ারা বললেন "সব অভ্যেস তো একদিনে হয় না। পুরুষমানুষ গায়ের ওপর উঠবে, সে অভ্যাস ছিল এতদিন? ছিল না তো, এবার হবে। কর, ওভাবেই ধোও, করতে থাকো, ঠিক হবে"।

মিনি স্তম্ভিত হয়ে মনোয়ারার দিকে তাকাল। এরকম কথা যে মহিলা বলতে পারেন সে কল্পনাও করে নি।

মনোয়ারা সেই একই গলায় বললেন “কাল তুমি খুব বেঁচে গেছো। কতদিন বাঁচবে? পাঁচ দিন, ছদিন? মনে রেখো, মেয়ে মানুষের জন্মই হয় পুরুষকে আনন্দ দেবার জন্য। কাল অনেক ক্লান্ত ছিলে বলে তোমাকে আমি কিচ্ছু বলি নি। আমাকে রাগিও না তুমি। আমি রাগলে তোমার কোন ধারণা নেই আমি কী করতে পারি”।

মিনি বলল “জ্যেঠুর সামনে আপনি এভাষায় কথা বলেন বুঝি? পুরুষমানুষ গায়ে উঠবে... এভাবেই বলেন?”

মনোয়ারা বললেন “মেয়েমানুষ নিজেদের মধ্যে যে কথা বলে, আর পুরুষমানুষের সঙ্গে যে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ আলাদা। তোমার বাড়িতে এসব সম্পর্কে ভাল শিক্ষা হয় নি তা তোমার চাল চলন দেখেই বুঝতে পেরেছি। বুক তো ঝোলা মনে হচ্ছে। হাত পড়েছে কতবার? কলকাতায় ছেলে ছোকরা জুটিয়েছিলে বুঝি? কলকাতার মেয়েদের সম্পর্কে তো অনেক কথাই শুনি। পেট বাঁধিয়েছ একবারও?”

মিনি রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

মনোয়ারা শান্ত গলায় বললেন “রাগ হচ্ছে? রাগ করে লাভ নেই। আমাদের বাড়ির সামনে নাজিব মোতালেবকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। বেশি অসভ্যতা করবে, তোমার ওই রক্তমাখা জায়গা দিয়েই মোতালেব তোমাকে যা শাস্তি দেওয়ার দেবে। যাও, কাপড় কেচে আমার ঘরে এসো। কথা আছে”।

মনোয়ারা চলে গেলেন।

মিনির জোরে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু সে কিছুই করল না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

৩৫।

আব্বাস ঘুম থেকে উঠে তীক্ষ্ণ চোখে সায়কের দিকে তাকিয়ে ছিল। সায়ক কম্পিউটারে কাজ করছিল।

আব্বাস বলল “তুমি সারারাত ঘুমাও নি, তাই না?”

সায়ক অন্যমনস্কভাবে বলল “কেন ঘুমাব না? দিব্যি ঘুমিয়েছি”।

আব্বাস রেগে গেল, “হতেই পারে না। আমার যখনই ঘুম ভেঙেছে, তুমি কম্পিউটারে কাজ করছিলে”।

সায়ক বলল “হু”।

আব্বাস বলল “কী হু? আজ কি এখানেই থানা গাড়ার প্ল্যান আছে?”

সায়ক বলল “হু”।

আব্বাস বলল “ধুস! কী হল?”

সায়ক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল “আমেরিকা নিয়াজির সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছে, চীন খুশি। রাশিয়া খুশি। সৌদি খুশি। আর কী চাই?”

আব্বাস বলল “এটা জানার জন্য তুমি সারারাত জেগে বসে আছো?”

সায়ক উঠল, “আমি নিচে গেলাম। তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো”।

আব্বাস লাফিয়ে উঠে বলল “ইয়ার্কি হচ্ছে? সকালের কাজ কর্ম তো করতে দেবে”।

সায়ক ঘড়ি দেখে বলল “সাত মিনিট ম্যাক্সিমাম”।

আব্বাস লাফ ঝাঁপ দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। দশ মিনিট পরে দরজা দিয়ে মাথা বের করে বলল “আর পাঁচ মিনিট দাও প্লিজ, কালকের কাবাব বুঝতেই পারছ, বেরোতে টাইম লাগছে”।

সায়ক বলল “দেরী কোর না”।

দুজনে নিচে নামল আরও মিনিট পাঁচেক পরে। আব্বাস বলল “আমার যদি রাস্তায় আবার পায়, তাহলে কী হবে?”

সায়ক বলল "রাস্তাতেই বসে পড়বে। স্বচ্ছ পাকিস্তান অভিযানের লোকেরা তোমায় ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করবে। আর কী হবে?"

চাচার দোকান থেকে বেরিয়ে দুজনে গলি দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আব্বাস বলল "এবার কোথায় যাব?"

সায়ক বলল "বাজার ঘুরব। বাজার ঘুরতে ভাল লাগে না তোমার?"

আব্বাস বিরক্ত গলায় বলল "সকালবেলা রাস্তায় নামিয়ে মস্করা হচ্ছে মিয়াঁ? আমরা বাজার ঘুরতে বেরিয়েছি"?

সায়ক বলল "আমি তো তোমাকে অপশন দিয়েছিলাম, নাও আসতে পারতে"।

আব্বাস মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল "পাকিস্তানে কখনও একা থাকতে নেই। এটা আমি প্রথম থেকে মেনে চলি। তুমি হারিয়ে গেলে আমার কী হবে?"

সায়ক বলল "কী হবে? চাচা আছে তো"!

আব্বাস বলল "চাচাও যদি হারিয়ে যায়?"

সায়ক হাসল "এ তো সেই গল্পটা মনে পড়িয়ে দিলে"।

আব্বাস ভ্রু কুঁচকাল "কোন গল্পটা"?

সায়ক বলল "সেই যে, একবার ক্লাসে এক স্যার জিজ্ঞেস করেছেন বল তো ছাত্ররা যদি তোমরা জাহাজে করে যাও আর ঝড় উঠে যায়, তাহলে কী করবে?কেউ পারল না। শুধু এক ছাত্র বলল নোঙর ফেলে দেব। স্যার বললেন যদি আবার ঝড় আসে? ছাত্র বলল আবার নোঙর ফেলব। স্যার বললেন যদি আবার ঝড় আসে? ছাত্র বলল আবার নোঙর ফেলব। শেষমেশ স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন এত নোঙর পাচ্ছ কোত্থেকে তুমি? ছাত্র বলল যেখান থেকে আপনি এত ঝড় পাচ্ছেন"।

আব্বাস বলল "ভেরি ফানি। সিরিয়াসলি বল না মিয়াঁ কোথায় যাচ্ছি?"

বড় রাস্তার কাছে এসে সায়ক একটা অটোকে বলল 'মিউজিয়াম চল'।

অটো স্টার্ট দিল। আব্বাস ফিসফিস করে বলল "মিউজিয়ামে কী আছে?"

সায়ক বলল "শহর দেখো। এত প্রশ্ন কেন। বল তো ওটা কার মূর্তি?"

আব্বাস চোখ ছোট ছোট করে দেখে বলল "জিন্নাহ?"

সায়ক বলল "একদম ঠিক। ওই কুলফির দোকানটার নাম কী?"

আব্বাস বলল "শান এ পেশোয়ার"।

সায়ক বলল "এই তো। তুমি শহর চিনতে শুরু করেছ"।

আব্বাস গজগজ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর অটো মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়াল। সায়ক টাকা মিটিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

আব্বাস বলল "ও মিয়াঁ, দেখতে পাচ্ছেন না, মিউজিয়াম তো এদিকে। আপনি উলটো দিকে যাচ্ছেন কেন?"

সায়ক বলল "মিউজিয়াম যাচ্ছি কে বলল তোমায়? অ্যাপ্লাই সাম কমন সেন্স ম্যান!"

আব্বাস বলল "ওহ। তা ঠিক ঠিক। কোথায় যাচ্ছি"?

সায়ক চারদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হতে হতে বলল "ভাল আখরোট কিনতে"।

আব্বাস অবাক গলায় বলল "আখরোট? সে তো কাশ্মীরেও পাওয়া যায়"।

সায়ক রাস্তার এপারে এসে একটা গলিতে ঢুকল। রাস্তার দুপাশে কেবল ড্রাই ফ্রুটসের দোকান। পেশোয়ার পুরনো শহর। বেশ কয়েকটা বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। আব্বাস বলল "ভিন্টেজ জায়গা সত্যি। বোম মেরে উড়িয়ে দিলেও কারও কিছু যায় আসে না"।

সায়ক বলল "আসে। এখানেও মানুষই থাকে আব্বাস"।

আব্বাস বলল "কীসের মানুষ? রোজই তো লাশ পড়ছে পাঠানদের ঝামেলায়"।

একটা বেশ বড় ড্রাই ফ্রুটসের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সায়ক। আব্বাসকে বলল “দাঁড়াও”।

দোকানের ভিতরে একজন বয়স্ক পাঠান বসে আছেন। সায়ক গিয়ে ভদ্রলোককে ফিসফিস করে কিছু বললেন। ভদ্রলোক উঠে একটা ছেলেকে ডাকল।

আব্বাস দেখতে পেল ছেলেটা সায়ককে কিছু বলছে।

একটু পরে ছেলেটাকে নিয়ে সায়ক দোকান থেকে বেরিয়ে আব্বাসকে বলল “চল”।

আব্বাস অবাক গলায় বলল “কোথায়?”

সায়ক বলল “চল চল”।

আব্বাস বলল “কিছুই বুঝছি না”।

সায়ক বলল “বুঝতে হবে না। চল”।

সায়কের সঙ্গে যে ছেলেটা এসেছিল সে বেশ জোরে হাঁটছিল। সায়ক আর আব্বাসকে প্রায় দৌড়তে হচ্ছিল।

খানিকক্ষণ পর ছেলেটা বড় রাস্তা পার্ক করে রাখা একটা গাড়িতে উঠে দরজা খুলে দিল।

সায়ক বলল “চল”।

আব্বাস বলল “কোথায়?”

সায়ক হাসল “জন্নত”।

৩৬।

রেহানের বাড়িতে প্রচুর খেতে হল বীরেনকে। বাড়ির সামনে প্রচুর নিরাপত্তারক্ষী দেখে বীরেন অবাক হয়ে রেহানের দিকে তাকিয়েছিল। রেহান হেসে বলেছেন “কী আর করবে বল, নিজভূমেই পরবাসী এখন আমরা। কাশ্মীরে আজকাল ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের চাকরি করাটাও গুণাহ”।

লাঞ্চের পর রেহান বীরেনকে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন “বিশ্রাম নাও। সায়ক এলে এখানে এই ঘরেই থাকে। ঘন্টাখানেক পরে তোমাকে হসপিটালে নামিয়ে দিয়ে আমি অফিসে বেরিয়ে যাব”।

বীরেন ঘরটা দেখল। পরিচ্ছন্ন ছিমছাম একটা ঘর। বইয়ের আলমারিতে প্রচুর বই। একটা বাংলা ভাষায় লেখা গীতাঞ্জলীও দেখতে পাওয়া গেল।

রেহান তাকে জামাকাপড় দিয়েছিলেন, সেগুলো পরে বীরেন আধ ঘন্টা মত চোখ বুজল। বাড়িতে ফোন করে বাবা মার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে আবার তৈরী হয়ে বেরোল।

রেহানও তৈরী হয়ে গেছিলেন, দুজনে বেরোল যখন তখন বিকেল সাড়ে চারটে।

রেহান ড্রাইভারকে বললেন “ওকে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে আমাকে অফিসে পৌঁছে দিও”।

খানিকক্ষণ পরে গাড়ি বড় রাস্তায় উঠল। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

বীরেনের ফোন বাজছিল। বীরেন দেখল তুষার স্যার ফোন করছেন, ধরল সে “হ্যাঁ স্যার”।

“বীরেন আমার আর্মি হসপিটালের ইনচার্জের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। কাল সকালে খানকে নিয়ে তোমাকে দিল্লি আসতে পারবে। চপারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে”।

“ওকে স্যার”।

“আমি রেহানকে ইন্সট্রাকশন দিয়ে দেব তোমাকে কী করতে হবে, তুমি চিন্তা কোর না, ও তোমাকে গাইড করে দেবে”।

“হ্যাঁ স্যার। নো প্রবলেম, রেহান স্যারের বাড়িতেই লাঞ্চ করেছি আজ। আমার পাশেই বসে আছেন উনি। কথা বলবেন?”

“ওহ, তা হলে তো খুব ভাল। দাও”।

বীরেন রেহানকে ফোনটা দিল। রেহান কিছুক্ষণ তুষারের সঙ্গে কথা বলে ফোনটা রেখে বললেন "স্যার রিস্ক নিতে চাইছেন না মনে হয় কাশ্মীরে রেখে"।

বীরেন বলল "অন্য কিছুও হতে পারে। দিল্লিতে এইমস আছে, স্যার ওখানেও ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন খান স্যারকে"।

রেহান বললেন "তা ঠিক। তুমি তাহলে কালকে কাশ্মীর ছাড়ছ। আশা করব আবার আমাদের দেখা হবে খুব শিগগিরি"।

বীরেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় তাদের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হল। এক ভদ্রলোক বাইকে যাচ্ছিলেন, উল্টোদিক থেকে আসা একটা গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। ভদ্রলোক ছিটকে পড়লেন রাস্তায়। গাড়িটা দাঁড়াল না ভয়েই হয়ত। স্পিড বেরিয়ে গেল।

আনোয়ার গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। রেহান বললেন "শিট! তারেক অ্যাম্বুলেন্সে ফোন কর জলদি"।

তারেক বলল "স্যার অ্যাম্বুলেন্স আসতে তো সময় লাগবে। আমরা তো হসপিটালেই যাচ্ছি, ভদ্রলোককে গাড়িতে তুলে নিই বরং"।

রেহান একটু ভেবে বললেন "বেশ। তবে আর কাউকে না। ওঁকেই তোল"।

রাস্তায় লোক জমে গেছিল। তারেক বেশ লম্বা চওড়া চেহারার যুবক। ভদ্রলোককে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়িতে বীরেনের পাশে বসালেন। ভদ্রলোক কাতরাচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন "শুক্রিয়া সাব। আল্লাহ আপনাদের ভাল করবে"।

রেহান বললেন "আপনি ঠিক আছেন তো?"

ভদ্রলোক যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে বললেন "পায়ে খুব ব্যথা করছে। আর বাইকটার কী হবে বুঝতে পারছি না। বাড়ি ফিরছিলাম এখন অফিস থেকে"।

রেহান বললেন "বাইকের চিন্তা আপনাকে করতে হবে না, আমি ফোন করে দিচ্ছি"।

রেহান ফোন বের করে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে রাস্তার নাম বলে বাইকের বর্ণনা দিয়ে বললেন বাইকটা আপাতত থানায় নিয়ে গিয়ে রাখতে। পরে ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন।

তারেক ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন "আপনার বাড়ি কোথায়?"

ভদ্রলোক বললেন "মুঘল মহল্লায়"।

তারেক বললেন "সে তো উল্টোদিকে। আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

ভদ্রলোক বললেন "আমার মেয়ে থাকে। ওর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম"।

তারেক বকবক করে যেতে লাগল ভদ্রলোকের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে তাদের গাড়ি আর্মি হসপিটালে পৌঁছল।

রেহান বললেন "আপনি হসপিটালের ভেতরে যান, আপনার ফার্স্ট এইডের জন্য আমি বলে দিচ্ছি। যদিও এখানে সিভিলিয়ানদের চিকিৎসা হয় না, তবু আমি বলে দিচ্ছি, চিন্তা করবেন না"।

ভদ্রলোক বললেন "আপনাকে অনেক শুক্রিয়া সাহাব"।

তারেক ভদ্রলোককে হাসপাতালের আউটডোর অবধি নিয়ে গেল।

রেহান বললেন "আমি এলাম বীরেন, তুমি আশরফের সঙ্গে দেখা করা হয়ে গেলে আমাকে জানিও, আমি আনোয়ারকে পাঠিয়ে দেব। আজ রাতটা আমার অতিথি হয়েই থেকো। গেস্ট হাউজে যেতে হবে না"।

বীরেন আপত্তি করতে যাচ্ছিল, রেহান হাত তুলে বললেন "কোন কথা না। এখানে আমি তোমার বস। ভুলে যেও না"।

বীরেন আর কী বলবে। রেহানের কথার ওপরে কথা বলতে পারল না। কিন্তু রাতেও দুপুরের মত অত খেতে হবে ভেবেই সে ভয় পেয়ে গেল।

আই সি ইউর সামনে পৌছতেই একজন সিস্টার এসে বললেন "আপনি বীরেন?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ"।

সিস্টার বললেন "আপনাকে স্যার খুঁজছেন। যান"।

বীরেন তড়িঘড়ি আই সি ইউর ভিতরে গেল। খান স্যার তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন "ভাল তো?"

বীরেন বলল "আপনি বলুন স্যার কেমন আছেন আপনি?"

খান স্যার বললেন "দিব্যি। বেঁচে গেলাম এ যাত্রায়। আল্লাহ তোমাকেই পাঠিয়েছিলেন এবার আমাকে বাঁচাতে"।

বীরেন বলল "আপনি আমাকে খুঁজছিলেন?"

খান চোখ বন্ধ করলেন। তারপর বললেন "হ্যাঁ। শোন বীরেন, এখন যে কথাটা বলছি সেটা কাউকে বলবে না, শুধু তুমি আর আমি জানি। তুষার স্যারের সঙ্গে দেখা হলে তবেই বলব। ফোন ব্যাপারটা আমার এখন আর সেফ মনে হচ্ছে না"।

বীরেন বলল "হ্যাঁ স্যার, বলুন"।

খান বললেন "কলকাতা পৌঁছে আমি একটা থ্রেট মেইল পাই। তুষার স্যারকেও বলি নি কথাটা"।

বীরেন বলল "কী ছিল মেইলে?"

খান বললেন "আমি যেন কাশ্মীর না যাই। এখানে নাকি আমার কবর প্রস্তুত হয়ে আছে। আমি তখন পাত্তা দিই নি ব্যাপারটা। এবারে মনে হচ্ছে পাত্তা না দেওয়াটা ভুল ছিল। আর যারা মেইল পাঠিয়েছিল, তারা খুব ভাল করে জানত আমি কার্গিল যাব। এর মানে হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ভেতর থেকে খবর লিক হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে দে আর প্ল্যানিং সামথিং বিগ হিয়ার, যার জন্য আমাকে শুধু থ্রেট দিয়েই থেমে থাকে নি, প্রায় মেরেই ফেলেছিল"।

বীরেন কিছু একটা বলার আগেই তার ফোন বেজে উঠল। দেখল রেহান ফোন করছেন। সিস্টার দূর থেকে আপত্তি জানালেন, "বাইরে গিয়ে ফোন ধরুন"।

বীরেন বলল "রেহান স্যার ফোন করছেন"।

খান বললেন "ঠিক আছে, তুমি ফোনটা ধরে এসো"।

বীরেন আই সি ইউ থেকে বেরিয়ে ফোনটা রিসিভ করল। ওপাশ থেকে রেহানের উত্তেজিত গলা ভেসে এল "বীরেন। তুমি খানের কাছেই আছো তো?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ, কেন স্যার?"

রেহান বললেন "ওখানেই থাকো। আমি সিকিউরিটি পাঠাচ্ছি আরও। এই মাত্র ট্রাফিক থেকে ফোন এসেছিল। যে লোকটা আমাদের সঙ্গে এল, সে একটা বাইক ছিনতাই করে পালাচ্ছিল। কী আশ্চর্য আজকাল চোর ছ্যাঁচড়ের চেহারা দেখেও চিনতে পারছি না আমি। যাই হোক, এর মানে হল হসপিটালে ঢোকাই ওর লক্ষ্য ছিল, অ্যাক্সিডেন্টটাও প্রি প্ল্যানড। আমি আসছি এখনই। তার আগে অবধি আশরফের দায়িত্ব তোমার"।

বীরেন ফোনটা রেখে আই সি ইউতে দৌড়ল।

৩৭।

জ্যোতির্ময়কে ইন্টারোগেশন টেবিলে হাত পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে। প্রায় আট ঘন্টা জল দেওয়া হয় নি।

জ্যোতির্ময় একবারও কিছু খেতে চান নি। চোখ বুজে বসে আছেন। মাঝে মাঝে পা দোলাচ্ছেন। তুষার বাইরে থেকে বেশ কিছুক্ষণ জ্যোতির্ময়কে দেখছিলেন।

পীযূষ এসে বললেন "স্যার। একজ্যাক্ট লোকেশন ট্রেস করেছে রাসেল। জায়গাটা বর্ডার থেকে বেশি দূরে না"।

তুষার বললেন "হু"।

পীযূষ উত্তেজিত গলায় বললেন "কিছু তো করতে হবে স্যার?"

তুষার পীযূষের দিকে তাকিয়ে বললেন "কী করব বল? মিনিস্টার আমার ফোনই ধরছেন না। আরেকটা কান্ট্রির টেরিটরিতে গিয়ে অপারেশন চালানোটা উইদাউট পারমিশন কিছুতেই করা যাবে না"।

পীযূষ বললেন "মেয়েটার বাড়ি থেকে বেশ কয়েকবার আমাদের ফোন করেছে স্যার"।

তুষার ম্লান মুখে বললেন "আমাকেও করেছে। ধরি নি একবারও"।

পীযূষ বললেন "বিডি আরের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করব? এখন মিজানুল হক সাহেব আছেন ওপাশে, ভদ্রলোক বেশ অনেস্ট অফিসার"।

তুষার পীযূষের দিকে তাকালেন "বেশ। তুমি কন্ট্যাক্টগুলো রেডি কর। আমি দেখছি"।

পীযূষ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তুষার জ্যোতির্ময়ের ঘরে প্রবেশ করলেন। জ্যোতির্ময় উঠলেন না। চোখ বুজে বসে রইলেন।

তুষার বললেন "মেয়েটাকে শুনলাম আপনিই কোলে পিঠে করে বড় করেছেন?"

জ্যোতির্ময় উত্তর দিলেন না।

তুষার বললেন "ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া সম্পর্কে আপনার জেহাদ কী বলছে মিস্টার মাকসুদ?"

জ্যোতির্ময় এবার চোখ খুলে বললেন "আমার ভাইঝিকে আমি আপনার থেকে বেশি ভালবাসি মিস্টার তুষার রঙ্গনাথন। আমি ওর জন্য যে ছেলেকে ঠিক করে দিয়েছি, সে এসব করবে না"।

তুষার হাসলেন "বটে? তা গোটা হিন্দুস্তানে একটা ছেলে পেলেন না? বাংলাদেশ যেতে হল?"

জ্যোতির্ময় আবার চোখ বুজে বললেন "ছেলের বাবা বাংলাদেশী নয়। পাকিস্তানি"।

তুষার বললেন "ওহ। তা এত পাকিস্তানপ্রীতি কেন আপনার? না, মানে পাকিস্তান সম্পর্কে আমার কোন অন্ধ জাতিগত বিদ্বেষ নেই, তবু জানতে ইচ্ছা হয় বই কি"।

জ্যোতির্ময় বললেন "রোজার মাস ছাড়া রোজা করাচ্ছেন অফিসার। আপনার ঈশ্বর পাপ দেবে তো"।

তুষার বললেন "আমার কোন ঈশ্বর নেই হাসান মাকসুদ। যে থাকুক বা না থাকুক, যার থাকা বা না থাকায় আমার জীবনে কোন হের ফের হবে না, তার অস্তিত্বকে আমার মেনে নিতে সমস্যা আছে। আপনি তো প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। আপনার কখনো মনে হয় নি, ধর্মের দোহাই দিয়ে এইসব খুনোখুনি আদতে আমাদের কোথাও নিয়ে যায় না?"

জ্যোতির্ময় শব্দ করে হেসে বললেন "যাবে, যাবে, নিয়ে যাবে। আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? উনি ঠিক নিয়ে যাবেন আমাদের সবাইকে, যেখানে আমরা যেতে চেয়েছিলাম"।

তুষার বাঁকা গলায় বললেন "কোথায় যেতে চেয়েছি আমরা হাসান মাকসুদ? সিরিয়া? না সোমালিয়া?"

জ্যোতির্ময় বললেন "জল খাওয়ান"।

তুষার বললেন "আপনার ঈশ্বরকে বলুন না। ঠিক জলের ব্যবস্থা করে দেবে। খেতেও উনিই দেবেন। আমরা খামোখা কেন আপনার জন্য ক্যান্টিনের ভাত ডাল নষ্ট করব বলুন?"

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বললেন "কেউ বাঁচবে না। কেউ বাঁচবে না। সবাইকে ওর কাছেই যেতে হবে"।

তুষারও হাসলেন। বললেন "বেশ তো। যাবে। তা ওখানে গিয়ে কী হবে? আপনি তো এককালে হিন্দু ছিলেন। আপনিই বলুন। ওর কাছে গিয়ে কী হবে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "সব হিসেব নেবেন উনি"।

তুষার বললেন "কেন? উনি কি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট? ওঁর খেয়েদেয়ে কাজ নেই বসে বসে সবার হিসেব নেবেন? আচ্ছা হাসান, আপনি তো সেক্সুয়ালি ফ্রাস্ট্রেটেড লোকও তো নন। দিব্যি বউ আছে, নিশ্চয়ই অ্যাক্টিভ সেক্স লাইফও ছিল। আপনি এরকম করে পেগলে গেলেন কেন হঠাৎ করে?"

জ্যোতির্ময় রাগী চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "পার্সোনাল কথা না বললেই খুশি হব আমি"।
তুষার বললেন "আপনার মানবাধিকার বাঁচাতে কেউ আসবে না হাসান মাকসুদ। চিন্তা করবেন না। ওহ, আপনার জন্য একটা জিনিস আছে"।
তুষার মোবাইল বের করে গ্যালারি থেকে একটা ছবি বের করে জ্যোতির্ময়ের সামনে রেখে বললেন "আপনার ছেলে। কুকুরের মত গুলি খেয়ে মেরেছে। এটা আপনার ঈশ্বরের কেমন বিচার বলে আপনার মনে হয়?"
জ্যোতির্ময় চোখ খুলে বেশ কিছুক্ষণ ছবিটা দেখে তুষারের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন "আমার ছেলের ওপর আমার গর্ব হয়। আই অ্যাম প্রাউড অফ মাই সান"।
তুষার হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "তা ঠিক, বড় বড় খুনি মাফিয়ারাও এভাবেই নিজের বিপথগামী ছেলে মেয়েদের নিয়ে গর্বিত হন। আপনি কেন তার ব্যতিক্রম হবেন?"
জ্যোতির্ময় বিড়বিড় করে বললেন "কেউ বাঁচবে না। কেউ বাঁচবে না। সবাই আমার ছেলের কাছেই যাবে"।
তুষার মিনিট দুয়েক জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারদের বললেন "ইলেকট্রিক শকের ব্যবস্থা করুন"।

৩৮।

শহর থেকে একটু দূরে একটা বিরাট বড় মহল্লার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ছেলেটা। সায়ক আর আব্বাস গাড়ি থেকে নামলে ছেলেটা সায়ককে বলল "আমি এখানেই অপেক্ষা করছি"।
সায়ক বলল "ঠিক আছে"।
আব্বাস বলল "এটা কোথায়?"
সায়ক বলল "তোমাকে বলেছিলাম তো। জন্নত। পেশোয়ারের ব্রোথেল। পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্রোথেলগুলোর মধ্যে একটা। কেউ কেউ বলে মুঘল হারেমে পেশোয়ারের বারবনিতাদের চাহিদা তুঙ্গে ছিল। বাদশাহ হুমায়ূনের একজন পেশোয়ারের মেয়েমানুষ ছিলেন যিনি নাকি বাদশার নাকে দম দিয়ে রেখে দিতেন"।
আব্বাস জিভ কেটে বলল "তওবা তওবা মিয়াঁ, দেশের কাজ করতে গিয়ে তুমি এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?"
সায়ক বলল "ভাল জায়গা তো। সব রকম অভিজ্ঞতা করা উচিত"।
আব্বাস গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। সায়ক আব্বাসের হাত ধরে টানতে লাগল। আব্বাস বলল "আমি যাব না, প্লিজ মিয়াঁ, খুব ঝামেলা হয়ে যাবে আমি যদি যাই"।
সায়ক কড়া গলায় বলল "কাজে এসেছি আব্বাস, ফালতু সীন ক্রিয়েট কোর না"।
আব্বাস দাঁড়িয়ে পড়ে বলল "কোন কাজে?"
সায়ক বলল "চল, না গেলে বুঝবে কী করে?"
আব্বাস আর প্রতিবাদ করল না। হাঁটতে শুরু করল।
গলির শুরুতেই বিভিন্ন কোণ থেকে আহ্বান আসা শুরু করল। বেশ কয়েকজন পাঠান দরদাম করছে রাস্তায় দাঁড়িয়েই। সায়ক কোন দিকে না তাকিয়ে গলি দিয়ে হেঁটে একটা বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার সামনে বেশ কয়েকজন মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সায়ক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল "কাজল বেগমকে কোথায় পাব?"
মেয়েগুলো চটুল অঙ্গভঙ্গি করছিল এতক্ষণ ধরে। সায়কের কথায় মুখ চাওয়া চাউয়ি করে বলল "আন্দার। বারো নম্বর ঘর"।

সায়ক আব্বাসকে বলল "এসো"।

বাড়িটা অনেক পুরনো হলেও দেওয়াল বিভিন্ন উত্তেজক ছবিতে ভর্তি। নুপুরের শব্দ ভেসে আসছিল কোন একটা ঘর থেকে। সায়ক দেখল একেকটা ঘরের একেকটা নম্বর। একটু খুঁজতেই বারো নম্বর ঘরটা দেখতে পেল। সে দরজায় নক করল।

ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল "বাদ মে আ। কাস্টমার হে"।

সায়ক আবার নক করল।

এবার ঘরের ভিতর থেকে মহিলা কণ্ঠে তীব্র গালাগাল ভেসে এল। আব্বাস মুখ কুচকাল। সায়ক মুখ অবিকৃত করে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজা খুললেন এক মাঝবয়সী মহিলা। কামিজের অনেকটা অংশ খোলা। ঘরের ভিতর এক বুড়ো পাঠান হাফ প্যান্ট পরে বসে আছে। আব্বাস চোখ বন্ধ করল।

মহিলা তেড়ে বললেন "ক্যা রে! আমি যা বলেছি শুনতে পাস নি?"

সায়ক বলল "হ্যায় আপনা দিল তো আওয়ারা। হেমন্তজী"।

মহিলাটি সায়কের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর খাটে বসা পাঠানকে বকে ঝকে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করলেন।

ছোট ঘর। একটা ছোট টিভি চলছে। এঘরেও বাইরের ঘরের মতই বিভিন্ন পোস্টার।

সায়ক বলল "ফারুকচাচা আপনাকে ইয়াদ করেছেন কাজলজী"।

কাজল বেগম সালওয়ার ঠিক করতে করতে বললেন "হ্যাঁ। সে তো তোমার মুখে হেমন্তজী শুনেই বুঝেছি। ফোন করেছিলেন। আমার জান বাঁচিয়েছিলেন ফারুক মিয়াঁ। আমার জান কবুল ওঁর জন্য। বল আমি কী করতে পারি"।

আব্বাস অবাক চোখে ঘরের চারদিকে দেখছিল।

সায়ক আব্বাসকে একটা চিমটি কেটে বলল "এই কিছুদিন আগে একজন খুব বড় কোন লোক আপনাদের এখান থেকে চারটে মেয়েকে কোথাও পাঠাতে বলে গিয়েছিলেন?"

কাজল বেগম বললেন "হ্যাঁ। অনেক টাকা দিয়েছেন। উপরওয়ালা ওঁর ভাল করবেন"।

সায়ক বলল "মেয়েগুলো কোথায় গেছে জানা যাবে?"

কাজল বেগম অবাক চোখে বললেন "কেন বল তো?"

সায়ক বলল "দরকার ছিল। ফারুকচাচারই কাজ ছিল একটা"।

কাজল বেগম অবিশ্বাসী মুখে বললেন "কী যে বল! যে লোকটা কোনদিন এখানেই এলেন না, তিনি খোঁজ করবেন ওই মেয়েগুলোর?"

সায়ক পকেট থেকে বেশ কিছু পাকিস্তানি টাকা কাজল বেগমের হাতে দিয়ে বলল "ফারুকচাচার খুব জরুরি দরকার চাচীজান"।

কাজল বেগম টাকাটা নিলেন, কিন্তু মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন "চাচী হোগি তেরী মা। অভি তো মে জওয়ান হু"।

সায়ক বলল "তা ঠিক তা ঠিক। আমি অনেক দিন পর আপনার মত একজন সুন্দরী দেখলাম"।

কাজল বেগম সায়কের গালে একটা টোকা দিয়ে বললেন "থাক থাক। তোমার বয়সী আমার একটা ছেলে আছে বুঝেছ?"

আব্বাস জোরে জোরে কাশতে লাগল। সায়ক আবার আব্বাসকে চিমটি কাটল।

সায়ক বলল "তাহলে তো আরও ভাল হল। প্লিজ দিন না অ্যাড্রেসটা"।

কাজল বেগম কয়েক সেকেন্ড সায়কের দিকে তাকিয়ে বললেন "তোমাদের দুজনকে দেখে তো পাঠান বলে মনে হচ্ছে না! তোমরা কারা? এই ঠিকানা দিয়ে কী করবে তোমরা?"

সায়ক বলল “আমার কোন দরকার নেই বিশ্বাস করুন। ফারুক চাচা চেয়েছিলেন”।

কাজল বেগম অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন “আমাদের ব্যবসায় উসুল আছে। কারও সম্পর্কে কোথাও মুখ খুলতে নেই। কিস্যা এই দালানেই শুরু হবে, এই দালানেই শেষ হবে। শুধু আমার জীবনে কয়েক জন মানুষ আছেন যাদের জন্য আমি সব রকম নিয়ম ভাঙতে তৈরী থাকি। তোমাদের কপাল ভাল তোমরা ফারুকভাইয়ের লোক। নইলে সুস্থ শরীরে এখান থেকে তোমাদের বেরোতে দিতাম না”।

আব্বাস ঘামতে শুরু করল।

কাজল বেগম খাটের তোষকের তলা থেকে একটা কাগজ বের করে সায়কের হাতে দিয়ে বলল “ইয়াদ কর লো। হয়ে গেলে কাগজটা আবার আমাকে দিয়ে দাও”।

সায়ক একবার দেখেই কাগজটা কাজল বেগমের হাতে দিয়ে দিল।

কাজল বেগম অবাক হয়ে বললেন “হয়ে গেল?”

সায়ক হাসল “হয়ে গেল। আসি মা জী”।

কাজল বেগম এবার আর মুখ ঝামটা দিলেন না। বললেন “ফারুক সাবকে আমার সেলাম দিও। সাবধানে যেও। গলির মুখের আওয়ারা ছেলেগুলো কিছু বললে আমার নাম বলবে। আর কিছু বলবে না”।

সায়ক বলল “শুক্রিয়া”।

কাজল বেগম চুপ করে রইলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে সায়ক জোরে হাঁটতে শুরু করল।

আব্বাস বলল “উফ! জান বেরিয়ে গেছিল! হয়েছে তোমার কাজ?”

সায়কের মুখে হাসি ফুটে উঠল “হ্যাঁ। চল এবার জাহান্নামটা দেখে আসি”।

৩৯।

বিকেল হয়েছে। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি ভিজেছে, খানিকটা জল জমেছে। মোতালেব আলী খুরপি দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল। মনোয়ারা বেগম ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন “নজর রাখবি। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি”।

মোতালেব আলী মাথা নাড়ল। সে বোবা। তবে কালা নয়। কানে শুনতে পায়।

বড় সড় চেহারা। বসে থাকতে পারে না। কিছু না কিছু কাজ করেই যাবে সব সময়।

মিনি ঘরে শুয়েছিল। কাপড় কাচার ফলে তলপেটে চাপ পড়েছিল। অনেকটা ব্লিডিং হচ্ছিল তার।

মনোয়ারা বেগমকে বেরোতে দেখে মিনি দরজা খুলে বেরোল।

মোতালেব মাটিতে বসে ছিল। মিনিকে বেরোতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

মিনি মোতালেবের দিকে তাকিয়ে রইল। মোতালেব চোখ নামাল।

মিনি বাড়ির সামনের বসার জায়গাটায় বসল। বাড়ির সামনে এক চিলতে বাগান করার জায়গা। তারপরে রাস্তা শুরু। মাটির রাস্তা।

পাশের বাড়িটা এ বাড়ি থেকে একটু দূরে। মিনি কৌতূহলী হয়ে সেদিকে তাকাল। বাড়ির ভেতর থেকে টিভির শব্দ আসছে। জোরে চ্যাঁচানোর ইচ্ছাটা মিনি দমন করল।

বাংলাদেশের কথা অনেকবার শুনেছে বাড়িতে, মিনির পড়ে গেল বাবা প্রায়ই বলত বাংলাদেশে বেড়াতে যাবার কথা। কিন্তু কোনদিন সুদূর কল্পনাতেও ভাবতে পারে নি, তাকে এভাবে এ দেশে আসতে হবে।

একটা বড় গাড়িতে এল নাজিব। বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে এসে তাকে বলল “কী দেখছ? মোতালেবকে? নিজে কথা বলতে পারে না কিন্তু মেয়েছেলেদের মুখ থেকে নানা দাদার নাম বের করে আনতে পারে”।

মিনি নাজিবের দিকে তাকাল না। চুপ করে বসে থাকল।

নাজিব মিনির হাত ধরে বলল “চল ঘরে চল”।

মিনি বলল “হাত ছাড়ুন”।

নাজিব বলল "আমি ভাল ভাবে নিয়ে যাচ্ছি, গেলে চল, নইলে কিন্তু মোতালেবকে ডাকব"।

মিনি ঘেন্নার চোখে নাজিবের দিকে তাকিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে ঘরের ভিতর রওনা দিল।

নাজিব ঘরে এসে তার সামনেই জামা, প্যান্ট ছেড়ে স্যান্ডো গেঞ্জি আর জাঙ্গিয়া পরে খাটে বসে বলল "তোমার রক্তপাত কবে শেষ হবে?"

মিনি বলল "জানি না"।

নাজিব বলল "সত্যিই পড়ছে তো, নাকি মিথ্যা মিথ্যি?"

মিনি বলল "দেখতে পারেন। দেখবেন?"

নাজিব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল "দেখব দেখব, এত জলদি কীসের?"

মিনির কান মাথা ঝা ঝা করছিল। সে ঘরের বাইরে গেল।

নাজিব উঠে মিনির হাত ধরে খাটে তার পাশে বসিয়ে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল "কোই যাও, কোলে বস না"।

মিনি বলল "আমার শরীর খারাপ। আপনি আমাকে না ধরলেই খুশি হব। আর দয়া করে পোশাক পরুন"।

নাজিব মিনির ঘাড়ে একটা চুমু খেল। মিনি ছিটকে গেল। নাজিব হাসতে হাসতে বলল "কী হল? এত লজ্জা কেন তোমার?"

মিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল "আপনাকে বলেছি আমার শরীর খারাপ। এসব কেন করছেন?"

নাজিব বলল "শরীর খারাপ তো কী হয়েছে? এদিকে আসো না, তোমাকে দেখাচ্ছি শরীর খারাপ থাকলেও শরীর ভাল করা যায়"।

নাজিব নিজের জাঙ্গিয়ায় হাত দিল।

মিনি আর পারল না। হড় হড় করে বমি করে দিল। নাজিব হাসতে হাসতে বলল "ওরে আমার ভদ্র মাগী রে, কত ভদ্র মাগী। তোর কপালে যে কী আছে তা তুই নিজেও জানিস না"।

মিনি বাথরুমে দৌড় দিল। দরজা বন্ধ করে কল ছেড়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল।

৪০।

ইসলামাবাদ প্রেসিডেন্ট ভবন বা আইয়ান এ সদর।

নিয়াজির ঘুম ভাঙল সকাল ন'টায়। ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গেছিল। অন্য বিছানায় ঘুম আসে না চটজলদি।

শেষ রাতের দিকে তার ইচ্ছা হচ্ছিল ক্যান্টনমেন্টে নিজের কোয়ার্টারের বিছানাতে গিয়েই ঘুমাবেন। অনেক পরে ঘুম এসেছিল।

ঘুম ভেঙে উঠে জেনারেল নিয়াজি জানলা খুললেন। নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ল তার যখন করাচীর রাস্তায় ক্রিকেট খেলতেন বন্ধুদের সঙ্গে। জানলার বাইরের লনটা কী সুন্দর। মাঠের অভাবে তাদের রাস্তায় খেলতে হত। আর এখানে মাঠ পড়ে আছে খেলার ঠিক নেই।

নিয়াজি ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে সবার আগে ফোন করলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ আলি আব্বাসকে। আব্বাস তার ফোন পেয়ে খানিকটা ঘাবড়েই গেলেন।

নিয়াজি বললেন "পাকিস্তান ক্রিকেটের কী হাল আব্বাস?"

আব্বাস বললেন "হাল খুব একটা ভাল না স্যার। আমাদের দেশের মাটিতেই কোন দেশ খেলতে আসতে চায় না নিরাপত্তার অভাবে। ইন্ডিয়া পাকিস্তান সিরিজ একটা হলে তো খুবই ভাল হত যেমন জেনারেল মুশারফের আমলে হয়েছিল"।

নিয়াজি বললেন "আমি ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সিরিজ করার ব্যবস্থা করুন"।

আব্বাস ইতস্তত করে বললেন “কিন্তু স্যার সিকিউরিটি… বিশেষ করে জামাল পাশা স্যারের…”

নিয়াজি বললেন “সেটা আমি বুঝব। আপনি ব্যবস্থা করুন। এই সিরিজের ফলে প্রচুর রেভিনিউ আসবে যেটা আমাদের ইমিডিয়েটলি দরকার। আর শুনুন, দেশের প্রতিটা শহরে ক্রিকেট অ্যাকাডেমী তৈরী করুন। বাচ্চাদের খেলার মাঠের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরী করুন। আমি চাই পরের ওয়ার্ল্ড কাপ যেন পাকিস্তানে আসে”।

আব্বাস বললেন “ইয়েস স্যার। কিন্তু এর জন্য কিছু গ্র্যান্টের দরকার হবে”।

নিয়াজি বললেন “আপনি ফাইল তৈরী করুন। আজ বিকেলেই আসুন আমার হাউজে। আমি কথা বলব আপনার সঙ্গে সামনা সামনি”।

আব্বাস বললেন “ওকে স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ”।

নিয়াজি ফোন রাখলেন। তার মনে হল, আর্মি জীবনে যে শৃঙ্খলা পালন করে চলতে হয়, একটা দেশের কর্ণধারের তো সে বালাই নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, স্বয়ং ঈশ্বরের সমতুল্য। চাইলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

ইংলিশ ব্রেকফাস্ট করলেন। খেয়ে হাউজ থেকে বেরিয়ে সিকিউরিটি চিফ মাসুদ হককে বললেন “কনভয় বের করুন। আমি শহর ঘুরতে চাই”।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইসলামাবাদের বিভিন্ন এলাকায় নিয়াজি গাড়ি দাঁড় করালেন। কখনও শহরের মেয়রকে বকা ঝকা করলেন, কখনও সেনা ছাউনিতে গিয়ে সেনাদের সঙ্গে কথা বললেন। কোথাও বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা দেখে কনভয় দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের বললেন বাচ্চাদের চকলেট বিলি করতে। এক অদ্ভুত প্রশান্তি বোধ করছিলেন। একটু একটু করে বুঝতে পারছিলেন দেশের নেতা মন্ত্রীরা কেন শত কষ্ট সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চিপে গদিতে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়। ক্ষমতায় থাকার স্বাদটাই আলাদা। প্রতিটা মানুষ যখন তার দিকে সম্ভ্রমের চোখে তাকাবে, তার একটা আলাদা অনুভূতি আছে। নিজের অপছন্দের লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যেও একটা স্বর্গীয় সুখ আছে।

দুপুর নাগাদ হাউজে যখন ফিরলেন তখন দেখলেন গুলাম মহম্মদ তার জন্য অপেক্ষা করছেন। গাড়ি থেকে নেমে হাউজের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বললেন “কী ব্যাপার? এরকম কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে কেন?”

গুলাম বললেন “আলাদা কথা আছে স্যার”।

নিয়াজি ড্রয়িং রুমে গিয়ে সিকিউরিটিদের বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। গুলাম মহম্মদকে বললেন “বস”।

গুলাম বললেন “স্যার, আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলেন”।

নিয়াজি মুখ বিকৃত করে বললেন “এ দেশের প্রেসিডেন্ট একজনই গুলাম। সেটা আমি। ওঁরা তো নাম কা ওয়াস্তে প্রেসিডেন্ট। আমার সঙ্গে যখন এদের ব্যাপারে কথা বলবে, তখন এদের প্রেসিডেন্ট বলে না ডাকলেও চলবে”।

গুলাম বললেন “জী জনাব”।

নিয়াজি বললেন “এবার বল কী বলছে আজাদ কাশ্মীরের হারামখোরটা”?

ঘরে যদিও কেউ ছিল না তবুও গুলাম চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন “মুস্তাক জিমরি ওকে ফোন করেছিল। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে”।

নিয়াজি বললেন “কখন কথা বলবে? আর কারও মাধ্যমে আমি কথা বলতে চাই না। যা কথা হবে, সামনা সামনি হবে”।

গুলাম বললেন “জনাব, এল ও সির দশ কিলোমিটারের মধ্যে বেশ কয়েকটা লস্কর বেস হয়েছে। মুস্তাক জিমরি চাইছে, আর্মি এখন বেশ কয়েক দিন বর্ডারে ফায়ারিং করুক, সেই ফাঁকে ওদের একটা গ্যাং ইন্ডিয়াতে ঢুকবে অন্য পয়েন্ট দিয়ে”।

নিয়াজি বিরক্ত গলায় বললেন "এসবের জন্য আমার সঙ্গে কথা বলার কী দরকার? আমরা তো বরাবরই ওদের এ ব্যাপারে হেল্প করে আসি"।

গুলাম বললেন "আর্মি তো জনাব আপনার কথা শুনেই চলবে। এই সময়টা ক'দিন যুদ্ধ বিরতি চলছিল বলে কোন ঝামেলা হয় নি। ইন্ডিয়ান আর্মিও ভেবে নিয়েছে আপনি প্রেসিডেন্ট হবার ফলে খানিকটা শান্তি আসবে। এই সময়েই কিন্তু আমাদের অ্যাটাক করার সুবর্ণ সময়। আপনি বললে আজ রাত থেকেই ফায়ারিং শুরু করবে আর্মি"।

নিয়াজি বললেন "শুরু করতে বল। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমার কাছে আসার দরকার নেই। তুমি আছো, তুমি দেখে নেবে"।

গুলাম ইতস্তত করে বললেন "ঠিক আছে জনাব, আপনি যেমন চান"।

নিয়াজি বললেন "আচ্ছা শোন, ইন্ডিয়া পাকিস্তান ক্রিকেট সিরিজ শুরু করতে হবে। আমি আব্বাসের সঙ্গে সকালে কথা বলেছি"।

গুলাম বললেন "ইন্ডিয়া আসবে না স্যার। বর্ডারে গুলি গোলা চললে আরও আসবে না"।

নিয়াজি রেগে গেলেন "কেন আসবে না? বর্ডারের সঙ্গে ক্রিকেট মেলাবে কেন?"

গুলাম বললেন "সেটা তো আমি বলতে পারব না জনাব। ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার বলতে পারবেন। যতক্ষণ না বর্ডার ঠান্ডা হবে, ইন্ডিয়া খেলবে না"।

নিয়াজি বললেন "তা বেশ তো। এক কাজ করা যাক, এখন যুদ্ধবিরতিটা বজায় থাক। আব্বাসকে বলে দাও একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করা যাক। নাম হবে আমান কাপ। ইন্ডিয়া যখন এই দেশে আসবে তখন বর্ডারে ফায়ারিং শুরু করা যাবে"।

গুলাম হেসে বললেন "আইডিয়া তো খুব ভাল জনাব, কিন্তু তার জন্য মুস্তাক অতদিন অপেক্ষা করবে নাকি, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন"।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন "মুজফফরাবাদ যাব আমি। কালকেই। ব্যবস্থা কর"।

৪১।

রাত আটটা। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। বাজ পড়ছে।

বাড়িতে থাকলে প্রবল বৃষ্টিতে মিনি দরজা জানলা বন্ধ করে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাত। এখানে সে উপায় নেই।

বিদ্যুৎ নেই। হ্যারিকেন জ্বালানো হয়েছে মাঝের ঘরে। মিনি একটা চেয়ারে বসে আছে। মনোয়ারা বেগম মোম জ্বালিয়ে রান্না করছেন। নাজিব মোবাইলে জোরে জোরে গান চালিয়ে বুঝদারের মত মাথা নাড়াচ্ছে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে বলে মোতালেবকেও ঘরের ভিতরে ডাকা হয়েছে। মোতালেব খালি গায়ে বসে আছে। মাছের মত চোখ মোতালেবের। চুপচাপ বসে আছে ঘরের এক কোণে।

নাজিব গান শুনতে শুনতে বলল "তুমি গান করতে পারো?"

মিনি বলল "না"।

নাজিব খুশি হয়ে বলল "খুব ভাল। বেহায়া মেয়েরা গান করে, নাচ করে। শরীর প্রদর্শন করে"।

মিনি কিছু বলল না।

নাজিব বলল "আচ্ছা ঘরে চল। একটা জিনিস দেখাব"।

মিনি বলল "এখানেই ঠিক আছি"।

নাজিব বলল "চল না। এখানে মোতালেব আছে তো। চিন্তা নেই"।

মিনি বলল "অন্ধকার, কিছু দেখতে পাচ্ছি না"।

নাজিব মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে মিনিকে বলল “এসো, আমার সঙ্গে এসো”।

মিনি উঠল। ধীর পায়ে বেডরুমে গেল। নাজিব দরজা বন্ধ করে উৎসাহী গলায় বলল “বস, বস একটা জিনিস দেখাই”।

মিনি বসল।

নাজিব মোবাইলে একটা পর্ণ চালিয়ে মিনির হাতে দিয়ে বলল “দেখো, কী দারুণ”।

মিনি কিছুক্ষণ দেখে বলল “এটা দেখেছি”।

নাজিব মিনির হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে বলল “তুমি ব্লু ফিল্ম দেখো?”

মিনি বলল “হ্যাঁ, দেখেছি”।

নাজিব রেগে গেল। অন্ধকারের মধ্যে মিনির চুলের মুঠি ধরে বলল “মহা বেশরম মেয়ে তুমি! লজ্জা করে না এগুলো দেখতে?”

মিনি বলল “আপনিই তো দেখালেন। আপনার লজ্জা লাগছিল না দেখানোর সময়”?

নাজিব মিনির চুল ছেড়ে ফুঁসছিল। বলল “আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। কলকাতার মেয়ে। আর কী হবে?”

মিনি উত্তর দিল না। নাজিব বলল “হাসানচাচার কথা শুনে মনে হত তোমার মত ভাল মেয়ে আর এই দুনিয়ায় নেই”।

মিনি বলল “আপনার ধারণাটাই ভুল। পর্ণ দেখলে কেউ খারাপ হয়ে যায় না। আর আপনি যখন আমাকে এটা খারাপ জেনেও দেখাতে গেছেন তার মানে নিশ্চয়ই আপনার মনেই পাপ ছিল”।

নাজিব রেগে গিয়ে বলল “একদম বেশরমের মত মুখে মুখে কথা বলবে না। খুব রস তোমার ওখানে তাই না? দাঁড়াও। এখনই তোমার বিষ ঝাড়ছি”।

নাজিব রেগে ঘর থেকে বের করে দিল। কয়েক সেকেন্ড পর মোতালেবকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমকের আলো জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকছে।

একসঙ্গে অনেকখানি ভয় মিনিকে জাপটে ধরল। সে চেঁচিয়ে উঠল “এ কী ধরণের অসভ্যতা?”

বাইরে থেকে নাজিবের হাসির শব্দ ভেসে এল।

মিনি খাটের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মোতালেব মেঝের ওপর চুপ করে বসে পড়ল।

মিনি যখন বুঝল মোতালেব বসে পড়েছে, সে খাটের কোণায় গিয়ে বসল।

বাইরে থেকে নাজিবের মোবাইলের গান, মনোয়ারা বেগমের রান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

মিনি প্রবল আতঙ্কে বসে থাকল।

খানিকক্ষণ পর বিদ্যুৎ এল। ঘরের আলো জ্বলে উঠল। মিনি দেখল মোতালেব চোখ বন্ধ করে মেঝেতেই বসে বসে ঘুমাচ্ছে।

সে উঠে দরজা ধাক্কা দিল। দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দে মোতালেবের ঘুম ভাঙল কিন্তু সে মেঝেতেই চুপ করে বসে রইল।

নাজিব দরজা খুলল। তার দিকে নিজের ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলল “নে কথা বল। বাড়িতে বল, হাসান মাকসুদকে ছেড়ে না দিলে তোকে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াব”।

মিনি কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা ধরল।

মায়ের ফোন নাম্বার তার মুখস্ত। ডায়াল করল। নাজিব বলল “আই এস ডি কর। এভাবে ফোন যায় না। দে ফোনটা”।

মিনির হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নাজিব ভারতের আই এস ডি কোডটা দিয়ে বলল "এবার নাম্বারটা দে"।

মিনি মায়ের ফোনটা একবারে পেল না। চার পাঁচবার চেষ্টার পরে পেল। মায়ের গলা পেতেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। এই দুদিনকেই তার অনন্তকাল মনে হচ্ছিল।

৪২।

রাত দশটা।

তুষার মাথা নিচু করে চেম্বারে বসে ছিলেন। দেখলেন ইরাবতী ফোন করছেন, ধরলেন তিনি "বল"।

"কী খবর তোমার? দিল্লি ফিরছ কবে?"

তুষার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "দেখছি। এখন অবধি কোন কিছু ঠিক নেই"।

ইরাবতী বললেন "ডিনার করেছ?"

তুষার বললেন "নাহ"।

ইরাবতী বললেন "খেয়ে নিও"।

তুষার বললেন "তুমি কি কিছু বলতে চাইছ?"

ইরাবতী একটু ইতস্তত করে বললেন "হ্যাঁ মানে একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার ঘটছে"।

তুষার বললেন "কী?"

ইরাবতী বললেন "আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, কেউ আমাকে ফলো করছে। আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মনে হল কেউ একজন স্কুটারে ফলো করছে। বাড়ি ফেরার সময়েও একই ব্যাপার"।

তুষার বললেন "ওকে, তুমি চিন্তা কোর না, আমি দেখে নিচ্ছি ব্যাপারটা"।

ইরাবতী বললেন "তুমিও সাবধানে থেকো"।

তুষার ফোনটা রাখলেন।

দিল্লিতে ডিপার্টমেন্টে ইরাবতীর জন্য একজন নিরাপত্তারক্ষীর কথা বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করলেন।

বেশ কয়েক বার রিং হয়ে যাবার পর মন্ত্রী ধরলেন "আমি তোমাকে আমার ডিসিশন জানিয়ে দিয়েছি তুষার। এর পরে আর আমাকে ফোন কোর না। তুমি চাইলে আমি ঢাকায় কথা বলতে পারি"।

তুষার একটু চুপ করে থেকে বললেন "আমি অন্য কারণে ফোন করছি স্যার"।

"ওহ, রিয়েলি? বল তাহলে"।

"ইন্টেলিজেন্স সূত্রে একটা খবর পেয়েছি। কয়েক জন লস্কর জঙ্গি আপনার নাতিকে টার্গেট করেছে। স্কুল থেকে আসার সময় কিডন্যাপ করতে পারে। আমি দিল্লিকে অ্যালার্ট করে দিয়েছি বটে তবু মনে হল আপনারও জেনে রাখা ভাল"।

"ওহ মাই গড। কখন জানতে পারলে?"

"দুপুরেই স্যার"।

"এখন জানালে?" মন্ত্রী ক্রুদ্ধ গলায় বললেন।

"আপনাকে সারা দিনে বার বার ফোন করছি, আপনিই তো ফোন ধরেন নি স্যার"।

"আমি কী করে জানব আমার নাতির ব্যাপারে ফোন করছ? আমি তো ভেবেছিলাম সেই ব্লাডি হাসানের ভাইঝির জন্য। ওকে, আমি বলে দিচ্ছি। নাতিকে স্কুলে পাঠাচ্ছি না ক'দিন"।

"ওকে স্যার। জয় হিন্দ"।

ফোনটা রেখে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন তুষার। এর পর থেকে দ্বিতীয়বার আর তার ফোন না ধরার সাহস করবেন না মন্ত্রী।

টেবিলে মাথা রেখে একটু চোখ বুজলেন। ঠিক করেছেন মাঝরাতে জ্যোতির্ময়কে আবার জেরা করতে যাবেন।

আন নোন নাম্বার থেকে ফোন আসছে।

তুষার ধরলেন "হ্যালো"।

"এয় মেরে ওয়াতান কে লোগো"।

"ওহ। সায়ক। বল। ইজ দিস লাইন সিকিওর? কোথায় আছো তুমি?"

"ইয়েস স্যার। হান্ড্রেড পারসেন্ট সিকিওর। পেশোয়ারেই আছি। আই হ্যাভ এ বিগ লিড স্যার"।

"তাই? কী ব্যাপারে?" নড়ে চড়ে বসলেন তুষার।

"স্যার কাশেম সোলেমানি ইজ ইন পেশোয়ার স্যার"। একটুও উত্তেজিত না হয়ে কথাগুলো বলল সায়ক।

তুষার থমকে বললেন "শিওর?"

"একদম স্যার। সরফরাজ খানের আতিথেয়তায় আছে"।

"প্রমাণ আছে তোমার কাছে?"

"হ্যাঁ স্যার। কয়েকটা ফটো পাঠাচ্ছি। দেখে নিন। আশা করি বুঝতে পারছেন লিডটা কত বড়?"

"বুঝতে পারছি। তুমি একজ্যাক্ট লোকেশনটা পেয়েছ?"

"ইয়েস স্যার। কো অরডিনেটটা মেইল করছি আপনাকে"।

তুষার উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, "সিকিউরিটি সিস্টেম কেমন সেখানে?"

"স্যার গ্রামের মধ্যে দুর্গের মত বড় বাড়ি। বেশ কয়েকজন আর্মস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে"।

"সরফরাজ খান যে ওই বাড়িতে যায়, তার প্রমাণ আছে?"

"পেয়ে যাবেন স্যার, নজর রাখছি। পেলেই আপনাকে পাঠাব"।

"দিস ইজ এ বিগ লিড সায়ক। এই মুহূর্তে মুজফফরাবাদের মত ভুলটা করতে যেও না তুমি। তুমি দূর থেকেই নজর রাখো। আমি দেখছি কী করা যায়"।

"কিন্তু স্যার, বাড়ির ভেতর না যেতে পারলে তো ফারদার আর কিছুই জানা যাবে না সেভাবে"।

"তোমাকে যা বলছি সেটাই কর সায়ক। অনেক দুঃসাহস দেখিয়েছ আগে। এবারে হাত জোর করছি, সিচুয়েশনের ওপর নজর রাখা ছাড়া আর কিচ্ছু করতে যেও না দয়া করে"।

"ওকে স্যার। গুড নাইট"।

"গুড নাইট"।

ফোনটা রাখতে তুষার দেখতে পেলেন সোমেনের মিসড কল। তিনি কল ব্যাক করলেন। ওপাশ থেকে অনিন্দিতা ধরলেন "স্যার, কোন খবর আছে?"

তুষার থমকে বললেন "চিন্তা করবেন না, আমরা চেষ্টা করছি"।

অনিন্দিতা বললেন "ফোন করেছিল মেয়েটা। ওর গলার স্বর আমার স্বাভাবিক লাগল না স্যার। বলছে আপনারা ওর জ্যেঠুকে না ছাড়লে ওর ওপর নাকি অনেক টর্চার হবে। প্লিজ স্যার কিছু করুন। আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। ওকে আমিই কলেজ যেতে বলেছিলাম"।

তুষার বললেন "আপনি একদম ভাববেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা মিনিকে উদ্ধার করব"।

অনিন্দিতা কেঁদে যাচ্ছিলেন।

তুষার ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

তারপর রওনা দিলেন ইন্টারোগেশন রুমে।

৪৩।

একটা লাশ পড়ে আছে হাসপাতালের মেঝেয়। আউটডোর থেকে লবিতে হাঁটতে শুরু করেছিল লোকটা, কিন্তু রেহানের ফোনে জওয়ানরা সচেতন ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সনাক্তকরণ এবং মাথায় গুলি চালিয়ে শুইয়ে দেওয়া গেছে টার্গেটকে।

বীরেন খানের ঘরেই বসে ছিল। কোন রকম উত্তেজনা যাতে খানের মধ্যে সঞ্চারিত হতে না পারে তার জন্য অন্য কথায় ব্যস্ত রেখেছিল খানকে। গুলির আওয়াজ শুনলে খান বিস্মিত গলায় যখন বললেন "কী হয়েছে?"

বীরেন তখন বলল "আমি দেখে আসছি"।

একজন সিস্টারকে বলে বীরেন এক তলায় নেমে দেখল জওয়ানরা হাসপাতালের দখল নিয়ে নিয়েছেন। রেহান খান এসে পৌঁছেছেন। তাকে দেখে দৌড়ে এসে বললেন "আশরফ ঠিক আছেন তো?"

বীরেন মাথা নাড়ল।

রেহান বললেন "থ্যাঙ্ক গড"।

বীরেন লাশটা দেখছিল। কিছুক্ষণ আগেই লোকটা তার পাশে বসে ছিল গাড়িতে। এই টুকু সময়ের মধ্যে এত কিছু হয়ে গেল? রেহান জওয়ানদের কিছু নির্দেশ দিয়ে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "লোকটা শ্রীনগরেরই লোক। অ্যানাদার ব্রেইন ওয়াশড ম্যান"।

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন খান।

বীরেন বলল "এও তো হতে পারে, লোকটা আসলে কাউকে মারতে আসে নি... সত্যি সত্যিই ইনজুরিটা ছিল"।

রেহান বললেন "হতেই পারে। বাট উই কান্ট টেক রিস্ক। ছিনতাই শুনে আমাকে দুয়ে দুয়ে চার করতেই হল"।

বীরেন অবাক চোখে রেহানের দিকে তাকিয়ে থাকল। ছিনতাই এর শাস্তি মৃত্যুদন্ড তবে?

রেহান বীরেনের কাঁধে হাত রাখলেন "আমাদের এভাবেই অ্যাসাম্পশন করে এগোতে হয় বীরেন। আমরা কোনভাবেই কোন রিস্ক নিতে পারি না। তিন মাস আগের কথা। একটা লোক এভাবেই ডাল লেকের একটা হাউজবোটে আচমকা ঢুকে তিনজন আমেরিকান নাগরিককে গুলি করে মেরেছিল। তুমি এখানে থেকো না, হয় খানের কাছে যাও, নইলে আনোয়ারকে বলে দিচ্ছি, তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নাও"।

বীরেন বলল "আমি খান স্যারের কাছে যাচ্ছি"।

রেহান বললেন "ওকে। চল আমিও যাব"।

কয়েকজন জওয়ান লাশটাকে স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে রক্ত পড়ে আছে। বীরেনের শরীর খারাপ লাগছিল। রেহান সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললেন "ইউ হ্যাভ টু বি স্ট্রং এনাফ টু ওয়ার্ক ইন আওয়ার ডিপার্টমেন্ট বীরেন। ডোন্ট থিংক অ্যাবাউট ইট। আমরা সামলে নেব"।

বীরেন বলল "প্রতিদিন এরকম কতজন কাশ্মীরিকে আপনারা সন্দেহের বশে মেরে ফেলেন?"

রেহান সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন "ভারতটা সবার দেশ বীরেন। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য কেউ সাংঘাতিক থ্রেট হয়ে উঠলে আমাদের ব্যবস্থা নিতেই হয়"।

বীরেন বলল "দেশের সর্বত্র সবার জন্য আপনাদের আইন সমান?"

রেহান বললেন "না। সেটা আমার থেকে ভাল কেউ জানে না।। কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা। আমরা কেউ নিরীহ মানুষদের খুন করতে চাই না। কিন্তু এই ধরণের অ্যাক্টিভিটি আমাদের অ্যাগ্রেসিভ করতে বাধ্য করে। জাস্ট ইমাজিন লোকটা হাসপাতালে একটা আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ করত এবং কয়েকটা লোক মারা যেত, সেক্ষেত্রে কী হত?"

বীরেন বলল "লোকটাকে তো না মেরে ধরাও যেত"।

রেহান মাথা নাড়লেন "তোমাকে তো বললাম আমাদের প্রম্পট ডিসিশন নিতে হয়। কিছু করার থাকে না"।

বীরেন বুঝল রেহান সুকৌশলে তার প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন।

আই সি ইউতে ঢুকে রেহান ডাক্তার রশিদের সঙ্গে কথা বললেন। চপারের কথা বলায় ডাক্তারবাবু মাথা নাড়লেন "এই অবস্থায় জার্নিটা রিস্ক হয়ে যেতে পারে"।

রেহান গলা নামিয়ে বললেন "কাশ্মীরে হি ইজ নট সেফ স্যার"।

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন "ওকে, তবে চপারে নয়। ওকে ফ্লাইটেই দিল্লি পাঠান। চপারটা আমার মতে রিস্ক হয়ে যাবে"।

রেহান বললেন "ঠিক আছে, আমি আমার বসের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি"।

রেহান আশরফের সঙ্গে দেখা করে আগামীকালের প্ল্যানের কথা বলে আই সি ইউ থেকে বেরিয়ে দেখল বীরেন চুপ করে বেঞ্চে বসে আছে। বললেন "কী হল? চল এবার"।

বীরেন রেহানের দিকে তাকিয়ে বলল "লোকটার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন আমাকে? আমি দেখতে চাই এর বাড়িতে কে কে আছে। কেন লোকটা এই কাজ করতে এসেছিল। ছিনতাইই বা করতে হল কেন?"

রেহান বললেন "ডোন্ট গেট ইমোশনাল ইন কাশ্মীর বীরেন। সম্ভাল নেহী পাওগে"।

বীরেন কিছু বলল না।

রেহানের ফোন বাজছিল। রেহান ফোন দেখে ভ্রু কুচকালেন "অবন্তী স্যার, জেনে গেলেন এর মধ্যে?"

ফোনটা ধরলেন। কয়েক সেকেন্ড কথা বলে ফ্যাকাশে মুখে ফোনটা রেখে বললেন "রামেশ্বর কল ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিল। জম্মু স্টেশন থেকে বেরোতেই ওকে চারজন গুলি করে পালিয়েছে"।

রেহান কথাটা বলে হাসপাতালের মেঝেতেই বসে পড়লেন।

৪৪।

পেশোয়ার।

রাত বারোটা।

সায়ক চোখ বুজে শুয়েছিল।

আব্বাস নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। সারাদিন অনেক পরিশ্রম হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কেউ একজন ঘরে তিন বার নক করলেন। সায়ক বলল "খোলা আছে"।

ফারুক চাচা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। বললেন "তোমার প্ল্যান বল"।

সায়ক বলল "এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কিছু করার নেই। তুষার স্যার এগোতে নিষেধ করছেন"।

ফারুক মাথা নেড়ে বললেন "ঠিকই বলছেন। ওদের গোটা ম্যান পাওয়ার, আর্মস পাওয়ার সম্পর্কে কিছুই না জেনে ওখানে ঢুকতে যাওয়াটা বিরাট বোকামি হবে।

সায়ক গম্ভীর হয়ে বলল "তা ঠিক। আচ্ছা, আমি শুনেছি এই মুহূর্তে পেশোয়ারে অনেক তালিবান আছে যারা মতি মসজিদের গোপন ডেরায় আত্মগোপন করে আছে আমেরিকানদের ভয়ে। এদের মধ্যে কি হাবিবুল্লাহ রসুল থাকতে পারে"?

ফারুক মাথা নাড়লেন "আমার কাছে এ ব্যাপারে কোন খবর নেই। আমার মনে হয় তুমি কাশেম সোলেমানির ওপর কনসেন্ট্রেট করলেই বেশি ভাল হবে"।

সায়ক হাসল "আপনার কি ধারণা আইসিস যদি সাবকন্টিনেন্টে শক্তি বৃদ্ধি করার কথা ভাবে তাহলে তালিবানদের দলে নেবে না?"

ফারুক চিন্তিত গলায় বললেন "সেটা আমিও ভেবে দেখেছি কিন্তু তালিবান জাতটা অত্যন্ত খ্যাপাটে জাত। ওদের মাথাও অতটা সূক্ষ্ম না। কাশেম সোলেমানি এই মুহূর্তে ওদের হাত নাও ধরতে পারে"।

সায়ক বলল “হু। সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন ছিল ততদিন আমেরিকা যত রকম ভাবে পারে চেষ্টা করে গেছে দেশটাকে ভাঙার। যে মুহূর্তে সোভিয়েত টুকরো টুকরো হল, তখন থেকে এই ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোই আমেরিকার গলার কাঁটা হয়ে গেল। তালিবানরা এখনও আমেরিকানদের প্রতি অভিমানী। রেগেও আছে। চোরাগুপ্তা হামলা তো চলেই আমেরিকান ঘাটিতে”।

ফারুক বললেন “পেশোয়ার বরাবরই সি আই এর ডেরা ছিল। আমেরিকাকে কখনই বিশ্বাস করা যায় না। এরা ঠিকই জানে, পাকিস্তান কীভাবে টেরোরিজমকে ব্যাক আপ দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে এরা কখনই টেররিস্ট কান্ট্রি বলবে না। পেশোয়ারে এই সেদিনও বোরখা না থাকার জন্য একটা মহিলাকে মাথায় পাথর মেরে মেরে ফেলা হয়েছে। তোমার কি ধারণা আমেরিকা এসব কিছুই জানে না?”

সায়ক বলল “আফগান বর্ডারের কী অবস্থা চাচা?”

ফারুক বললেন “ভুলেও ওদিকে যেও না। আমেরিকা ওত পেতে বসে আছে। আফগান রিফিউজিগুলোরও আমেরিকার ওপর প্রচুর রাগ আছে। দেখে নিও, যে কোন দিন আবার ঝামেলা লাগল বলে”।

ফারুকের ফোন বেজে উঠল। কয়েক মিনিট কথা বলে ফারুক গম্ভীর গলায় বললেন “এই একটু আগে কিসা খাওয়ানি বাজার নিয়াজির আর্মি দখল নিয়েছে। ছান বিন হচ্ছে। যে কোন দিন আমাদের এখানে চলে আসতে পারে”।

সায়ক ফারুকের দিকে তাকাল, “আপনার কী মত? আমাদের কী করা উচিত?”

ফারুক বললেন “তুমি সরফরাজ খানের সম্পর্কে প্রুফ চাইছ তাই তো?”

সায়ক বলল “হ্যাঁ। কংক্রিট প্রুফ দরকার”।

ফারুক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে বললেন “রিস্কটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। পাকিস্তানি আর্মি খ্যাপা কুকুরের মত পেশোয়ারের প্রতিটা রাস্তা দখল নিচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আমাদের সামনে আর কোন অপশন নেই”।

সায়ক একটা কাগজ নিল। পেন্সিল নিয়ে কাগজের মধ্যে কিছুক্ষণ আগোছালো দাগ কেটে বলল “এই মুহূর্তে একটা ছবি সামনে আসছে। দেখুন, হাসান মাকসুদ গ্রেফতার হল কিংবা আফসানা সাইদ, মীর্জা শেখ মারা গেল, তারপরেও এদের অপারেশন থামে নি। এরা আশরফ খানকে টার্গেট করেছে, কাশ্মীরে ইসলামিক স্টেটের পতাকাও উড়িয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, জামাল পাশা আর্মির নিজস্ব ক্যান্ডিডেট ছিল। জামাল পাশাকে আর্মি কিছুতেই মারতে পারে না। সরফরাজ খান কাশেমের সঙ্গে দেখা করতে পেশোয়ার আসছে, অংকটা কি মিলাতে পারছেন চাচা?”

সায়কের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ফারুক চোখ বন্ধ করে ভেবে নিয়ে বললেন “ইসলামিক স্টেট ওদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে ইন্ডিয়ায় ঢুকতে চাইছে এ ব্যাপারে আমিও নিঃসন্দেহ সায়ক, কিন্তু আমার মতে পাকিস্তানের পরিবর্তে ওরা নেপাল, ভুটান কিংবা বাংলাদেশ অনেক বেশি প্রেফার করবে। নেপাল, ভুটানের বর্ডার অনেকটাই শিথিল। বাংলাদেশের বর্ডার এখনও সিকিওর নয়”।

সায়ক পেন্সিলটা নিয়ে মন দিয়ে কাগজে একটা চতুর্ভুজ এঁকে বলল “উই নিড কাশেম সোলেমানি। অ্যাট এনি কস্ট”।

ফারুক বললেন “তোমরা দুজনে মিলে ধরবে? কিংবা ধরে নাও এই বুড়োটাও তোমাদের সঙ্গে থাকল। তিনজনে মিলে কী করব?”

সায়ক অন্যমনস্কভাবে পেন্সিল দিয়ে কাগজে হিজিবিজি আঁকতে লাগল। আব্বাস ঘুমের ঘোরে বলল “লাইটটা বন্ধ কর না মিয়াঁ, ঘুমাতে দাও প্লিজ। আল্লাহ জানেন, কাল আবার কী দিন রেখে দিয়েছেন আমাদের জন্য”।

সায়ক আব্বাসের পেটে একটা খোঁচা মেরে বলল “চাচা এসেছেন। কী বলবে বলছিলে তখন চাচাকে?”

আব্বাস চোখ পিটপিট করে ফারুক চাচার দিকে তাকিয়ে বলল "চাচা, তোমায় কাজল বেগম এত খুঁজছে কেন বলত?"

৪৫।

জেনারেল নিয়াজির হেলিকপ্টার মুজফফরাবাদের মাটি ছুঁল সকাল ন'টা নাগাদ। হেলিপ্যাডের কাছে কনভয় দাঁড়িয়ে ছিল। নিয়াজি গুলাম মহম্মদকে নিয়ে এসেছেন।

লিমুজিনে উঠে নিয়াজি বললেন "মুজফফরাবাদ ইজ গেটিং বিউটিফুল ডে বাই ডে। আই মাস্ট অ্যাডমিট"।

গুলাম বললেন "জনাব আমার মনে হয় মুস্তাক জিমরির সঙ্গে কনভারসেশনে আমাদের স্ট্যান্ডটা কী হবে সেটা এখন ঠিক করে নেওয়ার সময় এসেছে"।

নিয়াজি বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন "হু। তোমার আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট তো জামাই আদর করে জিমরিকে নিজের ভবনে নিয়ে এসেছে। এভাবে খুল্লমখুল্লা ব্যাট করলে একবার যদি বিদেশী মিডিয়া খবর পায়, তাহলে আমাদের কপালে দুঃখ আছে"।

পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। আগের দিন রাতে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তা ভেজা। কিন্তু এই মুহূর্তে আকাশ পরিষ্কার।

গুলাম বললেন "আজকে আপনার মিটিংটা হয়ে গেলে আর আপনাকে এখানে আসতে হবে না ইনশাল্লাহ। তার পর আমরা ইসলামাবাদ থেকেই কন্ট্রোল করতে পারব। অবশ্য আজকে আপনার না আসলেও হত। আপনি আসবেন বললেন, আমি আর আপনার কথার ওপর কথা বললাম না গতকাল"।

নিয়াজি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট হাউজে নিয়াজির কনভয় প্রবেশ করল।

আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট সর্দার ইউসুফ খান সপার্ষদ দাঁড়িয়ে ছিলেন জেনারেল নিয়াজিকে স্বাগত জানাবার জন্য। নিয়াজি গাড়ি থেকে নামতেই ফুলের স্তবক দিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললেন "আমাকে ডাকলেই তো পারতেন জনাব। কী দরকার ছিল এতটা পথ আসার?"

নিয়াজি উদাসীন ভাবে স্তবকটি তার নিরাপত্তারক্ষীর হাতে দিয়ে বললেন "আমি একজন আর্মি ম্যান আলম। পথশ্রমে আমার কষ্ট হওয়া অত সহজ নয়। চল, যে জন্য এলাম, সে কাজটা করা যাক"।

নিয়াজি হাঁটতে শুরু করলেন। খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ইউসুফ খান নিয়াজির পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করলেন। আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট হাউজের আসবাবপত্রের সবেতেই কাশ্মীরের সূক্ষ্ম কাঠের কাজের প্রাধান্য। নিয়াজি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ইউসুফ খানকে বললেন "তোমার গোপন কক্ষ কোথায়? আর এঁরা কী আমাদের সঙ্গে থাকবে?"

নিয়াজি ইউসুফ খানের পার্ষদদের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

ইউসুফ খান ব্যস্ত হয়ে বললেন "না জনাব, আসুন আমার সঙ্গে"।

নিয়াজি গুলাম মহম্মদ এবং তার দু জন নিরাপত্তারক্ষীকে বললেন "আমার সঙ্গে এসো"।

ইউসুফ খান প্রায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন তাদের।

প্রেসিডেন্ট হাউজের লাইব্রেরী রুমের একটা গোপন দরজা খুলতেই দেখা গেল মুস্তাক জিমরি সোফায় বসে আছেন। পরনে পাঠান পোশাক। গাল ভর্তি দাড়ি, গোঁফ কামানো। মাথায় ফেজ টুপি। নিয়াজিকে দেখে মুস্তাক উঠে দাঁড়ালেন।

নিয়াজি হাত নেড়ে মুস্তাককে বসতে বলে ইউসুফ খানের দিকে তাকালেন "আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন"।

ইউসুফ খান জিজ্ঞাসু চোখে নিয়াজির দিকে তাকালেন।

গুলাম বললেন "প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে বাইরে যেতে বলছেন"।

ইউসুফ খান খানিকটা অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে না দেখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নিয়াজি বললেন "বল মুস্তাক, তোমার কী চাই"।

মুস্তাক বললেন "জনাবকে অনেক শুক্রিয়া আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এতটা পথ আসার জন্য"।

নিয়াজি হাতে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বললেন "আমার এসব ছেঁদো কথায় সময় নষ্ট করার মত সময় নেই। কাজের কথায় এসো"।

মুস্তাক বললেন "জনাব, সারজিকাল স্ট্রাইকের সময় ইন্ডিয়া আমাদের বেশ কয়েকটা ঘাটি নষ্ট করতে পেরেছিল। সুখের খবর আমরা সেসব ঘাটিগুলো আবার আগের অবস্থায় আনতে পেরেছি। আল্লাহর রহমতে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোও আবার শুরু করা গেছে। ইন্ডিয়া থেকে হিজবুলের একটা দলও কাঠমান্ডু হয়ে পাকিস্তানে ঢুকতে পেরেছে কিছুদিন আগে। এই মুহূর্তে আমাদের একটাই সমস্যা"।

নিয়াজি চোখ ছোট করলেন "কী সমস্যা?"

মুস্তাক বললেন "আর্মস। ডোনেশন। এ দুটোর প্রচুর ঘাটতি আছে"।

নিয়াজি গুলাম মহম্মদের দিকে তাকিয়ে বললেন "তুমি তো বলছিলে ওরা ইন্ডিয়ায় ঢোকার ব্যাপারে পাকিস্তান আর্মির সাহায্য চায়"।

মুস্তাক বললেন "অপরাধ নেবেন না জনাব। আমরা অবশ্যই কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানকে সাহায্য করার ব্যাপারে সব সময় তৎপর, কিন্তু এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত আর্মস দরকার আমাদের। কাশ্মীরে আমাদের ঘাটিগুলোতে টাকা পৌঁছনোরও দরকার আছে। খামোখা কেন লোকগুলো ইন্ডিয়ান আর্মির ওপর পাথর ছুঁড়তে যাবে বলুন?"

নিয়াজি বললেন "আর্মস তোমাদের সরাসরি কী করে দেব?"

মুস্তাক বললেন "জনাব, আমরা সরাসরি চাইছিও না। আমরা অন্যভাবে আর্মস ইমপোর্ট করতে চাইছি। কিন্তু আমাদের এটুকু নিশ্চিত করতে হবে, পাকিস্তান সরকার যেন এই আমদানির সময় উদাসীন হয়ে থাকে। স্টেপ নিতে না যায়"।

নিয়াজি বললেন "কেন? কোত্থেকে আমদানি করতে চাইছ তোমরা আর্মস?"

মুস্তাক একটু থেমে একবার গুলাম মহম্মদ, তারপর নিয়াজির দিকে তাকিয়ে বললেন "আমাদের মুসলিম ব্রাদারহুড ইরাক থেকে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছে জনাব। সাপ্লাই লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেলে কাশ্মীর নিয়ে আমাদের আর চিন্তা করতে হবে না ইনশাল্লাহ"।

নিয়াজি বললেন "বাহ। খুব ভাল বুদ্ধি বের করেছ তো। আমেরিকা জেনে যাক আর তারপর আমাদের টেরোরিস্ট কান্ট্রি বলে দাগিয়ে দিক। সব রকম গ্র্যান্ট বন্ধ করে দিক... আর বাকি কী থাকল তাহলে?"

মুস্তাক বললেন "জনাব, আমরা তো পাকিস্তানকে জড়াবোই না এর মধ্যে। তাজাকিস্তান, আফগানিস্তান হয়ে আজাদ কাশ্মীর হয়ে র মেটিরিয়ালস ঢুকবে। বাকিটা আমরা বুঝে নেব"।

নিয়াজি মাথা নাড়লেন "সম্ভব না। আমি কিছুতেই এর পারমিশন দিতে পারি না"।

মুস্তাক বললেন "স্যার আই এস আই চিফ কিন্তু আমাদের সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন"।

নিয়াজি রেগে গেলেন "আই এস আই চিফ ইজ নট দ্য প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান । এ দেশে আমি যা বলব তাই হবে। আমার সিদ্ধান্তই শেষ কথা বলবে"।

মুস্তাক বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন "তা ঠিক জনাব। তবে আমার মনে হয় আই এস আই চিফ না থাকলে আপনি এ জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পেতেন না"।

নিয়াজি গুলাম মহম্মদের দিকে তাকালেন। গুলাম বুঝলেন নিয়াজি অত্যন্ত রেগে গেছেন। বললেন "আমরা এখন বরং ইসলামাবাদে ফিরে যাই জনাব। পরে এই ব্যাপারে কথা বলে নেওয়া যাবে"।

মুস্তাক নিয়াজির দিকে তাকিয়ে বললেন "প্রস্তাবটা বিবেচনা করলে খুশি হব জনাব"।

নিয়াজি উঠলেন। রাগী মুখে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুস্তাক বসে মিটিমিটি হাসতে থাকলেন।

৪৬।

আশরফ কিছুতেই দিল্লি যেতে চাইলেন না। বললেন আগে জম্মুতে রামেশ্বরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন তারপর দিল্লি যাবেন।

রেহান জম্মু অবধি চপারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক হল জম্মু থেকে ফ্লাইটে আশরফকে দিল্লি পাঠানো হবে। চপারে ভোরেই তারা জম্মু পৌঁছলেন।

গোটা রাস্তা আশরফ থমথমে মুখে বসে রইলেন। আর্মি ব্যারাকে রামেশ্বরের মৃতদেহ জাতীয় পতাকায় মুড়ে রাখা হয়েছে। বীরেন হুইল চেয়ারে করে আশরফকে রামেশ্বরের কাছে নিয়ে গেলেন। আশরফ রামেশ্বরের হাত ছুয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

রেহান আশরফকে ধরে অফিসে নিয়ে এসে বসালেন।

আশরফ বললেন "শ্রীনগর হাইজ্যাকিং এর প্রত্যেককে ওরা টার্গেট করছে রেহান"।

বীরেন চুপ করে ছিল।

রেহান বললেন "কারা? কে কে আছে ওদের দলে?"

আশরফ বললেন "তোমার বাড়ির দেওয়ালে কালি লেপে দেওয়া, আমার ওপর অ্যাটাক, ইভেন হাসানের ভাইঝিকে কিডন্যাপিং... এদের মাথা আর যেই হোক, হাসান মাকসুদ কিংবা আফসানা সাইদ হতে পারেন না। দ্য সেল ইজ স্টিল অ্যালাইভ। ভেরি মাচ অ্যালাইভ"।

রেহান বললেন "আমার মাথা কাজ করছে না। আমি... বুঝতেই পারছেন এমনিতেই কাশ্মীর আমাদের মাথাটা দখল করে রেখে দেয়, এর মধ্যে এর সঙ্গে যদি আরও রহস্য যুক্ত হয় তবে বেঁচে থাকব কী করে?"

আশরফ বললেন "আমি বীরেনকে আগেও বলেছি, উই আর ইন এ ওয়ার সিচুয়েশন। সামথিং ইজ গেটিং বিগার ডে বাই ডে আর আমরা সেটা বুঝতেও পারছি না। রেহান"।

রেহান বললেন "বলুন"।

আশরফ বললেন "অল হাউজবোটস নিডস টু বি চেকড ইমিডিয়েটলি। লালচকের প্রতিটা দোকান। আমাকে লাস্ট তিন চারটে ইয়ারের কয়েকটা ডেট বল যেখানে ওদের কাউকে মেরেছি আমরা"।

রেহান বললেন "এক মিনিট, আমি মোবাইলে লিখে রাখি। ওয়েট"।

রেহান মোবাইল বের করলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন "টেনথ সেপ্টেম্বর লাস্ট ইয়ার, আলি মাসুদকে মারা হয় লালচকে। এর দুদিন পরে, টুয়েলভথে, উলার লেক দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল হাসান রেজা, ওখানেই স্পট করে দেওয়া হয়। টুয়েন্টি ফার্স্ট সেপ্টেম্বর আলতাফ..."

রেহান আশরফের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। আশরফ বললেন "তুষার স্যারকে ফোন কর। ইমিডিয়েটলি"।

রেহান ফোন বের করে তুষারের নম্বর ডায়াল করলেন। বেশ কয়েকটা রিঙের পর ধরলেন তুষার, "বল রেহান, জম্মু পৌঁছেছ?"

রেহান আশরফকে ফোনটা দিয়েছিলেন। আশরফ বললেন "স্যার আমি আশরফ বলছি"।

তুষার বললেন "সে কী! তুমি কথা বলছ কী করে? তোমার তো এখন বেড রেস্ট হওয়া উচিত"!

আশরফ বললেন "স্যার, আপনার আলতাফ হুসেনের কথা মনে আছে? দ্যাট জামাত উল মুজাহিদিন লিডার, যাকে আমরা বাতালিক সেক্টরে মেরেছিলাম?"

তুষার বললেন "ওঁকে মনে থাকবে না? দ্যাট বম্ব স্পেশালিস্ট!"

আশরফ বললেন “স্যার, আলতাফ হুসেনের বাড়ি বাংলাদেশের যশোরে। ইন্ডিয়ান বর্ডারের কাছেই। পীযূষ যদি নাম্বারটা ট্রেস করেই থাকে তবে নিশ্চয়ই কো অরডিনেটসও পেয়ে গেছে। আই থিংক দ্যাট গার্ল ইজ ইন ডেঞ্জার স্যার। উই শুড টেক ইমিডিয়েট অ্যাকশন”।

তুষার বললেন “সবই তো বুঝতে পারছি আশরফ, কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা। কী করব বল? মিনিস্ট্রি থেকে কোন রকম গ্রীন সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে না”।

আশরফ অধৈর্য গলায় বললেন “স্যার, দ্য স্লিপার সেল ইজ স্টিল অ্যাক্টিভ। উই নিড টু ক্যাপচার দেম অ্যালাইভ। আমার মনে হচ্ছে ওরা আরও বড় কোন কিছু প্ল্যান করছে। হাসান কি কিছুই কনফেস করেন নি?”

তুষার বিষাদমাখা গলায় বললেন “ইলেকট্রিক শক দিয়ে জানোয়ারটার রক্ত বের করে দিয়েছি চোখ মুখ দিয়ে। যন্ত্রণা সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করছে না। আজ ওর ওয়াইফকে আনা হবে একই সেলে। সমস্যা হল, এই ধরণের জান্তব ইন্টারোগেশন আমি মন থেকে সাপোর্ট করতে পারি না”।

আশরফ বললেন “প্রয়োজন নেই স্যার। আগে মেয়েটাকে যারা আটকে রেখেছে তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরার ব্যবস্থা করুন। আপনি বলুন, আমি কোলকাতা চলে যাচ্ছি। গভর্নমেন্ট, মিনিস্ট্রি যায়ে ভাড় মে স্যার। বি এস এফ এবং বি ডি আর চিফের সঙ্গে কথা বলুন। এখন কো অরডিনেটস পেয়েছেন, এর পরে না পাওয়া গেলে আরও বড় সমস্যা হবে। মেয়েটাকে ওরা সরিয়ে দিতে পারে কিংবা আরবে বিক্রি পর্যন্ত করে দিতে পারে। সব থেকে বড় কথা আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে আলতাফের বাড়িতেই হাসানের ভাইঝিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে”।

তুষার একটু থমকে বললেন “তুমি রেস্ট নাও। আমি দেখছি। সাবধানে দিল্লি ফেরো। তোমার বাড়িতে জানানো হয়েছে। আমি দেখছি এদিকটা”।

আশরফ বললেন “স্যার প্লিজ আমায় পারমিশন দিন, আমি কোলকাতা যেতে চাই”।

তুষার বললেন “পাগল হয়ে গেছ নাকি? এই শরীরে এত ধকল নিতে পারবে না তুমি”।

আশরফ বললেন “পারব স্যার। আমাকে দরকার হবে আপনার। আমার জন্য না হয় অফিসে একটা লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের ব্যবস্থা করবেন, পারবেন না?”

তুষার হতাশ গলায় বললেন “ইউ আর ইম্পসিবল খান। ওকে, তুমি এসো। রেহান শ্রীনগরে ফিরে যাক। বীরেন থাকুক তোমার সঙ্গে। দাও রেহানকে ফোনটা দাও”।

৪৭।

রাতটা মিনির প্রবল আতঙ্কের মধ্যে কাটল। নাজিব পাশে এসে শুল। মেঝেতে মোতালেব। সারাটা রাত সিঁটিয়ে খাটের এক কোণে বসে ছিল সে।

নাজিব মাঝরাতে বাথরুম গেল। ফিরে এসে তার কান, গলা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। মিনি পাথর হয়ে বসে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে নাজিব দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল।

ভোর হতেই মিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির বাইরের বসার জায়গায় গিয়ে বসল। মোতালেব উঠে তার পেছন পেছন এসেছিল। খুরপি দিয়ে আবার মাটি খুড়তে শুরু করল।

বাড়িটা বিরাট বড়। দোতলা বাড়ির শুধু নিচের তলাটাই ব্যবহৃত হয়। মিনির কী মনে হল সে বাড়ির ভেতর ঢুকল। মনোয়ারা বেগম এবং নাজিব ঘুমোচ্ছে। মিনি পা টিপে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় গেল।

মোতালেবের মাটি কাটার শব্দ পাচ্ছিল মিনি। তা সত্ত্বেও তার বুক ধড়ফড় করছিল। ওপরটা পুরনো হলেও মানুষের যে যাতায়াত আছে তা বোঝা যাচ্ছিল। সাহস করে একটা ঘরের দরজাতে হালকা ধাক্কা দিল।

দরজা খুলে গেল। সাধারন একটা ঘর। কিছুই নেই তেমন ঘরে।

মিনি চারদিকে তাকিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পরের ঘরে গেল। একই রকম ঘর। কিছুই নেই।

তৃতীয় ঘরের দরজা তালা দেওয়া না থাকলেও ছিটকিনি দিয়ে আটকে রাখা ছিল। অনেক উঁচু দরজা। মিনি চারদিকে তাকিয়ে একটা টুল পেল। সে তড়িঘড়ি টুলটা জোগাড় করে ওটার ওপর দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলল। তার মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডটা খুলে বেরিয়ে চলে যাবে।

এ ঘরটা পরিপাটি করে সাজানো। ঘরের মধ্যে একটা কম্পিউটারও আছে। মিনি একটু অবাক হল। এই পরিবেশে কম্পিউটার।

সে টুলটা ঘরের ভিতরে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে কম্পিউটারটা অন করল।

বুটের পর দেখল ডেস্কটপে নাজিব এবং আরেকজনের ফটো। সে অপরজনকে চিনতে পারল না।

ডেস্কটপে এক গাদা ফোল্ডার। সব ক'টার ভিতরেই উলটো পালটা সব ফাইল।

সব ক'টা ফোল্ডার খুলেও কিছু পেল না। উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় কী মনে হতে ডেস্কটপে একটা পিডিএফ ফাইল ছিল সেটায় ক্লিক করল। দেখা গেল পাসওয়ার্ড চাইছে।

মিনি বিন্দুমাত্র কিছু না ভেবেই পাসওয়ার্ড দিল ব্লুফ্লাওয়ার।

তাকে চমকে দিয়ে পিডিএফটা খুলে গেল।

গোটা ফাইলটা আরবী ভাষায় লেখা। মিনি কিছুই বুঝতে পাল না।

প্রাণপণে ইন্টারনেট কানেকশন খুঁজতে শুরু করল কম্পিউটারের। পেল না।

আরও কয়েকটা ফাইল খুঁজবে ঠিক করেছিল এমন সময় দরজায় ধাক্কানো শুরু হয়ে গেল।

মিনি তড়িঘড়ি কম্পিউটারটা শাট ডাউন করে ঢেকে ঢুকে দিয়ে দরজাটা খুলে দেখল মোতালেব দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল। মিনি হাসতে চেষ্টা করল "এমনি, ঘরগুলো ঘুরছিলাম"।

মোতালেব একটা হাত মিনির মুখে দিল, অপর হাতটা কোমরে দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে খাটে শোয়াল। মোতালেবের হাত মিনির মুখ থেকে সরতেই মিনি চেঁচাতে শুরু করল।

মোতালেব চারদিকে তাকাল। টেবিলের ওপরে দড়ি রাখা। সে দড়ি নিয়ে মিনির হাত পা বাঁধল। মুখের মধ্যে একটা কাগজের দলা ঢুকিয়ে দিল। মিনি জোরে চেঁচাতে চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।

মোতালেব এবার দরজা বন্ধ করে মিনির সালোয়ার টান মেরে খুলে দিল। কামিজ ছিঁড়ে দিল। সম্পূর্ণ নগ্ন করে দিল মিনিকে।

মিনির বমি পাচ্ছিল। অসম্ভব মাথা ধরছিল। মোতালেব নিঃস্পৃহভাবে কাজটা করে যাচ্ছিল। মিনির গালে জোরে একটা চড় কষাল। মিনির মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

ব্লিডিং শুরু হয়ে গেছিল তার। খাট ভেসে যাচ্ছিল রক্তে। মিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল।

মোতালেব একটা কাচি নিয়ে এসে মিনির মাথার চুল কেটে দিল ছোট ছোট করে। তারপর আবার চড় মারা শুরু করল।

বেশ খানিকক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। মোতালেব দরজা খুলল। দেখল নাজিব। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নাজিব বলল "বাহ, কী সুন্দর দৃশ্য। দাঁড়াও, আমার ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। ছবিটা তুলে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া যাবে। একদিনের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যাবে সব কিছু"।

মিনি কাতরাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে মনোয়ারা বেগম এলেন। তাকে দেখে দাঁতে দাঁত চিপে বললেন "দেখলি তো মাগী? বেশি বাড়লে কী হতে পারে? তোকে অনেক বুঝিয়েছি। আর নয়। এভাবেই থাক তুই, যতদিন না তোর রক্ত পড়া বন্ধ হয়। তারপরে এখানেই মোতালেব তোর খবর নেবে"।

মিনি জ্ঞান হারালো প্রবল আতঙ্কে।

৪৮।

বেনাপোল সীমান্তের বি ডি আর চিফ মিজানুল হক ঘুম থেকে উঠে রোজ একটা গানই শোনেন। "ধন ধান্যে পুস্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'। "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি"র জায়গায়

প্রতিদিনই তার চোখে জল আসে।

মিজানুল হক চোখ বন্ধ করে সে জল অনুভব করেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে তারপর ইউনিফর্ম পরে টহল দিতে বেরোন।

এই দিনটা ভাল কাটছিল না মিজানুলের। একে বৃষ্টি, তার ওপর প্রচুর লোক হয়ে গেছে। অফিসের বাইরে লাইন দেখে মিজানুল হক সাহেব মুখ বিকৃত করে স্বগতোক্তি করলেন "এত লোক ইন্ডিয়া গিয়া কী করে? লাইন দেখো! থাক না দেশে! দেশটারে গড়তে লাগবে তো! তোরাই যদি সবাই বের হয়ে যাস তাহলে তো দেশটা সেই জামাতের হাতেই চইলা যাইব!"

মিজানুল তার ড্রাইভারকে বললেন "গাড়ি বের করো সাদিক। বর্ডার চক্কর দিয়ে আসি"।

সাধারণত মিজানুল হক একাই বেরোন। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। বর্ডার বরাবর মাটির রাস্তা আছে। বৃষ্টির ফলে সে রাস্তা কাদা ভর্তি হয়ে আছে। সাদিক বলল "স্যার, কতটা যাইবেন?"

মিজানুল বললেন "যতটা যেতে পারো যাও"।

খানিকটা গিয়ে বিডি আরের একটা ক্যাম্পে পৌছনো গেল। ক্যাম্পের বাইরে জনা দশেক গরীব লোককে আটক করা হয়েছে। মিজানুল হক গাড়ি থেকে নামতেই ক্যাম্পের ইমতাজ আলি বললেন "স্যার, এই যে, আজকের কালেকশন"।

মিজানুল হক লোকগুলোর দিকে তাকালেন। আটজন পুরুষ, কারও গায়ে সস্তা ছেড়া গেঞ্জি, কারও জামা, সবাই লুঙ্গি পরিহিত, একজন মহিলা, একজন সাত আট বছরের বাচ্চা, সেও লুঙ্গি পরে আছে। চোখে মুখে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। মিজানুল হুঙ্কার দিলেন "এবার যে তোদের জেলে দেব"।

বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করল। মিজানুল বললেন "কাঁদলে হবে না, অপরাধ বোঝ? তোমরা অপরাধ করস। এই যদি ইন্ডিয়ায় ধরা পড়তা তাহলে পেছনে গুলি ভইর‍্যা দিত। বুঝছ?"

মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বলল "কী করব ছার, টেকা নাই ,পয়সা নাই, খাবার ভাত নাই। কোই যামু কন?"

মিজানুল ভারতবর্ষের দিকে তাকালেন। কী চৌম্বকীয় ক্ষমতা আছে দেশটার? আদৌ খেতে দিতে পারে এদের? এভাবে সবাই কেন চলে যায়?

ইমতাজ চেয়ার নিয়ে এসেছিল। মিজানুল চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন, এই সিগারেটটা ইন্ডিয়া থেকেই আনা। প্রায়ই তারা বনগাঁর বাজারে বাজার করতে যান। বি এস এফ চিফ বলবিন্দর সিং এর সঙ্গেও তার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। বর্ডার অঞ্চলে এসব জলভাত ব্যাপার।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে মিজানুল বললেন "কী করবা তোমরা ইন্ডিয়ায় গিয়া?"

একজন পুরুষ বলল "মহারাষ্ট্রে নিয়ে যাবে হুজুর। কাম করাবে"।

মিজানুল বললেন "যদি খুন কইর‍্যা ফেলে। কী করবা?"

মহিলা বলল "করলে করবে। এহানেই বা বাইচ্যা আছি কোই?"

মিজানুল মুগ্ধ হলেন মহিলার কথা শুনে। কত কঠিন কথা কত সহজে বলে দিল মেয়েটা। এই তো তার বাংলাদেশ। দারিদ্র আছে কিন্তু মাথাটা এখনও নিচু করতে শেখে নি।

তিনি ইমতাজকে বললেন "ক'দিন জেলে রাইখ্যা পাঠায় দাও যেখান থেকে আইসিল সেহানে। আর এই পিচ্চিটা, কী নাম তোর?"

ছেলেটার নাক থেকে সিকনি বেরোচ্ছিল। লুঙ্গিও খুলে যাচ্ছিল। এক হাতে লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে বলল "ভগবান বিশ্বাস"।

মিজানুল মজা পেলেন "নামটা তো জব্বর রাখসে তোর বাপে। কোই তোর বাপ?"

একজন লোক হাত তুলল। মিজানুল বললেন "তুমি হিন্দু?"

লোকটা বলল "হ স্যার"।

মিজানুল বললেন “এদের সঙ্গে তুমিও যাবে?”

লোকটা বলল “পোলাডারে খাওয়াইতে পারি না স্যার। কী করুম কন”।

মিজানুল বললেন “দালালটা কোই?”

দালাল সাগির আহমেদ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। মিজানুল বললেন “এদিকে আয়”।

সাগির ধীর পায়ে মিজানুলের দিকে এগোল। মিজানুল সাগিরের কান ধরে দু গালে দুটো চড় মেরে হুঙ্কার দিয়ে বললেন “লজ্জা করে না দ্যাশের নাম ডুবাস?”

সাগির কেঁদে ফেলল “আর হইবে না ছার। সব ছাইড়া দিমু। দ্যাশে ফিইর‍্যা চাষ করমু। ছাইড়া দ্যান ছার”।

মিজানুল বললেন “উঠবস কর। একশোটা”।

সাগির উঠবোস করতে শুরু করল। মিজানুল উঠলেন। পকেট থেকে এক হাজার টাকা বের করে ভগবানের হাতে দিয়ে বললেন “দেশে যা। স্কুলে ভর্তি হ। এটা সবার দেশ। শুধু মোল্লাগো দেশ না। শুধু মোল্লাগো বাড়াবাড়ির লাইগ্যা আমার আব্বু মুক্তিযোদ্ধা লড়ে নাই বুঝছস? আবার যদি দেখসি তালে আমার থেকে খারাপ কেউ হইব না। পড়াশুনা জানিস?”

ভগবান বলতে শুরু করল “অ আ ই ঈ...”

মিজানুল বললেন “থাক থাক। অনেক হয়েছে। ইমতাজ এদের দেশে ফেরত পাঠাও। ভগবানকে স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কর। যা টাকা লাগে আমি দেখব”।

ইমতাজ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল বলতে পারল না। মিজানুল হক আবেগপ্রবণ মানুষ। কখন কী করবেন কেউ জানে না।

মিজানুল ভগবানের মাথায় হাত বুলিয়ে গাড়িতে উঠলেন। সাদিককে বললেন “অফিসের দিকে চলো”।

সাদিক গাড়ি স্টার্ট দিল। মিজানুলের ফোন বেজে উঠল।

মিজানুল দেখলেন ভারতীয় নম্বর। ভ্রু কুঁচকাল তার। ধরলেন “হ্যালো”।

“হক সাহেব বলছেন?”

“বলছি”।

“স্যার আমি পীযূষ বলছি। গত শীতে ঢাকা গেছিলাম আপনি অনেক হেল্প করেছিলেন চেকিংএর সময়”।

“মনে আছে। মনে আছে। বলুন”।

“স্যার, আমার বস আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান”।

“আচ্ছা, দিন”।

ওপাশ থেকে তুষার রঙ্গনাথনের গলা ভেসে এল “গুড মর্নিং সাহেব”।

“গুড মর্নিং। কে বলছেন?”

“আমি ডি আই বি চিফ বলছি সাহেব। একটা খুব বড় বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করছি। আপনি ছাড়া কিছুতেই এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব না”।

মিজানুল হক অবাক হলেন। ইন্ডিয়ার এত বড় অফিসার এভাবে কথা বলছেন?

বললেন “বলুন। কী সাহায্য করতে পারি আমি আপনাকে?”

৪৯।

নিয়াজি ইসলামাবাদে নামলেন দুপুর নাগাদ। লিমুজিনে উঠে গুলাম মহম্মদকে বললেন “আই ওয়ান্ট টু নো গুলাম, হোয়াট সরফরাজ ইজ ডুয়িং। আই এস আইকে মনে রাখতে হবে দে আর নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এনটিটি। আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে হোয়াটেভার দে ডু। আমাকে একটা তিন টাকার জঙ্গীর কাছ থেকে শুনতে হবে সরফরাজ খান আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছে? হাউ ডেয়ার হিম!”

গুলাম বুঝলেন নিয়াজী অত্যন্ত রেগে আছেন। বললেন “জনাব আপ প্লিজ নারাজ মত হইয়ে। আজ রাতেই সরফরাজ খানকে ডেকে নিন। আমরা কথা বলি সামনা সামনি”।

নিয়াজি বললেন “আমার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল জামাল পাশার মার্ডারের পিছনে সরফরাজ খানের হাত আছে। ও একজন পাপেট প্রেসিডেন্ট চাইছে যে ওর সব কথা শুনবে। আগে ভাবছিলাম শুধু সরফরাজ একাই সব কিছু করছে, এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এর পিছনে একমাত্র সরফরাজ নেই। একটা...”

গুলাম বললেন “বুঝতে পারছি জনাব। কিন্তু আমাদের ঘাবড়ালে চলবে না। পাকিস্তানি আর্মি মোটেও দুর্বল নয় এটা সবার জানা দরকার। আমরা যত রকমভাবে এদের উত্থানকে আটকাবো। তার জন্য জিস হদ তক জানা পড়ে হাম জায়েঙ্গে জনাব”।

নিয়াজি তবু ফুঁসছিলেন।

গুলাম বললেন “জনাব প্লিজ। অতিরিক্ত রেগে গিয়ে কোন ডিসিশন নিলে সেটা আপনার এবং এই দেশের, দুইয়ের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে। প্লিজ টেক ইওর টাইম। আমরা আরেকটু সময় নি”।

নিয়াজি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

কনভয় ফতিমা জিন্নাহ পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নিয়াজি দেখলেন কয়েকজন কিশোর পার্কের সবুজ ঘাসে ক্রিকেট খেলছে।

নিয়াজি বললেন “গাড়ি থামাও”।

গুলাম বললেন “কী জনাব, গাড়ি থামাবে কেন? মিটিং আছে তো”।

নিয়াজি বললেন “নাহ। মন মেজাজ ঠিক নেই। আমি ব্যাটিং করব”।

গুলাম কনভয় থামানোর নির্দেশ দিলেন।

নিয়াজি আর্মি ইউনিফর্ম পরে ছিলেন। গাড়ি থেকে নামলেন। গুলামকে বললেন “তুমি এখানেই থাকো। দেখ কেমন ব্যাট করি”।

তার নিরাপত্তারক্ষীরা নামতে যাচ্ছিল। নিয়াজি তাদেরও নিরস্ত করলেন।

যে কিশোররা ক্রিকেট খেলছিল, নিয়াজি এগিয়ে গিয়ে হেসে বললেন “মে আই ব্যাট?”

যে ছেলেটা ব্যাট করছিল সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না স্বয়ং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তার কাছে ব্যাট চাইছেন। সে চোখ বড় বড় করে নিয়াজির দিকে তাকাল।

একজন নিরাপত্তারক্ষী ছেলেটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল নিয়াজি হাত তুলে তাকে আসতে বারণ করলেন। ছেলেটাকে বললেন “তোমার নাম কী?”

ছেলেটা বলল “শাহিদ জনাব”।

নিয়াজি বললেন “আমাকে একটু ব্যাট করতে দেবে?”

শাহিদ বলল “জরুর জনাব, জরুর”।

নিয়াজি ব্যাট হাতে নিলেন। এককালে প্রচুর ক্রিকেট খেলতেন। অভ্যস্ত হাতে স্টান্স নিচ্ছিলেন এমন সময় চারদিক কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ হল। শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিয়াজি মাটিতে শুয়ে পড়লেন।

বিস্ফারিত চোখে দেখলেন তার গাড়িটায় বিস্ফোরণ হয়েছে। আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। পার্কে যারা খেলছিল তাদের মধ্যে একজন ঘাসেই পড়ে গেল। সম্ভবত গাড়ির কোন কিছু ছিটকে এসে তার গায়ে লেগেছে। বাকিরা প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে।

চতুর্দিক একটু শান্ত হলে নিয়াজি উঠলেন। দৌড়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দেখলেন গুলাম মহম্মদ মরে পড়ে আছেন। চোখ মুখ বিকৃত। চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

সামনের কনভয়ের দুটো গাড়ি অক্ষত ছিল। যে কজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল সে গাড়িতে তারা দৌড়ে এসে নিয়াজিকে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

নিয়াজি ঘামছিলেন মারাত্মকভাবে। একজন নিরাপত্তারক্ষীকে বললেন "ক্যান্টনমেন্টে চল। প্রেসিডেন্ট হাউজে না"।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ক্যান্টনমেন্টের কোয়ার্টারে পৌছলেন নিয়াজি।

নিজের ঘরে গিয়ে ইউনিফর্ম খুলে নিজের বিছানায় চুপ করে শুয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর ফোন বের করে গম্ভীর মুখে একটা নম্বর ডায়াল করতে শুরু করলেন।

৫০।

পেশোয়ার।

ঘুম থেকে উঠে সায়ক কোথাও বেরোয় নি। অলসভাবে কাটছে দিনটা।

টিভি দেখছিল আব্বাসের সঙ্গে। আব্বাস খেলা দেখতে ভালোবাসে। পাকিস্তানের প্রিমিয়ার লীগ দেখছিল। খেলা দেখতে দেখতে বলল "যাই বল মিয়াঁ, পাকিস্তানের পেসারগুলো খাসা"।

সায়ক বলল "হু"।

আব্বাস বলল "তবে আমাদের কোহলির সামনে সব ছুঁচো হয়ে যাবে, কী বল?"

সায়ক বলল "হু"।

আব্বাস বিরক্ত হয়ে বলল "কী সারাক্ষণ হু হু করে যাচ্ছ? ক্রিকেটমে কোই খাস দিলচস্তি নেহি হ্যায় ক্যা?"

সায়ক বলল "নাহ। বেঙ্গলের হয়ে একবার শুধু রঞ্জি খেলেছিলাম"।

আব্বাস অবাক হয়ে বলল "অ্যা? সিরিয়াসলি?"

সায়ক আব্বাসের কথার উত্তর না দিয়ে বলল "দয়া করে একটু নিউজ চ্যানেলটা দেবে? সকাল থেকে এই ভাটের ফিক্সড লিগ দেখে মাথা পচে গেল"।

আব্বাস রিমোটটা সায়কের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল "নাও, নিজেই দেখো। পাকিস্তানের আবার নিউজ চ্যানেল! সারাক্ষণ ইন্ডিয়ার এগেইন্সটে বলে যাচ্ছে! দেখো কী করে? আমার তো গা জ্বলে যায়"।

সায়ক বলল "গা জ্বললে হবে কী করে? এদেশে জাসুসি করলে পাকিস্তানিই হয়ে যেতে হবে মিয়াঁ বুঝেছ?" সায়ক চ্যানেল চেঞ্জ করে নিউজ চ্যানেল দিল।

খবরে দেখাচ্ছে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট নিয়াজীর ওপরে "জান লেবা" হামলা হয়েছে, অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন প্রেসিডেন্ট। সায়ক তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বলল "শিট!"

আব্বাস বলল "এ তো রোজকার ঘটনা মিয়াঁ। এতে এতো লাফালাফি করার কী আছে?"

সায়ক বলল "তুমি বুঝতে পারছ না আব্বাস! জামাল পাশাকে মারল, আজকে নিয়াজিও টার্গেট হয়ে গেলেন। এর মানেই হচ্ছে দেশ চালানোর হাল এখন পাকিস্তানের আর্মির হাতেও নেই"।

সায়ক কম্পিউটারে বসল। তুষারকে ফোন করার চেষ্টা করল বার তিনেক। তিনবারই ব্যর্থ হল। বলল "কী যে হল! কিছুতেই তুষার স্যারকে ফোন পাচ্ছি না! কী করা যায় বল তো?"

আব্বাস বলল "কী করবে? খবর দেখো। পরে পেয়ে যাবে ঠিক"।

সায়ক অস্থির ভাবে বলল "না না, তুমি বুঝতে পারছ না, কালকেই ফারুক চাচার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সামথিং ইজ কুকিং... সামথিং ডেঞ্জারাস ইজ অ্যাবাউট টু হ্যাপেন"।

আব্বাস অবাক হয়ে বলল "কী হ্যাপেন? কী যে বলছ? কিছুই মাথায় ঢুকছে না"।

সায়ক ঘর থেকে বেরোতে গেল। আব্বাস ডাকল "ও মিয়াঁ, কী কর, ফারুক চাচা বেরোতে বারণ করেছে তো"।

সায়ক একটা চেয়ারে জোরে লাথি মেরে বলল "শিট, শিট, শিট! দিস ইজ রিয়েল শিট! দেখি আবার"।

আবার তুষারকে ফোন করার চেষ্টা করল সায়ক। পাওয়া গেল না।

দরজা খুলে ফারুক ঢুকলেন। সায়ক যেন হাতে চাঁদ পেল। বলল "চাচা, খবরটা শুনেছ?"

ফারুক বললেন “শুনেছি, তবে তার থেকেও তোমার জন্য বড় খবর আছে। সরফরাজ খান পেশোয়ারে ঢুকেছে”।

সায়ক লাফিয়ে উঠল, “ইয়েস! গাড়ির ব্যবস্থা করুন চাচা”।

ফারুক বললেন “হয়ে গেছে। গলির মুখে তানবীর দাঁড়িয়ে আছে। তবে শোন, আবার বলে দিচ্ছি, তুমি কিন্তু কোনভাবেই ওই বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করবে না”।

সায়ক বলল “ক্ষেপেছেন? আমার কোন দরকারই নেই। আমি এবার আমার আরেকটা শখ পুরো করব”।

আব্বাস বলল “কী?”

সায়ক দেওয়াল থেকে ডি এস এল আর আর একটা টেলি লেন্স নিয়ে বলল “লাইফ ইজ অ্যামেজিং আব্বাস। লেটস গো”।

#

কাশেম সোলেমানির ডেরা থেকে প্রায় দুশো মিটার দূরে গাড়িটা দাঁড় করালো সায়ক।

আব্বাস বলল “হয়ে গেল? এখানেই?”

সায়ক বলল “গাড়িতেই বসে থাকো। আমি আসছি একটু পরেই”।

আব্বাস অবাক হয়ে বলল “খেপে গেছ? পাগলা গয়ে হো ক্যা? একা একা যাবে? না না তা হবে না, আমিও যাব”।

চারদিকে রুক্ষ্ম প্রান্তর। মাঝে মাঝে ঘাসের বড় বড় ঝোপ। সায়ক যতটা পারল এগোনোর চেষ্টা করল। বাড়িটার ভেতরে জুম করার চেষ্টা করল ক্যামেরা দিয়ে। বড় বড় দেওয়াল। কিছুই দেখা গেল না। একটু একটু করে অনেক খানি এগিয়ে গেল সায়ক।

খানিকক্ষণ পরেই একটা কনভয় বাড়িটার সামনে এল। সায়ক পর পর বেশ কয়েকটা ছবি তুলল। গাড়ির ভেতর সরফরাজ খানকে দেখা যাচ্ছে। সায়ক অস্ফূটে বলল “ইয়েস। ইয়েস। কাম হো গয়া”।

কথাটা শেষ হল না ঘাড়ে বন্দুকের শীতল স্পর্শ পেল সায়ক, অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একজন পাঠান তার হাতের একে ৪৭ নিয়ে তার দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

সায়ক বলল “জাস্ট ফটোগ্রাফি ফ্রেন্ড। জাস্ট ফটোগ্রাফি”।

পাঠান বন্দুক দিয়ে সায়ককে গুঁতো দিল, “চল, আন্দর চল। ফটো লেনে কা শখ হ্যায় না তুঝে? আন্দর চল কর লেনা”।

সায়ক কিছু বলার আগেই একটা উড়ন্ত ইট এসে পাঠানের মাথার পেছনে লাগল। পাঠান একবার সায়কের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে মাটিতে কাটা পাঠার মত শুয়ে পড়ল। সায়ক দেখল আব্বাস এসে পড়েছে। তার দিকে দাঁত বের করে তাকিয়ে বলল “তুমি মিয়াঁ রঞ্জি খেলেছ, আর আমি পাড়ার মাঠের ক্রিকেটের বেস্ট ফিল্ডার ছিলাম। হল প্রমাণ?”

সায়ক হেসে ফেলল।

৫১।

মিনি শুয়ে ছিল খাটে। তার চোখের তলায় কালশিটে পড়ে গেছে। ধর্ষণ না হলেও সারারাত মোতালেব মিয়াঁ মেঝেতে বসে ছিল। যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন চড় মেরেছে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছে সে। বিছানা ভর্তি রক্ত, পেচ্ছাপ। একবারও পরিষ্কার করে নি কেউ।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙেছে তার। উঠে দেখল মোতালেব মাছের মত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে আতঙ্কে আবার চোখ বুজে ফেলল।

কিছুক্ষণ পর বলল “আমার গায়ে একটা কাপড় দিন প্লিজ। আপনার বাড়িতে যদি মা বোন কেউ থাকত, তাহলে আপনি পারতেন এভাবে তাকে মারতে?”

মোতালেব কিছু বলল না। একই ভাবে বসে থাকল। মনোয়ারা বেগম কিছুক্ষণ পরে এসে একটা গামছা ফেলে দিলেন মিনির গায়ে। মোতালেবকে বললেন "একে আজ খেতে দিবি না। শুয়ে থাক এভাবেই"।

সারাদিন মোতালেব বসে থাকল তার পাশে। একবার বাথরুমে নিয়ে গিয়ে আবার একইভাবে বেঁধে শুইয়ে দিল। মিনি আটকাবার কথা ভাবতেও পারল না।

দুপুরের দিকে নাজিব এল। তার গায়ের গামছাটা সরিয়ে গোটা শরীরে হাত বোলাতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর মোতালেবকে বলল "যা তো, মার কাছ থেকে গুড় নিয়ে আয়। এ মেয়ের শরীরে গুড় মাখিয়ে দি। কিছুক্ষণ পর গুড়ের গন্ধে পিঁপড়ে আসবে, আরও মজা হবে"।

মোতালেব নিচে চলে গেল।

নাজিব মিনির গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল "আর তো খুব বেশি হলে একটা দিন। তারপর দেখ তোর কী হাল করি"।

মিনির মুখ দিয়ে বমি উঠে গেল। নাজিব মিনির পেটে মাথা পেতে শুল, বলল "পেট খারাপ হয়েছে সোনার? দেখি দেখি, পেট থেকে কেমন গুড়গুড় শব্দ আসে! আর এ কী রক্ত! দেখি, পরিষ্কার করে দি"।

মিনি চেঁচিয়ে উঠল "প্লিজ এখন ছেড়ে দিন আমায়, প্লিজ"।

নাজিব আদুরে গলায় বলল "দেব তো সোনা। তুমি তো আমার বউ। সকাল বিকাল তোমায় আনন্দ দেওয়া আমার কর্তব্য। দেখি দেখি বুক দুখানি দেখি"।

নাজিব হাত বাড়াল। মিনি চেঁচাতে গেল, নাজিব মিনির মুখের মধ্যে হাত দিয়ে হিসহিসিয়ে বলল "চিল্লিয়ে কোন লাভ নেই, কেউ শুনতে পাবে না। উফ, মোতালেব গুড় আনতে গিয়ে কোথায় চলে গেল? দাঁড়া, আমি আসছি, এখনই আসছি"।

খানিকক্ষণ পর নাজিব গুড় নিয়ে আসল। মিনির সারা শরীরে মাখাতে মাখাতে বলল "ভাল লাগছে না মাগী? আরও ভাল লাগবে। দেখ দেখ কেমন আনন্দ পাচ্ছিস আমি যখন তোকে গুড় মাখিয়ে দিচ্ছি"।

মিনি ককিয়ে উঠল। ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। মোতালেব এসে মিনিকে সপাটে একটা চড় কষাল। নাজিব হাসতে হাসতে বললে "মাগীর কিন্তু ভাল্লাগসে। বলে না, বুঝছিস?"

মিনি গোঙাতে গোঙাতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

নাজিব মোতালেবকে বলল "চ, নিচে যাই। মাগী পড়ে থাক এভাবেই। দরজাটা বন্ধ করে দে"।

#

রাত এগারোটা। নাজিব, মনোয়ারা বেগম খেতে বসেছিল। মোতালেব মাটিতে বসে খাচ্ছিল। বৃষ্টি পড়ছিল বলে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ হয়েছে। নাজিব ইলিশের কাঁটা বাছছিল মন দিয়ে। মনোয়ারা একটা ইলিশের পিস নাজিবের প্লেটে দিলেন।

নাজিব আপত্তি করল "না না দিও না, কী যে কর না"।

মনোয়ারা আদুরে গলায় বললেন " খা না বাবা, আরেকটু খিচুড়ি দেব?"

নাজিব মাথা নাড়ল "না না। থাক থাক। আর লাগবে না"।

মনোয়ারা উঠে গিয়ে মোতালেবকে খিচুড়ি দিয়ে আবার খেতে বসলেন। সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশ। কে বলবে বাড়িতে একটা মেয়ের ওপর ওভাবে অত্যাচার চলছে।

দরজায় কেউ বেল দিল। মনোয়ারা বিরক্ত গলায় বললেন "কে এল আবার"?

নাজিব বলল "সুলতানভাই মনে হয়। কালকে আসার কথা ছিল তো। আজ এসে গেছে হয়ত। কোন খবরও দেয় নি। মোতালেব দেখ তো গিয়ে"।

মোতালেব উঠল। দরজা খুলল।

তারা কিছু বুঝে ওঠার পাঁচজন ভারতীয় এন এস জি কম্যান্ডো এবং সাতজন বিডি আর কম্যান্ডো ঢুকল। মোতালেব একজন কম্যান্ডোকে এঁটো হাতেই ঘুষি মারল। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে বেশ কয়েকটা গুলি ঝাঝরা

করে দিল তাকে।

মোতালেব ওখানেই পড়ে গেল। নাজিব হাত তুলল, “সারেন্ডার, সারেন্ডার”।

মিজানুল হক ঘরে ঢুকলেন। নাজিবকে বললেন “মেয়েটা কোথায়?”

নাজিব উত্তর দিল না।

মিজনুক হক এগিয়ে সরাসরি নাজিবের নাকে ঘুষি মারলেন “বল মেয়েটা কোথায়?”

নাজিব ককিয়ে উঠল, “উপরে আছে। উপরে”।

মিজানুল বললেন “সিড়িটা কোনদিকে?”

নাজিব হাত দিয়ে দেখাল।

মিজানুল বললেন “তিনজন এদের দিকে নজর রাখো। বাকিরা আমার সঙ্গে এসো”।

মিজানুল দ্রুত উপরে উঠলেন। সব ঘরের দরজা ধাক্কিয়ে অবশেষে মিনিকে দেখলেন। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় শুয়ে আছে। খাট ভর্তি মল মূত্র। গায়ে পিঁপড়ে ভর্তি।

মিজানুলের নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল অজান্তেই।

৫২।

বাইরে প্রেসের লোক ভর্তি হয়ে আছে।

সবাই তার কথা শোনার জন্য বসে।

নিয়াজির দম বন্ধ হয়ে আসছিল। নিজে ইন্ডিয়া পাকিস্তান কার্গিল যুদ্ধের সময় বর্ডারে ছিলেন, ইন্ডিয়ান সেনাদের গুলিতে নিজের পাশের যোদ্ধাকে চোখের সামনে শহীদ হয়ে যেতে দেখেছেন। কিন্তু নিজের দেশে, নিজের চোখের সামনে গুলাম মহম্মদের মৃত্যুটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। বারবার মনে হচ্ছিল, ক্রিকেট খেলতে না নামলে তারও একই দশা হত।

ফোন বাজছিল তার। নিয়াজি দেখলেন হোয়াইট হাউজ থেকে ফোন এসছে।

ধরলেন না। কয়েক মিনিট বসে থেকে ঘর থেকে বেরলেন।

বাইরে একটা টেবিলে একগাদা মাইক রাখা। অন্য সময় হলে গুলম মহম্মদকে বলতেন সিকিউরিটি চেকিঙের জন্য। এবারে একেবারেই উদাসীন মুখে বসলেন।

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল চতুর্দিক থেকে। প্রশ্ন ভেসে এল “স্যার, আর ইউ ওকে”?

নিয়াজি তাকালেন প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে, ঠান্ডা গলায় বললেন “অ্যাবসোলিউটলি”।

“আপনার কার ওপর সন্দেহ হচ্ছে এই ঘটনাটার জন্য”?

“এই মুহূর্তে বলা যাবে না। তবে র এই মুহূর্তে পাকিস্তানে অতি সক্রিয় সে খবরটা আমি ক’দিন ধরেই পাচ্ছিলাম”।

বিবিসের সাংবাদিক সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন “তারমানে আপনি এই ঘটনাটার জন্য ইন্ডিয়াকে সন্দেহ করছেন?”

নিয়াজি একটু থমকে বললেন “আপাতত। কোন কংক্রিট ডেটা নেই এই মুহূর্তে আমার হাতে”।

“প্রথমে জামাল পাশা, তারপরে আপনি। আপনার কি মনে হচ্ছে না পাকিস্তানে অ্যানার্কি স্থাপনের লক্ষ্যে এই ব্লাস্টগুলো হচ্ছে?”

নিয়াজি বললেন “হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তানে সমস্যা তৈরী হলে কিছু দেশ তো স্বাভাবিকভাবে লাভবান হবেই”।

একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক বললেন “স্যার, এই মুহূর্তে আপনি কাকে নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করছেন?”

নিয়াজি সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে বললেন “আমাদের সবার একজনই পরম বন্ধু আছেন। পরম করুণাময় আল্লাহপাক। আমি জানি উনি ঠিকই আমাকে পথ দেখাবেন দেশের এই সঙ্কটে। আমি নিজেকে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কেয়ারটেকার বলে মনে করি। এই অ্যাক্সিডেন্টের ফলে বোঝাই যাচ্ছে কেউ আমাকে পথ থেকে সরাতে চাইছে যাতে পাকিস্তানে সমস্যা তৈরী করা যায়”।

“স্যার বিরোধী শিবির বলছে গুলাম মহম্মদকে মারার জন্য এটা আপনারই চক্রান্ত ছিল”।

নিয়াজি গলাটা চিনলেন না। ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে প্রশ্নটা কে করল বুঝতে পারলেন না। বললেন “কে প্রশ্নটা করলেন? দেখি মুখটা?”

কেউ হাত তুলল না। নিয়াজি বললেন “সাংবাদিক হয়েছেন বলে যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করতে পারেন না। আপনাদের কোন ধারণা নেই ওই গাড়িতে আমি যাচ্ছিলাম। যে টাইম বোমটা বিস্ফোরণ হয়েছে, আমার পক্ষে কোনমতেই জানা সম্ভব নয় কোন সময়ে সেটা ব্লাস্ট করবে। তাছাড়া গুলাম মহম্মদ আমার সব থেকে প্রিয় সহচর ছিলেন। তার মৃত্যুকে আমি কোনমতেই মেনে নিতে পারছি না। আশা করব, এইসব বেহুদা সওয়াল করে আমার সময় নষ্ট করবেন না। আর কোন প্রশ্ন আছে কারও?”

“স্যার এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ার অভিযোগ আছে, ইন্ডিয়াতে ঘটে যাওয়া পর পর হত্যাকান্ডে পাকিস্তানের হাত রয়েছে। ওরা কাশ্মীরের ঝামেলার জন্যও পাকিস্তানকে দায়ী করছে। ইন্ডিয়া স্পেসিফিক্যালি অভিযোগ করেছে ইসলামিক স্টেট পাকিস্তানকে ওদের টেরোরিজমের ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করছে আর আপনার তাদের পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছেন। এই মারাত্মক অভিযোগ সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?”

নিয়াজি বললেন “সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। পাকিস্তান কোন দিনও টেরোরিজমকে প্রশ্রয় দেয় না”।

“কিন্তু স্যার আজাদ কাশ্মীরে লস্কর কিংবা হিজবুলের ঘাটিগুলো সম্পর্কে আপনারা কিছু বলতে চান না কেন?” সি এন এনের বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

নিয়াজি বললেন “লস্কর কিংবা হিজবুল প্রসঙ্গে পাকিস্তান বরাবরই বিরোধিতা করে এসেছে। আপনারা ঠিক ঠাক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করলে দেখতে পাবেন পাকিস্তান নিজেই অনেকবার লস্করের ঘাটি ভাংতে সাহায্য করেছে। সমস্যা হল আজাদ কাশ্মীরে আমাদের সরাসরি হাত নেই”।

একজন সাংবাদিক একটা ছবি বের করে তুলে ধরল “স্যার, আমাদের কাছে এই ছবিটা মেইল করা হয়েছে এক অজানা সোর্স থেকে। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে আপনি মুস্তাক জিমরির সঙ্গে মিটিঙে ব্যস্ত। এই ছবিটা কি সত্যি? আপনি কি আজ মুস্তাক জিমরির সঙ্গে মিটিং করতে মুজফফরাবাদে গেছিলেন?”

নিয়াজি সাংবাদিকটিকে চিনলেন না, বললেন “আপনারা ফটোশপড ছবি কি বুঝতে পারেন না? প্লিজ এইসব ছবি নিয়ে অযথা ঝামেলা তৈরী করবেন না”।

নিয়াজি উঠে পড়লেন। একজন বললেন “স্যার, আপনি প্রেসিডেন্ট হাউজে ফিরবেন না?”

নিয়াজি বললেন “না, আপাতত আমি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। আজ এখানেই থাকব”।

“আপনার কি মনে হয় না দেশের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন তাহলে গোটা দেশের মানুষ কী করবেন?”

নিয়াজি প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসলেন।

৫৩।

গাড়িতে উঠে আব্বাস হাঁফাচ্ছিল। তানবীর কোন কথা জিজ্ঞেস না করেই গাড়ি স্টার্ট দিল।

সায়ক বলল “জোরে নিঃশ্বাস নাও। এত ভয় পাওয়ার কিছু হয় নি”।

আব্বাস বলল “কী যে বল মিয়াঁ, যদি অন্য কেউ আমাদের দেখে থাকে?”

সায়ক বলল “দেখলে দেখবে, কী আর হবে?”

আব্বাস বলল “সে কী? যদি গুলি টুলি চালিয়ে দেয়?”

সায়ক বলল “দিলে দিত, কথাই আছে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন”।

আব্বাস বলল “থাক বস, অনেক হয়েছে। এবার ভালয় ভালয় ফিরতে পারলে বাঁচি”।

সায়ক কিছু বলল না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রুক্ষ প্রান্তর। এখান থেকে আফগানিস্তান বর্ডার একেবারেই কাছে। বেশিরভাগ জায়গাই দখল করে নিয়েছে আফগান উদ্বাস্তুরা। ছোট ছোট বস্তি হয়েছে। জলের প্রচন্ড অভাব এ অঞ্চলে। তবু তালিবান এবং আমেরিকানদের মুহুর্মুহু সংঘর্ষ থেকে বাঁচতে অনেকেই এপারে শরণার্থী হয়েছে।

সায়ক বাইরে তাকিয়ে বলল “মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যাচ্ছে, অথচ এরা বন্দুকের ভাষা থেকে বেরোতে পারল না”।

আব্বাস বলল “ইন্ডিয়ায় বসে কেউ ভাবতেও পারবে না ঠিক কী পরিবেশে এখানকার মানুষেরা থাকে। আর আমাদের চ্যালেঞ্জটা বোধ হয় এটাই। ইন্ডিয়া যেন কোন দিন পাকিস্তান, আফগানিস্তান না হয়ে যায়”।

সায়ক বলল “ইন্ডিয়া চেষ্টা করছে সব রকমভাবে এরকম হবার। যে কোন দিন হয়ে যেতে পারে। দেশের পরিস্থিতিও কি খুব একটা ভাল ভেবেছ?”

আব্বাস মুখ কালো করে বসে রইল।

পেশোয়ার শহরে প্রবেশের আগে বিরাট জ্যাম।

সায়ক অবাক হয়ে তানবীরকে বলল “কী হল আবার?”

তানবীর গাড়ি থেকে নেমে বাইরে ঘুরে এসে বলল “আর্মির সঙ্গে আফগান রিফিউজিদের ঝামেলা লেগেছে। দু চারটে দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে আফগানরা। এখনও ঝামেলা চলছে”।

কথাটা তানবীর এমনভাবে বলল যেন এতো রোজকার ঘটনা, এত চাপ নেবার কী আছে?

আব্বাস ভিতু গলায় সায়ককে বলল “এবার কী হবে? আর্মি যদি আমাদের চেক করে? তোমার ক্যামেরা আছে মিয়াঁ”।

সায়ক একটা হাই তুলে বলল “চেক করলে করবে, কী আর হবে? খুব বেশি হলে গুলি করে মারবে!”

আব্বাস চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে বলল “আপ আদমি হো ইয়া পাজামা? ক্যায়সে ইতনা কুল রহতে হো মিয়াঁ?”

সায়ক চোখ বুজল “সকাল থেকে অনেক পরিশ্রম গেছে। আমি চোখ বুজলাম। পৌছলে ডেকে দিও”।

আব্বাস বিড়বিড় করতে লাগল “আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে”।

বাইরে বাস্তবিকই হুলস্থূল লেগে গেছে। আর্মি যথেচ্ছভাবে লাঠি পেটা করছে। বিক্ষোভকারী আফগানরা যে যেদিকে পেরেছে দৌড়ে পালাচ্ছে।

এর মধ্যেই গাড়ি শম্বুক গতিতে এগোতে থাকল।

আব্বাস বলল “আমার কিছুতেই তোমার সঙ্গে আসা উচিত হয় নি। কী সব কান্ড করে বেড়াচ্ছ। সবার কি আর তোমার মত সাহস আছে মিয়াঁ?”

সায়ক বলল “গাড়ি চলেছে তো। আর চিন্তা করছ কেন?”

আব্বাস বলল “চিন্তা করব না? চিন্তা না করার মত কী দেখলে তুমি? আমার এখনও বিয়ে হয় নি। যদি বিয়ে হবার আগেই মরে যাই তাহলে কী হবে?”

সায়ক চোখ মিটিমিটি করে বলল “বিয়েটা বড় কথা না অন্য কিছু? অন্য কিছু হলে বল, এখনই তানবীরকে বলছি জন্নতে নিয়ে যেতে”।

আব্বাস দুকান ধরল “তওবা তওবা, মিয়াঁ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার আব্বু জানতে পারলে আমাকে লাথ মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে”।

সায়ক বলল “সব কাজ আব্বুকে বলে কর নাকি?”

আব্বাস বলল "না না, তা কেন করব কিন্তু এসব কাজ করা যায় নাকি? ছি ছি ছি। কী যে বল"।

একটু দূরেই কানিংহাম ক্লক টাওয়ারের কাছে একটা বড় জটলা হয়েছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল ফের।

আব্বাস ভয়ার্ত গলায় বলল "ওই দেখো মিয়াঁ, আবার মনে হচ্ছে কোন ঝামেলা লেগেছে"।

সায়ক গাড়ি থেকে নামল।

আব্বাস অবাক হয়ে বলল "আবার কী হল?"

সায়ক বলল "নেমে যাও"।

আব্বাস ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বলল "মানে? নেমে যাব মানে? মাথা গেছে নাকি? এই ঝামেলার জায়গায় নেমে যাব?"

সায়ক কড়া গলায় বলল "যা বলছি শোন। এই জায়গা থেকে তানবীর ঠিক বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কখন, সেটা উপরওয়ালাই জানেন। আমাদের অন্য রুট ধরতে হবে"।

আব্বাস বলল "কোন রুট?"

সায়ক ধমক দিয়ে বলল "সেটা আমার সঙ্গে না গেলে কী করে বলব? চল শিগগিরি"।

আব্বাস তড়িঘড়ি নামল গাড়ি থেকে। সায়ক তানবীরকে বিদায় দিয়ে ঘিঞ্জি বাজারের একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করল।

আব্বাস বলল "এ আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

সায়ক বলল "পা চালাও"।

গলির দুপাশে একটার পর একটা দোকান। প্রত্যেকটা পাঠানদের চেঁচামেচি লেগেই রয়েছে। এই অঞ্চলে ঝামেলা রোজকার ঘটনা। তাতে আর বাজারে বিশেষ প্রভাব পড়ে না।

সায়ক কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে লাগল জোর পায়ে। পেছনে আব্বাস।

অনেকটা রাস্তা পার হবার পরে একটা দোতলা পুরনো বাড়ির সামনে দাঁড়াল সায়ক।

আব্বাস হাঁফাচ্ছিল। তার মধ্যেই অবাক গলায় বলল "এ আবার কোথায় নিয়ে এলে?"

সায়ক উত্তর দিল না। বাড়িটার নিচে দোকান। মাঝখানে একটা সরু গলি।

গলির ভেতর দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে একটা স্যাঁতস্যাঁতে সিঁড়ি।

সায়ক সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল।

আব্বাস গজগজ করতে করতে সায়কের পিছনে দৌড়তে লাগল।

দোতলায় উঠে দেখা গেল তিনটে দরজা।

সায়ক গালে হাত দিয়ে তিনটে দরজা মন দিয়ে দেখল। তারপর কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করল।

আব্বাস বলল "কী হল? কোথায় যেতে হবে ভুলে গেছ?"

সায়ক তীক্ষ্ণ চোখে তিনটে দরজার দিকে তাকাল। তারপর এক একটা দরজার দিকে আঙুল তুলে বিড়বিড় করতে লাগল "এক দো তিন, চার পাঁচ ছে...ইয়েস মনে পড়েছে"।

সিঁড়ি থেকে উঠে ডান দিকের দরজাটা তিনবার নক করল সায়ক।

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

একজন লম্বা পাঠান জিজ্ঞাসু চোখে সায়কের দিকে তাকাল।

সায়ক বলল "জানাম, দেখলো, মিট গয়ি দুরিয়া"।

পাঠান অবাক গলায় বলল "ক্যা?"

সায়ক হাত তুলল "সরি। গলতি হো গয়া"।

পাঠান একটা গালাগালি দিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।

আব্বাস বলল "একী? তোমারও ভুল হল মিয়াঁ?"

সায়ক আব্বাসের দিকে তাকাল "এটাকে বলে ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড। নিশ্চয়ই এর পাশেরটা হবে"।

আব্বাস মাথায় হাত দিল “ইয়া আল্লাহ, আজ মারওয়াওগে তুম”।
সায়ক মাঝের দরজাটা তিনবার নক করল।
এক বোরখা পরিহিতা মহিলা দরজা খুললেন।
সায়ক বলল “জানাম, দেখল, মিট গয়ি দূরিয়া...”।
মহিলা দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।
সায়ক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল “চলে এসো। এবারে আর ভুল হয় নি”।

৫৪।

ঘরের ভিতরে দুজন পাঠান সোফায় বসে আছে। বোরখা পরিহিত মহিলা অন্য ঘরের ভিতর চলে গেলেন।
আব্বাস ভয়ে ভয়ে সায়কের দিকে তাকাল।
সায়ক আব্বাসকে পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল “আই হ্যাভ এ লিড। অ্যালেক্সের সঙ্গে কথা বলব”।
দুজন পাঠান মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বলল “হু আর ইউ”?
সায়ক বলল “দ্যাটস নট ইম্পরট্যান্ট। প্লিজ টেল অ্যালেক্স, ইন্ডিয়ান কবুতর হ্যাজ কাম”।
একজন তাদের বলল “সিট ডাউন”।
সায়ক সোফায় বসল।
আব্বাস ঘাবড়ে ছিল। সায়ক বলল “বস”।
আব্বাস সায়কের পাশে বসে বলল “একী মিয়া? কোথায় নিয়ে এলে?”
সায়ক বলল “চুপ করে বসে থাকো বললাম তো”।
একজন পাঠান উঠে ভেতরের ঘরে গেল।
কিছুক্ষণ পর একজন ছোট খাট চেহারার ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান এ ঘরে এসে সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল “প্লিজ কাম”।
সায়ক আব্বাসকে বলল “তুমি এখানেই বস, আমি আসছি”।
আব্বাস মুখ চুন করে বসে থাকল।
কিছুক্ষণ পর সায়ক ঘর থেকে বেরিয়ে বলল “চল”।
আব্বাসের যেন ধড়ে প্রাণ এল। সে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল “কোথায় যাবে?”
সায়ক বলল “তোমার কোথায় যেতে ইচ্ছা করছে?”
আব্বাস বলল “সে তো মাম্মিকে পাস। নিয়ে যেতে পারবে?”
সায়ক হেসে বলল “কেন নিয়ে যেতে পারব না? তুমি যাবে?”
আব্বাস গম্ভীর মুখে বলল “এইসব ইয়ার্কি আমার একদম ভাল লাগে না মিয়া। দেখতেই পারছ, এমনিতেই কী অবস্থা হয়ে আছে, তার মধ্যে তুমি এসব বলে যাচ্ছ”।
তারা আবার বাজারের মধ্যে ঢুকল। সায়ক বাজারের মধ্যে দিয়ে বেশ খানিকটা পথ গেটে একটা পিসিও থেকে ফারুককে ফোন করল।
ফারুক ধরলেন, “হ্যালো”।
“চাচা, কী অবস্থা?”
“তোমার কাজ হয়ে গেছে?”
“হ্যাঁ চাচা”।
“তুমি আর এদিকে এসো না এখন। গোটা বাজার আর্মি ঘিরে ফেলেছে”।
“সেকী? তাহলে কমিউনিকেটিং ডিভাইস, কম্পিউটার, এসবের কী হল?”
“সেসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সব সরিয়ে ফেলেছি”।

"থ্যাঙ্ক গড চাচা"।
"শোন, এখন কোথায় আছ?"
"ক্লক টাওয়ারের কাছে"।
"আচ্ছা, ওখান থেকেও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে স্টেশন পৌঁছে যাও। পেশোয়ার এখন আর তোমাদের জন্য নিরাপদ নয়। যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে। খুদা হাফেজ"।
"নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবে চাচা। খুদা হাফেজ"।
ফোনটা রেখে সায়ক পিসিও থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল।
কিছুক্ষণ পরে একটা ভ্যাটের সামনে এসে উপস্থিত হল তারা।
সায়ক ক্যামেরার ব্যাগটা ভ্যাটের মধ্যে ফেলে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।
আব্বাস তার পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে বলল "ও মিয়াঁ, এত দামী জিনিস। সব ফেলে দিলে? প্রমাণ থাকল না তো কিছু?"
সায়ক বলল "কী আর করা? আর্মি এগুলো পেলে তো আমাদের ছাল ছাড়িয়ে নেবে"।
আব্বাস ব্যাজার মুখে হাঁটতে থাকল।
গলির বাইরে এসে অটো নিল সায়ক। রাস্তার দখল আর্মি নিয়ে নিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে বিক্ষোভকারীদের মেরে হটিয়ে দিয়েছে তারা।
দোকানগুলো আবার খুলে গেছে। লোকজন আবার রাস্তায় নেমেছে।
সায়ক হেসে বলল "এদের কাছে এসব জলভাত। এই কেউ মরছে, পরক্ষণেই আবার ব্যাক টু লাইফ"।
আব্বাস কিছু বলল না। সায়কের কাজকর্ম সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। গম্ভীর হয়ে বসে থাকল।
কিছুক্ষণ পর উশখুশ করে বলল "কাবাব মিস করব"।
সায়ক বলল "আমিও"।
দু প্রান্তে ঘিঞ্জি বাজারের মধ্যে মানুষের কোলাহল। আজকে বিস্ফোরণ, কালকে খুন খারাপি, এই মানুষেরা এভাবেই বেঁচে থাকেন। সায়ক অস্ফূটে বলল "ভালো থেকো পেশোয়ার। ভালো থেকো মানবসভ্যতা"।
কিছুক্ষণের মধ্যে তারা স্টেশনে পৌঁছল।
দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল একটা ট্রেন ইসলামাবাদ যাচ্ছে, আরেকটা লাহোর।
আব্বাস বলল "কোথায় যাবে মিয়াঁ?"
সায়ক হাসল "অনেকদিন দেশে যাওয়া হয় না আব্বাস। যাবে নাকি?"
আব্বাস প্রথমে খুশি হল, পরক্ষণেই সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইয়ার্কি করছ না তো মিয়াঁ?"
সায়ক বলল "একেবারেই না। চল ক'দিন ছুটি কাটিয়ে আসা যাক। যাও লাহোরের দুটো টিকিট কেটে আনো"।
আব্বাস লাফাতে লাফাতে টিকিট কাটতে ছুটল।
৫৫।
পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে একটু দূরে বি এস এফের এক চেক পোস্টে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন তুষার। তার সঙ্গে পীযূষ এসেছেন।
তুষার বললেন "এত দেরী হচ্ছে কেন ওদের?"
পীযূষ বসে ছিলেন। বললেন "স্যার এমন কিছু দেরী তো হয় নি। আধ ঘন্টাও তো হয় নি"।
তুষার বললেন "আধঘন্টা অনেক সময়। তিরিশ মিনিট তোমার কম মনে হচ্ছে?"
পীযূষ একটু ইতস্তত করে বললেন "মিনিস্ট্রিকে কি কিছুই জানান নি স্যার?"
তুষার মাথা নাড়লেন "সম্ভব নয়। কিছুতেই মানবে না। মিজানুল হকই ভরসা এখন পীযূষ"।

পীযূষ বললেন "আমার আপনার দুজনেরই মনে হয় চাকরি চলে যাবে স্যার"।

তুষার বললেন "হু। যদি জানে"।

পীযূষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসল "চাকরি গেলে কেউ চাকরি দেবে না স্যার। আপনি দেবেন তো?"

তুষার হাসলেন "হ্যাঁ, আমি একটা কোম্পানি খুলব। নাম হবে ইনভেস্ট এন্ড আর্ন। তোমার যা টাকা পয়সা আছে ইনভেস্ট করে দিও, লাভ হলে নিয়ে যেও। লস হলে গেল"।

পীযূষ হো হো করে হেসে উঠলেন।

পীযূষ বললেন "স্যার, একটা খটকা এখনও থেকে গেল। হাসান মাকসুদ তো জানত, ও যাকে ফোন করবে তার ফোন ট্রেস করা যাবে। তাহলে এই বোকামিটা করতে গেল কেন?"

তুষার বললেন "কখনও কখনও জিনিয়াসরা সব কিছু পারফেক্ট করতে গিয়ে এক একটা এমন ভুলই করে ফেলে পীযূষ। হাসান এতটাই ওভার কনফিডেন্ট ছিল যে বাংলাদেশে আমরা কোন নেটওয়ার্ক ইউজ করতে পারব না, যে এই ভুলটা করে ফেলল। অবশ্য আরেকটা কারণও থাকতে পারে"।

পীযূষ জিজ্ঞাসু চোখে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "ভাইঝির প্রতি ওর সাবকনশাস মাইন্ডে এখনও ভালোবাসা ছিল। হয়ত নিজের কৃতকর্মের একটা ব্যাক আপ রাখতে চেয়েছিল লোকটা"।

বনগাঁর বি এস এফ চিফ বলবিন্দর সিং এসে ঢুকলেন অফিসে। বললেন "স্যার কোন খবর?"

তুষার বললেন "খবর তো তুমি দেবে বলবিন্দর। মিজানুল তোমার বন্ধু। তুমিই ভাল বলতে পারবে"।

বলবিন্দর পীযূষকে দেখালেন "মিজানুল হককে পীযূষও ভাল করে চেনেন। এক কথার মানুষ। চিন্তা করবেন না স্যার"।

তুষার বললেন "চিন্তা কি আর সাধে করছি সিং, এত বড় একটা অপারেশন হচ্ছে যেখানে আমরা ছাড়া দেশের গভর্নমেন্টের কাছে কোন খবরই নেই। যদি কিছু এদিক ওদিক হয় তো সব গেল"।

বলবিন্দর বললেন "স্যার,আমাদের দেশের মেয়েই বিপদে আছে। আমরা তাকে হেল্প করছি। কোন পাপ তো করছি না। ওপরওয়ালার ওপর ভরসা রাখুন স্যার, নিশ্চয়ই উনি আমাদের সাহায্য করবেন"।

তুষার হাসলেন "আমি কোন ওপরওয়ালাকে বিশ্বাস করি না সিং। এই মুহূর্তে মিজানুল হকই আমার সব কিছু। আমাদের এন এস জি কম্যান্ডাররা পর্যন্ত আমার ভরসাতেই বর্ডার পার করেছে"...

তুষারের কথা শেষ হল না বলবিন্দরের ফোন বেজে উঠল। বলবিন্দর ফোনটা ধরলেন, একটু কথা বলেই হাসলেন "বলেছিলাম না স্যার, উপরওয়ালা আমাদের নিশ্চয়ই সাপোর্ট করবেন। অপারেশন ইজ সাক্সেসফুল। বাইরে চলুন স্যার"।

তুষার দৌড়ে বেরোলেন অফিস থেকে। তার পেছন পেছন সবাই। ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে নো ম্যান্স ল্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালেন। বি ডি আরের যারা ওপারে চেক পোস্টে ছিলেন, বলবিন্দরকে দেখে বললেন "স্যার, প্লিজ আসুন, মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের দেশের বদনাম"।

বলবিন্দর তুষারকে বললেন "স্যার, চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে আছি জানলে মিজানুল রাগ করবে"।

সবাই মিলে বাংলাদেশে ঢুকলেন। বিডি আরের একজন রক্ষী তাদের জন্য চেয়ার এনে দিলেন। তিনজন বসলেন। তুষার উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন "কোথায় ওরা বলবিন্দর?"

বলবিন্দর বললেন "স্যার প্লিজ অধৈর্য হবেন না। একটু তো অপেক্ষা করুন"।

তুষার দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন।

খানিকক্ষণ পরেই একটা আর্মি ভ্যান আসতে দেখা গেল।

তুষার লাফিয়ে উঠলেন। গাড়িটা এসে দাঁড়ালে মিজানুল নামলেন। তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "উই ডিড ইট"।

তুষার মিজানুলকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন "মেয়েটা কোথায়?"

মিজানুল বললেন “অ্যাম্বুলেন্স আছে তো?”
তুষার বললেন “হ্যাঁ”।
মিজানুল বললেন “গাড়ি নিয়ে আসুন এখানে”।
তুষার বলবিন্দরের দিকে তাকালেন। বলবিন্দর অ্যাম্বুলেন্স আনতে ছুটলেন।
মিজানুল তার অফিসারদের নির্দেশ দিলেন।
কিছুক্ষণ পরে মিনিকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিল।
মিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। কোন মতে কাপড়ে জড়িয়ে মিজানুল তাকে নিয়ে এসেছেন।
তুষার মিনির অবস্থা দেখে মিজানুলকে বললেন “কারা করেছে?”
মিজানুল বললেন “গাড়ির ভেতর বসে আছে। চলুন দেখবেন”।
তুষার গাড়ির ভেতর ঢুকলেন। দেখলেন নাজিব এবং মনোয়ারা বসে আছে।
তুষার বললেন “আপনারা মানুষ?”
নাজিবের চোখ মুখ থেকে রক্ত বেরচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সে কড়া চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে মিজানুলকে বলল “আপনার সাহস কী করে হয় অফিসার? ইন্ডিয়ান কুত্তাগুলোর কাছে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে?”
মিজানুল এগিয়ে গিয়ে এক ঘুষি মারলেন নাজিবের মুখে। তুষারকে বললেন “নিয়ে যান দুজনকেই। মহিলা বলে ছেড়ে দেবেন না। দুটোই সমান জানোয়ার। আরেকটা ছিল। সেটার লাশ ফেলে দিয়ে এসেছি। এরা আমাদের দেশের কলঙ্ক। বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করেছিলেন আর এরা আবার সেটাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে শুরু করেছে। এদের বিচার আল্লাহ করবেন, আমি নিশ্চিত”।
তুষার মিজানুলকে বললেন “অনেক ধন্যবাদ বন্ধু। আমি আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, দেখা হবে আবার আপনার সঙ্গে”।
মিজানুল বললেন “ওসব বলবেন না। একজন মানুষ যা করত আমি তাই করেছি। আপনার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, এসব জানোয়াররা যেন শাস্তি পায়, প্লিজ এনশিওর করবেন। আরেকটা কথা, এদের কাছ থেকে আমি একটা কম্পিউটার, দুটো ট্যাব আর কিছু বই পেয়েছি। আপনাদের গাড়িতে তুলে দিচ্ছি সে সব কিছুই”।
তুষার হাসলেন “আমি টুপি খুললাম আপনার সামনে জনাব। ইউ আর গ্রেট”।
মিজানুল বললেন “আপনাকে তো আমি বললাম, একজন মানুষ হিসেবে যা মনে হয়েছে আমি তাই করেছি”।
তুষার বললেন “সমস্যা তো ওখানেই হক সাহেব, মানুষের সংখ্যাটাই আজকাল কমে যাচ্ছে। ভাল থাকবেন বন্ধু”।
মিজানুল বললেন “নিশ্চয়ই। খুদা হাফেজ”।
তুষার বলবিন্দরকে বললেন “এ দুজন মেহমানকে আমার অফিসে পৌঁছে দিতে হবে যে”।
বলবিন্দর মাথা নাড়লেন “সার্টেনলি স্যার”।

৫৬।

রেহান শ্রীনগরে ফিরলেন রাতের দিকে। এয়ারপোর্টে তারেক এবং আনোয়ার তার জন্য অপেক্ষা করছিল।
রেহানকে দেখে দুজনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। রেহান গাড়িতে উঠে বলল “কী খবর?”
তারেক বলল “এই মুহূর্তে শান্তি আছে চারদিকে”।
রেহান বললেন “তার মানেই তো ঝড়ের আগের শান্তি। কোথাও বিক্ষোভ হয়েছে আজ?”
তারেক বলল “লালচকে হয়েছে”।

রেহান হতাশ গলায় বললেন “সে তো রোজের গল্প”।

এয়ারপোর্টের পরে অনেকটা এলাকা পেরিয়ে মূল শ্রীনগর শহরে ঢুকতে হয়। চারদিকে ভারতীয় সেনা টহল দিচ্ছে। এত রাতে বেশিরভাগ দোকানও বন্ধ।

রেহানের ফোন বাজছিল। রেহান ধরলেন। বললেন “হ্যালো”।

“স্যার, বিলাল বলছি”।

রেহান বললেন “বল”।

“স্যার ইসমাইল আব্বাসের কথা মনে আছে? হাইজ্যাকিঙের সময় যাকে ধরা হয়েছিল”?

“হ্যাঁ, সে তো এখন সেন্ট্রাল জেলে আছে”।

“স্যার, পাক্কা খবর আছে”।

“কী?”

“ইসমাইল আব্বাস সেলের ভেতর থেকেই অপারেট করছে। মোবাইল ফোন আছে ওর কাছে”।

“তুমি শিওর?”

“হান্ড্রেড পারসেন্ট স্যার। খুদা হাফিজ”।

রেহান কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে গেল।

রেহান একটু ভেবে আনোয়ারকে বললেন “সেন্ট্রাল জেল চল। জলদি”।

আনোয়ার অবাক হয়ে বলল “কিন্তু স্যার বাড়ি...”

রেহান ধমক দিলেন “যা বলছি চুপচাপ কর”।

আনোয়ার গাড়ির স্পিড বাড়াল।

#

সেন্ট্রাল জেলের গেটের বাইরে গাড়ি রেখে রেহান গেটে নক করলেন।

একজন সেপাই ছোট একটা দরজা খুলে বলল “কে?”

রেহান আই কার্ড বের করে বললেন “জেলার সাহেব কোথায়?”

সেপাই রেহানের আই কার্ড দেখেই দরজা খুলে দিল। বলল “অফিসেই আছেন স্যার”।

সেন্ট্রাল জেলের জেলার হিলাল আহমেদ অফিসে বসে কাজ করছিলেন।

রেহানকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। অবাক গলায় বললেন “স্যার, এত রাতে?”

রেহান বললেন “ইসমাইল আব্বাস কোন সেলে আছে মিস্টার আহমেদ?”

হিলাল আহমেদ বললেন “ওকে তো আলাদা সেলেই রাখা হয়েছে স্যার”।

রেহান বললেন “চাবিটা নিন। আমি ওর সেলে যেতে চাই”।

হিলাল বিস্মিত গলায় বললেন “এত রাতে?”

রেহান বললেন “কেন? কোন সমস্যা আছে?”

হিলাল বললেন “না না স্যার, আপনি বললে তো মানতেই হবে”।

রেহান বললেন “তবে চলুন”।

হিলাল চাবি নিলেন। দুজন কনস্টেবলকে বললেন তাদের সঙ্গে যেতে।

তারা জেলের ভিতর প্রবেশ করলেন। জেলের ভেতর অনেকটা হাঁটার পর স্পেশাল কয়েদিদের সেলে যেতে হয়। রেহান বুঝতে পারছিলেন প্রতিটা সেল থেকেই কৌতূহলী চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু রেহান সেসবের তোয়াক্কা করলেন না।

একটা ছোট সেলের সামনে গিয়ে হিলাল বললেন “এই যে স্যার। ইসমাইলের সেল”।

রেহান বললেন “দরজা খুলুন। আমাকে একটা টর্চ দিন”।

হিলাল একজন কন্সটেবলকে ইঙ্গিত করলেন। সে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ইসমাইল আব্বাস চেচিয়ে উঠল "কউন হে রে?"

রেহান বললেন "তোর বাপ"।

ইসমাইল বলল "জানোয়ারের বাচ্চা, তোর সাহস হয় কী করে আমার বাপ তুলে কথা বলিস?"

রেহান ইসমাইলকে সটান একটা লাথি মারল। ইসমাইল মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝের ওপর। টর্চ জ্বালিয়ে ছোট্ট ঘরটার বিভিন্ন কোণে আলো ফেললেন। কোথাও কিছু পেলেন না।

ইসমাইল ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল "ক্যা রে মাদারচোদ, কুছ নেহী মিলা ক্যা?"

রেহান ইসমাইলকে আবার লাথি মারলেন। হিলাল দৌড়ে এলেন "স্যার, জেলের মধ্যে এভাবে কয়েদীকে মারা বেআইনি"।

রেহান হিলালের দিকে তাকিয়ে বললেন "কোন কিছু বেআইনি না। এরা যখন আমাদের লোকেদের গুলি করে সেটা কোথাকার আইন বলে দেয়?"

হিলাল চুপ করে গেলেন।

রেহান টর্চ দিয়ে আবার ঘর সার্চ করতে শুরু করল। সেলের প্রতিটা কোণে আলো ফেলল। কিছুই পাওয়া গেল না।

ইসমাইল মেঝেতে শুয়েই হেসে যাচ্ছে।

রেহান সিমেন্টের মেঝেতে বসে পড়ল। মেঝেতে কান দিয়ে মেঝেতে ঘুষি মারতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে তার মুখে হাসি ফুটল। মেঝের একটা ইট সরাতেই একটা মোবাইল পাওয়া গেল।

রেহান মোবাইলটা নিয়ে ইসমাইলকে আরেকটা লাথি মেরে বললেন "তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে"।

ইসমাইল এবার আর হাসল না। চুপ করে থাকল।

রেহান হিলালের দিকে মোবাইলটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন "এই জিনিসটা এখানে এল কী করে?"

হিলাল বললেন "জানি না স্যার। এত বড় জেলের সব কিছু কি দেখা সম্ভব আপনিই বলুন?"

রেহান বললেন "কাল সকালে আমি আবার আসব। এসে যেন দেখতে পাই ওর সেল চেঞ্জ হয়ে গেছে। আই ওয়ান্ট সিসিটিভি সারভেইলেন্স ইন দ্যাট রুম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?"

হিলাল ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লেন।

রেহান ফোনটা নিলেন। বললেন "এটা আমি নিয়ে গেলাম। প্রয়োজনে ইসমাইলকে অন্য সেলে ট্রান্সফার করতে হবে"।

হিলাল বললেন "জি স্যার"।

রেহান বললেন "গুড নাইট"।

হিলাল বললেন "চলুন স্যার, আপনাকে গেট অবধি ছেড়ে দিয়ে আসি"।

রেহান রওনা দিতেই পেছন থেকে পরপর দুটো বুলেট তার মাথায় এসে লাগল।

রেহান মাটিতে পড়ে গেলেন। পাশের সেলগুলো থেকে কয়েদীরা উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠল।

ইসমাইল হো হো করে হেসে রেহানের স্থির শরীড়ে লাথি মেরে সোল্লাসে বলল "শুধু মোবাইল না রে ইন্ডিয়ানদের কুত্তা, সেলের ভিতর আরও অনেক কিছুই রেখেছি।"

হিলাল আহমেদের দিকে বন্দুক তাক করল ইসমাইল, "চল, ওমর শেখকে বের কর এবার"।

৫৭।

ভোর বেলা।

নিয়াজি ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় এলেন।

বৃষ্টি পড়ছে।

নিয়াজি ক্যান্টনমেন্টের রাস্তায় একা একাই ভিজতে ভিজতে হাঁটতে বেরলেন। তার নিরাপত্তারক্ষীরা তার পেছন পেছন যাচ্ছিল নিয়াজি নিরস্ত করলেন তাদের।

জওয়ানরা ওয়ার্ম আপ করছে। নিয়াজি তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। সবাই একটু ত্রস্ত হল। নিয়াজি সবাইকে স্বাভাবিক হতে বলে নিজেও ওয়ার্ম আপ করা শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই জওয়ানরা দৌড়তে শুরু করল।

নিয়াজিও তাদের সঙ্গে দৌড়তে লাগলেন বৃষ্টির মধ্যেই। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল ট্রেনিং এর প্রথম দিনগুলোর কথা। কী কঠিন ট্রেনিংই না হত তাদের। অনেকখানি পথ দৌড়ে বুঝলেন দমে কুলোচ্ছে না। দাঁড়িয়ে পড়ে জওয়ানদের বললেন "ক্যারি অন"।

জওয়ানরা দৌড়তে দৌড়তে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল।

নিয়াজি ভিজে গেছিলেন পুরোটাই। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। জগিং করতে করতে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলেন।

হীম শীতল ঠান্ডা জলে স্নান করলেন। দাড়ি কাটলেন।

তারপর আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে নিজের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। নিজের মনে মনে বললেন "ডর ডর কে নেহী জিনা। ডর ডর কে নেহী জিনা। নেহী জিনা"।

কিছুক্ষণ বাদে ইউনিফর্ম পরে কোয়ার্টারের দরজায় তালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের বললেন "গাড়ি বের কর। আমি প্রেসিডেন্ট হাউজ যাব"।

দু মিনিটের মধ্যে তার কনভয় এসে হাজির হল।

নিয়াজি গাড়িতে উঠলেন।

প্রেসিডেন্ট হাউজে পৌঁছে নিয়াজি দেখলেন প্রেসের লোকজন হাউজের বাইরেই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে।

তাকে দেখতে পেয়েই ফটো তোলা শুরু করল।নিয়াজি কড়া গলায় বললেন "এখানে তামাশা হচ্ছে?" সবাই ভয় পেয়ে ফটো তোলা বন্ধ করল।

প্রেসিডেন্ট হাউজে ঢুকে নিয়াজি নিরাপত্তারক্ষীর চিফকে বললেন "উমর খান এবং রশিদকে খবর দিন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তারা যেন প্রেসিডেন্ট হাউজে আসেন"।

নিয়াজি ড্রয়িংরুমে গেলেন। চুপ করে বসলেন। দেওয়ালে জিন্নাহর ফটো। সুদৃশ্য আসবাবপত্রে ড্রয়িংরুম সুন্দরভাবে সাজানো। বেশ কয়েকজন খানসামা পর্দার আড়ালে দাঁড়ানো। একবার ডাকলেই সব রকম খিদমৎ খাটতে দৌড়ে আসবে।

তার ফোন বাজছিল।

নিয়াজি দেখলেন একটা আননোন নম্বর থেকে ফোন আসছে।

ধরলেন না।

ফোন আবার বাজতে শুরু করেছে।

অন্য সময় হলে গুলাম মহম্মদকে ফোন ধরে ধমক দিতে বলতেন।

এবারে ফোনটাই অফ করে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রেসিডেন্ট হাউজের সিকিউরিটি চিফ ঘামতে ঘামতে এলেন, "স্যার, প্লিজ নিউজ চ্যানেল দেখুন"।

নিয়াজি অবাক হয়ে বললেন "কেন?"

সিকিউরিটি চিফ রিমোটটা নিয়ে টিভি অন করলেন।

নিয়াজি বিরক্ত হয়ে বললেন "কী হয়েছে বলবে তো?"

সিকিউরিটি চিফ আল জাজিরা চ্যানেলে দিল। টিভিতে দেখাচ্ছে পেশোয়ারের বর্ডারের কাছে একটা বাড়িতে আমেরিকা বোমা বিস্ফোরণ করে গোটা বাড়িটাই ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। আমেরিকা দাবী করেছে বাড়ির মধ্যে ইসলামিম স্টেটের অন্যতম মস্তিষ্ক কাশেম সোলেমানি ছিল। পাকিস্তান সরকার এখনও এই মুহূর্তে এই অপারেশন সম্পর্কে কিছুই জানে না।

নিয়াজি হতভম্ব গলায় বললেন "আমার দেশের নিউজ আমাকেই টিভি দেখে জানতে হচ্ছে?"

সিকিউরিটি চিফ থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৫৮।

সকাল সাতটা।

জ্যোতির্ময় বসে ছিলেন একা।

তুষার নাজিবকে নিয়ে ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করলেন।

জ্যোতির্ময় চমকে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "আপনি একা একা ছিলেন, আপনার একজন সঙ্গী এনে দিলাম"।

একজন কম্যান্ডো এনে জ্যোতির্ময়ের পাশে নাজিবকে বসাল।

তুষার চেয়ারে বসে বললেন "মিস্টার মাকসুদ। আপনার ভাইঝিকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। আপাতত মেয়েটা মারাত্মক মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল শকে আছে। এই ভদ্রলোক আপনার ভাইঝির ওপরে এমন টর্চার করেছিল যা স্বয়ং শয়তানকে করতে হলেও উনি হয়ত দুবার ভাবতেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে, চুল কেটে, পাশবিক অত্যাচার করে, মেয়েটার গায়ে গুড় মাখিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে পিপড়েরা এসে ওকে খুবলে খুবলে খেতে পারে। আপনি বলেছিলেন মিনির জন্য আপনিই এই ছেলেকে পছন্দ করেছিলেন। ছেলে নাকি ধর্ম শিক্ষায় ভাল, নীতিশিক্ষায় ভাল, বনেদী পরিবার। তা এই তার উদাহরণ?"

জ্যোতির্ময় উত্তর দিলেন না। চোখ বন্ধ করলেন।

তুষার বললেন "পৃথিবীর কোন ধর্ম, কোন নীতি, কোন পরিবার মেয়েদের প্রতি এইরকম ব্যবহার করার কথা বলে না। যারা এই সব কিছুর দোহাই দিয়ে এগুলো করে, তারা মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। আই অ্যাম সরি টু সে মিস্টার মাকসুদ, যে পথ আপনি বেছেছেন, তা শুধু আপনার জন্য না, মানবতার জন্যও ক্ষতিকারক। কী চান আপনি? গোটা পৃথিবীতে কেবল কয়েকজন হিংস্র মানুষের মত দেখতে পশু বেঁচে থাকবে? আর সুস্থ পৃথিবীর মানুষ সেটা হতে দেবে? যদি ভেবে থাকেন, তবে আপনি ভুল ভাবছেন"।

জ্যোতির্ময় চোখ খুললেন না।

তুষার বললেন "আমি উঠলাম। আপনারা মিটিং করুন। আপনারা দুজনেই হয়ত জন্নতে যাবার জন্য এ সব কিছু করেছেন, তবে আমি আপনাদের দুজনকেই একটা কথা দিতে পারি, জীবিত অবস্থাতেই জাহান্নাম কী, তা আপনাদের দেখিয়ে দেব। ইয়ে ওয়াদা হে মেরা।"

তুষার ঘর থেকে বেরোলেন। রেহানের খবরটা রাস্তাতেই পেয়েছেন। মাথা কাজ করছিল না তার।

আশরফ খান চেম্বারে চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। পেটে ব্যান্ডেজ করা। চোখে মুখে যন্ত্রণার ছবি স্পষ্ট। টিভি চলছে।

বীরেন বসে ছিল চুপচাপ। তুষারকে ঢুকতে দেখে বীরেন উঠে দাঁড়াল। তুষার বললেন "বীরেন, তুমি আশরফকে নিয়ে কলকাতার গেস্ট হাউজে গিয়ে বিশ্রাম কর। কাল থেকে তোমার হসপিটালে ডিউটি থাকবে। মেয়েটা যতক্ষণ না জ্ঞান ফেরে ততক্ষণ ওই রুমের নজরদারি তোমার দায়িত্বে"।

আশরফ বললেন "আমি বেটার আছি স্যার। আপাতত এখানেই থাকি। বীরেন তুমি যাও"।

বীরেন জিজ্ঞাসু চোখে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "ঠিক আছে বীরেন, আশরফ থাকুক। মেডিকেল সাপোর্ট টিম তো আছেই, সেরকম সমস্যা হলে ওকে আমি নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে পারব"।

বীরেন ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল।
তুষার বসলেন।
টিভিতে পেশোয়ারের নিউজটা দেখাচ্ছে।
আশরফ বললেন "সব ভালো খবর রেহানের খবরটায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে স্যার"।
তুষার চোখ বন্ধ করলেন। রেহানের মুখটা ভেসে উঠছে মুখের সামনে।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "আমাদের ট্রেনিং টাইমে একটা কথা বলতেন আমাদের ট্রেনিং অফিসার। যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পিছনে ফিরে দেখবে না। তোমার বন্ধু, প্রাণের মানুষ, সবাই ধীরে ধীরে পড়ে যাবে, তোমাকে কর্তব্যে অবিচল থাকতে হবে। নইলে অভীষ্ট লক্ষ্যে কোন দিন পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু কখনও কখনও এত আবেগহীন থাকা যায় না। মানুষ তো আফটার অল। সায়কের কী খবর?"
আশরফ বললেন "ফারুক যোগাযোগ করেছিলেন, সায়ক কালকেই পেশোয়ার ছেড়েছে। কোথায় গেছে জানা নেই"।
তুষার গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।
আশরফ ক্লান্ত ছিলেন। চোখ বন্ধ করলেন।
কিছুক্ষণ পর তুষারের মোবাইল বেজে উঠল।
তুষার দেখলেন একটা আননোন নম্বর থেকে মেসেজ এসেছে। তাতে শুধু লেখা "মা তুঝে সালাম। ইনকিলাব জিন্দাবাদ"।
তুষারের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল।
আশরফ বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।
তুষার আশরফকে বিরক্ত করলেন না।
উঠে জানলার কাছে গেলেন।
আরেকটা দিন...
আরও লড়াই...
তুষার ফিসফিস করে বললেন "লং লিভ রেভোলিউশন এগেইন্সট এনিমিজ অফ হিউম্যানিটি"...

পর্ব ৩

ভূমিকা

দোকান থেকে রিয়াজ যখন লাখমা কিনে বাড়ির পথে রওনা দিল তখন সময়টা গোধূলি । আলো আধারির খেলায় তাদের বোমাবিধ্বস্ত শহরটা চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াতে। মাস খানেক আগেও রাস্তায় বেরনো যাচ্ছিল না। এখন দেশের সেনা অনেকটাই দখল নিয়েছে রাজপথের। সন্ত্রাসীরা পিছু হটেছে। গ্রামের বাড়িতে সব কিছু ছেড়ে পালাতে হয়েছিল রিয়াজকে। গতকালই বাড়ির সবাইকে নিয়ে শহরে ফিরেছে সে।

আজ তৈল শোধনাগারে জয়েন করেছে। কারখানায় খুশির আমেজ। প্রথমদিনেই মালিকপক্ষ তাদের পাওনাগন্ডা বুঝিয়ে দিয়েছে। পরের মাস থেকে আমেরিকা সরকার তাদের কারখানা অধিগ্রহণ করছে। সুখের কথা হল তাদের চাকরি যাচ্ছে না। দেশের অর্থনীতি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে আশা করা হচ্ছে। জেহাদের নামে খুনখারাপি নতুন সরকার মানবে না কথা দিয়েছে। ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়েছে। বর্ডার সিল করে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা থেকে ব্যাপক হারে সেনা পাঠানো হয়েছে। রাজপথে ঘুরছে ট্যাঙ্কার।

বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস ধরে তাদের বাড়ির কাছের স্টপে নামল রিয়াজ।

সোহানের মুখটা ভেসে উঠল। ছেলেটা লাখমা খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল গ্রাম থেকেই। এইটুকু বয়সেই কথার চাষ করা শিখে গেছে ছেলেটা। বাড়ি এলেই তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমিনার কথা ভেবে খুশি হল রিয়াজ।

আমিনার খুব ইচ্ছা ছিল শহরের স্কুলে পড়াবে ছেলেকে। সব কিছু যখন ঠিক হয়ে গেছে, এবারে নিশ্চয়ই স্কুলও শুরু হবে। সোহানকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে গেছিল রিয়াজ। তাদের ব্যালকনিতে সোহানকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমিনা। তার ফেরার সময়টা। আগে যেরকম দাঁড়াত।

সোহান তাকে দেখামাত্র হাত নাড়াল। রিয়াজ হাটায় জোর দিল।

আরেকটু দূরেই অ্যাপার্টমেন্ট।

আমিনা তাকে দেখে হাসছে।

রিয়াজ দাঁত বের করল।

তার বউটা এত সুন্দর কেন? এই হাসি দেখলেই সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতে ইচ্ছা করে।

রিয়াজ প্রতিদিনের মত চোখ বন্ধ করে সর্বশক্তিমান প্রভুকে ধন্যবাদ দিল আমিনার মত একজন বউ দেবার জন্য।

চোখ খুলে আমিনার দিকে হাত বাড়াল।

ঠিক এই মুহূর্তে চারপাশ কাঁপিয়ে প্রবল শব্দে কিছু একটা তাদের অ্যাপার্টমেন্টের ওপর পড়ল। রিয়াজ গত ক'দিনের অভ্যাস মত রাস্তায় শুয়ে পড়েছিল। পরক্ষণেই মাথায় এল আমিনা আর সোহানের কথা। লাফ দিয়ে উঠতেই আবার প্রবল শব্দে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে আরেকটা বিস্ফোরণ হল। এবারে আর রিয়াজ শুল না।

প্রবল ধুলো, আর ইটে ধোঁয়াশার মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

আরেকটু এগোতেই দেখা গেল যে ব্যালকনিতে আমিনা সোহানকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেই ব্যালকনিটাই এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

কংক্রিটের কংকাল তার দিকে তাকিয়ে বিশ্রী হাসি হাসছে।

রিয়াজ আর্তনাদ করে উঠল প্রবল যন্ত্রণায়।

এই দুঃস্বপ্নটাই তো সে দেখে এসেছে এতদিন ধরে।

সত্যি হয়ে গেল শেষ মেষ?

১

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গম্ভীর মুখে বললেন "কাশ্মীর ইজ ডিটোরিয়েটিং এভ্রি ডে তুষার"।

তুষার বললেন "নট অনলি ইন ইন্ডিয়া স্যার। ইন বোথ রিজিয়ন দ্য সিচুয়েশন ইজ গেটিং টেরিবল"।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তুষারের দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বললেন "বোথ রিজিয়ন মিনস? ও পারেও? কেন, কী হয়েছে ওদিকে?"

তুষার বললেন "কিছু বাইরের দেশ থেকে আর্মস ইমপোর্ট করছে টেররিস্ট অরগানাইজেশনগুলো। পাকিস্তান গভর্নমেন্ট পর্যন্ত এদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ওরা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র মজুত করেছে। পাকিস্তানি আর্মির একাংশের মদত আছে"।

মন্ত্রী বললেন "সে তো থাকবেই। আমাদের এই মুহূর্তে কী করা উচিত বলে আপনি সাজেস্ট করেন?"

তুষার বললেন "উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট প্রেশার। আমাদের কাছে কিছু ফটোগ্রাফস এসেছে, সেগুলো আমরা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার কাছে তুলে ধরতে পারি। আই এস আই চিফ সরফরাজের সঙ্গে কাশেম সোলেমানির মিটিং এর কিছু সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। আমাদের সেটা নিয়েও প্রেশার ক্রিয়েট করা প্রয়োজন"।

মন্ত্রী একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন "ওকে, লেটস ডু দ্যাট। ওয়ান মোর থিং তুষার, আপনার অফিসাররা উইদাউট আওয়ার পারমিশন এফ বি আইকে পেশোয়ার সম্পর্কে ডেটা সাপ্লাই করেছে বলে একটা অভিযোগ উঠছে, এটা নিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি করতে হবে আপনাকে। সায়ককে শো কজ করতে হবে"।

তুষার হাসলেন "ওকে স্যার। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন আছে। পেশোয়ারে কাশেম সোলেমানি আছে, এটা আমরা জানলে কী করতে পারতাম? আদৌ কি কিছু করতে পারতাম? আর আমাদের সিচুয়েশন ডিটোরিয়েট করলে ডিসিশন নিজেদেরই নিতে হয়। সে দিন আর্মি আমাদের ঘাটি খুঁজে পেলে কী হত আশা করি আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে না"।

মন্ত্রীও হাসলেন "আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি তো জাস্ট একটা রুটিন এনকোয়ারি করতে বললাম। তারা একটা রিপোর্ট দিয়ে দেবে সায়ক এটা করে নি। ব্যস। মিটে যাবে ঝামেলা"।

তুষার বললেন "সরি স্যার, কিন্তু আমার মনে হয়, এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি না ঘাঁটানোই ভাল। যে মুহূর্তে আমরা এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করব, সরকারি নথি তৈরী হবে, সে মুহূর্তে ব্যাপারটা অফিশিয়াল হয়ে যাবে। আমরা এই নিয়ে বেশি না এগোলেই ব্যাপারটা সবার জন্য ভাল হবে বোধ হয়"।

মন্ত্রী তুষারের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন "ওকে। আপনার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। সায়ক কোথায় এই মুহূর্তে?"

তুষার বললেন "আমি জানি না স্যার, কোন যোগাযোগ নেই"।

মন্ত্রী বললেন "আপনি জানেন না, নাকি বলতে চাইছেন না?"

তুষার মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কিছু বললেন না।

মন্ত্রী বললেন "ওকে, আমি আপনাকে এই নিয়ে বেশি বিব্রত করব না। আমাকে শুধু আপনি কাশ্মীরটা নিয়ে হেল্প করুন। গত সাতদিনে তেরো জন সরকারি কর্মচারী খুন হয়েছেন, তাদের মধ্যে পাঁচ জন পুলিশ। কাশ্মীর সরকারের লোক পর্যন্ত অনন্তনাগ যাওয়ার আগে দুবার ভাবছে। শ্রীনগরে আর্মি ক্যাম্প হামলা হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। এভাবে ক'দিন চলবে বলুন তো?"

তুষার বললেন "যেখানে পলিটিশিয়ানরা অবধি যেতে ভয় পায় সেখানে আমাদের আর্মি আছে তো স্যার। চিন্তা করছেন কেন? এভাবে আমি অন্তত বেশিদিন চালাতে দেব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন"।

মন্ত্রী কাঁধ ঝাঁকালেন "ওকে। দেখা যাক, কী করেন আপনারা। আশা করি জানেন কাশ্মীরে একটা বিদ্রোহ দমন করতে গেলে কী পরিমাণ আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়"।

তুষার বললেন "সে তো নিশ্চয়ই। চাপটা তো শুধু... ঠিক আছে স্যার। আমি আসছি"।

মন্ত্রী গম্ভীর মুখে তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "কী হল জানাবেন"।
তুষার বললেন "সারটেনলি স্যার"।
মন্ত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তুষার নিজের গাড়িতে বসলেন।
গোটা দিল্লি কুয়াশার চাদরে ঢাকা এই দিনের বেলাতেও।
গাড়ি অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছিল।
তুষার নোটপ্যাড বের করে জরুরি কিছু তথ্য নোট করছিলেন, এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল।
তুষার ধরলেন "হ্যালো"।
ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল "সন্দেশে আতে হ্যায়, হামে তড়পাতে হ্যায়, কে ঘর কব আওগে"।
সায়ক।
তুষার হেসে ফেললেন।

২

"শেষ কবে এসিতে ছিলাম ভুলে গেছি মিয়াঁ। কী বিচ্ছিরি গরম বলত?"
গরমে ছটফট করতে করতে বলল আব্বাস।
সায়ক চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিল। বলল "বাড়িতে গিয়ে এসি চালিয়ে শুয়ে থেকো। হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানির কথা মনে করে ভাল থাকার চেষ্টা কর"।
আব্বাস বলল "আর ক'দিন এভাবে লাহোরে পড়ে থাকতে হবে?"
সায়ক বলল "যতক্ষণ না সিগন্যাল আসছে। কিচ্ছু করার নেই"।
আব্বাস হতাশ গলায় বলল "ধুস মিয়াঁ। তোমার ওপর কত আশা ছিল আমার। ভেবেছিলাম তুমিই সব ব্যবস্থা করে ঠিক দেশে নিয়ে যাবে। এখন দেখছি তোমার ক্ষমতা আমার চেয়েও কম"।
সায়ক হেসে ফেলল। বলল "বাড়ি যাবার জন্য যদি এত ছটফটই করতে হয় তাহলে এই চাকরি বাছলে কেন?"
আব্বাস বিরক্ত গলায় বলল "সে অনেক গল্প। আমার কি আজকে এখানে থাকার কথা নাকি? আমার বন্ধুরা সবাই বাইরে আছে"।
সায়ক বলল "তুমিও তো বাইরে আছো"।
আব্বাস বলল "ও মিয়াঁ, কার সঙ্গে কার তুলনা হয়? আমি যে আছি, এখানে কাউকে আমার পরিচয় দিতে পারব? এই একটা বাড়িতে কতদিন ধরে আটকে বসে আছি। কবে যাব, কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বন্ধুরা কেউ থাকে ইউ এস এ, কেউ থাকে দুবাই, কেউ থাকে আবু ধাবি... আর আমি?"
সায়ক বলল "তুমি গোটা দেশকে রিপ্রেসেন্ট করছ। তোমার যে বন্ধু সব থেকে বেশি মাইনেও পায়, তার থেকেও বেশি উপকার তুমি নিজের দেশের জন্য করছ। নিজের ওপর গর্ব কর, নিজেকে ঘেন্না করে কারো কোনদিন উপকার হয় নি আব্বাস"।
আব্বাস কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে থেকে বলল "দেখো মিয়াঁ, আমি সত্যিই ক্লান্ত। আর পারছি না। ইসলামাবাদে কী করি নি বলত? লোকের জুতো পালিশ অবধি করেছি। আমাদের দিকটাও তো আমাদের লোকেদের দেখা উচিত। আর কতদিন এভাবে লাহোরে পড়ে থাকব?"
"পাঞ্জাবের কিন্তু একেবারেই কাছে বুঝলে লাহোর? এখানকার লোকের কথা বার্তা সবই পাঞ্জাবের মতই। পাকিস্তানের পাঞ্জাবেই আছি আমরা আপাতত"। কথা ঘোরাতে চেষ্টা করল সায়ক।
আব্বাস বলল "এর থেকে আমরা কিন্তু ইসলামাবাদ গিয়ে অন্য কিছু একটা চেষ্টা করতে পারতাম"।
সায়ক বলল "কী চেষ্টা?"

আব্বাস বলল "নকল পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতাম। তারপর দুবাই গিয়ে সেখান থেকে ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে কন্ট্যাক্ট করে দেশে ফেরা। ইজি"।

সায়ক বলল "যদি নকল পাসপোর্ট এরা চিনে নিত? তাহলে কী করতে?"

আব্বাস মরিয়া হয়ে বলল "কেউ ধরতে পারবে না। অত সোজা নাকি? প্লিজ মিয়াঁ, ইসলামাবাদ যাই আমরা"।

সায়ক কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বলল "তৈরী হয়ে নাও। আমরা ওয়াঘা যাচ্ছি"।

আব্বাস তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বলল "বর্ডার পার করবে?"

সায়ক বলল "না, বর্ডারে ফ্ল্যাগ মার্চ দেখতে যাব। আবার চলে আসব"।

আব্বাস উঠল। বলল "উফ, কতদিন পর নিজের দেশ দেখতে পাব"।

সায়ক বলল "উৎসাহের আতিশয্যে আবার জয় হিন্দ বলে দিও না। ওরা কিন্তু একটু বেচাল দেখলেই..."

আব্বাস বলল "বুঝেছি বুঝেছি। সব সময় এক ভয় দেখিয়ে যাচ্ছ"।

দুজনে তৈরী হয়ে নিল। ডেরা থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে বাস স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছল তারা। সায়ক চোখে সুরমা লাগিয়েছে। আব্বাসকেও দিয়েছে।

বাস এলে দুজনে উঠে বসল।

ভর্তি বাস। ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে পাকিস্তানের পতাকা। একজন বাচ্চা এসে তাদের হাতেও ছোট দুটো পতাকা দিয়ে গেল।

সায়ক বাচ্চাটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

আব্বাস ফিসফিস করে বলল "নাও, এবার এদের পতাকা নিয়েও নাচানাচি কর"।

সায়ক বলল "উগ্র জাতীয়তাবাদ থাকলে স্পাইগিরি করে এজন্মে পেট চালাতে হবে না হে। জাস্ট চেপে যাও। সবার সঙ্গে মিশে থাকো"।

আব্বাস গোমড়া মুখে বসে থাকল।

ঘন্টাখানেক লাগল ওয়াঘা বর্ডার পৌঁছতে।

ভারতের গ্যালারিতে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। দেশাত্মবোধক গান বাজছে। বাচ্চারা সে তালে তালে নাচছে।

পাকিস্তানের বাচ্চারাও বাস থেকে নেমে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে লাগল।

উৎসবের পরিবেশ।

সায়ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভারতবর্ষের গ্যালারির দিকে তাকিয়ে থাকল।

৩

গ্রামের নাম ওয়াজুরা।

অনন্তনাগ জেলার মধ্যে গ্রামটি।

লিডার নদী বয়ে চলেছে গ্রামের পাশ দিয়ে।

এ গ্রামের লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম। সেনা ছাউনি আছে গ্রামের বাইরে। মাঝে মাঝে অবশ্য সেনারা টহল দিয়ে যায়।

গ্রামের ভেতরে একটা ছোট বস্তি আছে। সেখানেই একটা বাড়িতে ইসমাইল আব্বাস আস্তানা গেড়েছে। বাড়িটা মাটির। এক বুড়ো বুড়ি থাকেন। ইসমাইল তাদের ভয় দেখিয়ে রেখেছে। বুড়ো বুড়িকে বলে দিয়েছে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে যেন শ্রীনগর থেকে ভাইপো এসেছে। দুদিন পরেই চলে যাবে।

একটা ঘর নিয়ে রয়েছে সে। গাল ভর্তি দাড়ি। সারাদিন শুয়ে থাকে আর মাঝে মাঝেই খাটের তলায় একটা ট্রাংক খুলে অস্ত্র শস্ত্রগুলো ঠিক আছে নাকি দেখে নেয়।

সন্ধ্যে নেমেছে।
ইসমাইল নামাজ শেষে করে চুপ করে বসেছিল। এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল। ইসমাইল ফোন তুলল, ওপাশ থেকে ভেসে এল "কী খবর?"
ইসমাইল বলল "কোন খবর নেই। আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষাতে আছি"।
ওপাশের গলা একটু চুপ করে থেকে বলল " আল্লাহ তোমাদের মত বান্দাদের জন্য আলাদা জায়গা রেখেছেন তার জন্নতে। তোমরা তার খাস বান্দা"।
ইসমাইল বলল "শুক্রিয়া"।
"সময় নষ্ট হচ্ছে"।
"সে তো ঠিকই। কতদিন আর এভাবে বসে থাকব?"
"আগামীকাল শ্রীনগরে সেন্ট্রালের মিনিস্টার আসছে। তার জন্য আজ কোন সুখবরের ইন্তেজাম করা যাবে?"
ইসমাইল নড়ে চড়ে বসে অবাক গলায় বলল "এখন বলছেন? আরেকটু আগে বললে ভাল হত"।
"আগে পরে তো কিছু হয় না। তার ইচ্ছাতেই সব হয়। তিনি যদি মনে করেন তবে আজকেই হবে। এখনই হবে"।
ইসমাইল বলল "রাখছি এখন। এসে কথা হবে ইনশাআল্লাহ"।
"আবার যদি ধরা পড়..."
"ধরা এবার একবারই পড়ব। আল্লাহর কাছে"।
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গলায় কথাটা বলে ফোনটা কেটে দিল ইসমাইল। মিনিট তিনেকের মধ্যে তৈরী হয়ে নিয়ে বাড়ির বাইরে এল। বুড়ো বসেছিল। তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। ইসমাইল কড়া গলায় বলল, "জলদি আসছি। দরজা খোলা রাখবি"।
ইসমাইল বাড়ি থেকে বেরিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে একটা বাড়ির দরজায় তিনবার টোকা মারল। একজন যুবক দরজা খুলল। তাকে দেখে গলা নামিয়ে বলল "কোথাও যাবার আছে?"
ইসমাইল বলল "বাইক বের কর"।
ছেলেটা ইসমাইলের নির্দেশ শোনামাত্র বাড়ির ভিতরে গিয়ে মিনিট দুয়েকের মধ্যে বাইক নিয়ে হাজির হল। ইসমাইল বাইকের পিছনে বসে পড়ল। ঠান্ডা পড়েছে তবে ইসমাইলকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না সেটা। সে চোয়াল শক্ত করে বসে ছেলেটাকে রাস্তার দিকনির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল।
একটু পরেই তারা পেট্রোল পাম্পের সামনে এসে গেল। দেখা গেল পাম্পের একটু দূরের শাটার দেওয়া দোকানটায় আর্মির দুজন জওয়ান দাঁড়িয়ে আছে।
বাইকটা একটু দূরে দাঁড় করাল ছেলেটা। ইসমাইলকে বলল "আর্মি আছে"।
ইসমাইল জওয়ান দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছেলেটাকে বলল "সে তো আমিও দেখেছি। বাইক নজদিক কর"।
ছেলেটা চমকে বলল " জওয়ান তো"।
ইসমাইল হেসে বলল "এইগুলোকে মেরেই বেশি মজা। চালা বাইক"।
ছেলেটা গাইগুই করছিল ইসমাইল ছেলেটার মাথায় একটা চাপড় মারল। ছেলেটা আর দ্বিরুক্তি না করে বাইক স্টার্ট দিল। হাত কাঁপছিল ছেলেটার।
জওয়ান দুজনের একজন ছেলেটার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলে চেচাল।
"ওখানেই দাঁড়া"।
ইসমাইল চাপা গলায় বলল "নজদিক লে, নজদিক লে"।
ছেলেটা ভয় পেয়ে বাইকের গতি বাড়িয়ে দিল।

জওয়ান দুজন কিছু একটা আন্দাজ করে বন্দুক বের করতে যাবে ঠিক সেই সময় কোমর থেকে রিভলভার বের করে নিখুঁত নিশানায় দুজন জওয়ানেরই কপালে গুলি চালাল ইসমাইল। দুজনে পড়ে গেল। রিভলভারে সাইলেন্সার ছিল। কোন শব্দ হল না। ভয়ে ছেলেটার হাত কাঁপছিল। ইসমাইল বলল "চল, চল, গাঁও চল, জলদি"।

ছেলেটা বাইক ঘোরাতে গেল। কিন্তু ঠিক করে ঘোরাতে পারল না খানিকটা স্নায়ুর চাপেই। গাড়ি নিয়ে পড়ে গেল। ইসমাইলও পড়ে গেছিল, তবে তার ফিটনেসের জোরে সে উঠে দাঁড়াল। ছেলেটাকে একটা চড় মেরে বলল "শালে বাইক চালানে কা আউকাত নেহী, নিকলে জিহাদ করনে মাদারচোদ"।

ছেলেটা কাতরাচ্ছিল। ইসমাইল বাইকটা ডাবল স্ট্যান্ড করে ছেলেটাকে বাইকের পেছনে বসিয়ে বাইক স্টার্ট দিল। খানিকটা দূর থেকে গাড়ির আওয়াজ আসছিল। ইসমাইল বাইকটা নিয়ে পেট্রোলপাম্পের ভিতরে ঢুকল। শুনশান পেট্রোলপাম্প। কর্মীরা ভেতরে বসে আছে শীতের মধ্যে। বাইক দেখে একজন বেরিয়ে এল। ইসমাইল ঠান্ডা গলায় তাকে বলল "ফার্স্ট এইডের কিছু আছে? বাইক থেকে পড়ে গেছে আমার ভাই"।

লোকটা আবার পাম্পের ভেতরে ঢুকল। একটা বড় আর্মির ট্রাক পাম্পের বাইরের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। টহলে বেরিয়েছিল।

জওয়ান দুজনকে পড়ে থাকতে দেখেছে। ইসমাইল ব্যাপারটা আঁচ করে আর অপেক্ষা করার ঝুঁকি নিল না। বাইক স্টার্ট দিয়ে পাম্পের উলটোদিকের রাস্তায় ঢুকে গেল। পেট্রোলপাম্পের যে লোকটা অফিসে ঢুকেছিল ফার্স্ট এইড বক্স আনতে সে দৌড়তে দৌড়তে এল। চলে যাওয়া বাইকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

৪

রাত সাড়ে দশটা।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজি খানিকক্ষণ আগে ডিনার করেছেন।

ড্রয়িং রুমে বসে নিউজ চ্যানেল দেখছিলেন।

তার খাস খানসামা জাকির খান তার সোফার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

নিয়াজি জাকিরকে বললেন “দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বসুন আপনি”।

জাকির হেসে বলল “কী যে বলেন জনাব। এ তো অসম্ভব কথা”।

নিয়াজি বললেন “শুনুন, অসম্ভব কোন কিছুই নয়। প্রেসিডেন্ট হাইজের প্রটোকল আমিও জানি। কিন্তু আপনি ভুলবেন না আমি একজন আর্মি ম্যানও বটে। আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। প্লিজ হ্যাভ এ সিট”।

জাকির খানিকটা ইতস্তত করে অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে সোফার ওপরে বসল।

নিয়াজি বললেন “আপনি এই হাউজে কতদিন ধরে আছেন?”

জাকির বলল “তা জনাব আমার চাকরি জীবনের অধিকাংশ সময় এখানেই কেটে গেল। পঁচিশ বছর তো আছিই”।

নিয়াজি বললেন “আপনার কী মনে হয়, পাকিস্তানের জন্য আমি কেমন প্রেসিডেন্ট হব?”

জাকির বলল “খুবই ভাল প্রেসিডেন্ট হবেন আপনি জনাব। এ নিয়ে আমি একটুও দ্বিধাগ্রস্থ নই”।

নিয়াজি বললেন “আপনি সৎভাবে বলুন। ভয় নেই, আমি আপনার কোর্টমার্শাল করব না”।

জাকির বলল “আমি অত্যন্ত সততার সঙ্গেই আমার কথা বললাম জনাব। পাকিস্তানের জন্য আপনাকেই দরকার ছিল। আমার সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা ব্যক্তি একেবারেই পছন্দ না”।

নিয়াজি বললেন “আগের আর্মি প্রেসিডেন্ট আসগর খান সম্পর্কে আপনার কেমন মতামত ছিল জাকির?”

জাকির বলল “যথেষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। তবে প্রেসিডেন্ট হাউজের একটা সম্মান আছে। সব ধরণের লোক এখানে না আনাই ভাল। আসগর খানের...”

জাকির চুপ করে গেল।

নিয়াজি বললেন “উনি প্রেসিডেন্ট হাউজে প্রস্টিটিউট নিয়ে আসতেন, তাই তো?”

জাকির পায়ের নখের দিকে একভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল।

নিয়াজি বললেন “এটা হয়। দীর্ঘদিন বর্ডারে নারীহীন অবস্থায় থাকার পর হঠাৎ যখন কেউ ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যায় তখন সে কী করবে নিজেই ঠিক করে উঠতে পারে না। আপনি বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নাম শুনেছেন আশা করি। ভদ্রলোক নিজের হাতে তৈরী টুপি বিক্রি করে নিজের খরচ চালাতেন। রাজ কোষাগারে হাত পর্যন্ত দিতেন না। একজন শাসককে চরিত্রহীন হলে চলে না। তাহলে রাষ্ট্রের চরিত্রও নষ্ট হয়ে যায়। আপনি হয়ত জানেন, দ্বিতীয়বার সেনা অভ্যুত্থানের সময় আসগর খানের বুকে আমিই প্রথম গুলি চালিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য এই ধরণের লোক একেবারেই ঠিক নন। সেই সময় আমাদের গণতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, যে গণতন্ত্রকে আমরা এত কষ্ট করে আনলাম, রাজনীতিবিদরা তার দাম দিতে পারলেন না। দুর্নীতি করে করে দেশের অর্থনীতিকে ছিবড়ে করে দিলেন”।

অনেকটা কথা বলে নিয়াজি থামলেন।

জাকির মুগ্ধ গলায় বলল “জনাবের অগাধ জ্ঞান”।

নিয়াজি বললেন “পাকিস্তানের এই মুহূর্তে জ্ঞানী ব্যক্তির প্রয়োজন নেই জাকির। পাকিস্তানের প্রয়োজন একজন কড়া লোকের”।

ড্রয়িং রুমের ফোন বাজছিল।

জাকির নিয়াজির থেকে অনুমতি নিয়ে ফোন ধরল। একটু কথা বলে নিয়াজিকে বলল “মুস্তাক ইব্রাহিম ফোন করছেন জনাব করাচি থেকে”।

নিয়াজি জাকিরের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন “ওঁকে বলুন, এই সময়টা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেক রাত। কাল সকালে ফোন করতে বলুন”।

জাকির ও প্রান্তকে কথাটা রিলে করে শোনাল। ও প্রান্তের কথা শুনে জাকির নিয়াজিকে বলল “জনাব, অত্যন্ত জরুরি কথা বলার আছে বলছেন”।

নিয়াজি বিরক্ত মুখে বললেন “ওকে। যেটা বললাম সেটাই আবার বলুন”।

জাকির কথাগুলো বলে ফোনটা রেখে দিল।

নিয়াজির দিকে তাকিয়ে বলল “মুস্তাক একটু রেগে গেছেন মনে হল”।

নিয়াজি বললেন “গেলে যাবে। ও আমাদের আতিথেয়তায় আছে। আমরা ওর আতিথেয়তায় নেই। ওকে অত পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই তো”।

জাকির কিছু না বলে মেঝের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে বসে থেকে বললেন “আগামী কাল আমি করাচী যাব। ইন্তেজাম করতে বলে দিন”।

৫

শালামার গার্ডেন/শালিমার গার্ডেন, লাহোর।

বিকেল পাঁচটা।

একটা কাঠের বেঞ্চে বসে আইসক্রিম খাচ্ছিল সায়ক।

আব্বাস বিরক্ত গলায় বলল "মিয়াঁ,তোমার চাল চলন আমি সত্যি বুঝতে পারছি না। পেশোয়ার থেকে লাহোর নিয়ে এলে বাড়ি নিয়ে যাবে বলে, এখন শুধু এখানে ওখানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছো। তুমি সত্যি সত্যি কী চাও একটু বলবে?"

সায়ক আব্বাসের কথার উত্তর না দিয়ে বলল "এই যে শালিমার গার্ডেনটা তুমি দেখছ, এটা বানিয়েছিলেন বাদশাহ শাহজাহান। শাহজাহান ছিলেন প্রকৃত শিল্পের সমজদার। এই ধরণের বাগিচা তুমি শ্রীনগরেও দেখতে পাবে। অথচ দেখো, এই ভদ্রলোক, মানে শাহজাহান যখন কোথাও বাগিচা, কোথাও বা তাজমহল বানিয়ে রাজকোষের অর্থ শেষ করছেন, ঔরঙ্গজেব কিন্তু ঠিক তার উল্টো। তুমি ঔরঙ্গজেবের বানানো দুর্গ কিংবা মসজিদ যদি দেখো, দেখবে ভদ্রলোক এক টাকাও ফালতু কাজে ব্যয় করেন নি। ওঁর কাজগুলো ছিল কমপ্যাক্ট..."

আব্বাস সায়ককে থামিয়ে দিয়ে বলল "তুমি কি আমার ইতিহাস ক্লাস নিতে চাইছ? মানে বিশ্বাস কর, এসব ব্যাপারে আমার সত্যি কোন দিলচস্তি নেই"।

সায়ক বলল "মুঘল যুগে হিন্দুস্তান পাকিস্তান ছিল না। সবটাই একটা দেশ ছিল। তুমি তো দেশেই আছো আব্বাস। মনে কর গ্রেটার হিন্দুস্তানে। টাইম মেশিনে করে চাইলে ফেরত চলে যেতে পারো সেই সময়টায়। জাস্ট ভাবো, ওই যে বেদীর কাছটায় একজন লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজি একটা ঠুমরি ধরেছেন। বাদশাহ শাহজাহান চোখ বন্ধ করে সে ঠুমরি শুনতে শুনতে মাঝে মাঝেই মোহর ছুঁড়ে দিচ্ছেন বাঈজির দিকে। চারদিকে ঘিরে আছে তার পারিষদেরা। তারা মনে মনে হিংসে করছে। নিজেদের গা টেপাটেপি করে আলোচনা করছে এই লোকটা তো রাজকোষ পুরো ফাঁকা করে দিল। এর ছেলেদের জন্য আদৌ কি কিছু রেখে যেতে পারবে?"

আব্বাস বলল "গ্রেটার হিন্দুস্তান? এখানে কাউকে বললে পেটে কুড়িটা গুলি করে দিয়ে চলে যাবে"।

সায়ক বলল "সে তো স্বাভাবিক। মানুষ তো যত দিন যাচ্ছে তত অসভ্য হচ্ছে। গ্রেটার হিন্দুস্তান কেন, শুধু হিন্দুস্তানটাই এখন ইন্ডিয়াতে নেই। প্রতিটা রাজ্যে রাজ্যে ঝামেলা। কোথাও বাঙালীকে মারছে, কোথাও বিহারীকে তাড়াচ্ছে, ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি ছিল আমাদের দেশের গর্ব। জানিনা কতদিন এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারব"।

আব্বাস রেগে গিয়ে বলল "আচ্ছা মিয়াঁ, তুমি কি লেকচার দিতে আমাকে নিয়ে ঘুরছ? তোমার কাজ কর্ম আমার ঠিক সুবিধার লাগছে না কিন্তু। ঠিক কী চাইছ বল তো তুমি?"

সায়ক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল "গোলাপ বাগিচার দিকে তাকাও আব্বাস। দেখো একজন আর্মির পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে"।

আব্বাস বলল "সে তো থাকবেই। আর্মি এখন দেশ দখলে রেখেছে, সব খানে তো ওদেরই লোক থাকবে"।

সায়ক বলল "হ্যাঁ। তা ঠিক। এবার নজর দাও ওর কাছাকাছি বেঞ্চটাতে। দেখো একজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা বসে রয়েছেন। ভদ্রমহিলা হিজাব পরিহিত। দুজনের চাল চলন এবং পোশাক দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে এরা পাকিস্তানি নন। খুব সম্ভবত মিডল ইস্টের লোক। আরেকটু ভাল করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে এই ভদ্রলোক লেবাননের সেই কুখ্যাত ফারমান আলী। এফ বি আই, সি আই এ এই লোকটাকে পেলে পাতি ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নেবে পারলে। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়ান্টেড পারসন অফ এফ বি আই"।

আব্বাস চমকে উঠে বলল "ফারমান আলী লাহোরে কী করছে?"

সায়ক বলল "আর্মস এক্সপোর্টার তো। নিশ্চয়ই কোন ডিল করতে এসেছে"।

আব্বাস বলল "পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে? নাকি এর মধ্যে আবার পাকিস্তানি আর্মির মধ্যে কোন এগেইন্সট গোষ্ঠী তৈরী হয়ে গেছে"?

সায়ক মাথা নেড়ে বলল "এ সম্পর্কে আমার কোন আইডিয়া নেই"।

আব্বাস একটা শিস দিয়ে বলল "এ শালা পাকিস্তানেই সম্ভব। খুলে আম ঘুরে বেড়াচ্ছে বউ নিয়ে। সত্যি সত্যি দেশটা টেরোরিস্টদের কান্ট্রি হয়ে গেছে"।

সায়ক বলল "ওটা ওর বউ নাও হতে পারে। লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য ট্যুরিস্ট সেজে আছে। এদের অনেক বউ। রাতের পার্টনারও অনেক। এরাও এক একটা শাহজাহান"।

ফারমান উঠল। চারদিক তাকিয়ে আর্মি পোশাক পরিহিত লোকটার সঙ্গে একটা কথা বলেই মহিলাকে নিয়ে হাঁটা দিল।

সায়ক চাপা গলায় বলল "লেটস ফলো দেম"।

সায়ক হাঁটতে শুরু করল।

আব্বাস তার পিছনে ছুটতে ছুটতে এসে বলল "সত্যি করে বল তো মিত্রো, তুমি লাহোরে এদের লিড পেয়েই এসেছ না? বাড়ি যাওয়া টাওয়া আমাকে উল্লু বানাবার জন্য?"

সায়ক আব্বাসের পিঠে হাত দিয়ে বলল "বাড়ি তোমাকে আমি নিয়ে যাবই। কথা দিলাম তোমায়"।

৬

বীরেন কলকাতার আর্মি হাসপাতালে পৌঁছল বিকেল নাগাদ।

মিনির কেবিনের বাইরে সোমেন দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাকে দেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

বীরেন বলল "স্যার আমাকে এখানেই থাকতে বলেছেন আপাতত। কালকে রিলিজ করা হবে শুনলাম"।

সোমেন বললেন "হ্যাঁ। কিন্তু মেন্টাল শকটা কাটতে কত দিন লাগবে সেটা ডাক্তারবাবু বলতে পারেন নি। রেগুলার কাউন্সেলিং দরকার। এখনও ঘুমের ফাঁকে চেচিয়ে উঠছে"।

বীরেন দেখল মিনির মা অনিন্দিতা কেবিনের থেকে বেরিয়ে এলেন।

সোমেন বললেন "আপনি কি যাবেন দেখতে?"

বীরেন মাথা নাড়ল "না, আমি এখানেই ঠিক আছি। আমাদের বেশ কয়েকজন লোক এখানে রাখা আছে, এটা হাইসিকিউরিটি জোনও বটে, তবু কোন রকম বেচাল দেখলে আমাকে ফোন করবেন। আমার নাম্বারটা এখানে আছে"।

বীরেন একটা কার্ড এগিয়ে দিল সোমেনের দিকে।

সোমেন কার্ডটা নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন "আমি জানি না, ঠিক কী বলব আমি। এ ক'দিন কী প্রবল উৎকণ্ঠায় দিন কেটেছে আমাদের! আমার তো এখনও বিশ্বাস হয় না, আমার নিজের দাদা এরকম একটা সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমরা গোটা পরিবারটা একটা শকে আছি"।

বীরেন চুপ করে থাকল।

অনিন্দিতা চোখের জল মুছছিলেন। বীরেনকে দেখে একটু সামলে বললেন "ওই স্কাউন্ড্রেলটার কী খবর?"

বীরেন বলল "ইন্টারোগেশন চলবে"।

অনিন্দিতা বললেন "আদৌ কিছু হবে? এসব লোককে তো জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা উচিত"।

সোমেন বললেন "আহ, কী যে বল না"।

অনিন্দিতা বললেন "তা ছাড়া আর কী বলব বল? আমার মেয়েটার কী দশা করেছে দেখেছ? এদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত?"

সোমেন বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "প্লিজ কিছু মনে করবেন না। মা তো..."

বীরেন বলল "ওঁর রাগ করা স্বাভাবিক। উচিত ছিল সেদিনই নাজিবকে মেরে ফেলা। কিন্তু সমস্যা হল..." বীরেন চুপ করে গিয়ে বলল "সব কথা তো বলা যায় না"।

সোমেন বলল "তা ঠিক। আমাদের কপাল ভাল মিনিকে ওরা উদ্ধার করতে পেরেছেন। তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব তুষার রঙ্গনাথনের কাছে। উনি না থাকলে হয়ত এত বড় রেসকিউ অপারেশনটা হতই না"।

অনিন্দিতা বললেন "দাদার সঙ্গে দেখা করেছেন আপনি?"

বীরেন মাথা নাড়ল "না, ওখানে আমি যাই নি এখনও"।

অনিন্দিতা বললেন "কোনদিন দেখা হলে বলবেন, ওঁকে আমরা কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না"।

সোমেন বললেন "তুমি প্লিজ একটু নিজেকে সামলাও। বুঝতে পারছ না এসব সংগঠন কী সাংঘাতিক। নিজের মায়ের পেটের দাদা পর্যন্ত আমাদের এভাবে আঘাত দিল, বুঝতে পারো না?"

অনিন্দিতা বললেন "আমি সংগঠন, হিন্দু, মুসলমান কিচ্ছু বুঝি না। শুধু বুঝি যে লোকটা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে, আমাদের বাড়ির দোতলায় থেকে, আমাদের মেয়েকে ছোটবেলা থেকে বড় হতে দেখে, আমাদের এত বড় সর্বনাশ করল, তার ফাঁসি দেখতে পারলে আমি খুশি হব। আর কোন শাস্তি না। আমি মৃত্যুদন্ড দেখতে চাই"।

সোমেন মাথা নিচু করলেন।

বীরেন বলল "আপনারা চাইলে মেন্টাল কাউন্সেলিংটা এখানেও শুরু করা যায়। সেক্ষেত্রে সিকিউরিটি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে"।

অনিন্দিতা চোয়াল শক্ত করলেন "না, আমার মনে হয় মিনি আমাদের বাড়িতে গিয়েই ঠিক থাকবে। কিংবা কোন জায়গায় হাওয়া বদল করলে। ওর বাবা চেষ্টা করছে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে যদি ওকে পুরী নিয়ে যাওয়া যায়"।

বীরেন বলল "সেক্ষেত্রে আমাদের কয়েকজনকেও যেতে হবে। আমি তুষার স্যারের সঙ্গে কথা বলে জানাচ্ছি আপনাদের"।

অনিন্দিতা বললেন "মিনিকে কি সারাজীবন এরকম সিকিউরিটি নিয়েই ঘুরে বেড়াতে হবে?"

বীরেন বলল "সেটা আমি বলতে পারব না ম্যাম, তবে এই মুহূর্তে তো সিকিউরিটি খুবই প্রয়োজন সেটা আপনারাও বুঝতে পারছেন। যেভাবে শহরের মাঝখান থেকে ওঁকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ওরা কাউকে ভয় পায় না। এবারে আর কোন রকম ঝুঁকি নেওয়া যাবে না"।

অনিন্দিতা থমথমে, গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

৭

নাজিবের সামনে বসে আছেন আশরফ খান।

নাজিব আশরফের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে।

আশরফ বললেন "তা এই নিরীহ অসহায় মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা কোন জেহাদে শিখিয়েছে ভাই?"

নাজিব বলল "তার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কী ব্যবহার করব সেটার জবাবদিহি ভারতের পুলিশকে আমি দেব না"।

আশরফ জোরে হেসে বললেন "তাই নাকি? জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে করা ইসলাম স্বীকৃত কে বলল?"

নাজিব আশরফের দিকে লাল চোখে তাকাল, "কাফেরদের সাথে আমি এই নিয়ে কোন কথা বলতে রাজি নই"।

আশরফ উঠে গিয়ে নাজিবের কানটা জোরে মুচড়ে দিয়ে বললেন "তোর থেকে অনেক বেশি মুসলমান আমি। তুই মুসলমান কেন, মানুষও নোস"।

নাজিব আশরফের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গাত্মক হেসে বলল "ওহ, আপনি মুসলমান? তা এই রেন্ডিয়াতে আবার মুসলমানদের মানুষ বলে মনে করে নাকি? গরু খেলে তো কেটে রেখে দেয়। নিজের ধর্মের ভাইদের বিরুদ্ধে গেছেন আর বলছেন আপনি মুসলমান?"

আশরফ মুখে চুক চুক শব্দ করে বললেন "লাভ নেই, লাভ নেই। এসব সুড়সুড়ি আমায় দিয়ে লাভ নেই। অশিক্ষিত, গোঁয়ার গোবিন্দদের দিবি"।

নাজিব ফুঁসে উঠে বলল "অশিক্ষিত, গোঁয়ার গোবিন্দ? তাই নাকি? নিজের ধর্মের কথা বললে, নিজের মানুষদের কথা বললে সেটা অশিক্ষিতদের কথা হয় বুঝি? কোথায় ছিলিস তুই আফগানিস্তানে যখন আমেরিকা বোমা মেরেছিল? কোথায় ছিলিস তুই যখন ইরাকে অ্যাটম বোম আছে বলে একের পর এক মিসাইল হামলা হয়েছিল? বিশ্বের সর্বত্র এখন আমাদের এক হওয়ার সময়। আমাদের এক হতে হবে। উড়িয়ে দিতে হবে সব বিধর্মীদের। হয় আমাদের কথা শুনবে নয় মরবে। তুই মুসলমান? তোর নিজের দেশে কাশ্মীরিদের কীভাবে রেখেছে দেখিস নি? লজ্জা হায়া বলে কিছু রাখে নি কাশ্মীরি মেয়েদের। তুই আবার বড় বড় কথা বলিস"?

আশরফ নাজিবের দিকে চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে বললেন "তা একটা শহরের রাস্তা থেকে একটা নিরীহ মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ের নামে রেপ করাটা কোন ধর্মে আছে?"

নাজিব বলল "অবশ্যই আছে। সমস্ত বিধর্মীদের গর্ভে আমাদের সন্তান থাকবে। এভাবেই আমাদের লোকেরা বাড়বে"।

আশরফ মাথা নেড়ে বললেন "ইউ সিক বাসটার্ড! তোর ক্লাস আমি পরে নিচ্ছি"।

নাজিব রাগী চোখে আশরফের দিকে তাকিয়ে রইল।

আশরফ গলা বাড়িয়ে একজনকে ডাকলেন।

তিনি এলে আশরফ বললেন "এখন সকাল এগারোটা বাজে। এই মালটাকে দুপুর দুটো পর্যন্ত থার্ড ডিগ্রি দিয়ে যাবেন। আধমরা হলে খবর দেবেন"।

নাজিবের মুখ শুকিয়ে গেল।

আশরফ বললেন "দেখি, তোর জিহাদ তোকে কতটা কষ্ট সহ্য করতে শিখিয়েছে"।

ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে আশরফ পীযুষের ঘরে গেলেন।

পীযূষ নাজিবের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক চেক করছিলেন।

আশরফকে দেখে বললেন "কী বলল শুয়োরটা?"

আশরফ হাসলেন "যা করে, লাইক মাকসুদ, লাইক হিস চ্যালা। রিলিজিয়াস সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। তোমার খবর বল। কী কী উদ্ধার হল?"

পীযুষ বললেন "প্রচুর কোডেড মেসেজ আছে। ডিকোড করতে টাইম লাগছে। তবে যা বোঝা যাচ্ছে হাসান মাকসুদ যশোরের এ বাড়িতে হল্ট দিত প্রায়ই। ওখানে বেশ কয়েকটা অরগানাইজেশনের লোকজনও আসত। চট্টগ্রামের তিন থেকে চারটে জায়গার নাম পাওয়া যাচ্ছে যেখানে এরা বেশ ভাল পরিমাণ আর্মস মজুত করেছিল"।

আশরফ বললেন "তুষার স্যারকে জানিয়েছ?"

পীযূষ বললেন "হ্যাঁ। তবে পুরোটা নয়। আমি আরও ডিকোড করছি। ঢাকা ব্লাস্টে এদের হাত থাকলে অবাক হব না। সিলেট, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা মাদ্রাসাতে এদের যোগাযোগ আছে। ধর্মশিক্ষার নামে অস্ত্রশিক্ষা চলে। ইমিডিয়েটলি আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে সতর্ক করা প্রয়োজন"।

আশরফ বললেন "হ্যাঁ, স্বস্তির ব্যাপার হল জঙ্গি দমনে ঢাকার ভূমিকা যথেষ্ট সদর্থক। তবে আমাদের যেটা আরও বেশি করে জানা প্রয়োজন, এদের সাপ্লাই লাইনটা কারা? কোত্থেকে আসছে সব কিছু? ইন্ডিয়াতেই

বা এদের আর্মস ইম্পোর্টের স্পটগুলো কোথায়?"

পীযূষ মাথা নাড়লেন, "অত কিছু এখানে পাওয়া যাবে না। তার জন্য মাকসুদ আর আর এই নাজিবকে আরও বেশি করে জেরা করতে হবে"।

আশরফ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

৮

ইরাবতী টিভি দেখছিলেন।

তুষার যখন বেল বাজালেন তখন রাত সাড়ে ন'টা বাজে।

ইরাবতী উঠে দরজা খুললেন।

তুষার বললেন "সেম সিরিয়াল দেখছ নিশ্চয়ই?"

ইরাবতী বললেন "মুভি দেখছিলাম। কমেডি"।

তুষার জুতো খুলে সোফায় বসে বললেন "কমেডি? কেন থ্রিলার ফেভারিট ছিল যে তোমার"?

ইরাবতী হাসলেন "বয়স বাড়ছে তো। আর থ্রিলার ভাল লাগে? তাছাড়া তুমি এমনিতেই যা থ্রিলের মধ্যে রেখে দাও, আর নতুন করে থ্রিলার দেখতে ইচ্ছে করে না"।

তুষারও হাসলেন, "তা বটে। এ নিয়ে কোন ডাউট নেই। কাল যেমন কলকাতা যাব আবার"।

ইরাবতী অবাক হয়ে বললেন "কালই যেতে হবে"?

তুষার বললেন "হ্যাঁ, হাসানকে এবার দিল্লি নিয়ে আসব। সঙ্গে ওই বাস্টার্ডটাকেও"।

ইরাবতী বললেন "কী যেন নাম? নাজিব?"

তুষার ক্লান্ত গলায় বললেন "হ্যাঁ। ব্রেইনওয়াসড পাবলিকে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে সব দিকে। এদেশে একরকম, মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে আরেকরকম। সারাক্ষণ ধর্ম ধর্ম ধর্ম করে যাচ্ছে, অ্যাস ইফ এই মুহূর্তে এ জিনিসটা বাদ দিয়ে অন্য কিছু নেই। প্রায়োরিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানুষের"।

ইরাবতী চিন্তিত মুখে তুষারের দিকে তাকালেন। বললেন "তুমি ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়ছ আজকাল। আগে কিন্তু এতটা পড়তে না"।

তুষার বললেন "জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। এছাড়া তো আর কিছু উপায় নেই। আজকাল তো আমার মনে হচ্ছে আমরা যত উন্নত হচ্ছি, ততটাই পিছিয়ে পড়ছি। মিডল ইস্টের দিকেই দেখো, দে আর বিকামিং থ্রেট ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। আই এস আই এস এমনভাবে এগোচ্ছে, যে কোন দিন ওদের হাতে নিউক্লিয়ার ওয়েপন চলে আসবে। তার পর কী হতে পারে ভাবতে পারছ?"

ইরাবতী বললেন "ভাবতে চাইছি না। তুমি কফি খাবে"।

তুষার মাথা নাড়লেন, "নাহ। ডিনার করে নেব। কাল ভোরের ফ্লাইট"।

ইরাবতী বললেন "আশরফের শরীর কেমন আছে?"

তুষার বললেন "অনেকটা ইমপ্রুভ করেছে"।

ইরাবতী বললেন "বেঁচে গেল বলতে হবে"।

তুষার বললেন "আমাদের চাকরিতে বেঁচে থাকাটাই একটা প্রাইজ বলতে পারো"।

ইরাবতী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তুষারের ফোন বেজে উঠল, তুষার অন্য ঘরে গেলেন।

তুষার দেখলেন শ্রীনগর থেকে ফোন এসেছে। ধরলেন "হ্যালো"।

"স্যার, হামিদ বলছি"।

রেহানের মৃত্যুর পরে হামিদ কাশ্মীরের চার্জে আছেন এখন।

তুষার বললেন "হ্যাঁ, বল হামিদ"।

"স্যার আজ পহেলগাওয়ের কাছে হাইওয়েতে আমাদের দুজন জওয়ানের ওপর হামলা হয়েছে শুনেছেন তো?"

"হ্যাঁ, সে তো শুনেছি। গ্রামগুলো তল্লাশি করতে বলেছিলাম তো, সেটা চলছে তো?"

"হ্যাঁ স্যার, সে ব্যাপারেই ফোন করেছি। ওই ঘটনার পরে ওয়াজুরা বলে একটা গ্রামে গিয়ে জানা যায় দুটো বাড়িতে দুই মক্কেল ছিল বেশ কয়েক দিন ধরে। আজকের পর গা ঢাকা দিয়েছে"।

"শিট। কারা ছিল কিছু জানা গেছে?"

"না স্যার। তবে যা ডেসক্রিপশন পাওয়া গেছে তাতে একজন যে ইসমাইল, তা ক্লিয়ার"।

তুষার মাথায় হাত দিলেন। ঠিক এই সময়গুলোতে তিনি রেহানের অভাব ভীষণ বোধ করেন। বললেন "সব ক'টা চেকপোস্ট অ্যালার্ট করে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ স্যার, ওদের সঙ্গে বাইক ছিল। কতদূর গেছে সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না। যদি অনন্তনাগ পৌঁছে গিয়ে থাকে তার আগে তাহলে তো..."

তুষার বললেন "আমি অবন্তীর সঙ্গে কথা বলছি। অনন্তনাগে যত বাজে সিচুয়েশনই হোক, চিরুণি তল্লাশি জারি রাখতে হবে। তাতে যা হয় হোক। ইসমাইলকে খোলা ময়দানে ছেড়ে রাখার মত বিলাসিতা আমি করতে পারি না"।

হামিদ বললেন "ওকে স্যার। আমিও খবর রাখছি। কোন আপডেট হলে আপনাকে জানাচ্ছি"।

তুষার ফোন রাখলেন। অবন্তীকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন। একবার রিং হতেই অবন্তী ধরলেন "আমি তোমাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। নিশ্চয়ই ওয়াজুরা ইনসিডেন্টটা নিয়ে কথা বলবে?"

তুষার বললেন "অবভিয়াসলি। তোমার কি মনে হয়, ইসমাইল অনন্তনাগে পৌঁছে গেছে?"

অবন্তী বললেন "হাই চান্স আছে। আরেকটা চান্স আছে, পহেলগাও গিয়ে বসে থাকতে পারে"।

তুষার বললেন "অমরনাথ যাত্রা এখন নেই তো?"

অবন্তী বললেন "না, তবে নেক্সট মান্থ থেকে শুরু হবার কথা"।

তুষার বললেন "চাপটা বুঝতে পারছ অবন্তী?"

অবন্তী বললেন "সে তো বুঝতেই পারছি। তুমি কী সাজেস্ট কর সেটা বল আগে"।

তুষার বললেন "আমি কী করি বলত? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন স্টেটের লোক যদি আমাদের তাদের শত্রু বলে মনে করে তাহলে আমরা কী করতে পারি"?

অবন্তী বললেন "খুব অস্বস্তিকর কথা। এর উত্তর আমি না দিলেই খুশি হব"।

তুষার বললেন "সে তো ঠিকই। এসব কথা না বলাই ভাল আমাদের। কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে পড়ি"।

অবন্তী বললেন "হামিদ ভরসাযোগ্য তুষার?"

তুষার বললেন "হ্যাঁ। যথেষ্ট। ওর সমস্যা অন্য, রেহানকে যেমন সব কথা বলার প্রয়োজন হত না, হামিদ ঠিক তার উল্টোটা। আমি যা যা বলব, তার বাইরে একটা কাজও করবে না। ইন্টেলিজেন্সের লোকেদের এভাবে কাজ করলে চলে?"

অবন্তী বললেন "দেন সেন্ড ইওর বেস্ট অফিসার হিয়ার। অ্যাটলিস্ট ইসমাইলকে তো ধরতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট?"

তুষার বললেন "ওকে, তাই হবে, অ্যাজ ইউ উইশ"।

৯

রাত সাড়ে এগারোটা।

লাহোরের কাবাব গলিতে এক ছোট দোকানে বসে মন দিয়ে মুরগীর ঠ্যাং চিবোচ্ছিল সায়ক।

আব্বাস এক প্লেট তন্দুরি চিকেন নিয়েছে কিন্তু খাচ্ছে না।
সায়ককে বলল “ফারমান আলীর হোটেলে রুম নিলেই তো ভাল করতাম আমরা”।
সায়ক আড়চোখে চারদিকে তাকিয়ে বলল “তারপর? ট্র্যাক করে ফেললে কী করতে?”
আব্বাস অধৈর্য মুখে বলল “তাহলে কী করতে চাও তুমিই বল। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না”।
সায়ক বলল “তুমি কী করতে চাও শুনি”।
আব্বাস বলল “আমি তো পারলে মেরেই দিতাম জানোয়ারটাকে”।
সায়ক বলল “হু”।
আব্বাস উত্ত্যক্ত হয়ে বলল “কী হু? তুমি এত নিশ্চিন্ত থাকো কী করে বল তো?”
সায়ক বলল “চুপচাপ খেয়ে নাও। এখানে এসব আলোচনা করার জায়গা না”।
আব্বাস ব্যাজার মুখে মাংসে কামড় দিল।
সায়ক বলল “তোমাকে কিন্তু পাঠান ড্রেসে পাঠানের মতই লাগছে”।
আব্বাস বলল “না লাগার কী আছে? আমি তো পাঠানই”।
সায়ক বলল “তোমার হাবভাবে তো সেরকম লাগে না। কেমন বাঙালি বাঙালি ব্যাপার আছে তোমার মধ্যে একটা। বাড়ি যাব, বাড়ি যাব ভাব সারাক্ষণ। পাঠান হলে এরকম তো হত না”।
কাবাব গলিতে ভিড় আছে বেশ। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা দল বেঁধে কাবাব খেতে এসেছে। চারদিক ঝলমল করছে।
আব্বাস বলল “সবাই বাড়ি যেতে চায় মিয়াঁ। তুমি ছাড়া। তুমি যে কী দিয়ে তৈরি আল্লাহই জানেন”।
সায়কের খাওয়া হয়ে গেছিল। হাত ধুয়ে নিয়ে বলল “এইরকম কাবাব পেলে কে বাড়ি যাবে বল তো?”
আব্বাস বলল “তুমি আমাদের বাড়ি চল। আমার আম্মি যা কাবাব বানায়, তার পাশে এ সব কাবাব ফেল”।
সায়ক বলল “তা ঠিক। মায়েদের হাতের সব রান্না পৃথিবীর যে কোন রান্নার থেকে ভাল। এটা আমিও মানি”।
গলিতে আর্মির একটা গাড়ি ঢুকে দাঁড়াল। গাড়িতে ভর্তি সেনা। দুজন নেমে এক দোকান থেকে কাবাব অর্ডার করল। তার মধ্যে বিকেলে শালিমার গার্ডেনে দেখা জওয়ানও ছিল।
আব্বাস একটু হলেই চেচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। সায়ক আব্বাসের পায়ে একটা চিমটি কাটল। বলল “চুপচাপ খেয়ে যাও”।
আব্বাস সায়কের চিমটি খেয়ে চুপসে গেল। ফিসফিস করে বলল “আস্তে কাটো মিয়াঁ। কাল সকালেই নখ কেটো। উফ, কী ধার রে বাবা নখে”।
প্যাকেট নিতে বেশিক্ষণ লাগল না। গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই সায়ক বলল “তুমি খাও। আমি আসছি। খাওয়া হয়ে গেলে তারপরেই আসবে”।
আব্বাস প্রতিবাদ করার আগেই সায়ক বেরিয়ে গেল। আব্বাস দেখল যে দোকান থেকে সেনারা কাবাব নিয়েছিল সে দোকানে ঢুকে পড়ল সায়ক।
আব্বাস তাড়াতাড়ি নিজের খাওয়া শেষ করে টাকা মিটিয়ে সেদিকে দৌড়ল।
দোকানের ভিতর বেশ ভিড়। অপরিসর জায়গা কিন্তু প্রচুর লোক খাচ্ছে। সায়ক একটা টিক্কাকাবাব নিয়ে বসেছে।
আব্বাস অবাক গলায় সায়কের সামনে বসে বলল “এই তো খেয়ে উঠলে হে”।
সায়ক বলল “অসাধারন টেস্ট মনসুর মিয়াঁর কাবাবের। তাই তো ভাবি এই টুকু দোকানে এত ভিড় কেন?”
আব্বাস বলল “এত খেলে সকালে চাপ হয়ে যাবে যে”।

সায়ক উত্তর দিল না। মন দিয়ে খেতে লাগল।

খাওয়া হয়ে গেলে উঠে পড়ল। বিল মিটিয়ে ক্যাশে বসা লোকটার সঙ্গে গুজগুজ করে কী সব কথা বলে বলল "চল। আলম রোডে যেতে হবে। ফারমানের হোটেলের নাম তাজ"।

আব্বাস সায়কের সায়কের পাশে জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে বলল "এই যে বললে ফারমানের হোটেলে থাকলে ট্র্যাক করে ফেলবে"?

সায়ক উত্তর না দিয়ে অটোস্ট্যান্ডে পৌঁছে অটোতে বসে আলম রোডের ঠিকানা দিল।

আব্বাস বিড় বিড় করে বলল "কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না"।

সায়ক আব্বাসের কথার উত্তর না দিয়ে মোবাইল বের করল।

মোবাইলে লাহোরের ম্যাপ বের করে স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

১০

লিফলেট ছাড়া হয়েছে গোটা কাশ্মীর জুড়ে। যার বয়ান হল

"প্রিয় কাশ্মীরবাসী,

এই অত্যাচারী ভারত সরকার আমাদের সব দিক থেকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই মুহূর্তে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনা/সি আর পি এফের সংখ্যা সাত লাখেরও বেশি। আম কাশ্মীরিরা বারে বারে আবেদন জানিয়েছেন আফস্পা তুলে নিতে। কিন্তু এ দেশের অত্যাচারী শাসকেরা তাতে কর্ণপাত পর্যন্ত করেন নি। উপরন্তু প্রতি কাশ্মীরিকে প্রতিদিন চূড়ান্ত হেনস্থা হতে হচ্ছে। মা বোনেদের লজ্জা হায়া বলে কিছু আর নেই। আমাদের ধর্ম প্রতিমুহূর্তে কলুষিত হচ্ছে। আমরা চাই আজাদ কাশ্মীর। আমরা চাই, এই অত্যাচারী ভারতীয় শাসকরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই পবিত্র ভূমি ছেরে পিছু হটুক।

আমরা চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দিতে চাই ভারতীয় সেনার কাছে। হয় তারা এই ভূমি পরিত্যাগ করুক, নয়ত তাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব করে দেব আমরা"।

মাথুর লিফলেটটা মন দিয়ে পড়ছিলেন। খানিকক্ষণ আগে এসেছেন শ্রীনগরে।

হামিদ গম্ভীর মুখে বসে আছেন তার সামনে।

মাথুর বললেন "সর্বত্র ছড়িয়েছে এই পোস্টার?"

হামিদ মাথা নাড়লেন।

মাথুর বললেন "অবন্তীস্যারকে জানিয়েছেন?"

হামিদ বললেন "হ্যাঁ স্যার, উনি বিশেষ আমল দিলেন না"।

মাথুর বললেন "তুষার স্যারের অফিসে এই কপি স্ক্যান করে ইমেল করে দিন"।

হামিদ বললেন "ওকে স্যার"।

মাথুর বললেন "রেহান খানের ফ্যামিলির কী অবস্থা এই মুহূর্তে?"

হামিদ বললেন "ওর মা আছেন ওর বাড়িতে। যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে"।

মাথুর বললেন "কোন পোস্টার বা কালি লেপা ইত্যাদি কিছু হয় নি তো?"

হামিদ মাথা নাড়লেন, "না"।

মাথুর বললেন "বাকি খবর কী? ইসমাইলের কোন খবর আছে?"

হামিদ বললেন "অনন্তনাগের কোথাও একটা লুকিয়ে আছে। কোন গ্রামেও হতে পারে। স্থানীয় কাশ্মীরিদের থেকে কোন খবর আদায় করা যাচ্ছে না। যারা আমাদের ইনফরমার ছিল তারা হয় খুন হয়েছে নয়ত তাদের গুম করা হয়েছে। এই মুহূর্তে কাশ্মীর অগ্নিগর্ভ জনাব"।

মাথুর চিন্তিত মুখে হামিদের দিকে তাকিয়ে বললেন “আশরফের ওপর কারা অ্যাটাক করেছিল সে সম্পর্কে কোন ক্লু পাওয়া গেছে?”

হামিদ দুদিকে মাথা নাড়লেন।

মাথুরের মুখে গালাগাল চলে আসছিল। তিনি উঠে বললেন “আমি অনন্তনাগ যেতে চাই”।

হামিদ অবাক গলায় বললেন “এখন?”

মাথুর বললেন “হ্যাঁ। এখনই। কেন? কোন সমস্যা?”

হামিদ বললেন “এই মুহূর্তে না যাওয়াই ভাল। একটা ডেমনস্ট্রেশন চলছে আজকে। প্রচুর র‍্যাফ মোতায়েন আছে। ব্যাপারটা পিসফুলি হবার কথা তবে যে কোন সময় আগুন ছড়াতে পারে”।

মাথুর বললেন “ছড়ালে ছড়াবে। আমরা কি ঘরে বসে থাকার জন্যই মাইনে পাই হামিদ সাহেব?”

হামিদ নিরুত্তর থাকলেন।

মাথুর বললেন “রেহানের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল? আপনার ইচ্ছা করে না রেহানের খুনের প্রতিশোধ নিতে?”

হামিদ বললেন “আমরা একসঙ্গে কাজ করতাম। রেহান খান আমাদের ডিপার্টমেন্টের শান”।

মাথুর বললেন “শান বলে চুপ করে বসে থাকলে হবে? এই মুহূর্তে আমাদের দেশ ঠিক কী ধরনের বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?”

হামিদ মাথা নিচু করলেন “জি জনাব”।

মাথুর বললেন “আমি বেরোচ্ছি। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করুন”।

হামিদ বললেন “স্যার একটু সময় লাগবে। সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হবে”।

মাথুর বললেন “কোন সিকিউরিটির দরকার নেই আমার। অনেক হয়েছে। একটা ভাল ড্রাইভার দিন আমায়। আশা করি আপনার অফিস থেকে খবর লিক হবে না আমি অনন্তনাগ যাচ্ছি”।

হামিদ বললেন “না জনাব। এতো অসম্ভব”।

মাথুর বললেন “সবই অসম্ভব হামিদসাহেব। এর আগে আশরফের ওপর যে হামলা হয়েছিল সেটাও আমরা অসম্ভবই ভেবেছিলাম। যাই হোক, আপনি ছেড়ে দিন। আমি অবন্তীস্যারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করছি”।

হামিদ বললেন “তার কোন দরকার হবে না স্যার। আমিই নিয়ে যাব আপনাকে অনন্তনাগ। প্রয়োজন হলে আমি নিজেই ড্রাইভ করব”।

মাথুর বললেন “আপনি শিওর?”

হামিদ বললেন “হান্ড্রেড পারসেন্ট স্যার”।

মাথুরের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

১১

সকাল এগারোটা। আশরফ খান পীযূষের ঘরে বসে কাজ করছিলেন।

পিওন এসে খবর দিল এক অ্যাডভোকেট এসে দেখা করতে চাইছেন।

আশরফ বললেন “পাঠিয়ে দিন”।

মিনিট পাঁচেক পরে কালো কোট পরিহিত এক ভদ্রলোক এসে হাত জোর করলেন “আমি অ্যাডভোকেট সুলতান আলী”।

আশরফ বললেন “বসুন। ঠিক কী ব্যাপারে এসেছেন বলুন”।

সুলতান ব্যাগ থেকে একগাদা কাগজ বের করে আশরফকে দিলেন।

আশরফ বললেন “আমার পড়ার অত সময় নেই। আপনি একটা ব্রিফ করে দিন আমায়”।

সুলতান বললেন "ওকে। আমাদের কাছে খবর আছে আপনি আমার মক্কেল শ্রী জ্যোতির্ময় ওরফে হাসান মাকসুদকে বিনা গ্রেফতারি পরোয়ানায় আপনাদের হেফাজতে রেখে দিয়েছেন। এটা একটা লিগাল নোটিস দেওয়া হল। এই দেশের আইন অনুযায়ী হাসান সাহেব আইনি সহায়তা পাবেন। যতক্ষণ না ওঁর দোষ কোর্টে প্রমাণ না হয়, ততদিন ওঁকে আপনারা আটকে রাখতে পারেন না"।

আশরফ সুলতানের দিকে তাকিয়ে হেসে আবার কম্পিউটারে মন দিলেন।

সুলতান খানিকটা অধৈর্য হয়ে বললেন "আপনি শুনতে পেরেছেন আমি কী বলতে চাইছি?"

আশরফ বললেন "তার আগে বলুন আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনি কোথায় এসেছেন?"

সুলতান বললেন "আপনারা আমার মক্কেলকে আটক করে রেখেছেন সেটা ঠিক তো?"

আশরফ বললেন "একেবারেই মিথ্যা কথা। আমাদের অফিসটা দেখে মনে হচ্ছে আপনার মক্কেলকে এখানে কোথাও আটকে রাখা হয়েছে"?

সুলতান বললেন "দেখুন স্যার, আমরা কিন্তু ওঁর বাড়িতেও গেছিলাম। উনি বাড়িতে নেই। ওঁর বাড়ির লোকও আপনার অফিসের কথাই বলেছে"।

আশরফ বললেন "ওরা জানেন না অত কথা। আপনার কথা বলুন সুলতান সাহেব। আপনার কার্ডটা একটু দেখতে পারি?"

সুলতান গম্ভীর মুখে বললেন "আমার কোন কার্ড নেই"।

আশরফ বললেন "আপনাকে কে অ্যাপয়েন্ট করেছে?"

সুলতান বললেন "সেটা জানাতে আমি বাধ্য নই"।

আশরফের ফোন বাজছিল। আশরফ দেখলেন তুষার ফোন করছেন। ধরলেন "হ্যালো স্যার"।

তুষার বললেন "সব রেডি তো?"

আশরফ বললেন "আপনি কোথায় স্যার?"

তুষার বললেন "এই তো, এসে গেছি। আর দশ মিনিট ম্যাক্স। কেন কী হয়েছে? কোন প্রবলেম?"

আশরফ বললেন "এক অ্যাডভোকেট সাহেব এসেছেন। হাসান মাকসুদের সম্পর্কে জানতে"।

তুষার বললেন "কথা বলতে থাকো। আমি আসছি"।

আশরফ ফোন রেখে দেখলেন সুলতান ঘরটা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন।

বললেন "আপনার বাড়ি কোথায়?"

সুলতান বললেন "বলা যাবে না"।

আশরফ বললেন "এই দেশে তো? নাকি অন্য কোন দেশে যার জন্য আপনার বাড়ির কথা বলতে এত সমস্যা?"

সুলতান বললেন "আমি আমার ব্যক্তিগত কথা আপনার সঙ্গে শেয়ার করতে বাধ্য না"।

আশরফ বললেন "এই যে আপনি যার জন্য এখানে এসেছেন, তিনি ঠিক কতজনের মৃত্যুর কারণ, সেটা জানেন আশা করি?"

সুলতানের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল।

তুষার ঢুকলেন পাঁচ মিনিট পরেই। সুলতান তুষারকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

তুষার বললেন "বলুন, আপনার কী দাবী?"

সুলতান বললেন "আমার কোন দাবী নেই স্যার। আমি কেবল আমার ক্লায়েন্টকে দেখতে চাই। তিনি কেন নিখোঁজ হয়ে আছেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাই তথ্য জানার অধিকার আইনে। বুঝেছেন?"

তুষার সুলতানের দিকে ঝুকে পড়ে বললেন "আপনার কোন আইডিয়া আছে আপনি কোথায় এসেছেন? নাকি ভাবছেন পাড়া গাঁয় যেমন গরু চুরির কেসের ইনভেস্টিগেশন করার জন্য শালিশি সভা বসে, এখানেও সেরকম কিছু একটা হয়েছে?"

সুলতান কঠিন গলায় বললেন “আমি অন্য কোন কথা বলতে চাই না। আমি আমার ক্লায়েন্ট জনাব হাসান মাকসুদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য চাই”।

তুষার সুলতানের সামনের টেবিলে বসে পড়ে বললেন “ঠিক কে পাঠিয়েছে আপনাকে সুলতান সাহেব?”

সুলতান একবার তুষার, আরেকবার আশরফের দিকে তাকিয়ে বললেন “আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসেছি। আমাকে আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হোক”।

তুষার মাথা নাড়লেন “আপানাকে কে পাঠিয়েছে না বললে আপনাকে কোন রকম তথ্য দিতে আমরা অপারগ”।

সুলতান ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তুষার হঠাৎ করে সুলতানকে জোরে কষিয়ে একটা চড় মারলেন। সুলতান মেঝেতে পড়ে গেলেন।

আশরফ উঠে দারিয়েছিলেন।

তুষার বললেন “সবার আগে এটাকে ইন্টারোগেট করা শুরু কর। আই নিড এভ্রি ইনফো ফ্রম হিম। থার্ড ডিগ্রি,ফিফথ ডিগ্রি, যা লাগে দাও। কিন্তু আমি এদের নেটওয়ার্ক ঠিক কতটা ছড়িয়েছে, সে সম্পর্কে সব জানতে চাই”।

সুলতান ধুকতে ধুকতে বললেন “কাজটা ভাল করলেন না আপনারা। এর ফল ভুগতে হবে আমাদের”।

তুষার হাসতে হাসতে বললেন “ঠিক। হাসানের মত ইনিও আজ থেকে লা পতা”।

১২

তাজে রুম পেতে সমস্যা হল না।

দুজনের কাছেই করাচীর আইডি ছিল। রিসেপশনে কোন প্রশ্নও করল না।

অ্যাডভান্স নিয়ে রুমের চাবি দিয়ে দিল রিসেপশনিস্ট।

ঘরে ঢুকে আব্বাস বলল “এই হোটেলেই ফারমান আলী আছে তো মিয়াঁ? কোন আলাদা সিকিউরিটি দেখলাম না কিন্তু”।

সায়ক জুতো পরেই খাটে শুয়ে পড়ে বলল “রেজিস্টারে অ্যাটলিস্ট কোন ফারমান নেই”।

আব্বাস অবাক গলায় বলল “ওহ তোমার রেজিস্টার পড়া হয়ে গেল? ফারমান আলী নেই? তাহলে কী হবে?”

সায়ক ঠান্ডা গলায় বলল “ফারমান নিজের নামে থাকলেই বরং বেশি অবাক হতাম। যাই হোক, আপাতত তুমি ঘুমিয়ে পড়। কালকে দৌড় করতে হতে পারে সে হিসেবে যতটা পারো রেস্ট নিয়ে নাও”।

আব্বাস বলল “আর তুমি?”

সায়ক বলল “আমিও ঘুমাব”।

আব্বাস বলল “কাল কোথায় যাব? লাহোর ছাড়ব?”

সায়ক বলল “দেখা যাক”।

আব্বাস রেগে বলল “তোমার সঙ্গে না মিয়াঁ এগুলোই সমস্যা! অর্ধেক কথা পেটে রাখো, অর্ধেক কথা মুখে বল। অর্ধেক কেন, প্রায় সব কথাই পেটে রাখো। এত চেপে থাকলে কী করে হবে বল তো?”

সায়ক বলল “কেন? কোন কথা পেটে রাখলাম?”

আব্বাস বলল “এই যে মিয়াঁ, প্রথমে বললে বাড়ি নিয়ে যাবে। তারপর দেখা গেল বাড়ি নিয়ে গেলে না, এখানে ফারমান আলীকে ফলো করা শুরু করালে। এখন বলছ কাল দৌড় করতে হতে পারে, কিন্তু কোথায় যাব, কী বলছ কিছুই বলছ না। এভাবে চললে কী করে হবে বল তো?”

সায়ক হাসল “বুঝতে পারছি দেশে যেতে না পেরে তোমার মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও এখন। কাল সকালে সব বলছি তোমায়...”

সায়কের কথা শেষ হল না দরজায় জোরে জোরে নক করল কেউ।

আব্বাস ভীতু চোখে সায়কের দিকে তাকাল।

সায়ক উঠে দরজার কাছে গেল। কী হোল দিয়ে দেখল বাইরে দুজন সেনা দাঁড়িয়ে আছে।

আব্বাস ফিসফিস করে বলল "কে?"

সায়ক বলল "করাচীতে মোবাইলের ব্যবসা করি। এখানে ডিলারশিপের কাজে এসছি। তুমি আমার চাচাতো ভাই। মনে আছে তো?"

আব্বাস ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল।

সায়ক দরজা খুলল।

বাইরে দাঁড়ানো একজন সেনা তার দিকে তাকিয়ে বলল "আপনার নাম?"

সায়ক বলল "সেলিম রিজভি স্যার। ও আব্বাস রিজভি"।

সেনা সায়কের আপাদমস্তক মেপে বলল "মে আই কাম ইন?"

সায়ক দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।

দুজন ঘরে ঢুকে রুমের চারদিকে তাকাল। একজন খাটের তলা দেখল। বলল "লাহোরে কী করতে এসেছেন করাচী থেকে? লাগেজ নেই কেন?"

আব্বাসের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছিল। সায়ক দৃঢ় গলায় বলল "ও স্যারজী, মোবাইল সেটের ব্যবসা। লাহোরে হেড কোয়ার্টার আমাদের। টাকা দিতে এসেছিলাম। রাত হয়ে গেল, আব্বু বলল থেকে যেতে"।

"আই ডি দেখি"।

সায়ক আইডি দেখাল।

সেনা বলল "শহরে এত হোটেল থাকতে এখানে উঠেছেন কেন?"

সায়ক বলল "কোন কারণ নেই স্যারজী। অটোওয়ালা নিয়ে এল এখানে। আমরা তো কোন হোটেলই চিনি না"।

দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল "চল মুস্তাক। এরা সাধারন লোক"।

প্রথমজন সায়কের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঘর থেকে বেরোল।

সায়ক দরজা বন্ধ করল।

আব্বাস জোরে একটা শ্বাস ফেলে বলল "এরকম হল কেন?"

সায়ক বলল "ফারমান আলী আছে যে হোটেলে সে হোটেলে একটু ছান বিন হবেই। তার ওপরে যে দেশে সেনা অভ্যুত্থান ঘটেছে, সেখানে তো এসব কোন ব্যাপারই না। কপাল ভাল কোন ঘুষ চেয়ে বসে নি। এদেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভীষণ দুর্নীতিগ্রস্থ। আরও কপাল ভাল এরা আমাকে চিনতে পারে নি"।

আব্বাস মাথায় হাত দিয়ে বলল "আমাদের উচিত ছিল এ হোটেলে না থেকে অন্য কোন হোটেলে থাকা। আমায় যদি কিছু জিজ্ঞেস করত আমি নির্ঘাত কিছু চেপে রাখতে না পেরে সব বলে দিতাম"।

সায়ক উঠল। দরজা খুলল।

আব্বাস বলল "কোথায় যাচ্ছ?"

সায়ক আব্বাসকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে দেখাল।

গলা বের করে চারদিক দেখল। খানিকক্ষণ বাইরে থেকে ঘুরে এসে আবার ঘরে ঢুকে গেল।

আব্বাস বলল "কী হল? কেন বেরোতে গেলে?"

সায়ক হেসে বলল "ব্যাটা এই ফ্লোরেই আছে। সে জন্যই এরা উকি দিয়ে গেল"।

চুয়াল্লিশ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে গাড়ি চলছে। হামিদ গাড়ি চালাচ্ছেন।

পাশে বসে আছেন মাথুর। রাস্তার প্রতিটা ইঞ্চি দখল নিয়েছে ভারতীয় সেনা। তবু কেমন একটা থমথমে পরিবেশ। আম কাশ্মীরিরা রাস্তায় বাইকে বা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন বটে তবে তাদের মধ্যে একটা নিস্প্রাণ, নিস্তেজ ভাব।

মাঝে মাঝেই টহলদারি ভ্যান কিংবা জিপের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

মাথুর বললেন "আপনার বাড়ি কোথায়?"

হামিদ বললেন "মুজফফরাবাদে জন্মেছিলাম। আমার বাবা মা এদেশে চলে এসেছিলেন আমার ছোটবেলাতেই। ওপারে খুব সমস্যা হচ্ছিল"।

মাথুর বললেন "এখন শ্রীনগরেই বাড়ি?"

হামিদ বললেন "হ্যাঁ। বাবা এখানে এসে লোকাল ট্যুরিস্ট গাইড হলেন। আজন্ম ভারতীয় হিসেবে গর্ব করতেন। বলতেন আমাদের লোকেরা বোকা, এদের কোন ধারণা নেই, পাকিস্তানি আর্মি আর জঙ্গিরা কত খারাপ। ছোট ছোট ছেলেদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় মানববোমা বানাবার জন্য, ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হয়"।

মাথুর বললেন "আপনার জন্মের সময় কাশ্মীর নিয়ে টেনশন ছিল?"

হামিদ বললেন "না। অ্যাকচুয়ালি সে সময়টা বিভিন্ন জঙ্গী ঘাঁটি তৈরী হচ্ছিল ও প্রান্তে। প্রতিটা বাড়ি থেকে জোর করে নিয়ে যেত ট্রেনিং দেওয়ার নাম করে। আমার বাবা সে সময়েই আমার মাকে নিয়ে এদেশে পালিয়ে আসেন"।

মাথুর বললেন "ইন্টারেস্টিং"।

হামিদ বললেন "চা খাবেন?"

মাথুর বললেন "কেশর দেওয়া?"

হামিদ হাসলেন "হ্যাঁ"।

গাড়িটা রাস্তার ধারে একটা দোকানে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামতেই প্রবল ঠান্ডা হাওয়া ভেসে এল।

মাথুর বললেন "উইন্টার ইজ কামিং"।

হামিদ বললেন "হ্যাঁ স্যার। এই সময়টা ওদের ঘর গোছানোর সময়"।

হামিদ দুজনের জন্য চা নিলেন। মাথুর চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন "ঘর থাকলে ঘর তো গোছাবেই হামিদ সাহেব। প্রশ্নটা হল ঘর রাখার সাহস পাচ্ছে কী করে?"

হামিদ বললেন "কাশ্মীরকে আসলে অতটা সহজে বোঝা সম্ভব না। সব কাশ্মীরিই যে মিলিট্যান্টদের সমর্থন করেন তা নয়। কিন্তু খোদ রাষ্ট্র যদি একজন আম কাশ্মীরির সঙ্গে একজন আম ভারতীয়র তফাৎ করে দেয়, সমস্যাটা সেখান থেকে শুরু হয়। আপনিই বলুন না, কিছুদিন আগে একটা সিনেমা রিলিজ নিয়ে হরিয়াণায় বেশ কয়েকটা স্কুল বাসে পাথর চার্জ করল বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ কিচ্ছু করল না। ঠিক এই জিনিসটা যদি শ্রীনগরে হত তাহলে কী হত? স্বয়ং রাষ্ট্রই যদি তার নাগরিকদের সন্ত্রাসবাদী ভেবে নেয়, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাঁধা দেয় অনবরত, তখন মানুষ কোথায় যাবে?"

মাথুর হামিদের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি তবে আফস্পা সমর্থন করেন না? প্রত্যাহার হোক সেটা আপনিও চান?"

হামিদ বললেন "নিশ্চয়ই। আপনাকে আপনার দেশের মানুষকে তাদের মত করে থাকতে দিতে হবে। যখনই আপনি সেটাকে আটকাতে যাবেন, মানুষ দেশের বিরুদ্ধে চলে যাবে। যেটা দিনের পর দিন কাশ্মীরে ঘটে চলেছে"।

মাথুর বললেন "একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে আপনি আপনার চাকরিদাতার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন? জানেন উপরমহল যদি আপনি এটা বলেছেন জানতে পারে, তাহলে কী হতে পারে?"

হামিদ হাসলেন “উপরমহল আর কীই বা করতে পারে জনাব? আমাকে সরিয়ে দেবে, কিংবা সাসপেন্ড করবে। কিন্তু তাতে কি কাশ্মীরের অবস্থার কিছু উন্নতি হবে?”

মাথুরের চা শেষ হয়ে গেছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি একটা সিগারেট বের করে ধরালেন।

ভারতীয় সেনার একটা টহলদার জিপ এসে দাঁড়াল।

হামিদকে দেখে প্রশ্ন করা শুরু করল।

হামিদ শুরুতেই নিজের আই কার্ড দেখিয়ে দিলেন। সেনারা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হামিদ বললেন “জাতীয় সড়কে এরকম জিজ্ঞাসাবাদ সাধারণত হয় না। ইসমাইলের জন্য সবাই খুব অ্যালার্ট হয়ে আছে”।

মাথুর বললেন “হামিদ সাহেব”।

হামিদ বললেন “জি”।

মাথুর বললেন “আমাকে হয়ত অনন্তনাগে দু তিন দিন থাকতে হতে পারে। আমি এই মুহূর্তে শ্রীনগরে ফিরব না। কোন সরকারী আবাসনে থাকতে চাই না। কাছাকাছি কোন গ্রামে কারো বাড়িতে আমার থাকার জায়গা করতে পারবেন?”

হামিদ বললেন “এখানে বিশ্বাস করার মত তেমন কেউ নেই জনাব। নিরাপত্তার স্বার্থে আপনাকে সেনাদের আশ্রয়েই থাকতে হবে”।

মাথুর একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে বললেন “আমাকে নামিয়ে দিয়ে আপনি শ্রীনগর ফিরে যান। বাকিটা আমি বুঝে নিচ্ছি।

১৪

করাচীর আইয়ান এ সদর রোডে সিন্ধের গভর্নর হাউজে এসেছেন প্রেসিডেন্ট নিয়াজি।

সিন্ধ প্রদেশের গভর্নর ইসমাইল জুবের ভীত মুখে বসে আছেন তার সামনে।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজি কফিতে চুমুক দিয়ে গম্ভীর মুখে জুবেরের দিকে তাকিয়ে বললেন “আপনার গভর্নর হিসেবে ক বছর হল?”

জুবের বললেন “দু বছর জনাব”।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজি বললেন “এই দুবছর মুস্তাক ইব্রাহিমের সঙ্গে কত বার দেখা করেছেন?”

জুবের গলা খাকড়ানি দিয়ে চারদিকে তাকালেন। চতুর্দিকে ব্যুরোক্র্যাটেরা দাঁড়িয়ে আছে।

নিয়াজি বললেন “আপনি সবার সামনে বলতে পারেন। এরা সবাই আমাদের গভর্নমেন্টের বিশ্বস্ত লোক”।

জুবের বললেন “জনাব মুস্তাক ইব্রাহিম আমাদের সব রকম সাহায্য করেন ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। আপনি জানেন সে কথা”।

নিয়াজি চোখ ছোট ছোট করে বললেন “সব ধরণের সাহায্য করেন? তা কী কী ধরণের সাহায্য করেন শুনি”।

জুবের আবার অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকালেন।

নিয়াজি বাকিদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে আধ মিনিটের মধ্যে।

নিয়াজি বললেন “বলুন”।

জুবের বললেন “জনাব আরব সাগরে করাচী থেকে মুম্বই যাবার যে করিডর রয়েছে, সেখানে অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে পাকিস্তানি সেনা ঢুকতে না পারলেও মুস্তাকের লোক ড্রাগ পাচার করতে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে। ইন্ডিয়ান টেরিটরিতেও ওদের বেরাদারি আছে। আপনি ভুলে গেছেন কী না জানি না, কিন্তু ছাব্বিশ এগারোর মত সফল অপারেশন মুস্তাককে ছাড়া কি সম্ভব হত?”

নিয়াজি ভ্রু কুঁচকে বললেন "পাকিস্তানি জলসেনা ঢুকতে পারে না, মুস্তাক ইব্রাহিমের লোক অনায়াসে ঢুকে যায়? রিয়েলি? ডু ইউ হ্যাভ স্পেসিফিক ইনফরমেশন"?

জুবের মাথা নিচু করে বললেন "স্পেসিফিক ইনফরমেশন না থাকলেও আমাদের বিশ্বাস সেরকম। বলিউডের বহু বড় বড় নামের সঙ্গে মুস্তাক এখনও জড়িত। করাচী থেকে মুস্তাক যেভাবে অপারেশন চালান, সেটা আমাদের দেশের পক্ষে একটা অত্যন্ত সদর্থক ব্যাপার"।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে বললেন "আপনি জানেন মুস্তাকের ব্যাপারে আমাদের ওপর ইন্টারন্যাশনাল প্রেশার আছে? ইন্টারপোল পর্যন্ত আমাদের বার বার বলছে মুস্তাককে ওদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য?"

জুবের বললেন "পাকিস্তানের ওপরে কোন ব্যাপারে ইন্টারপোলের প্রেশার নেই জনাব? কিন্তু পাকিস্তানকে তো টিকে থাকতে হবে সব রকম প্রতিকূলতা মাথায় রেখে। কাশ্মীরে যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে, তারা না থাকলে কাশ্মীরে আমরা ঠিক ঠাক অপারেশন চালাতে পারতাম?"

নিয়াজি জুবেরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন "দেশের সব ব্যাপারে আপনার ভালই জানকারি আছে জুবের সাহেব। আই অ্যাম ইমপ্রেসড"।

জুবের প্রত্যুত্তরে কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। চুপ করে বসে রইলেন।

নিয়াজি বললেন "মুস্তাক ইব্রাহিমকে গভর্নর হাউজে আনার ব্যবস্থা করা যাবে?"

জুবের উশখুশ করে বললেন "জনাব, মিডিয়া আছে, ব্রিটিশ মিডিয়া, আমেরিকান মিডিয়াও এসেছে আপনার সঙ্গে। হাউজের বাইরেই তারা আছে"।

নিয়াজি বললেন "আমি তো মুস্তাককে আনতে বলেছি শুধু। কীভাবে আনবেন সেটা আপনার ব্যাপার"।

জুবের চিন্তিত মুখে ফোন বের করে নিচুস্বরে কারো সঙ্গে কথা বললেন।

পরক্ষণে বললেন "আসবেন। তবে বোরখা পরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার মিসেসের বন্ধুরা আসেন। তাদের সঙ্গে আসবেন"।

নিয়াজি অবাক হয়ে বললেন "আপনার মিসেসের বন্ধুদের সঙ্গে আসবেন? তার মানে এ হাউজের সঙ্গে মুস্তাকের ভালই যোগাযোগ আছে, তাই তো?"

জুবের মাথা নিচু করলেন "মুস্তাকের ছোট ছেলে আমার ছেলের বন্ধু জনাব। করাচীর সফল ব্যবসায়ী ইজাজ ইব্রাহিম"।

নিয়াজি মাথা নাড়লেন, "হু। একজন মুম্বইবাসী এখন করাচীতে গভর্নর হাউজ অবধি ঢুকে পড়েছে। জেনানা মহল, ব্যবসায়ী মহলে তার অবাধ যাতায়াত। খানিকক্ষণ পরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও তার মুলাকাত হবে। উত্থানের পরিধিটা বুঝতে পারছেন আপনি?"

জুবের বললেন "জি হুজুর, পাকিস্তানের স্বার্থে আমরা এটা করতেই পারি। তাই না?"

নিয়াজি বললেন "পাকিস্তানের স্বার্থে আমরা আর কী কী করতে পারি সেটাই জানতে চাই আমি। আসুক ইব্রাহিম"।

ঘরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

১৫

"এই মুহূর্তে কাশ্মীর যে পরিস্থিতিতে আছে, সেখানে কাশ্মীরিদের কোন দোষ নেই। তারা পরিস্থিতির শিকার। যে পরিস্থিতি মানুষকে দিনের পর দিন গোলাম করে রেখে দিয়েছে এই দেশের সরকারের কাছে।

কাশ্মীরের মানুষ চেয়েছে স্বাধীনতা। সব রকম গোলামির থেকে। এই স্বাধীনতা কাশ্মীরের মানুষকে অর্জন করতে হবে। শুধু নিয়ম মাফিক পড়াশুনা নয়। পড়াশুনা তখন হয়, যখন দেশে স্থিতাবস্থা থাকে। আপনাদের

কি মনে হয় আমরা এখন স্থিতাবস্থার মধ্যে আছি?”

ছাত্রছাত্রীদের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন মহম্মদ কাদরী।

ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের দিকে তাকাল।

কাদরী উত্তেজিতভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ইউনিভারসিটির ক্লার্ক হুসেন দরজায় নক করল।

কাদরী শব্দ শুনে সেদিকে তাকালেন “কী হল?”

হুসেন বলল “আপনাকে প্রিন্সিপাল স্যার এখনই ওঁর অফিসে ডেকেছেন”।

কাদরী বললেন “যাচ্ছি, ক্লাস শেষ করে”।

হুসেন বলল “ক্লাস শেষ করে না, উনি বলেছেন এখনই যেতে। জরুরি তলব”।

কাদরী হুসেনের দিকে তাকিয়ে স্থির চোখে বললেন “যাও, আসছি”।

হুসেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে গেল।

কাদরী হেসে ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন “মনে হয় প্রভুরা জানতে পেরে গেছেন তাদের পোষা কুকুরগুলো কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে গেছে। আর মনে হয় আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না। অলভিদা”।

একটা ঝড়ের হাওয়া যেন ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

ছাত্রছাত্রীরা যন্ত্রবৎ বসে রইল। কী করবে কিছুই বুঝতে পারল না।

প্রিন্সিপাল ঘরে ছিলেন।

কাদরী নক করলেন। প্রিন্সিপাল গম্ভীর গলায় কাদরীর দিকে তাকিয়ে বললেন “আসুন”।

কাদরী ঘরে ঢুকে বললেন “কী ব্যাপার জনাব? আমি কি আমার শেষ ক্লাসটা নিয়ে ফেলেছি”?

প্রিন্সিপাল খানিকটা থতমত খেয়ে পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে একটা চিঠি কাদরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন “আপনার নামে স্পেসিফিক অভিযোগ আছে কাদরী, আপনি ক্লাসে পড়াবার পরিবর্তে দেশ বিরোধী কথা বলছেন। ছাত্র ছাত্রীদের এই দেশের বিরুদ্ধে উস্কাচ্ছেন। আমি অনেক রকম ভাবেই চেষ্টা করেছিলাম ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিতে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আই ফেইলড। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। আপনাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শ্রীনগর পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যেতেও বলা হয়েছে আপনার সময়মত”।

কাদরী বাঁকা হাসি হেসে বললেন “ওহ, তাই বুঝি? হেডকোয়ার্টারে আমার সময়মত ডেকে পাঠিয়েছে? কী সৌভাগ্য বলুন তো আমার? আমি তো ভেবেছিলাম কোমরে দড়ি পরিয়ে নিয়ে যাবে আপনার সরকার। তাও ভাল, আল্লাহর অসীম রহমত, একজন শিক্ষকের প্রতি এটুকু সৌজন্যবোধ দেখানো হয়েছে”।

প্রিন্সিপাল বললেন “দেখুন কাদরীসাহেব, আমাদের সবাইকেই একটা স্পেসিফিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। রুলস এন্ড রেগুলেশনস সব খানেই আছে। আপনি যদি সেগুলো না মেনে দেশবিরোধী কথা বার্তা বলে চলেন সেক্ষেত্রে...”

কাদরী প্রিন্সিপালকে থামিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বললেন “আপনি কি আশা করেন জনাব, পলিটিক্যাল সায়েন্স ক্লাসে আমি সার্নের কোলাইডার নিয়ে বক্তৃতা দেব? আমার ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীরা দেশের হালহকিকত সম্পর্কে কিছুই জানবে না? তারা একেবারে অজ্ঞ থাকবে? যেখানে ইউনিভারসিটিতে যেতে আসতে পর্যন্ত হাজারগন্ডা কারফিউ পেরিয়ে আসতে হবে, যেখানে নিজের দেশেই নিজের বাড়িতে থাকতে পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হবে, সেখানে কীভাবে আশা করেন শুধুমাত্র কতগুলো পুথিগত বিদ্যাতেই আটকে থাকবে আমার ক্লাস?”

প্রিন্সিপাল চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে কাদরীকে বললেন “আপনি যা বলছেন, তা অনেকাংশেই আমি মানি কাদরীসাহেব। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ রয়েছে। এই মুহূর্তে কাশ্মীর যে পরিস্থিতিতে আছে, সেখানে আমাদের কারো কিছু করার নেই। স্বাধীন কাশ্মীরের কথা ভাবা একান্তই বাতুলতা। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে থাকতে হবে আমাদের”।

কাদরী হাসলেন “তা বটে। কাঁচের ঘরে বসে এ সব কথা বলতে আমাদের কারো কোন সমস্যা নেই, এ কথা আমরা সবাই খুব ভাল করে জানি। শুধু মনে রাখবেন জনাব, গান্ধীর যুগ এখন নেই, এ দেশের মানুষও কাশ্মীরিদের এখন আর ভারতীয় বলে মনে করে না। তারা আমাদের আদৌ মানুষ বলেই মনে করে না। নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে গেলে যে আওয়াজের প্রয়োজন হয়, তা আমাদের দরকার। এবং তা দরকার এখনই। আর আপনি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলছেন? এ দেশের কোন রাজ্যে এভাবে আফস্পা চলে? কোন রাজ্যে ঘরে ঘরে যখন তখন সেনা ঢুকে ঘরে ঘরে মা বোনেদের পোশাক তল্লাশি করে। জঙ্গিদমনের নাম করে শিশু কিশোরদের অবলীলায় খুন করে? বলতে পারবেন কোন রাজ্যে? যাই হোক, আপনি ভাল থাকুন। আমার বেস্ট উইশেস থাকল আপনার জন্য”।

কাদরী চেয়ার ছেড়ে উঠে আর প্রিন্সিপালের কথা শোনার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না।

সটান বেরিয়ে গেলেন প্রিন্সিপালের চেম্বার ছেড়ে।

প্রিন্সিপাল একমুখ অস্বস্তি নিয়ে বসে রইলেন।

১৬

ভোর চারটেয় উঠে বসল সায়ক। খোঁচা দিয়ে আব্বাসকে ডাকল।

আব্বাস ধড়মড় করে উঠে বসে চেঁচাতে যাচ্ছিল সায়ক আব্বাসের মুখে হাত দিয়ে বলল “আসতে কথা বল”।

আব্বাস হতাশ গলায় বলল “কী ব্যাপার মিয়াঁ,এখনও তো সকালই হয় নি। ডাকলে কেন হঠাৎ করে”?

সায়ক ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল “শব্দ পাচ্ছ?”

আব্বাস একটু শোনার চেষ্টা করে বলল “হ্যাঁ। কিছু একটা টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে মনে হচ্ছে”।

সায়ক লাফ দিয়ে উঠে খুব ধীরে ব্যালকনির দরজা খুলে ব্যালকনিতে গেল। নিচে একটা ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানি সেনারা এক গাদা কফিন তুলছে ট্রাকে।

সে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

আব্বাস গলা নামিয়ে বলল “কী হল?”

সায়ক বলল “ঘরের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখো তো বাইরে আর্মি আছে নাকি?”

আব্বাস ভয়ার্ত গলায় বলল “ওরে বাবা রে, ওসব আমি পারব না”।

সায়ক বলল “কেন? না পারার কী আছে? যাও”।

আব্বাস মাথা নাড়ল, “না না মিয়াঁ, তুমি ক্ষেপেছ? ধরা পড়লে একদম হালাল মাংস বানিয়ে দেবে আমার”।

সায়ক চিন্তিত মুখে আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল “তা ঠিক। চল রেডি হয়ে নি”।

আব্বাস আঁতকে উঠে বলল “ওদের সামনে গিয়ে পড়বে এক্কেবারে?”

সায়ক নির্লিপ্ত গলায় বলল “করাচীর বাস ছাড়ে ভোর ছ’টায়। আমাদের তো করাচী পৌছতে হবে না মিয়াঁ তার আগে? তাছাড়া ফজরের আজানের আগে উঠে গেছো। সমস্যা কোথায়?”

আব্বাস ব্যাজার মুখে উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে বলল “রাতে ঘুমাতে দেবে না, দিনে দু দন্ড সুস্থির হয়ে বসতে দেবে না। তুমি মিয়াঁ বড্ড জ্বালাতন করছ কিন্তু”।

সায়ক পোশাক পরতে পরতে বলল “কথা কম বল। তৈরী হও জলদি”।

আব্বাস তবু গজগজ করতে করতে তৈরী হয়ে গেল।

দুজনে ঘর লক করে ফ্লোরে এসে দেখল ফ্লোর আর্মিতে ছয়লাপ হয়ে গেছে। তাদের দেখে একজন গলা তুলে বলল “কোথায় যাবেন?”

সায়ক মিঠে গলায় বলল "জনাব, কালকে তো আপনাদের বললাম করাচী থেকে এসেছি আমরা। ভোরের বাসে সেখানেই ফিরে যাব"।

তাদের ছেড়ে দিল সেনার লোকজন। সায়ক এক মুহূর্তও কোন দিকে না তাকিয়ে রিসেপশনে পৌঁছে বকেয়া মিটিয়ে দিল।

হোটেলের বাইরে চার পাঁচটা অটোওয়ালা অটো দাঁড় করিয়ে ঘুমাচ্ছিল।

সায়ক হেঁটে গিয়ে একজনকে তুলে বলল "বাসস্ট্যান্ড যাবে মিয়াঁ?"

অটোওয়ালা কোন কথা না বলে উঠে বসল।

সায়ক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল "উঠে পড়"।

অটোওয়ালা একটু পরে অটো স্টার্ট দিল।

সায়ক বলল "কভি কভি মেরে দিল মে খায়াল আতা হে... আমি তো ভেবেছিলাম এত তাড়াতাড়ি তুমি আসতে পারবে না বিলাল"।

অটোওয়ালা হাসল "কাল রাতে মেসেজ পেয়ে কালই চলে এসেছিলাম"।

আব্বাস অবাক গলায় বলল "হ্যাঁ? চেনো একে?"

সায়ক আব্বাসকে পাত্তা না দিয়ে বলল "কফিন নিয়ে কী করছে এঁরা? তাও এই লোক ভর্তি জায়গায়?"

বিলাল বলল "জনমানবহীন জায়গাতে সন্দেহ বেশি হয় মিয়াঁ। এদের টার্গেট দিনের আলো ফোটার আগে সব মুজফফরাবাদে পাঠানো। কফিন তো মানুষের চোখে ধুলো দেবার জন্য। ভেতরে ভর্তি আর্মস"।

সায়ক বলল "হু, সে তো হবেই। নইলে ফারমান বাস্টার্ড এখানে কী করতে আছে। কী করে মাল চলে আসছে কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না"!

বিলাল বলল "তোমাদের বাস স্ট্যান্ডেই নামাতে হবে। পাক সেনার ওপর আমার ভরসা নেই। আমরা সত্যিই বাস স্ট্যান্ডে যাচ্ছি নাকি সেটা দেখার জন্য আমার পেছনে তাড়া করতেই পারে। ওখান থেকে তোমরা যেখানে ইচ্ছা যাও কোন অসুবিধা নেই"।

সায়ক বলল "ঠিক আছে"। তারপরই সায়কের গলায় ঠাট্টার সুর শোনা গেল, "আচ্ছা শোন বিলাল, আব্বাস খুব জ্বালাচ্ছে আমায়। অমৃতসর যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা যাবে আজকে? ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। বাড়ি যেতে চায় বেচারা।"

বিলাল বলল "মাথাতেও আনবে না এখন এসব কথা। আপাতত বাস স্ট্যান্ড পৌঁছে ডিসিশন নাও আজকে কী করবে"।

আব্বাস রাগী মুখে সায়কের দিকে তাকাল।

১৭

রাত এগারোটা।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজী ইসলামাবাদে ফিরে প্রেসিডেন্ট হাউজে ডেকেছেন আর্মি চিফদের। চারজন এসেছেন। আমরা নাম না বলে চিফ ১, চিফ ২ বলে অভিহিত করছি। নিয়াজি স্কচের গ্লাস নিয়ে চারজনের প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে বললেন "অপারেশন ব্লু ফ্লাওয়ার ফার্স্ট ফেজ ওয়াজ আ বিগ ফেইলিওর, যদিও ব্লু ফ্লাওয়ার সম্পর্কে কোন কিছুই আমার কাছে পুরোপুরি ক্লিয়ার নয় এখনও। এটা নিয়ে কোন রকম আপডেট কিন্তু আমার কাছে আসে নি। আপনাদের কাছে কোন আপডেট আছে?"

চিফ ১ বললেন "ইসমাইল আব্বাস শ্রীনগর জেল থেকে পালিয়েছে। অনন্তনাগের কাছে দুজন ইন্ডিয়ান আর্মির জওয়ানকে খুন করে গা ঢাকা দিয়েছে"।

নিয়াজী বললেন "ইসমাইল? ও কি ব্লু ফ্লাওয়ারে ইনক্লুডেড ছিল"?

চিফ ১ বললেন “জি জনাব। এয়ারপোর্ট এক্সিট প্ল্যানে ওই ক’জনের মধ্যে ও ছিল”।

নিয়াজি বললেন “ওকে কে কন্ট্রোল করে এখন? লস্কর?”

চিফ ১ বললেন “জি”।

নিয়াজি বললেন “ঠিক আছে। আই নিড টু নো হিজ একজ্যাক্ট পজিশন। কালকের মধ্যে। যেভাবে পারেন আমাকে দেওয়ার চেষ্টা করুন”।

চিফ ১ বললেন “জি জনাব”।

নিয়াজি বললেন “ইন্ডিয়া থেকে আর কী কী ইনপুটস পাওয়া যাচ্ছে?”

চিফ ৪ বললেন “ইন্ডিয়ান মুসলিমস আর নট ইন আ গুড স্টেট স্যার। বিফ ইটিং নিয়ে তাদের মনে একটা ভয় ঢোকানো হয়েছে। মন্দির মসজিদ ইস্যুসও আছে। একটা অংশ ফুঁসছে”।

নিয়াজি স্কচে চুমুক দিয়ে বললেন “গুড নিউজ। থোড়া আউর জেহের ডাল দো”।

চিফ ৪ বললেন “সেম সিচুয়েশন ইন সিন্ধ প্রদেশ স্যার। বেশ কয়েকজন হিন্দু অত্যাচারের জন্য ইন্ডিয়ায় পালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে তাদের শেল্টার দেওয়া হচ্ছে”।

নিয়াজি নড়ে চড়ে বসলেন “কোন করিডর দিয়ে”?

চিফ ৪ বললেন “রাজস্থান”।

নিয়াজি বললেন “ডু উই হ্যাভ হিন্দু স্পাই?”

চিফ ৪ বললেন “ডেফিনিটলি স্যার”।

নিয়াজি বললেন “নেক্সট মান্থ দিল্লিতে সার্ক মিট আছে। তার আগে আমার এ সমস্ত স্পাইয়ের অপারেশন ডিটেলস চাই”।

চিফ ৪ বললেন “আমি পরশুর মধ্যে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি ডিটেলস”।

নিয়াজি বললেন “পাকিস্তানের মত দেশে প্রেসিডেন্ট হবার সমস্যা কী জানেন? এক্সটারনাল প্রব্লেমের থেকে ইন্টারনাল প্রবলেম নিয়ে বেশি জেরবার থাকতে হয়”।

চিফ ৪ বললেন “আর্মি যতদিন দেশের চার্জে আছে জনাব, ততদিন আমাদের ইন্টারনাল প্রবলেম নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না”।

নিয়াজি লাল চোখে চিফ ৪ এর দিকে তাকিয়ে বললেন “তাই নাকি? তো আপনিই বলুন তো, আমার ওপর অ্যাটাকটা কারা করেছিল সেটা বের করা গেছে”?

চিফ ৪ আমতা আমতা করে চুপ করে গেলেন।

নিয়াজি বললেন “আই এস আই নিয়ে আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে। আর্মির সঙ্গে ইন্টেলিজেন্সের সিনক্রোনাইজেশন প্রবলেম হচ্ছে। কমিউনিকেশন গ্যাপও আছে। নইলে কাশেম সোলেমানীর সঙ্গে সরফরাজ নিয়মিত মিট করত আমরা জানতামই না? এটা মেনে নেওয়া যায়?”

সবাই চুপ করে বসে রইলেন উত্তর দিতে না পেরে।

নিয়াজি বললেন “ইন্ডিয়া পাকিস্তান মৈত্রী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করছি। বিসিসিআই মেনেও নিয়েছে”।

চিফ ১ বললেন “ওই সময়টা আমরা ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টারকেও ইনভাইট করতে পারি স্যার”।

নিয়াজি বললেন “গুড। কালকেই ফোন করছি। দুশমন যত কাছে থাকে, তার ওপরে নজর রাখা তত সুবিধা”।

চিফ ২ বললেন “ওই সময়টা একটা ব্লাস্ট করবেন নাকি কোন একটা শহরে?”

নিয়াজি চিফ ২ এর দিকে তাকিয়ে বললেন “পাকিস্তানের সিটিতে? আর ইউ ক্রেজি?”

চিফ ২ মাথা নাড়িয়ে বললেন “না না, ইন্ডিয়ান সিটিতে। ইন্ডিয়াতে অ্যাটাক হলেই খেলাটা জমবে। প্রাইম মিনিস্টার আর ক্রিকেট টিম এখানে আর ইন্ডিয়ান সিটিতে অ্যাটাক। দ্যাট উইল বি আ গ্রেট জোক”।

নিয়াজি বললেন “কে করবে অ্যাটাক?”

চিফ ২ হাসলেন “আপনি বলুন জনাব, বাকিটা আমরা দেখে নেব”।

নিয়াজির গ্লাস খালি হয়ে গেছিল। নিজের পেগ নিজেই বানাতে বানাতে বললেন “খেলার মাঝে হলে টিম নিয়ে চলে যেতে পারে ওরা। সেটা হলে পিসিবির লস হবে। আফটার সিরিজ করলেই ভাল হয়”।

চিফ ২ বললেন “সেক্ষেত্রে আমরা ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টারকে শেষের দিকে আমন্ত্রণ করি”।

নিয়াজি চিন্তিত মুখে বসে বসে গ্লাস শেষ করতে লাগলেন।

১৮

সকাল ছ'টা।

অনন্তনাগ, কাশ্মীর। আর্মি ক্যাম্প।

তীব্র শীত। হিমাংকের নিচে নেমে গেছে তাপমাত্রা।

মাথুর জমে যাচ্ছিলেন শীতে। নিজের তাবুতে কোনমতে খাট থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখলেন জওয়ানরা ফুটবল খেলছে। বেশ কয়েকজনের পরনে শুধু স্যান্ডো গেঞ্জি আর শর্টস। মাথুর অবাক হয়ে সেদিকে তাকালেন।

অবন্তী কফি খাচ্ছিলেন মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে।

মাথুর কাঁপতে কাঁপতে অবন্তীর পাশে গিয়ে বললেন “এই ঠান্ডায় ফুটবল খেলছে কী করে বলুন তো এরা? তাও এই ড্রেসে?”

অবন্তী হাসলেন “আমিও খেলেছি তো এককালে। আপনি খেলবেন নাকি?”

মাথুর আঁতকে উঠে বললেন “ক্ষেপেছেন? আমি এই শীতেই মরে যাচ্ছি”।

অবন্তী বললেন “এখানকার নিয়ম হচ্ছে শীত আপনাকে দখল করার আগে আপনার কাজ হল শীতের দখল নেওয়া”।

মাথুর বললেন “যা বলেছেন। আমরা টাকা দিয়ে হলে সুপারহিরো দেখতে যাই কিন্তু সত্যিকারের সুপারহিরোরা খুব কাছেই আছে। বুঝতে পারি না”।

অবন্তী মাথুরকে একটা কফি মাগ দিলেন। মাথুর বললেন “আব্বাসের কোন খবর পাওয়া গেল?”

অবন্তী বললেন “নাহ। এই মুহূর্তে কিছু পাওয়া যায় নি। একবারে গা ঢাকা দিয়ে দিয়েছে আবার”।

মাথুর চিন্তিত গলায় বললেন “ওকে যে করেই হোক ধরতে হবে অফিসার। হি ইজ দ্য টাফেস্ট গাই”।

অবন্তী বললেন “সে তো আমিও বুঝি, কিন্তু কাশ্মীরের এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে যদি এখানকার লোকজনই ওকে লুকিয়ে রাখে তখন আমাদের আর কী করার থাকতে পারে?”

মাথুর বললেন “হয়ত তুষার স্যার কিছু বুদ্ধি দিতে পারবেন”।

তুষারের নাম শুনে অবন্তীর মুখে চওড়া হাসি খেলল “তা ঠিক। তুষার কাশ্মীরে এলে ভালও লাগত। বহুদিন দেখা হয় না ওর সঙ্গে”।

মাথুর কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন “আসবেন হয়ত স্যার। আমাকে ওই জন্যই পাঠিয়েছেন অবস্থা দেখে রিপোর্ট পাঠাবার জন্য। আসলে রেহানের মার্ডার হওয়াটা আমাদের জন্য একটা বিরাট সমস্যা হয়ে গেছে। হি ওয়াজ ওয়ান ম্যান আর্মি। দ্যাট বাস্টার্ড ইসমাইল!”

অবন্তীর চোয়াল শক্ত হল “চিন্তার কিছু নেই মাথুর, এই মুহূর্তে সড়ক পথ দিয়ে যাতে ইসমাইল ফস্কে না যেতে পারে তার ব্যবস্থা করছি”।

মাথুর বললেন “আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না ইসমাইল এরকম ছুটকো ছাটকা সমস্যা তৈরী করতে এ পারে এসেছে। ওর আরও বড় কোন প্ল্যান আছে”।

একজন জওয়ান ফুটবলে জোরে শট করেছিলেন। বলটা গড়াতে গড়াতে মাথুরের কাছে চলে এসেছিল। মাথুর এক শটে সেটা মাঠে ফেরত পাঠালেন।

অবন্তী বললেন "বাহ, আপনি তো ভালই শট মারতে পারেন"।
মাথুর বললেন "সে খেলতাম এককালে কলেজ লাইফে"।
অবন্তী বললেন "খেলা চালিয়ে যেতে পারতেন। বাই দ্য ওয়ে, আপনি ঠিকই বলেছেন, ইসমাইল এসব ছুটকো ছাটকা সমস্যা তৈরী করতে এ পারে আসে নি। আমি শুনেছি ও একটা মারাত্মক লেভেলের সাইকো। ওর লক্ষ্য আরও ভয়াবহ কিছু"।
মাথুর বললেন "সাইকো না হলে কেউ অন্য দেশের লোকেদের মারার জন্য এত রিস্ক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? আপনি ভাবুন না, কেউ কেউ এখন চেষ্টা করছে কী করে মানব সভ্যতার জন্য ভাল ভাল ওষুধ বের করা যাবে, কেউ চেষ্টা করছে জানার জন্য বাইরের কোন গ্রহে প্রাণ আছে কী না, আর এই ইসমাইলের মত লোকগুলো চেষ্টা করছে ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করতে। কোথাকার শিক্ষা বলুন তো এসব?"
অবন্তী বললেন "দু বছরের বাচ্চাকে মানব বোমা হিসেবে ব্যবহার করে। এদের নিয়ে আর কী বলব!"
হঠাৎ বাইরে থেকে ফায়ারিং এর শব্দ ভেসে এল।
জওয়ানরা সঙ্গে সঙ্গে খেলা থামিয়ে দিলেন।
মাথুর অবাক হয়ে বললেন "কী হল?"
অবন্তী কফি মাগ রেখে বললেন "বুঝতে পারছি না। দেখতে হবে। চেক পোস্ট থেকে শব্দটা আসছে। আপনি এখানেই থাকুন। দেখছি"।
অবন্তী দৌড়লেন চেক পোস্টের দিকে। ক্যাম্পগুলো থেকে মুহূর্তের মধ্যে জওয়ানেরা বেরিয়ে চেক পোস্টের দিকে দৌড়ে গেলেন।
মাথুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

১৯

মিনিকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে।
মিনি অদ্ভুত রকম শান্ত হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে কোন কথা বলছে না।
ডাক্তারবাবু নার্ভের ওষুধ দিয়ে রেখেছেন।
বীরেন সকাল থেকেই ড্রয়িং রুমে বসে ছিল।
ফোন বেজে ওঠায় চমকে উঠে দেখল তুষার ফোন করছেন।
বীরেন ধরল "হ্যাঁ স্যার"।
তুষার বললেন "কী খবর ওদিকে?"
বীরেন বলল "বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে স্যার"।
তুষার বললেন "আমি আধঘন্টার মধ্যে পৌছচ্ছি। তুমি ওখানেই থেকো"।
বীরেন বলল "শিওর স্যার"।
ফোন রেখে বীরেন কাগজে মন দিল। এ বাড়িতে সকালে আসে, রাতে অফিস কোয়ার্টারসে চলে যাবে আপাতত ঠিক ছিল। তুষার আসায় কী হবে ঠিক নেই। ভেতরের ঘর থেকে মিনির মা এবং কাকীমার গলা ভেসে আসছে। মিনি খাচ্ছে না। চুপ করে বসে আছে। মিনির মা অনিন্দিতা বাইরে এলেন কিছুক্ষণ পরে। তাকে দেখে বললেন "ওহ, আপনাকে কিছু দেওয়া হয় নি। একটু বসুন প্লিজ আমি ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাচ্ছি"।
বীরেন শশব্যস্ত হয়ে বলল "না না, প্লিজ আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমি খেয়েই এসেছি"।

অনিন্দিতা কুণ্ঠিত মুখে বললেন “এরকম তো আমাদের বাড়িতে কোন দিন হয় নি। কেউ না খেয়ে বসে থাকবে আমাদের বাড়িতে এসে, আমরা ভাবতেও পারি না। কিন্তু কী করি বলুন, কেমন একটা ঝড় এসে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে চলে গেল আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই”।

বীরেন বলল “আমি বুঝতে পারছি। আমার জীবনটাও তো এ ক'দিনে পুরো পালটে গেল। আমি তো নিজে স্বপ্নেও কোন দিন ভাবতে পারি নি এরকম কিছু হতে পারে”!

অনিন্দিতা বললেন “মেয়েটা কিছুতেই খাচ্ছে না। এরকম চললে বাঁচাতে পারব না। মানুষ কী করে এত ভয়ংকর হতে পারে আমি বুঝে উঠতে পারি না”।

বীরেন উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অনিন্দিতা বললেন “আমি চা করছি”।

ভেতরের ঘরে চলে গেলেন অনিন্দিতা।

কিছুক্ষণ পরেই তুষার এলেন একটা সাদামাটা গাড়িতে। বীরেনই দরজা খুলল। তাকে দেখে তুষার বললেন “কোন সিকিউরিটি কনসার্ন আছে?”

বীরেন বলল “এখন অবধি সেরকম কিছু দেখতে পারি নি স্যার”।

তুষার বললেন “নজর রেখো, আমরাও সতর্ক আছি। ওদের আক্রোশ মনে হয় না এত সহজে যাবে। আচ্ছা মেয়েটি কোথায়?”

বীরেন বলল “ভেতরে আছে”।

তুষার ভেতরের ঘরের দরজায় নক করলেন।

অনিন্দিতা তুষারকে দেখে অবাক হয়ে বললেন “আপনি কি এখনই এলেন?”

তুষার বললেন “হ্যাঁ। মেয়ে কেমন আছে?”

অনিন্দিতা বললেন “সেই একই। খাচ্ছেই না। এরকম হলে কী করি বলুন তো?”

তুষার বললেন “কোথায় আপনার মেয়ে? আমি দেখতে চাই”।

অনিন্দিতা তুষারকে মিনির ঘরে নিয়ে এলেন।

তুষারের সঙ্গে বীরেনও ধীর পায়ে মিনির ঘরে ঢুকল।

মিনি তুষারকে দেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল।

তুষার হেসে একটা চেয়ারের ওপর বসে বললেন “বুঝলে মিনি, তোমাকে একটা গল্প বলি। গল্প না, সত্যি কথা। এই কিছুদিন আগের কথা। একটা স্লিপিং সেল এ দেশের বিভিন্ন জায়গায় একটার পর একটা সিরিয়াল ব্লাস্ট করছিল। আমাদের ইন্টেলিজেন্স মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। কী হবে! কে করছে এসব! প্রতিটা ব্লাস্টের টেকনিক অভূতপূর্ব। এত সূক্ষ্ম বোম আমরা কেউ আগেও দেখি নি। এয়ারপোর্ট স্ক্রিনিংএও ধরা সম্ভব নয় সেসব জিনিস। সেই কঠিন সময়টা আমাদের... শুধু আমাদের কেন, আমাদের গোটা দেশকে একটা মেয়ে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। শুধু সেই ভয়াবহ বিপদটা থেকে রক্ষা করে নি মেয়েটা, আমাদের সাহায্য করেছিল সব কিছু থেকে বেরোতে। মেয়েটা কে জানো নিশ্চয়ই তুমি?”

মিনি মাথা নিচু করল। দু চোখ দিয়ে তার জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। প্রতিমা বললেন “ওর ওপর বেশি চাপ দেবেন না অফিসার”।

তুষার মিনির দিকে তাকিয়ে বললেন “বিজয়ীদের ওপরে কখনও চাপ থাকে না ম্যাডাম। যারা যেতে, যারা দেওয়ালে পিঠ ঠেকতে ঠেকতে ফিরে আসতে পারে, যারা তাদের বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে একটা গোটা দেশকে বাঁচিয়ে দেয়, তারা কখনও হেরে যায় না। মিনি...”

মিনি কেঁপে উঠল।

অনিন্দিতা বললেন “ভয়ে শিউরে উঠছে এখনও”।

তুষার বললেন “ওকে নিয়ে চলুন”।

অনিন্দিতা অবাক হয়ে তাকালেন "কোথায়?"
তুষারের চোয়াল শক্ত হল "ওর আংকেলের কাছে"।

২০

আর্মি ক্যাম্পে বাইরে থেকে এসে উদ্দেশ্যহীনভাবে গুলি চালিয়ে পালাচ্ছিল দুজন যুবক। সেনারা তাদের ধাওয়া করেছিল। যুবক দুজন গুলি থামায় নি। অগত্যা তাদের পায়ে গুলি করতে হয়েছে। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অবন্তী মাথুরকে বললেন "লোকাল আইডি আছে। এরা দুজনই কাশ্মীরি। বয়স দেখুন, খুব বেশি হলে একুশ। কিংবা তাও না"।

মাথুর বললেন "কী করবেন এদের নিয়ে?"

অবন্তী বললেন "জেলে পাঠাতে হবে। শ্রীনগরে। আর্মস কোত্থেকে পাচ্ছে বুঝতে পারছেন আশা করি"।

মাথুর বললেন "ওরা শুধু একটা কেওস তৈরী করতে এসেছিল। পাকিস্তান চাইছে এই মুহূর্তে কাশ্মীর অশান্ত হয়ে উঠুক যাতে ওরা ঘোলা জলে মাছ ধরতে পারে। এরা সুস্থ হলে আমি এদের জেরা করতে চাই"।

অবন্তী বললেন "কত জেরা করবেন? জেরা করে করে ক্লান্ত হয়ে যাবেন। এরা সব ব্রেইনলেস ক্রিচার"।

মাথুর বললেন "করিডরগুলো তো জানতে হবে? কোথা থেকে এত আর্মস আসছে"!

অবন্তী বললেন "কাশ্মীর ছেয়ে গেছে এই ধরণের আর্মসে। আমরা প্রচুর তল্লাশি করি। প্রচুর আর্মস উদ্ধার করা হয়। তবু এরা হাল ছাড়ে না। পঙ্গপালের মত বাড়ছে সব কিছু"।

মাথুর চিন্তিত গলায় বললেন "সবাই তো আর বিরোধী হয়ে যায় নি। পাকিস্তানপন্থীও সকলে নয়। সব মানুষ কি খেতে পান? রোজগার আসে কোত্থেকে?"

অবন্তী বললেন "মূলত উলের ব্যবসা, কাঠের কাজ, আর পর্যটন শিল্পে চলে কাশ্মীর। উলের ব্যবসার সেই রমরমা আর নেই। আর এই ভায়োলেন্সের মরসুমে ক'টা পর্যটক আসবে বলতে পারেন?"

মাথুর বললেন "হু। সুতরাং অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে"।

অবন্তী বললেন "নেভার এন্ডিং হেট স্টোরি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের। যার ফলাফল একটা গোটা রাজ্যের মানুষের জীবন বরবাদ হয়ে গেল"।

অবন্তীর ফোন বাজছিল। অবন্তী কয়েক সেকেন্ড কথা বলে ফোন রেখে মাথুরের দিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় বললেন "ক্যাম্পের গেটের বাইরে লোকাল গ্যাদারিং হয়েছে। ছেলেদুটোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য"।

মাথুর বললেন "আপনারা কী করতে চাইছেন?"

অবন্তী ম্লান হেসে বললেন "যা আফস্পা চালু থাকা অবস্থায় করতে হয় তাই করব। বাইরে গিয়ে দেখে আসুন, মেয়ে বাচ্চা পুরুষ এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে। সবার আমাদের ওপর প্রবল ক্ষোভ"।

মাথুর বললেন "আর্মি ক্যাম্পে গুলি গালাজ করে চলে গেছে। এদের এত কথা শোনার কী দরকার? আমরা তো কাঁদানে গ্যাস ছেড়ে এদের শান্ত করতে পারি"।

অবন্তী বললেন "তাই করা হবে। এছাড়া আর কী করব? আমরা নিরূপায়"।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কড়া হাতে বিক্ষোভ দমন করা গেল। আর্মি রাস্তার দখল নিতে জনতা ছত্র ভঙ্গ হয়ে গেল।

মাথুর তুষারকে ফোন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। উদ্দেশ্যহীনের মত হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করলেন।

অবন্তী বললেন "আমার সামান্য হলেও সন্দেহ হচ্ছে ইসমাইলের ওপর। ও নিশ্চয়ই কোন প্ল্যান করে এটা করিয়েছে, আমরা সবাই এদের নিয়ে ব্যস্ত থাকব আর ইসমাইল ওর প্ল্যানে আমাদের ওপরে আরও বড় কোন অ্যাটাক করবে"।

মাথুর বললেন "সব ক'টা ক্যাম্পে খবর পাঠিয়ে দিন। সবাই যেন অ্যালার্ট থাকে। ছেলেদুটো সুস্থ হলেই ওদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে হবে। থার্ড ডিগ্রি হোক ফোর্থ ডিগ্রি হোক, ওদের ওপর সব প্রয়োগ করে পেট থেকে কথা বের করতে হবে।"।

অবন্তী বললেন "আমি মোবাইল টাওয়ারে জ্যামার বসিয়ে দিতে বলেছি সর্বত্র, যাতে এখান থেকে কোন রকম ফোন বাইরে না যায়। ওপার থেকেও কিছু আসতে পারে"।

মাথুর বললেন "ইসমাইল মোবাইল ইউজ করবে না। ওর কাছে নিশ্চয়ই আরও কোন ডিভাইস আছে যেগুলোর মাধ্যমে ও বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যেমন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ট্রাই করতে পারে, জাস্ট এক্সাম্পেল দিলাম, আরও অনেক কিছুই হতে পারে"।

অবন্তী বিষণ্নমুখে মাথা নেড়ে বললেন "শত্রুপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। অত্যাধুনিকও বটে। এদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য এদের লেভেলে নামতে হবে। নইলে কিচ্ছু হবে না"।

২১

জ্যোতির্ময়কে বসিয়ে রাখা হয়েছিল অন্ধকার ঘরে।

তুষার বললেন "আলো জ্বালাও"।

আলো জ্বলল।

তুষার ঘরের বাইরে থেকে দেখলেন আলো জ্বলার ফলে জ্যোতির্ময় খানিকটা চমকে চারদিকে দেখছেন। তুষার আশরফকে বললেন "আমি ভেতরে যাচ্ছি। মিনি এখানেই বসুক"।

মিনিকে একটা চেয়ারে বসানো হল।

অনিন্দিতাও এসেছেন। মেয়ের পাশে বসলেন।

তুষার ঘরের ভেতর গিয়ে বললেন "কেমন আছেন হাসান মাকসুদ?"

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে চোখ ছোট ছোট করে তাকালেন।

তুষার চেয়ার টেনে বসে বললেন "আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে"।

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকিয়েই রইলেন। কোন কথা বললেন না।

তুষার বললেন "বেনাপোল পেরিয়ে যশোর থেকে একটা নেটওয়ার্ক বানানো হয়েছে। নোয়াখালী, চট্টগ্রামে একটার পর একটা অস্ত্র কারখানা, যার ইনচার্জ আপনি। আপনার অবর্তমানে এই জায়গাগুলো কে চালাচ্ছে মিস্টার মাকসুদ?"

জ্যোতির্ময় বাঁকা হাসি হেসে বললেন "কারখানা আছে যখন জানেন, তখন কে চালাচ্ছে সেটাও আপনার জানা উচিত"।

তুষার পায়ের ওপর পা তুলে বললেন "আপনি আমাকে বিস্মিত করেছেন। একটা দেশের প্রতি ঠিক কতটা ঘেন্না থাকলে এই কাজগুলো করা যায় সেটাই ভাবছিলাম। আচ্ছা আপনি কখনও ভাবেন না নিরীহ মানুষদের মারলে আসলে কোন লাভ হয় না?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আমি আপনার সঙ্গে এই ব্যাপারে কোন কথা বলতে চাই না"।

তুষার বললেন "বেশ তো বলবেন না। আপনাকে বলতেও হবে না। আমার কাছে আপনি জবাব দিতে বাধ্যও নন। কিন্তু কারো কারো কাছে আপনাকে জবাব দিতেই হবে হাসান মাকসুদ"।

জ্যোতির্ময় রাগী গলায় বললেন "একমাত্র আমার উপরওয়ালার কাছে আমি জবাব দিতে বাধ্য। আর কারো কাছে নয়"।

তুষার কাঁচের জানলার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন।

অনিন্দিতা মিনিকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

জ্যোতির্ময় মিনিকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল।

বললেন "ওকে কেন এখানে নিয়ে এসেছেন? ও ছোট মেয়ে"।

তুষার হাসলেন "ছোট মেয়ে? এই ছোট মেয়েটাকেই আপনার লোকজন তুলে নিয়ে গেছে। অকথ্য অত্যাচার করেছে, ধর্ষণ করেছে। এখন আপনার মনে পড়ছে মিনি ছোট মেয়ে?"

মিনি আচ্ছন্নের মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তুষারের কথাগুলো শুনে শিউরে উঠে জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকাল। তুষার দেখলেন জ্যোতির্ময় মিনির চোখের দিকে তাকাতে পারছেন না। তুষার বললেন "তাকান হাসান মাকসুদ, এই ছোট মেয়েটার দিকে তাকান। আপনাকে তাকাতেই হবে। এই মেয়েটাকেই আপনি কোলে পিঠে করে বড় করেছেন, একই বাড়িতে থেকেছেন, একই সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছেন। আর নিজের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আপনি এই মেয়েটাকে নিজের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন,আপনি নিজেই বলুন তো কোনদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখার ইচ্ছা হবে আপনার?"

তুষারের কথা শেষ হবার আগেই সবাইকে চমকে দিয়ে মিনি জোরে একটা চিৎকার করে এগিয়ে গিয়ে জ্যোতির্ময়ের গালে সজোরে একটা চড় মারল। অনিন্দিতা দৌড়ে গিয়ে মিনিকে ধরলেন কিন্তু মিনিকে আটকানো যাচ্ছিল না। জ্যেঠুর দু গালে ক্রমাগত মারতে মারতে অবসন্ন হয়ে মাটিতে বসে পড়ল।

তুষার ইঙ্গিত করলেন, একজন মহিলা কর্মী ঘরে এলেন। তুষার বললেন "ওর মাকে সাহায্য করুন মেয়েটিকে বাইরে নিয়ে যেতে"।

মিনিকে ধরে নিয়ে দুজনে বাইরে গেলেন।

জ্যোতির্ময় বিধ্বস্ত হয়ে বসে ছিলেন। তুষার বললেন "কেমন লাগল হাসান মাকসুদ? খুশি হলেন?"

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "কাজটা আপনি ভাল করলেন না অফিসার। এর ফল ভুগতে হবে আপনাকে"।

তুষার ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন "আমরা তো চিরকাল ফল ভোগার জন্যই আছি। আপনারা আছেন আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। আপনি নিজেকেই প্রশ্ন করুন না হাসান মাকসুদ, ঠিক কী পেলেন আপনি এত কিছু করে? আপনার নিজের ছেলে গুলি খেয়ে মরেছে, আপনার স্ত্রীকে জেলে রাখা হয়েছে। আপনার ভাইয়ের মেয়েকে আপনারই লোকেরা অকথ্য অত্যাচার করে স্থবির বানিয়ে রেখে দিয়েছে। আপনার নিজের পরিবার বিধ্বস্ত। আর আপনি এখানে। আমার সামনে। কী পেয়েছেন আপনি? বলুন হাসান মাকসুদ, কী পেয়েছেন আপনি?"

জ্যোতির্ময় গম্ভীর গলায় বললেন "পার্থিব কিছু চাওয়া পাওয়া হারানোর জন্য আমরা তার কাজ করি না। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে বা মেরে ফেললে কিচ্ছু হবে না অফিসার। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি। এবার আপনারা কী করবেন ভেবে দেখুন"।

তুষার মাথা নাড়লেন "ঠিক। আপনি ঠিক বলেছেন। বেস্ট অফ লাক"।

ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরলেন তুষার। মিনিকে জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফেরানো হয়েছে। চুপচাপ বসে আছে মিনি। তুষার খানের দিকে তাকিয়ে বললেন "মাকসুদকে দিল্লি নিয়ে যাব। রেডি হও"।

২২

বীরেন অফিসের রিসেপশনে বসে ছিল। মিনিদের বাড়ি থেকে সে তুষারের সঙ্গে এসেছিল কিন্তু তুষার তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে মিনিদের নিয়ে ইন্টারোগেশন চেম্বারে গেছেন।

ফোনটা নিয়ে খেলছিল সে এমন সময় দেখল ফোনটা রিং হচ্ছে। আননোন নাম্বার। বীরেন ধরল "হ্যালো"।

"ভাল আছেন?"

"কে বলছেন?" অবাক হল বীরেন।

"বাংলাতেই তো জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর দিতে অসুবিধা হচ্ছে?"

বীরেন খানিকটা রাগল "কে বলছেন বলবেন তো?"

"আমাকে আপনি চিনবেন না। শুধু জেনে রাখুন, আপনাকে আমাদের দলে নেওয়ার জন্য হাসান সাহেবকে সুপারিশটা আমিই করেছিলাম"।

বীরেন বলল "মানে?"

ওপাশ থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে এল। বীরেন বলল "কী ইয়ার্কি মারছেন? ফোনটা রাখুন"।

"ইয়ার্কি মারব কেন বীরেনবাবু? আপনি তো আমাদের দলেরই লোক। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে এখন কো অপারেট না করেন তবে আপনার পরিবারের দায়িত্ব তো আর আমরা নিতে পারব না, কী হবে বলুন তো সেক্ষেত্রে?"

বীরেন ফোনের দিকে তাকাল। আননোন নাম্বার লেখা। কোন নম্বর দেখাচ্ছে না ফোনে। সে ফোনটা কেটে দিল।

রাখার সঙ্গে সঙ্গেই মেসেজ এল "মিনির সঙ্গে যে ব্যাপারটা হয়েছে যদি আপনার বোনের সঙ্গে আমরা করি, সামলাতে পারবেন তো?"

বীরেনের একটা হার্টবিট মিস হল।

সে উঠতে যাচ্ছিল এমন সময় পরের এস এম এসটা এল "ভুলেও কাউকে বলার চেষ্টা করবেন না। অফিসের বাইরে গিয়ে ফোনটা ধরুন"।

বীরেন ঘামছিল।

অফিস থেকে বেরোল। ফোনটা রিং হতে শুরু করল তার।

ধরল সে, "কে বলছেন আপনি?"

"কে বলছি আমি সেটা ইম্পরট্যান্ট নয়। ইম্পরট্যান্ট হল কেন ফোন করেছি"।

বীরেন বলল "বলুন... কী বলবেন?"

"আপনাকে আজ দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে। সঙ্গে আশরফ খান এবং তুষার রঙ্গনাথন যাবেন। জানেন আপনি?"

বীরেন অবাক গলায় বলল "না, জানি না"।

ওপাশে কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পরে ভেসে এল "আপনার কাজ বেশি না, আপনাদের অফিসের বাইরে দেখুন একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, নাম্বার হল ডব্লু বি জিরো টু নাইন টু থ্রি সিক্স, দেখতে পাচ্ছেন?"

বীরেন ট্যাক্সিটাকে দেখতে পেল, বলল "হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি"।

"ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসুন। ড্রাইভার আপনাকে একটা ছোট মোবাইল দেবে। আপনার কাজ হল সেটা হাসান মাকসুদের কাছে পৌছনো"।

বীরেন বলল "আমি কী করে পৌঁছবো?"

"সেটা তো আমি আপনাকে বলে দেব না। আপনাকেই বের করতে হবে। মিনির এখন অবস্থা দেখেছেন তো? তার চেয়েও খারাপ অবস্থা আপনার বোনের হতে পারে। আরবের শেখেদের কাছে একবার বিক্রি হয়ে গেলে বুঝতেই পারছেন কী দশা হতে পারে। বেস্ট অফ লাক"।

ফোনটা কেটে গেল।

রাস্তার মাঝখানে বীরেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে সোজা ট্যাক্সিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখা মাত্রই ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিল। বীরেন জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকল "ও দাদা কিছু দেওয়ার আছে?"

ট্যাক্সিচালক জানলা দিয়ে একটা ফোন তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেশ স্পিডে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বীরেন চারদিকে তাকাল। কেউ তাকে দেখছে না দেখে মোবাইলটা হাতে নিল।

সাধারন একটা কিপ্যাডওয়ালা কম দামী ফোন। আবার চারদিকে দেখে বীরেন ফোনটা নিয়ে অফিসে ঢুকল।

হৃদস্পন্দন বাড়ছিল তার। পীযুষ বেরোচ্ছিলেন অফিস থেকে। বীরেনকে দেখে হাসলেন "কী ব্যাপার বীরেন? কেমন আছো?"

বীরেন হাসল কোন মতে। পীযূষ বললেন "তোমাকে মনে হয় দিল্লি যেতে হবে আজকে। স্যার বলছিলেন। সাবধানে থেকো। কলকাতা এলে দেখা হবে আবার"।

বীরেন বলল "শিওর স্যার"।

পীযূষ বেরিয়ে গেলেন। বীরেন সোফায় বসে চোখ বন্ধ করল।

কিছুক্ষণ পরে অনিন্দিতা মিনিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মিনিকে দেখা মাত্রই মিনির মুখের পাশাপাশি বোনের মুখটাও মনে পড়ে গেল বীরেনের। চোয়াল শক্ত হল তার। সোফা থেকে উঠে তুষারের চেম্বারের দিকে রওনা দিল। চেম্বারের দরজা বন্ধ ছিল।

বীরেন দরজায় টোকা দিল। তুষার দরজা খুলে তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন "তোমার তো অপেক্ষা করার কথা ছিল"।

বীরেন বলল "একটু কথা ছিল স্যার"।

তুষার বললেন "ভেতরে এসো"।

বীরেন ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল জ্যোতির্ময়কে তুষারের ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। জ্যোতির্ময় তার দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "তুমি আমাদের সঙ্গে দিল্লি যাচ্ছ"।

বীরেন বলল "আপনার সঙ্গে কথা ছিল স্যার"।

জ্যোতির্ময় বীরেনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে জোরে হেসে উঠলেন।

২৩

ভোরবেলা। লাহোর বাস স্ট্যাণ্ডে সার দেওয়া অটো আর বাস দাঁড়িয়ে আছে।

বিলাল করাচীগামী বাসের পাশে অটো দাঁড় করিয়ে বলল "কী করবে বল"।

সায়ক চারদিকে তাকাল। এখনও ভাল করে আলো ফোটে নি। লোকজনের ব্যস্ততা অবশ্য শুরু হয়ে গেছে।

আব্বাস বলল "কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে নিয়ে এলে মিয়াঁ, এবার কী করবে ঠিক কর তাড়াতাড়ি। বাসে একটা জায়গা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। যেখানে নিয়ে যাবে, যাব, আর কী করব"।

বিলাল বলল “এসি বাস আছে করাচীর। ওতে চলে যাও”।

সায়ক বিলালের দিকে কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে তাকিয়ে বলল “কিন্তু ওঁরা আর্মসগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বল তো?”

বিলাল হাসল। বলল “আমি জানি তুমি এত সহজে এখান থেকে যাবে না। চল তবে”।

বিলাল অটো স্টার্ট দিল। আব্বাস অবাক গলায় বলল “কোথায় যাচ্ছি? এই যে বলছিলে পাকিস্তানী আর্মি আমাদের ফলো করতে পারে”?

বিলাল কোন কথা বলল না। সায়ক আব্বাসের দিকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করল চুপ করে যেতে।

বেশ খানিকক্ষণ অটো চালিয়ে বিলাল একটা বস্তির মুখে এসে অটো থামাল। বিলাল নামতে সায়কও অটো থেকে নেমে বিলালকে অনুসরণ করতে করতে আব্বাসকে বলল “এসো জলদি”।

ঘুপচি ঘুপচি ঘর, প্রবল দুর্গন্ধের মধ্যে দিয়ে মিনিট খানেক হাঁটার পর বস্তির অপরপ্রান্তে একটা গ্যারেজের সামনে এসে হাজির হল তারা। বিলাল পকেট থেকে চাবি বের করে গ্যারেজটা খুলে একটা গাড়ি বের করল।

আব্বাস বলল “এ আবার কী?”

সায়ক বলল “কথা না বলে গাড়িতে উঠে বস”।

আব্বাস প্যাঁচা মুখ করে গাড়িতে উঠল।

বিলাল গাড়ি গ্যারেজ থেকে বের করে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিল।

আব্বাস বলল “নিশ্চয়ই আমরা তাজের কাছে যাচ্ছি?”

সায়ক হাসল “এই তো তুমি বুদ্ধিমান হয়ে গেছ”।

আব্বাস রাগী গলায় বলল “মারওয়াগে ক্যা? পাকিস্তান আর্মি দেখে নেয় যদি?”

সায়ক বলল “দেখলে দেখবে। কী হবে খুব বেশি হলে? মরে যাবে। তার থেকে আর খারাপ কী হবে?”

আব্বাস বলল “হুহ, সত্যিই তো, সিয়াচেনের উদাহরণ দাও নি আমার আব্বুর ভাগ্য ভাল”।

ভোরের রাস্তা ফাঁকাই ছিল। হোটেল তাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাড়িটা পার্ক করল বিলাল।

দুটো আছে হোটেলের নীচে। একটা ট্রাকে আর্মস লোড করা হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টায় আর্মির লোকেরা নিঃশব্দে গাড়ির মধ্যে আর্মস তুলছিল। সায়ক ফিসফিসিয়ে বলল “ফারমান আলী নিজে এসে তদারকি করছে দেখছি”।

বিলাল বলল “হ্যাঁ, পাক-কাশ্মীরে যাবে ট্রাকগুলো সম্ভবত”।

সায়ক বলল “লস্কর ক্যাম্পে?”

বিলাল বলল “হ্যাঁ”।

সায়ক বলল “লস্করকে এভাবে আর্মস পৌঁছে দিয়ে এদের লাভ কী হচ্ছে?”

বিলাল কাঁধ ঝাঁকাল “আল্লাহ জানে”।

তাদের নজর সামনের দিকে ছিল। হঠাৎ তাদের চমকে দিয়ে একটা মিলিটারি জিপ গাড়ির পাশে দাঁড়াল। আব্বাস ভয়ার্ত গলায় বলল “মর গয়ে”।

বিলাল বলল “একটাও কথা বোল না,আমি দেখছি”।

একজন সেনা এসে গাড়ির কাঁচে নক করল। বিলাল কাঁচ নামিয়ে বলল “জি জনাব?”

সন্দিগ্ধ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে জওয়ান বলল “কী হচ্ছে এখানে?”

বিলাল বলল “হোটেলে বন্ধুকে নিতে এসেছি জনাব, স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসব”।

“কোন হোটেলে?”

বিলাল পাশের হোটেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল “কোয়ালিটি হোটেলে জনাব”।

জওয়ান বলল “কাহা হে তেরা দোস্ত?”

বিলাল বলল “হোটেলে আছে। ওয়েট করছি। আসবে এখনই”।

জওয়ান কিছুক্ষণ তার দিকে চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে নিজেদের জিপের দিকে ঘুরল।

সায়ক গলা নামিয়ে বলল “গাড়ি স্টার্ট দাও। এখনই”।

বিলাল ঘাবড়ে গেছিল খানিকটা। সায়ক বিলালের হাত ধরে নাড়া দিল। জওয়ান গাড়িতে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কিছু কথা একটা মনে হল তার। বিলাল গাড়ি স্টার্ট দিতেই হই হই করে উঠল।

বিলাল কোন দিকে না তাকিয়ে প্রবল বেগে গাড়ি ছোটাল। জিপের লোকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেকটা এগিয়ে গেছিল তাদের গাড়ি, কিন্তু একটু সামলে নিয়ে জিপটা তাদের ধাওয়া করল। আব্বাস ভয় পেয়ে বলল “এবার কী হবে?”

সায়ক বলল “চুপ করে বসে থাকো”।

বিলাল গাড়ির গতিবেগ বাড়াল।

বলল “গাড়িটার মায়া ত্যাগ করতে হবে মিয়াঁ। চল তাই সই”।

কিছুক্ষণ পরে বিলাল একটা গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল “চল”।

তিনজনে বেশ খানিকক্ষণ দৌড়নোর পর একটা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল।

২৪

দরজা খোলা ছিল। তিনজন দরজা ঠেলে ঢুকলে বিলাল দরজা ভেজিয়ে বলল “এসো”।

একটা সংকীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি। বেশ খানিকটা উঠে একটা করিডর এল।

করিডর বরাবর বেশ খানিকটা যাওয়ার পর একটা দরজার সামনে এসে বিলাল পকেট থেকে চাবি বের করে দরজাটা খুলল।

বোঝা যাচ্ছে ঘরটা পরিত্যক্ত। প্রচুর ধুলো। বিলাল দরজা খুলে রাখল কিছুক্ষণ। আব্বাস হতভম্ব গলায় বলল “এখানে থাকব কী করে?”

সায়ক নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলল “তোমার জন্য ফাইভ স্টার হোটেলের ব্যবস্থা করছি। আপাতত এখানেই সেঁধিয়ে যাও”।

মিনিট পাঁচেক পরে বিলাল দরজা বন্ধ করল। মেঝেতে পুরু ধুলো। সায়ক বলল “কার ঘর এটা?”

বিলাল বলল “এক বুড়ির ছিল। তার গাড়ি চালাতাম। বুড়ির তিন কূলে কেউ নেই। মরে যাবার আগে চাবি দিয়ে গেছিল। আসা হয়ে ওঠে না”।

আব্বাস বলল “বুড়ি ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠত কী করে?”

বিলাল বলল “উঠত কোথায় আর? শেষ জীবনে বহুদিন নামে নি। আমিই খাইয়ে দিয়ে যেতাম”।

আব্বাস বলল “বোঝ! ভারতীয় এজেন্ট এসে পাকিস্তানি বুড়িকে খাইয়ে দিয়ে যেত”।

বিলাল হাসল “মায়ের আবার ভারত পাকিস্তানি কি মিয়াঁ? তাছাড়া বুড়ি না থাকলে আজ কোথায় লুকোতে বল দেখি?”

সায়ক বলল “আমার পুনর্জন্ম পাকিস্তানি বাবা মায়ের হাতেই আব্বাস। দেশ তো মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু কখনও কখনও সত্যিকারের মানুষ হওয়ারও দরকার পড়ে”।

আব্বাস অধৈর্য হয়ে বলল “সব বুঝলাম কিন্তু এবার কী করব আমরা সেটা তো বল”।

সায়ক বলল “আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তবে পাকিস্তানি সেনা এতক্ষণে বুঝে গেছে আমি লাহোরেই আছি। আমাদের এখানে কিছু দিন চুপ করে বসে থাকতে হবে”।

আব্বাস বলল "তখন গাড়ি চালাবার দরকারটা কী ছিল হে? গাড়ি না চালালে জীবনেও বুঝতে পারত ওরা আমরা ওখানে আছি?"

সায়ক একটা টাওয়েল জোগাড় করে সোফা ঝেড়ে তার ওপর শুয়ে পড়ে বলল "আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল ব্যাটা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়ি থেকে নামাত। আর আমার সিক্সথ সেন্স খুব একটা ভুল করে না"।

বিলাল বলল "তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সকাল হোক, আমি দেখছি কী করা যায়"।

সায়ক বলল "কিচ্ছু করতে হবে না। অন্তত আজ সকালটা তো কোন প্রশ্নই নেই। ওরা এই চত্বরে কড়া নজর রাখবে"।

বিলাল বলল "কিচ্ছু হবে না। বুড়ির বোরখা আছে, আমি সেটা পরে খাওয়ার নিয়ে আসব"।

সায়ক আগ্রহী গলায় বলল "বোরখা আছে? তাহলে এখানে থাকার কী দরকার? আমরা আমাদের ঘাটিতে পৌঁছে যেতে পারি তো আরামসে"।

আব্বাস রেগে গিয়ে বলল "তোমার সাহস আছে বটে মিয়াঁ। এই কিছুক্ষণ আগে ব্যাটাদের গুলি থেকে কোন মতে বাঁচলে, আবার এখনই বলছ নতুন অ্যাডভেঞ্চারে নেমে পড়বে"।

সায়ক মাথা নেড়ে বলল "অ্যাডভেঞ্চারের কিছু নেই। আমাদের এখানে শুধু নিজেদের বাঁচিয়ে রাখলে চলবে না, অস্ত্রগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটাও জানতে হবে। বিলাল, তুমি বুড়ির বোরখা বের কর"।

বিলাল বুড়ির আলমারি ঘেটে বেশ কয়েকটা বোরখা বের করল।

সায়ক বোরখার দৈর্ঘ্য দেখে বলল "বিলাল তোমার লাহোরী মা ইনশাল্লাহ ভালই লম্বা ছিলেন। এক্কেবারে আসল জিনিস পেয়ে গেছি। চল তৈরী হওয়া যাক"।

আব্বাস গাই গুই করতে করতে বোরখা পরল।

ঘন্টাখানেক পরে তারা রাস্তায় নামল। রাস্তার মোড়ে সেনার গাড়ি টহল দিচ্ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তাদের কেউ সন্দেহ করল না। একটা অটো নিয়ে বিলালের বস্তিতে পৌঁছল। বস্তির ভেতর বেশ কয়েকটা ঘর পেরিয়ে বিলাল তাদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে হাঁফ ছেড়ে বলল "এবার বোরখা ছাড়তে পারো"।

আব্বাস বোরখা ছেড়ে মেঝেতে লম্বা হয়ে বলল "আল্লাহ!!! জীবন বের করে দিয়েছিল! অটোওয়ালা কেমন কেমন করে তাকাচ্ছিল! সন্দেহ করছিল নির্ঘাত"।

সায়ক বোরখা খুলে হাসতে হাসতে বলল "সেটাই স্বাভাবিক। যে বেশি ভয় পায়, তার প্রতিই সন্দেহটা বেশি হয়। এত ওভার অ্যাক্টিং করার কী দরকার ছিল?"

বিলাল বলল "আধঘন্টা সময় নিচ্ছি। একটা গাড়ির জোগাড় করছি। আমাদের মুজফফরাবাদ বেরোতে হবে"।

সায়ক বিলালের দিকে তাকিয়ে হাসল, "তার আগেই রেডি হয়ে যাচ্ছি"।

২৫

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ইকবাল আখতারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে প্রেসিডেন্ট হাউজে। ইকবাল আখতার এককালে বাঁ হাতি স্পিনার ছিলেন। তবে তার ক্রিকেট কেরিয়ার বেশি দিন দীর্ঘায়িত হয় নি। ইংল্যান্ডের সঙ্গে টেস্টের সময় বাঁ হাতের আঙুলে চোট পেয়ে খেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ক্রিকেট প্রশাসনে এসে দ্রুত উন্নতি করেন।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজিকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ইকবাল।

নিয়াজি নিজে বসে ইশারায় ইকবালকে বসতে বললেন। ইকবাল সালাম জানালেন। নিয়াজি বললেন "দেশের ক্রিকেটের কী হাল মিস্টার আখতার?"

ইকবাল বললেন "সমস্যায় আছে জনাব। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড কেউই পাকিস্তানে আসতে চায় না। আবুধাবি কিংবা দুবাইতে খেলা তো হয় কিন্তু তাতে আমাদের বোর্ডের তো কোন লাভ হচ্ছে না"।

নিয়াজি হাসলেন "সে কারণেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি চাইছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইন্ডিয়ার সঙ্গে একটা টেস্ট আর ওয়ান ডে সিরিজ শুরু করতে"।

ইকবাল অবাক হয়ে নিয়াজির দিকে তাকিয়ে বললেন "ইন্ডিয়া? ওরা কোন দিন রাজি হবে না জনাব"।

নিয়াজি বললেন "ঠিক রাজি হবে। আমরা তো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে এই সিরিজটা করার প্রস্তাব পাঠাব না। আপনি পাঠাবেন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ডকে। টিভি স্বত্ব, অ্যাড, হাইপ এই সব কিছু থেকে দুটো বোর্ড অর্থনৈতিকভাবে কত লাভবান হবে সে সম্পর্কে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ড কনভিন্স হলে ওরাই সব ব্যবস্থা করে নেবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে না"।

ইকবাল একটু ভেবে বললেন "সেটা আপনি ঠিকই বলেছেন জনাব কিন্তু এই সফর চলাকালীন এদের সিকিউরিটির পুরো দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। একটা কিছু হলে গোটা দুনিয়া আমাদের ছেড়ে কথা বলবে না"।

নিয়াজি মাথা নাড়লেন "কিচ্ছু হবে না। অন্তত পাকিস্তান সেনাবাহিনী যতক্ষণ দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে ততক্ষণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন রকম সমস্যা তৈরী হলে সেসব আমি দেখে নেব"।

ইকবাল বললেন "ক্রিকেট ক্যালেন্ডার দেখতে হবে জনাব। ইন্ডিয়ার কার কার সঙ্গে খেলা আছে সেসব দেখতে হবে। আমাদের সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুর আছে, তারপরেই নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আবুধাবিতে টেস্ট সিরিজ। অন্তত এক বছরের আগে কি সব কিছু অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব হবে?"

নিয়াজি বললেন "আপনি প্রপোজাল রেডি করুন। স্পন্সরদের সঙ্গে বসুন, তাদের সঙ্গে কথা বলে এই সিরিজের ফলে দুটো বোর্ড কতটা আর্থিক সুবিধা পাবে সে সব ডেটা ওদের জানান। ইন্ডিয়ান বোর্ড এত বোকা না যে এই ব্যাপারটা এত সহজে উড়িয়ে দেবে। আমিও ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি মিট করব। আমাদের তরফ থেকে এল ও সিতে এখন যেন কোন রকম কোন উত্তেজনা তৈরী না হয় সেটাও দেখব। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়াকে যে করেই হোক এই সিরিজটা খেলার ব্যাপারে রাজি করাতে হবে"।

ইকবাল গলা খাকরিয়ে বললেন "জনাব আপনার বিচার বিবেচনার ওপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে কিন্তু আপনার কি মনে হয় না বর্তমান পরিস্থিতিতে এত বড় ইভেন্ট হোস্ট করা আমাদের পক্ষে সমস্যা হতে পারে?"

নিয়াজি বললেন "একেবারেই না। আমি তো কোন কোন শহরে খেলা হবে সেটাও ভেবে রেখেছি। পেশোয়ার, লাহোর আর করাচিতে তিনটে টেস্ট হবে। পাঁচটা ওয়ান ডে আর দুটো টি টুয়েন্টি। প্রত্যেকটা পিচে পুরু ঘাস থাকবে, ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানদের তো যাবতীয় জারিজুরি ফ্ল্যাট ট্র্যাকে হয়। দেখব বাউন্সি ট্র্যাকে কেমন দম তাদের"।

ইকবাল এবার একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে বললেন "জনাব যে ক্রিকেট খুব পছন্দ করে সেটা শুনেছিলাম, এবারে বুঝতে পারলাম"।

নিয়াজি বললেন "আমি খেলতেও পছন্দ করতাম। ক্রিকেট না থাকলে আজ আমি বেঁচেও থাকতাম না মিস্টার আখতার। সেদিন যদি পার্কে আমি গাড়ি থেকে নেমে খেলতে না যেতাম তাহলে হয়ত..." নিয়াজি অন্যমনস্ক হলেন।

ইকবাল বললেন "ঠিক আছে জনাব, আগামী সপ্তাহেই জোহানেসবারগে আইসিসির সভা আছে, সেখানে ইন্ডিয়ান বোর্ড প্রেসিডেন্টকে আমি প্রস্তাবটা দিচ্ছি"।

"আগামী সপ্তাহে জোহানেসবারগে না, আগামী কাল ফোনেই বলবেন"। নিয়াজি ঠান্ডা গলায় বললেন।

ইকবাল চমকে তাকালেন।
নিয়াজি বললেন “আপনি কালকেই প্রস্তাব পাঠিয়ে আমাকে জানাবেন”।
ইকবাল মাথা নাড়লেন “জি জনাব। যা বলবেন”।

২৬

রুটি নিয়ে এসেছে বিলাল। প্লেটে সব্জির সঙ্গে সেগুলো তিনভাগ করে বলল “খেয়ে নাও। আমি দেখছি কী করা যায়। আর্মি টহল আছে শহরে আজকে বেশি মাত্রায়। এখন বেরোলে ধরা পড়ে যাব”।

সায়ক বলল “সে তো বুঝতেই পারছি। সমস্যা হল অন্তত এটুকু যদি জানতে পারতাম এরা ঠিক কী প্ল্যান করে রেখেছে, তাহলেও শান্তি পেতাম”।

আব্বাস রুটি খেতে খেতে বলল “শোন মিয়াঁ, একটা খুব সিম্পল কথা শোন। পাকিস্তান একটা টেরোরিস্ট কান্ট্রি। এরা এসব পাক কাশ্মীরে পাঠাবে কাশ্মীরে আরও সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে। ব্যস। এটা নিয়ে তো এত চিন্তার কোন কারণ নেই”।

সায়ক বলল “সেটা হলে তাও একটা পয়েন্ট এস্টাব্লিশ হয়। কিন্তু সেটা যদি না হয়? এদের প্ল্যান অন্যকিছুও তো থাকতে পারে?”

আব্বাস বিরক্ত হয়ে বলল “কী থাকতে পারে আবার?”

সায়ক বলল “এরা যদি এই আর্মসগুলো কোনভাবে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন শহরে পাঠাতে পারে তাহলে কী ধরণের নাশকতা বাড়তে পারে সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে?”

বিলাল বলল “হতেই পারে। লাহোর থেকে অনেকগুলো করিডর ইউজ করা যেতে পারে। শুধু কাশ্মীরেই যাবে, এরকম কোন ব্যাপার নেই”।

সায়ক নড়ে চড়ে বসল “যেমন?”

বিলাল বলল “পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়াতে ফুটবল, খেলা ধুলোর সরঞ্জাম, চামড়ার জিনিস সহ বেশ কিছু জিনিস এক্সপোর্ট হয় ওয়াঘা সীমান্ত থেকে”।

সায়ক বলল “সে তো সব রকম সিকিউরিটি চেকিং পেরিয়ে তারপরেই ইন্ডিয়ায় ঢোকে”।

বিলাল বলল “জিনিস শুধু মাত্র আইনী পথেই যায় তা তো নয়। বে আইনী পথেও পাঠানো সম্ভব”।

সায়ক বলল “এরকম কোন করিডরের সন্ধান আছে তোমার কাছে?”

বিলাল হাসল “থাকলে কি আর চুপচাপ বসে থাকতাম? সেসব সন্ধান করব বলেই তো ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করি এখানে”।

খাওয়া হয়ে গেছিল। বিলাল টিভি চালাল। টিভিতে দেখাচ্ছে পেশোয়ারে আফগান শরণার্থীদের বিদ্রোহে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে। সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পেশোয়ারের দখল নিয়েছে। দেশের গণতন্ত্র ফেরানোর সর্বতভাবে চেষ্টা চালাবে সেনাবাহিনী, জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিয়াজি।

আব্বাস বলল “বোঝ অবস্থা, নিয়াজি নাকি গণতন্ত্র ফেরাবে। এর থেকে ছোটদের জোকসের বই পড়া ভাল”।

বিলাল বলল “পরিস্থিতি ঘোরালো হচ্ছে। পাকিস্তানি সেনা দেশের দখল নিচ্ছে বুঝতেই পারছ। আমরা এখন দুটো কাজ করতে পারি। এক, এখান থেকে যেভাবেই হোক দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে পারি। দুই, এখানে থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতটা খবর দেশে পাঠানো সম্ভব, সেটা পাঠাতে পারি”।

সায়ক বলল “দুটো একসঙ্গেও করা যায়”।

আব্বাস বলল “মানে? পালাবেও আবার খবরও পাঠাবে?”

সায়ক বলল “একজ্যাক্টলি। আমাদের এখানে এত কষ্ট করে থাকার তো লক্ষ্য একটাই। সেটা ঠিক ঠাক হচ্ছে নাকি আমাদের সেটাই দেখতে হবে”।

দরজায় কেউ তিনটে টোকা দিল।
বিলাল দরজা খুলল। একজন উত্তেজিতভাবে বিলালকে কিছু বলল।
বিলাল তাদের দিকে তাকাল "উঠে পড়। আমার সঙ্গে চল । বস্তিতে আর্মি ঢুকে পড়েছে"।
সায়ক আর আব্বাস বিলালের কথা শুনে উঠে পড়ল।
বিলাল জোর পায়ে হাঁটতে লাগল।
সায়ক বলল "বস্তিতে আর্মি এল কী করতে?"
বিলাল বলল "এই তো চলছে ক'দিন ধরে। যখন তখন যেখানে সেখানে তল্লাশি শুরু করে দিচ্ছে। এদিকে এসো"।
একটা অপরিসর গলির মধ্যে খানিকটা নিয়ে গিয়ে বিলাল একটা কোঠাবাড়িতে নিয়ে গেল। মেয়েদের হাসির আওয়াজ আসছে। বিলাল বলল "মুজরো শুনি চল"।
আব্বাস বলল "তোবা তোবা। পাগল নাকি মিয়াঁ?"
বিলাল বলল "পেছনে আর্মি লেগেছে এখন তোবা করে লাভ নেই। চল শিগগির"।
কোঠাবাড়ির একটা ঘরে মুজরো দেখতে বসে গেল তিনজনে। চটুল বলিউডি সঙ্গীতে দুজন নাচছিল। বেশ কয়েকজন মধ্য বয়স্ক লোক টাকা উড়াচ্ছিল মেয়েদুটির গায়ে।
তারা তিনজন সে ঘরে ঢুকে বসে পড়ল।
আব্বাস ব্যাজার মুখে সায়ককে বলল "তোমার সঙ্গে বেরোলেই শুধু এসব জায়গায় আসতে হয়, কী পাপ যে করেছিলাম আমি যে আমার তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল"।
সায়ক আব্বাসের কথা শুনে হেসে ফেলল।

২৭

লাহোরের হীরা মান্ডি এলাকা। বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত পতিতাপল্লী।
দিনের বেলাতেও গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। এই পল্লী তৈরী হয়েছিল ব্রিটিশ সেনাদের মনোরঞ্জনের স্বার্থে। কালে কালে ব্রিটিশরা গেছে, কিন্তু লাহোরের মানুষদের মনোরঞ্জন তো আর বন্ধ হয় নি। থেকে গেছে এই অঞ্চল। উপমহাদেশের অন্যান্য শহরের নিষিদ্ধ পল্লীর মতই হীরা মান্ডির ঘর বাড়িও অপরিসর, ছোট ছোট ঘরে ভর্তি। গলিতে ঢুকতেই দেখা গেল মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে।
আব্বাস মাথা নিচু করে যেতে যেতে বলল "মিয়াঁ, আবার তুমি আমাকে এইরকম জায়গায় নিয়ে এলে? আমার জাহান্নাম আর ঠ্যাকায় কে?"
সায়ক বলল "চুপচাপ বিলালকে ফলো করে যাও। আর শোন, আগে তো বেঁচে থাকো কোন রকমে, তারপরে না হয় জাহান্নামের কথা ভাববে"।
আব্বাস বলল "আর বেঁচে থাকা, এই পাকিস্তানিদের হাতেই মরতে হবে যা বুঝতে পারছি"।
একটা তিনতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিলাল তাদের ইশারা করল।
সায়ক কোন দিকে না তাকিয়ে বিলালের পেছনে হাঁটতে শুরু করল।
বিলাল ফিসফিস করে বলল "কোন দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকো"।
তিনজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল। বিলালকে দেখা গেল অনেকেই চেনে তাই কেউ কোন প্রশ্ন করল না।
বাড়িটার ছাদে নিয়ে এল বিলাল। চারজন মহিলা বসে তাস খেলছিল। বিলাল সায়কের দিকে ইশারা করল। সায়ক এগিয়ে গিয়ে এক মহিলাকে কিছু বলল। তিনি সায়কের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে উঠে পড়ে বললেন "আসুন"।

মহিলার পিছন পিছন হাঁটতে থাকল সায়ক। আব্বাস অবাক গলায় বলল “কী বললে মিয়াঁ? চেনো নাকি?”

সায়ক হাসল “আমাকে না। কাজল বেগমকে চেনেন”।

আব্বাস মাথায় হাত দিল “উফ, কন্ট্যাক্ট রাখতেও পারো তুমি। তোমাকে সেলাম মিয়াঁ”।

সায়ক উত্তর দিল না।

তিনতলার একটা বদ্ধ ঘরের তালা খুলে তাদের বসতে বলে দরজাটা বন্ধ করে চলে গেলেন মহিলা। একেবারেই ছোট একটা অপরিচ্ছন্ন ঘর। আব্বাস হাঁচতে হাঁচতে বলল “এ কোথায় নিয়ে এলে মিয়াঁ?”

সায়ক বলল “দুঃখিত, তোমার জন্য ফাইভ স্টার হোটেল পাওয়া গেল না। আপাতত পৈতৃক প্রাণটা এখানে থেকেই বাঁচিয়ে রাখো, আর কী বলি”।

আব্বাস মুখ চুন করে বলল “তোমার সঙ্গে বেরনোই আমার ভুল হয়ে গেছে। এর থেকে পাকিস্তানের জেলে পচে মরা ভাল। অন্তত সারাক্ষণ পেছনে আর্মির গুলি খাওয়ার ভয় থাকে না”।

বিলাল মুখ খুলল এবার, সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল “আজ সন্ধ্যেয় একটা ট্রাক যাবে ইসলামাবাদে। কুড়ি থেকে পঁচিশজন মেয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সব চেক পোস্টে এদের টাকা খাওয়ানো থাকে। কেউ কিছু বলবে না। তোমাদের বোরখা পরে উঠে পড়তে হবে ট্রাকে। কষ্ট হবে, কিন্তু কিছু করার নেই”।

সায়ক কিছু বলার আগেই আব্বাস ঝাঝিয়ে উঠল “না না মিয়াঁ, আর জেনানা সাজতে পারব না। বোরখা পরে থাকা যায় নাকি?”

সায়ক আব্বাসকে থামিয়ে দিয়ে বিলালকে বলল “নো প্রবলেম। এত মেয়ে কেন যাবে?”

বিলাল বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল “হিউম্যান ট্রাফিকিং। এসব তো সব দেশেই হয়। ইন্ডিয়াতেও হয়। লাহোর এদেশের এই সব মেয়েদের বেস ক্যাম্প বলতে পারো। এখান থেকে ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডির বিভিন্ন কোঠায় মেয়ে সাপ্লাই হয়। এদের গড় বয়স দশ থেকে সাড়ে দশ। এখন থেকেই ওদের বিভিন্ন ভাবে তৈরী করা হয়। আরেকটু বয়স হলে...”

সায়ক মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল “এত ছোট মেয়েদের সঙ্গে আমরা যাব? সন্দেহ করবে না?”

বিলাল বলল “বোরখা পরে বসে থাকবে। তোমরা ছাড়াও এদের এখান থেকে দুজন যাবে। ওরা তোমাদের ইসলামাবাদ পৌঁছে দেবে। কিন্তু ইসলামাবাদ পৌছে কী করবে কিছু ভেবেছ?”

সায়ক মাথা নাড়ল “আমি ব্ল্যাংক হয়ে গেছি। সম্ভবত আবার মুজফফরাবাদে যাব”।

আব্বাস চমকে উঠে বলল “ক্ষেপেছ? লস্করের ডেরায়? আমি নেই, আমাকে ছাড়া প্ল্যান কর তুমি”।

সায়ক বলল “বেশ তো, তোমাকে রাঘবস্যারের কাছে রেখে যাব, কিন্তু মনে রেখো, ইসলামাবাদে থাকলে কিন্তু দেশে ফেরার চান্স কমে যাবে। হ্যাঁ হতে পারে, মুজফফরাবাদ থেকে আমরা নাও ফিরতে পারি, তবু... খানিকটা হলেও চান্স থাকবে দেশে ফেরার, তুমি যা ঠিক করবে”।

আব্বাস ব্যাজার মুখে সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল “তুমি মানুষ খুন করে দেবে মিয়াঁ। সত্যি বলছি বিশ্বাস কর”।

সায়ক হাসল “সে তো করতেই হবে, হয় আমি বাঁচব, নয় আমি মরব। আমাদের কাজে কি মাঝামাঝি কোন রাস্তা আছে আব্বাস মিয়াঁ?”

দুপুর দুটো।

তাদের গাড়ি কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছল। একটা ছোট কনভয়। দ্রুত গতিতে পৌঁছে দিল তাদের।

আলাদা একটা গাড়িতে কম্যান্ডোবেষ্টিত করে জ্যোতির্ময়কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বীরেন তুষারকে সব কথা বলবে ভেবেও চুপ করে গেছে। যখনই বোনের মুখটা মনে পড়ছে, তার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

আরেকটা ব্যাপারও আছে। ফোনটা পাওয়ার পর থেকে তার মনে হচ্ছে তাদের মধ্যেই কেউ আছে যে অনবরত শত্রুপক্ষকে খবর দিয়ে যাচ্ছে।

কম শীতেও ঘেমে যাচ্ছিল বীরেন।

ড্রাইভার চুপ করে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভারের পাশে বসেছে বীরেন। পিছনে খান এবং তুষার বসলেন।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে একটা আলাদা ঘরে তাদের নিয়ে যাওয়া হল। বীরেন, খান এবং তুষারের সঙ্গে বসল।

তুষার ট্যাব দেখতে দেখতে খানকে বললেন “দে আর প্ল্যানিং সামথিং বিগ খান। কাশ্মীর ইজ নট সেফ”।

খান বললেন “শুধু কাশ্মীর? আমার বারবার অপারেশন ব্লু ফ্লাওয়ারের কথা মনে পড়ছে”।

বীরেনের পকেটের ফোনটা বাজছিল। বীরেন ফোনটা ধরে উঠে একটু আলাদা হয়ে ফোনটা ধরল “হ্যালো”।

“বলছি অ্যাসিড অ্যাটাক হলে একটা মেয়ের কী হতে পারে জানা আছে?”

বীরেন শিউরে উঠল। একটু ভেবে বলল “আমাকে একটু সময় দিন প্লিজ। আমি দেখছি”।

“দেখো দেখো। তোমার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে আছে বীরেন। তোমার বাবা আবার সকালে সাইকেল চালিয়ে বাজার যান। জাস্ট ভাবো একটা লরি এসে…”

বীরেন বাধা দিয়ে বলল “আমি দেখছি। প্লিজ এরকম কিছু করবেন না। ওঁর কাছে ফোনটা আমি ঠিক পৌঁছে দেব। একটু সময় দিন আমায়”।

“গুড। আমরা জানি তুমি পারবে। তুমি তো আমাদেরই দলের লোক। ইনাম পাবে। চিন্তা কোর না”।

ফোনটা কেটে গেল।

বীরেনের দরদর করে ঘাম হচ্ছিল। সে কী করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

সে আবার তুষারের পাশে গিয়ে বসল।

তুষার বললেন “কী হল বীরেন, তোমাকে একটু টেন্সড লাগছে। সব ঠিক আছে তো?”

বীরেন মাথা নাড়ল “হ্যাঁ স্যার। নো প্রবলেম”।

তুষার বললেন “তোমাকে কাশ্মীরে স্পেশাল ট্রেনিং এ পাঠাব ভাবছি। ওখানে এখন মাথুর আছে। তোমার সঙ্গে মাথুরের পরিচয় আছে তো?”

বীরেন বলল “হ্যাঁ স্যার”।

খান বললেন “মাথুরকে বেশিদিন কাশ্মীরে রাখা যাবে না বীরেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে কাশ্মীরের সমস্তটা বুঝে নিতে হবে”।

তুষার বললেন “না, বীরেনকে এখনই গোটা কাশ্মীর বুঝে নিতে বললে সেটা একটু বেশিই হয়ে যাবে তবে বীরেনকে নিয়ে আমার অন্য প্ল্যান আছে”।

বীরেন জিজ্ঞাসু চোখে তুষারের দিকে তাকাল।

তুষার হাসলেন “সময় হলেই বলব”।

বিমানবন্দর অথোরিটি থেকে কয়েকজন অফিসার এসে তুষারের সঙ্গে দেখা করলেন। তুষার তাদের বললেন “আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা রওনা দিচ্ছি। তোমাদের কি খিদে পেয়েছে?"

বীরেন মাথা নাড়ল।

তুষার বললেন “হাসান মাকসুদের ইন্টারোগেশন পার্ট খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। লোকটা যে সব জিনিস দিয়ে এবং যেভাবে ছোট সাইজের শক্তিশালী বোম বানিয়েছে, তা আমাদের ডিফেন্স অ্যাকাডেমীকে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে হাসান মাকসুদকে পেতে ওরা সচেষ্ট হবে। আর কোন ভাবেই যেন কোন কম হাইজ্যাকিং এর...”

তুষারের ফোন বেজে উঠল। তুষার ধরলেন না।

কয়েক সেকেন্ড পরে খানের ফোন বেজে উঠল। খান ফোনটা ধরেই তুষারকে বললেন “স্যার আপনার ফোন”।

তুষার বিরক্ত হয়ে বললেন “কে?”

খান বললেন “বুঝতে পারছি না স্যার, আপনাকে চাইছে”।

তুষার ফোনটা ধরলেন। কয়েক সেকেন্ড পরে তার হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল।

খান বললেন “কি হল স্যার?”

তুষার ফ্যাকাসে মুখে বললেন “ইরাবতীকে কলেজের মধ্যে কেউ গুলি মেরেছে এইমাত্র। দে হ্যাভ স্টারটেড দ্য গেম, খান”।

খান এবং বীরেন দুজনেই চমকে উঠল।

খান বললেন “শিওর স্যার আপনি? এটা কোন প্র্যাংক কল নয় তো?”

তুষার ফোন বের করে পাগলের মত দিল্লিতে ফোন করতে শুরু করলেন।

খান অবাক হয়ে বীরেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

২৯

ডাল লেক বরাবর বেশ খানিকটা গিয়ে বাজার এলাকায় গাড়ি দাঁড় করালেন মহম্মদ কাদরী। ডাল লেক বরফের চাদরে মুড়ছে অল্প অল্প করে। দিনের বেশির ভাগ সময় তুষারপাত হচ্ছে। গাড়ি পার্ক করে বাজারের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে বোঝার চেষ্টা করলেন তাকে কেউ লক্ষ্য করছে নাকি। কয়েক মিনিট পরে নিঃসন্দেহ হবার পরে হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট শোপিসের দোকানের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

দোকানী একাই ছিল দোকানে। কাদরীকে দেখে হাসল। সালাম দিল।

কাদরী প্রত্যুত্তরে সালাম দিয়ে বললেন “এসেছে?”

দোকানী কাদরীকে একটা ছোট কৌটো দিল।

কাদরী সেটা নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে ভরে দোকান থেকে বেরিয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের গাড়িতে গিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলেন।

মিনিট কুড়ি গাড়ি চালাবার পর নিজের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালেন। বাড়ির অনতিদূরে সশস্ত্র আর্মিরা পাহারা দিচ্ছে। তাকে চেনে অনেকেই। কাদরী জওয়ানদের দেখে হাসলেন। একজন জওয়ান হাত নাড়ল।

গাড়ি পার্ক করে কাদরী চাবি বের করে দরজার তালা খুললেন।

ঠান্ডা পড়ছে জাঁকিয়ে। কাদরী আলো জ্বালাতে সুইচ দিলেন। আলো জ্বলল না।

কাদরী হতাশ হয়ে মোম জ্বালিয়ে বেডরুমে গেলেন।

খাটে একজন ঘুমাচ্ছে। কাদরী টেবিলের ওপর মোম রেখে বললেন “সারাদিন ঘুমোলে জেহাদ হবে কী করে?”

খাট থেকেই ঘুম জড়ানো গলায় ইসমাইল আব্বাস বলল “অনেকদিন পর এরকম নরম বিছানায় ঘুমাচ্ছি প্রফেসর। ভাল লাগছে খুব”।

কাদরী বললেন “সে তো বুঝতেই পারছি তোমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু আমাদের খুব শিগগিরি এই বাড়ি ছাড়তে হবে। ওরা কিছু একটা আন্দাজ করছে”।

ইসমাইল আব্বাস উঠে বসল। বলল “তুমি জিনিয়াস প্রফেসর। তুমি ঠিকই জানো তোমাকে কী করতে হবে। আমার জন্য কী বার্তা আছে?”

মহম্মদ কাদরী পকেট থেকে ছোট কৌটোটা বের করে ইসমাইলকে দিল। ইসমাইল বলল “লাইট প্লিজ”।

কাদরী মোবাইলের টর্চ জ্বালালেন। ইসমাইল বাক্সটা খুললে একটা চিরকুট বেরোল।

কাদরী বললেন “পেয়েছ বার্তা?”

ইসমাইল হাসতে লাগল।

কাদরী বললেন “কী হল?”

ইসমাইল বলল “এতে তো তোমাকে মেরে ফেলার কথা বলা আছে”।

কাদরী হাসলেন “নো প্রবলেম। যদি তাই লেখা থাকে, মেরে ফেলো। আমি প্রস্তুত"।

ইসমাইল হাসতে হাসতে কাদরীর কাঁধে হাত রেখে বলল “আমি জানি প্রফেসর তুমি এক কথার মানুষ। কিন্তু এত সহজে তোমার জন্নত যাওয়া হবে না। তার আগে অনেক কাজ করতে হবে। আচ্ছা আমাকে এবার বল, তুমি এখান থেকে পালাবার কথা ভাবছ কেন? তোমাকে ওরা সন্দেহ করছে?”

কাদরী বললেন “আজ কলেজ থেকে তাড়িয়েছে। নজর রাখছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এখানে থাকা আমার জন্য সেফ না। তোমার জন্য তো নয়ই”।

ইসমাইল এবার গম্ভীর হল। বলল “আমাদের ওপর অমৃতসর যাওয়ার নির্দেশ এসেছে। আজকেই”।

কাদরী বললেন “যাব কী করে? রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ চেকিং আছে, আর্মি চেকিং আছে...”

ইসমাইল হো হো করে হেসে বলল “বেওকুফ ইন্ডিয়ান আর্মি আমাকে বনে বাদারে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওরা কখনও ভাবতেই পারবে না ওদের বুকের ওপর দিয়ে রাস্তা দিয়ে আমি যেতে পারি। তুমি চিন্তা কোর না প্রফেসর। আজ রাতের খাবার খেয়ে আমরা শ্রীনগর ছাড়ব”।

কাদরী চিন্তিত মুখে ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে বললেন “তুমি আমাদের একমাত্র ভরসা ইসমাইল। এত বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে?”

ইসমাইল বলল “যে বান্দা রেহান খানের মত অফিসারকে মেরে শ্রীনগর জেল থেকে পালাতে পারে, সে সব করতে পারে প্রফেসর। তুমি আমার ওপর ভরসা রাখো। আমিও জানি, তুমিও জানো, কাশ্মীরে যেভাবে তল্লাশি চলছে, তাতে বেশিদিন এখানে থাকলে আমাদের ধরা পড়বার চান্স অনেক বেশি। ওখান থেকে যখন নির্দেশ এসেছে, তখন নিশ্চয়ই কোন কাজ সম্পূর্ণ করার কথা ভেবেই করা হয়েছে। তুমি গোছগাছ শুরু করে দাও। যা হবে দেখা যাবে”।

কাদরী কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে গোছগাছ শুরু করলেন।

ইসমাইল আব্বাস আবার শুয়ে পড়ল।

৩০

সন্ধ্যে সাতটা।

একটা বড় ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে গলির মুখে। ট্রাকের ভেতরে টানা বেঞ্চ রাখা। তার মধ্যে দশ বারো বছরের একগাদা মেয়েকে গাদা করে বসানো হয়েছে।

আব্বাস আর সায়ককে সে ট্রাকের মধ্যে তুলে দিল বিলাল।

বোরখার ভেতর থেকে আব্বাস বলল “কী একটা বোরখা দিয়েছে বুঝতে পারছি না মিয়াঁ, জঘন্য গন্ধ, কেউ মনে হয়ে এর ভেতরেই ওসব করেছে”।

সায়ক বলল “যেভাবে আছো, সেভাবেই থাকো। বেশি বকবক কোর না”।

মেয়েগুলো ভয়ে সিটিয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে কথা পর্যন্ত বলছে না। যে বয়সে নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা, ইয়ার্কি করবে, সে বয়সে যেন ওদের মধ্যে কোন আতঙ্ক ভর করে আছে।

একটা মেয়ে "আব্বু আব্বু" বলে কাঁদছিল। একজন মহিলা এসে চড় দিয়ে চুপ করিয়ে দিল।

আব্বাস সায়ককে বলল "মেয়েটার বাবা মেয়েটাকে বিক্রি করে দিয়ে গেছে?"

সায়ক বলল "হু। থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির সমস্যা। নিজেরা গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা পয়দা করবে, তারপর কন্যাসন্তানকে বেচে দেবে"।

আব্বাস বলল "এই টুকু টুকু মেয়েদের ইসলামাবাদে নিয়ে যাচ্ছে কেন?"

সায়ক বলল "এখন থেকে তৈরী করবে। এদের রেটই সব থেকে বেশি। যেদিন থেকে মেন্সট্রুরাল সাইকেল শুরু হবে, সেদিন থেকে সব থেকে বেশি দামে বিকোবে এরা"।

আব্বাস হতাশ গলায় বলল "এরা তো শিশু"।

সায়ক বলল "যারা হিউম্যান ট্রাফিকিং করে তাদের কাছে শিশুর দামই সব থেকে বেশি। কলকাতা বল কী করাচি, মুম্বই বল কী ইসলামাবাদ, মেয়েদের যোনির দাম সর্বত্র সমান"।

আব্বাস বলল "ঈশ, কী হবে মিয়াঁ এই যুদ্ধ যুদ্ধ করে! মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?"

সায়ক বলল "কোথাও নেই। আই এস আই এস কিংবা লস্কর আরও এক কাঠি ওপরে। তালিবানেরা তো মেয়েদের মানুষ বলেই মনে করে না। তুমি শোন নি, কোন এক মেয়ে পর্দা করে নি বলে স্টেডিয়ামসুদ্ধ লোক মেয়েটাকে পাথর মেরেই মেরে ফেলেছিল?"

আব্বাস মাথায় হাত দিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ট্রাকের পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল। ট্রাক নড়ে উঠে চলতে শুরু করল।

সায়ক বলল "তবে আজকাল মানুষ অনেক সভ্য হয়েছে। এককালে রাজা যুদ্ধে জিতলে পরাজিত রাজ্যের মেয়েদের ধর্ষণ করা হত, তাদের ক্রীতদাসী বানিয়ে রাখা হত। নিউক্লিয়ার ওয়েপুনের ভয়াবহতা সম্পর্কে লোক সম্যক ওয়াকিবহাল বলেই হয়ত মানুষ তার জন্যই অনেক সংযত হতে পেরেছে। এসব অস্ত্র এসে একদিকে ভালই হয়েছে। বলতে পারো হিরোশিমা, নাগাসাকি নিজে মরে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেছিল। নইলে এতদিনে মানবসভ্যতা বলে কিছু থাকত না"।

একটা মেয়ে বমি করতে শুরু করল। আব্বাস বলল "আহা রে, জার্নিতে বমি করে। আমার ভাইঝিও করে। এদের দেখে আমার ভাইঝির সঙ্গে পার্থক্য করতে পারছি না মিয়াঁ"।

একজন মহিলা ছিলেন। তিনি মেয়েটাকে জল দিলেন। মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেই চড় মারলেন। তাতে মেয়েটার কান্না বেড়ে গেল।

আব্বাস ফিসফিস করে বলল "আমরা কি কিছুই করতে পারব না মিয়াঁ? এতগুলো শিশুর জীবন বরবাদ হয়ে যাবে, চোখের সামনে দেখব?"

সায়ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল 'কতজন শিশুকে বাঁচাব মিয়াঁ? আমাদের প্রথম প্রায়োরিটিগুলোই তো চেঞ্জ হয়ে গেছে বুঝতে পারছ না? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান না। যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ"।

আব্বাস কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

আব্বাস বলল "কী হল?"

সায়ক বলল "চুপচাপ বসে থাকো। মাথা নিচু করে থাকবে'।

মিনিট দুয়েক শ্বাসরোধ করে বসে থাকার পর ট্রাকের পেছনের ডালা খোলা হল। টর্চের আলো এসে পড়ল মেয়েগুলোর ওপর।

দুজনে বোরখা পরেছিল।

ট্রাকে কেউ উঠল না। নিজেদের মধ্যেই সেনারা হাসি মশকরা করতে করতে ডালা বন্ধ করে দিতে বলল।

মিনিট পাঁচেক পরে ট্রাক আবার চলতে শুরু করল।

আব্বাস বলল "উফ! আমার টয়লেট পেয়ে গেল মিয়াঁ। এদের কিচ্ছু বলল না?"
সায়ক হাসল "তোমাকে বললাম না, আমাদের দেশগুলোর প্রায়োরিটিগুলোই চেঞ্জ হয়ে গেছে"।

৩১

বসন্ত নেমেছিল উপত্যকায় সেদিন। টিউলিপ ফোটার মরসুম। বরফ গলতে শুরু করেছে কাছের পাহাড়গুলোতে। সবুজের ভরসায় দিন গুনছে সবাই।

এর মধ্যে গ্রামে সেদিন তীব্র চাঞ্চল্য। জঙ্গী ঢুকেছে শুনে গ্রামে আর্মি তল্লাশি শুরু হয়েছে। প্রতিটা ঘরে সেনারা তল্লাশি করছে।

ছোট কাদরী বাড়ির সামনে খেলছিল।

চাচা এসেছে বলে তার খুব মজা। কিছু বোঝার আগেই বাড়ির বাইরে আর্মির গাড়ি এসে দাঁড়াল।

কাদরী অবাক হয়ে দেখল একগাদা লোক হাতে বন্দুক নিয়ে তাদের বাড়ির ভিতর ঢুকল। আলমারিতে লুকিয়ে ছিল তার চাচা। তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল আর্মি। বাড়ির লোক, গ্রামের লোক ভিড় করে এসেছে দেখার জন্য। তার চাচা ভীত চোখে চার দিকে তাকাচ্ছে। পকেট থেকে কিছু একটা বের করতে গেল আর সেই মুহূর্তে গর্জে উঠল সেনার গুলি।

চোখের সামনে ছোটচাচাকে লুটিয়ে পড়তে দেখেছিল মহম্মদ কাদরী।

ঈদে তারা জম্মু এসেছিল ফুপার বাড়িতে। ঝামেলার সময় ফুপাকে আগুনে পুড়িয়ে মারল অচেনা লোকেরা। আব্বু ফুপাকে বাঁচাতে গেল। আব্বুকেও মেরে দিল।

সে রাতটা দুঃস্বপ্নে এল আবার। শিউরে উঠে গাড়িতে উঠে বসলেন কাদরী। রাত দেড়টা। জওহর টানেল আটকে রাখা হয়েছে। গাড়ির দীর্ঘ লাইন। রাস্তার পাশেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

সারে সারে আর্মি ট্রাক জম্মু থেকে কাশ্মীরে আসছে। অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

ইসমাইল পেছনের সিটে ঘুমিয়ে আছে। কাদরী দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট ধরালেন। দুজন ভারতীয় সেনা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। ইসমাইল সরাসরি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন "স্যার গাড়ি কখন ছাড়বে?"

একজন ঘড়ি দেখে বললেন "আরও দু ঘন্টা। কোথায় যাবেন আপনি?"

কাদরী বললেন "ফুপার বাড়ি। জম্মু। কাল ফুপাতো বোনের বিয়ে। খুব দেরী হয়ে যাবে স্যার"।

জওয়ানটি বললেন "কিছু করার নেই। অপেক্ষা করুন"।

কাদরী বললেন "আপনার বাড়ি কোথায়?"

জওয়ান বললেন "ওয়েস্ট বেঙ্গল। আপনি প্লিজ গাড়িতে গিয়ে বসুন। এভাবে কথা বলবেন না"।

কাদরী হেসে বাংলায় বললেন "জানি, সিভিলিয়ানদের সঙ্গে আপনাদের কথা বলা বারণ, চিন্তা করবেন না, আমিও ভারতীয়। ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। আর বেঙ্গলে আমি অনেকবার গেছি। টেগোরের দেশ। আমরা কাশ্মীরিরা অনেকেই কিন্তু সুন্দর বাংলা বলতে পারি"।

জওয়ান বললেন "জানি প্রফেসর সাহেব। কিন্তু আপনি প্লিজ গাড়িতে গিয়ে বসুন। এখানে হাই অ্যালার্ট আছে বুঝতেই পারছেন"।

কাদরী বললেন "জানি তো। কাশ্মীর মানেই তো তাই। আপনারাও বুঝতে পারছেন আমরা কীসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি"।

অপর জওয়ান জিজ্ঞাসু চোখে এগিয়ে এল। বাঙালি জওয়ান কাদরীকে বললেন "জানি স্যার। কিন্তু কিছু করার নেই"।

অপর জওয়ান বাঙালি জওয়ানটিকে জিজ্ঞেস করলেন "কী হচ্ছে?"

বাঙালি জওয়ান বললেন “কিছু না। উনি শ্রীনগরের কলেজে পড়ান”।

কাদরী সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন দুজনের দিকে। দুজনেই মাথা নাড়লেন। বাঙালি অপর জওয়ানকে বললেন “তুমি যাও। আমি দেখছি”।

অপরজন চলে গেলেন।

কাদরী বললেন “আপনাদের সারাদিন সারারাত এভাবে পাহারা দিতে কষ্ট হয় না?”

জওয়ান হেসে বললেন “সেটাই আমার কাজ”।

কাদরী সিগারেটে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন “তা বটে। টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলোর যেমন কাজ বর্ডারে আর ইন্ডিয়ার ভেতরে সমস্যা তৈরী করা”।

জওয়ান উত্তর দিলেন না। একের পর এক গাড়ি যাচ্ছে। ঠান্ডা পড়ছে জাঁকিয়ে। কাদরী বললেন “আপনি সিগারেট নেবেন না?”

জওয়ান বললেন “না। আপনি গাড়িতে চলে যান। বুঝতেই পারছেন এসব জায়গায় আপনার সঙ্গে কথা বলাটা সমস্যা আছে”।

কাদরী হাসি মুখে “থ্যাঙ্কিউ” বলে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোতে বেশিরভাগ মানুষ ঘুমাচ্ছে। জম্মু কাশ্মীর পুলিশের ভ্যান টহল দিচ্ছে।

ইসমাইল শুয়ে থাকা অবস্থাতে ফিসফিস করে বলল “কয়েক কেজি জিনিস থাকলে এই কমবখত দেশটাকে এখানেই কিছু শিক্ষা দিয়ে যাওয়া যেত প্রফেসর”।

কাদরী গম্ভীর গলায় বললেন “এসব মাথাতেও এনো না এখন। মিশন ভুলে যেও না”।

ইসমাইল হাই তুলে বলল “হ্যাঁ প্রফেসর। রক্ত গরম। বুঝতেই পারছেন”।

কাদরী বললেন “তোমার গরম রক্ত ঠান্ডা কর প্রয়োজনমত। এখানে সুইসাইডাল অ্যাটেম্পটের কোন মানে নেই। কাশ্মীরে রোজ এরকম গণ্ডায় গণ্ডায় অ্যাটেম্পট হয়। লোকের গা সওয়া হয়ে গেছে। ইন্টেলিজেন্স তোমাকে গ্রামে গ্রামে পাগলের মত খুঁজছে। তোমার কোন রকম বোকামি এখন আমি অ্যালাউ করব না বুঝতে পারছ আশা করি”।

ইসমাইল বলল “হ্যাঁ হ্যাঁ প্রফেসর। আল্লাহ সময় বলবেন জানি আমিও। তবু তর সয় না”।

কাদরী চোখ বুজলেন “তর সওয়াও। কোন জলদি নেই”।

ইসমাইল ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

৩২

গোটা রাস্তা তুষার একটা কথাও বললেন না। থমথমে মুখে বসে রইলেন।

দিল্লি পৌঁছে জ্যোতির্ময়কে নিয়ে কনভয়ে বেরিয়ে গেলেন খান। তুষারের সঙ্গে বীরেন থাকল। গাড়িতে তুষারকে কী বলে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারছিল না বীরেন। একই সঙ্গে ভয়ে তার গলা শুকিয়ে আসছিল। কতটা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক হলে এরা ইরাবতীর মত মহিলাকে টার্গেট করতে পারে তা অচিন্তনীয়।

নার্সিং হোমে পৌঁছে আই সি ইউর দিকে দৌড়লেন তুষার। পিছন পিছন বীরেন। ডাক্তার জানালেন গুলি বুকের ডান দিক ছুঁয়ে গেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। পেশেন্টের জ্ঞান নেই। এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না। তুষার সবটা শুনে বেরিয়ে ভিজিটরস রুমে গিয়ে বসলেন। বীরেন দাঁড়িয়ে ছিল, তুষার বীরেনকে বললেন “বোস। এখন আমাদের হাতে কিছু নেই”।

বীরেন কোন কথা না বলে বসল।

তুষার একটু চুপ করে থেকে বললেন “বুঝতে পারছ আমরা ঠিক কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি?”

বীরেন বলল "হ্যাঁ স্যার"।

তুষার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন "সব থেকে ভাল হত হয়ত কোন পিছুটান না থাকলে। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সেটা তো সম্ভব নয়। কী আর করা যায়"।

বীরেন নিজেও বুঝল কথাটা। তুষার অবশ্য চুপ করে বসে থাকলেন না। আশরফ খানকে ফোন করে তারা ঠিক ঠাক পৌঁছেছেন কিনা হাসান মাকসুদকে নিয়ে, তার খবর নিলেন। মিনিস্ট্রি থেকেও ফোন আসতে শুরু করল কিছুক্ষণ পরে।

তুষার ঠান্ডা মাথায় সবাইকে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। বীরেন চমৎকৃত হল তুষারকে দেখে। এই মারাত্মক ব্যক্তিগত বিপর্যয়েও কী অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে আছেন তুষার! অথচ বাবা মা কিংবা বোনকে নিয়ে একটা হুমকিতেই সে কীভাবে ভেঙে পড়ছে। সেও তো একটা টেনশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্যান্টের পকেটে ফোনটা আছে। কী আছে এই ফোনে যেটা জ্যোতির্ময়ের কাছে পাঠাবার জন্য ওরা এত ব্যাকুল হয়ে আছে?

বীরেন ফোনটা বের করে দেখে আবার পকেটে রেখে দিল।

তুষার বললেন "চল ক্যান্টিনে চল কিছু খেয়ে নেওয়া যাক"।

বীরেন একটু অবাক হয়েই তুষারের দিকে তাকাল।

তুষার বললেন "নিজেদেরকে ঠিক রাখতে হবে। কী করব? কিছু করার আছে? চল"।

দুজনে নার্সিং হোমের ক্যান্টিনে গেল। তুষার ধোসা নিলেন দুজনের জন্য। চুপচাপ খেয়ে যেতে থাকলেন।

তুষার খেতে খেতে বললেন "এটাও ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর। আমি ওর ওপর নজর রাখার জন্য দুজনকে রেখেছিলাম। তারাও কিছু করতে পারল না। আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল ওরা কিছু একটা করতে পারে। এতটা মরিয়া হয়ে উঠবে বুঝতে পারিনি"।

বীরেন বলল "ওদের দুজনের সামনেই গুলি করেছে?"

তুষার বললেন "ওরা সবটাই ট্র্যাক করেছিল। যে মুহূর্তে সুযোগ পেয়েছে গুলি চালিয়ে পালিয়েছে"।

বীরেনের ফোন বাজতে শুরু করল। বীরেন দেখল বাবা ফোন করছে। ধরল সে "হ্যালো"।

"কী রে তোর খবর কী? কোথায় আছিস এখন?"

বীরেন তুষারের দিকে তাকাল। তুষার খেয়ে যাচ্ছেন। সে বলল "দিল্লিতে এসেছি। আমি রাতের দিকে ফোন করছি বাবা, ব্যস্ত আছি এখন"।

ফোন রাখল বীরেন।

তুষার বললেন "বাড়ি থেকে ফোন এলে কথা বলা উচিত। দে মিস ইউ"।

বীরেন বলল "হ্যাঁ স্যার। বলব"।

তুষার বললেন "ফিল ফ্রি টু টক। খেয়ে নিয়ে ফোন কর"।

বীরেন বলল "ওকে স্যার"।

তুষার খেয়ে বললেন "আমি আই সি ইউর দিকে যাচ্ছি, অপারেট করার কোন প্ল্যান আছে নাকি দেখি ওদের। তুমি কথা বলে নিও"।

বীরেন মাথা নাড়ল।

তুষার বেরিয়ে গেলেন। বীরেন খেয়ে ফোন বের করে বাবাকে ফোন করবে ভেবে ফোন বের করতে দেখল আননোন নাম্বার থেকে আবার ফোন আসা শুরু করেছে।

সে ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল "কাজ হয়েছে?"

বীরেন বলল "না। আমি জ্যোতির্ময়বাবুর সঙ্গে নেই"।

"ওকে। ওয়েটিং। তোমাকে খুব বেশি হলে আর বারো ঘন্টা দিতে পারি আমরা"।

ফোনটা কেটে গেল।

বীরেন চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ।

তুষারের মুখটা মনে পড়ল অকারণেই। শান্ত সমাহিত ফোকাসড একজন মানুষের মুখ।

বাবাকে ফোন করল সে। বাবা ফোন ধরেই বলল “কী রে, বললি যে রাতে ফোন করবি?”

বীরেন বলল “না বল। কী বলছিলে”?

বাবা উদ্বিগ্ন গলায় বলল “সব ঠিক আছে তো রে?”

এই সাধারন একটা কথা বীরেনের সব কিছু এলোমেলো করে দিল। চোখের কোণা জলে ভিজে উঠল তার।

৩৩

দিল্লিতে ইন্টেলিজেন্সের গোপন ডেরায় নিয়ে আসা হয়েছে জ্যোতির্ময়কে।

সারারাস্তা জ্যোতির্ময় একটা কথাও বলেন নি।

আশরফ খানের নির্দেশে একটা চেয়ারে হাত পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

রাত দশটা।

আশরফ নিজের চেম্বারে বসেছিলেন।

তুষার ফোন করলেন।

আশরফ ধরলেন “হ্যাঁ স্যার”।

তুষার বললেন “কী আপডেট খান?”

আশরফ বললেন “বসিয়ে দিয়েছি। রেস্ট দিই নি কোন”।

তুষার বললেন “গুড। তুমি নিজে নজর রেখো”।

খান বললেন “সে তো নিশ্চয়ই। ডাক্তাররা কী বলছেন স্যার?”

তুষার ঠান্ডা গলায় বললেন “যা বলে। প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে। অবজারভেশনে রাখা হচ্ছে। সারভাইভালের চান্স আছে”।

খান বললেন “ম্যাডাম নিশ্চয়ই সারভাইভ করবেন স্যার। একদম চিন্তা করবেন না”।

তুষার বললেন “আমিও জানি ও সারভাইভ করবে। ব্যাপারটা হল ওরা ইচ্ছা করে এটা করেছে। ওদের লক্ষ্য আমাদের ভয় দেখানো। তোমার ফ্যামিলিকেও সাবধানে রেখো খান। মাথুরকেও আমি অ্যালার্ট করে দিয়েছি। দে হ্যাভ এভ্রি ফাকিং ডিটেইলস অ্যাবাউট আস”।

খান বললেন “আমাদের ভেতরের খবর ওরা পাচ্ছে কী করে?”

তুষার বললেন “অনেকগুলো পথ আছে। হানি ট্র্যাপ হতে পারে কিংবা ফ্যামিলির লাইফ থ্রেট। সিসিটিভি মনিটরিং চাই মাকসুদের ইন্টারোগেশন চেম্বারে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে যারা আমাদের ইনফরমেশন লিক করছে, তাদের কেউ ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে”।

খান বললেন “সিসিটিভি অলরেডি ইনস্টলড স্যার”।

তুষার বললেন “মিনিস্টার মাকসুদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আমি ডিরেক্ট না করে দিয়েছি। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি ইনভলভমেন্ট”।

খান হাসলেন, “আপনাকে মিনিস্ট্রি থেকে সরিয়ে দেবে এরপরে। ওদের কোন কথাই শুনছেন না আপনি”।

তুষার বললেন “সরিয়ে দিলে দেবে। যতক্ষণ আমি আছি আমার পোস্টে, ততক্ষণ কারো কথা শুনব না”।

খান বললেন “রাইট স্যার”।

তুষার বললেন “গুড নাইট খান। কোন রকম সমস্যা হলে ফোন করবে”।

খান বললেন “গুড নাইট স্যার”।

ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ করিডরে হাঁটাহাঁটি করলেন খান। পরক্ষণেই নিজের চেম্বারে এসে কম্পিউটার খুললেন। মাথুর ফোন করছেন। ধরলেন "বল মাথুর, কাশ্মীরের কী হাল"?

মাথুর বললেন "কাশ্মীরের হাল কখনও ভাল হবে না খান। কী করবে বল? তার ওপর যা ঠান্ডা এখানে, মরেই যাব মনে হচ্ছে"।

আশরফ বললেন "একা একা বেরিও না কিন্তু। কাশ্মীর ইজ নট সেফ অ্যাট অল"।

মাথুর বললেন "তা আর বলতে। কিন্তু এই ইসমাইলটাকে না পেলে যে সমস্যা বেড়েই যাবে। ওয়াজুরায় যেভাবে দুজন জওয়ানকে মেরেছে ইমাজিন করতে পারবে না। কে জানে ব্যাটা কোন গ্রামে এখন লুকিয়ে আছে"।

আশরফ বললেন "অবন্তীসাহেবের হেল্প নাও"।

মাথুর বললেন "নিচ্ছি তো। চিরুণিতল্লাশি হচ্ছে রীতিমত। ওদের কমিউনিকেটিং ডিভাইসগুলোরও কোন রকম নাগাল পেলাম না। তুমি কি একবার কাশ্মীরে আসবে?"

আশরফ একটু থমকে গিয়ে বললেন "ডেফিনিটলি। তুষার স্যার আমাকে ছাড়লেই আমি যাব। অবশ্য আমি শুনছিলাম বীরেনকে তোমার কাছে পাঠানো হতে পারে"।

মাথুর বললেন "বীরেন ইজ আ ব্রেভ বয়। কিন্তু আমার মনে হয় ইসমাইলকে ধরার জন্য কোন পাকা মাথার দরকার আছে যে কাশ্মীরকে ভাল করে চেনে"।

আশরফ বললেন "ডেফিনিটলি। আমি যাব। তুমি চিন্তা কোর না। ভাল থেকো"।

ফোন রেখে আশরফ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। মাথুর আর তিনি এক সঙ্গেই জয়েন করেছিলেন। আশরফ থাকলে মাথুর আলাদা বল পান।

আশরফ মোবাইলের ইনবক্স দেখলেন। প্রতিদিন দশ বারোটা করে হুমকি মেসেজ আসে। ধর্মের নাম করে ভয় দেখানো হয়। এই মেসেজগুলো তার ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি। গালি গালাজ দেওয়া মেসেজগুলো এলেই তিনি বুঝতে পারেন, ঠিক পথেই এগোচ্ছেন। কোন ভুল কাজ করছেন না।

ইন্টারোগেশন চেম্বারের সিসিটিভির সারভারে লগ ইন করলেন তার কম্পিউটার থেকে। জ্যোতির্ময় চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। এত অত্যাচারের পরও স্নায়ু শান্ত করে এভাবে চুপ করে বসার জন্য কতটা ট্রেনিং দরকার সেটা ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছিলেন আশরফ। শুনেছেন এদের ট্রেনিং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কম্যান্ডো ট্রেনিংএর মতই হয়। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে কিংবা মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা ট্রেনিং নিয়ে আসে।

আশরফ তীক্ষ্ণ চোখে জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে ইন্টারোগেশন চেম্বারের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

চেম্বারের বাইরে একজন নিরাপত্তারক্ষী বসে ছিলেন। আশরফ তাকে চেম্বারের আলো জ্বালাতে বলে ঘরের ভিতরে গেলেন।

চেয়ার নিয়ে জ্যোতির্ময়ের সামনে বসলেন।

জ্যোতির্ময় হেসে বললেন "কেমন আছেন অফিসার? পরিবারের সবাই ভাল তো?"

আশরফ বললেন "তা জেনে আপনি কী করবেন হাসান মাকসুদ?"

জ্যোতির্ময় বললেন "দিল্লি খুব ড্রাই এলাকা বুঝলেন খানসাহেব। বেশি করে জল খাবেন"।

আশরফ বললেন "আপনার মত কোন শুভানুধ্যায়ী আমার দরকার নেই হাসান মাকসুদ"।

জ্যোতির্ময় বললেন 'হজে যান? নিজের মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন? নাকি এই সব না পাক নাস্তিকদের সঙ্গে থেকে থেকে আপনিও নাস্তিক হয়ে গেছেন"?

আশরফ হাসলেন "দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস। আপনি ভাবলেন কী করে এত কিছু আপনাকে বলব?"

জ্যোতির্ময় মাথা নাড়লেন “তা বটে। আপনি সৎ মানুষ। আপনার জন্নতই নসীব হবে”।

আশরফ বললেন “আপনাদের দৌলতে তো এখনই পৃথিবীটা জাহান্নাম হয়ে গেছে। মৃত্যুর পর কী হবে ভেবে কী হবে? তার আগেই তো সব কিছু শেষ করে দিচ্ছেন আপনারা”।

জ্যোতির্ময় বললেন “সব কিছু আপেক্ষিক খানসাহেব। আমরা আমাদের দুনিয়াটা আমাদের মত করে নেব। তৃতীয় কোন ব্যক্তি কী বলল তা নিয়ে আমরা কখনই চিন্তিত নই। বাই দ্য ওয়ে, তুষার স্যারের ওয়াইফ কেমন আছেন?”

আশরফ চমকে উঠতে গিয়ে সামলে নিয়ে বললেন “ভাল আছেন”।

জ্যোতির্ময় বললেন “সাবধানে থাকতে বলবেন। দিনকাল ভাল নয়”।

আশরফ স্থির চোখে জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৩৪

রাত সাড়ে বারোটা।

আব্বাসের চোখ লেগে এসেছিল।

সায়ক চুপচাপ বসেছিল।

ট্রাক দাঁড়াতে আব্বাসের ঘুম ভেঙে গেল। সে বিরক্ত গলায় বলল “উফ, একটু শান্তিতে ঘুমাতেও দেয় না”।

সায়ক বলল “ইসলামাবাদ এসে গেছে”।

আব্বাস বলল “এত তাড়াতাড়ি? সারারাত পরে এলেই ভাল হত? এখন কোথায় ঘুমাব?”

ট্রাকের পেছনের দরজা খুলে গেল। বেশ কয়েকজন মহিলা এসে গাড়ি থেকে মেয়েদের নামাতে শুরু করল।

আব্বাস বলল “চল নামি”।

সায়ক বলল “চুপ করে বসে থাকো”।

বাচ্চা মেয়েগুলো সব নেমে গেলে একজন বোরখা পরিহিত মহিলা ট্রাকে উঠে এসে তাদের সামনে বসলেন।

আব্বাস সভয়ে সায়কের দিকে তাকাল।

সায়ক হেসে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলল “অনেকদিন পর দেখা হল”।

বোরখা সরিয়ে রাঘব বললেন “হ্যাঁ”।

আব্বাস চমকে উঠে বলল “উফ, আপনি পুরো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। ভাবছিলাম হয়ে গেল বোধ হয়”।

রাঘব বললেন “গাড়ি এনেছি। নামো তাড়াতাড়ি”।

তিনজনে তাড়াতাড়ি নেমে হাঁটতে শুরু করল।

খানিকটা দূরে রাঘবের গাড়ি পার্ক করা ছিল।

তিনজনে গাড়িতে উঠে বসল।

আব্বাস বলল “ভাগ্যিস এসেছিলেন। নইলে আমি ভাবলাম আজকেও এই মিয়াঁ আমাকে এখানেই রেখে দেবে”।

রাঘব গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললেন “সে থ্যাঙ্কস টু সায়ক। লাহোরে থাকলে এতক্ষণে উপরওয়ালার কাছে পৌঁছে যেতে। ওখানে তোমাদের খোঁজে রীতিমত তল্লাশি শুরু হয়েছে”।

সায়ক হেসে বলল “স্বাভাবিক। দে হ্যাভ মেনি সিক্রেটস টু কিপ”।

রাঘব বললেন “প্ল্যান কী তোমার?”
সায়ক বলল “আজকের রাতে বিছানা চাই। ঘুমাব। আর কোন প্ল্যান নেই”।
রাঘব হাসতে থাকলেন, বললেন “ওকে ওকে”।
আব্বাস আবার গাড়ির মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।
কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের ডেরায় পৌঁছে গেল তারা।
আব্বাসকে ঠেলে তুলতে হল।
হাই তুলতে তুলতে আব্বাস বিরক্ত গলায় বলল “আবার সেই জায়গা। আর ভাল লাগে না মিয়াঁ”।
সায়ক হাসতে হাসতে বলল “চল ঘুমাও”।
রাঘব গাড়ি থেকে দুটো প্যাকেট বের করে বললেন “খেয়ে নিও”।
রাঘব বেরিয়ে গেলেন।
সায়ক আব্বাসকে নিয়ে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল।
আব্বাস বলল “তুমি খেয়ে নাও মিয়াঁ। আমার খিদে নেই”।
সায়ক বলল “নাহ। সেই লাহোরে খেয়েছিলে। এখন খেয়ে শক্তি সঞ্চয় কর। কাল কী আছে কে জানে?”
আব্বাস মুখ কালো করে বলল “এই জন্য না মিয়াঁ তোমাকে আমি নফরত করি। যেই একটু স্বাভাবিক কথা ভাবব, তুমি ঠিক বাগড়া দিয়ে ভয় দেখিয়ে দেবে”।
সায়ক প্যাকেটটা খুলল। বাখরখানি আর কাজু কিসমিস আছে। সে শুকনো বাখরখানি চিবোতে চিবোতে বলল “বাড়িতে এত রাতে ফিরলেও মা ভাত গরম করে দিত। যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হবে, বসে থাকত”।
আব্বাস বলল “মাকে ফোন করতে পারো তো মিয়াঁ”।
সায়ক বলল “কী দরকার? উই অল হ্যাভ সিক্রেটস টু কিপ”।
আব্বাস মুখ শুকনো করে বলল “এসব কথা কেন বলতে গেলে? আমারও এবার বাড়ির জন্য মন খারাপ করতে শুরু করল”।
সায়ক বলল “খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। মন খারাপ আমাদের জন্য না”।
আব্বাস গজগজ করতে করতে খেতে শুরু করল।
#
সকাল ন'টা।
আব্বাসের ঘুম ভাঙল। সে উঠে সায়ককে ঠেলে তুলল।
বলল “আমি মার্কেট যাচ্ছি মিয়াঁ”।
সায়ক বলল “কেন?”
আব্বাস বলল “আরে কিছুই তো নেই। রান্না করে খাই আজ। বাইরে খেয়ে খেয়ে পেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে”।
সায়ক বলল “এখন বেরোবে?”
আব্বাস বলল “হ্যাঁ। বেশিক্ষণ লাগবে না। দেখি তুমি কাল মাছ মাছ করছিলে, কোন মাছ পাওয়া যায় নাকি”।
সায়ক হেসে বলল “ওকে। তাড়াতাড়ি আসবে। বেশি দেরী করবে না”।
আব্বাস তৈরী হয়ে বেরোল। সায়ক উঠে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে দরজা খুলে বাইরের দিকে উঁকি মারল। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে।
রাস্তার পাশেই বাড়িটা। প্রচুর লোকের আনাগোনা। এই ধরণের ডেরা জনবহুল এলাকাতেই রাখা হয় যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে।
সায়ক রুমে এসে আবার শুল। গত দুদিন ধরে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি হয়েছে। শরীর অবসন্ন লাগছিল।

ক্লান্তিতে আবার চোখ বুজে এল তার।

ঘুম ভাঙল দরজার নকের শব্দে। সায়ক সচেতন ছিল। উঠে দরজার কাছে গিয়ে বলল "কে?"

ওপাশ থেকে রাঘবের গলা ভেসে এল "আমি। খোল শিগগির"।

সায়ক দরজা খুলতেই রাঘব ঘরে ঢুকে বললেন "এখনই এ ডেরা ছাড়তে হবে"।

সায়ক অবাক গলায় বলল "কেন? আব্বাস ফেরেনি তো এখনও"।

রাঘব সায়কের দিকে তাকিয়ে বললেন "আব্বাস অ্যারেস্টেড। জাস্ট লিভ উইথ মি। নাও"।

৩৫

বীরেন রাতে তুষারের সঙ্গেই ছিল। তুষার বাড়ি যান নি।

শেষ রাতের দিকে নার্সিং হোমের ভিজিটরস রুমের বেঞ্চে বীরেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সকাল ন'টা নাগাদ ঘুম ভাঙতে দেখল তুষার চুপ করে বসে আছেন।

বীরেন তাড়াতাড়ি উঠে বলল "গুড মর্নিং স্যার"।

তুষার বললেন "গুড মর্নিং বীরেন। তবে এই মর্নিংটা অত ভাল না আমাদের কাছে"।

বীরেন বলল "ম্যাডাম ঠিক আছেন তো?"

তুষার বললেন "হ্যাঁ, ও ঠিক আছে, হয়ত আজকে জ্ঞানও ফিরে আসবে"।

বীরেন অবাক হয়ে বলল "তবে?"

তুষার অস্বস্তির সঙ্গে বললেন "সমস্যা একটা হয়েছে। এখন সেটা তোমাকে বলতে পারছি না। তুমি আমাদের গেস্ট হাউজে চলে যাও। এখানে থেকো না"।

বীরেন মাথা নাড়ল "না না স্যার, তা হয় না। আমি থাকছি। আমার কোন প্রবলেম নেই"।

তুষার বললেন "প্রবলেম নেই তো?"

বীরেন বলল "না স্যার"।

তুষার বললেন "মিনিস্ট্রি থেকে প্রচুর ফোন আসছে। আমাকে হয়ত ডিফেন্স মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তুমি তবে এখানেই থেকো। কোন রকম খবর এলে আমাকে ফোন করে দিও"।

বীরেন ঘাড় নাড়ল "ওকে স্যার"।

তুষার বীরেনের কাঁধে হাত রেখে বললেন "থ্যাংকিউ"।

বীরেন চুপ করে থাকল। তার ভেতরে যে ঝড়টা যাচ্ছে সেটা তুষারকে বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

তুষার বেরোলেন। ড্রাইভারকে বলা ছিল, তাকে সরাসরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বাংলোতে নিয়ে গেল।

মন্ত্রীর বাড়ির গেটে তুষারের আইডেন্টিটি কার্ড দেখা মাত্র নিরাপত্তারক্ষীরা ছেড়ে দিল। দলীয় কর্মীরা বাইরের ঘরে দল বেঁধে বসে ছিল। তুষার ফোন করলেন। তাকে মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক এসে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন।

মন্ত্রী বেডরুমেই ছিলেন। খানিকক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

তাকে দেখে উঠে বসে বললেন "আসুন তুষার, আপনার ওয়াইফ ভাল আছেন তো?"

তুষার চেয়ারে বসলেন। ঘরে যারা ছিলেন মন্ত্রী তাদের বেরিয়ে যেতে বললেন। ঘর ফাঁকা হতে তুষার বললেন "হ্যাঁ স্যার। শি ইজ ইমপ্রুভিং"।

মন্ত্রী চিন্তিত গলায় বললেন "এটা একটা গেল। এবার সেকেন্ডটায় আসি। খবরটা সত্যি?"

তুষার বললেন "কোন খবরটা স্যার?"

মন্ত্রী বললেন "আপনার লোক ইসলামাবাদে অ্যারেস্ট হয়েছে?"

তুষার মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনাকে কে বলল স্যার?"

মন্ত্রী বললেন "কাম অন তুষার, আমি জানব না তো কে জানবে? আমার তো ঘুমই ভাঙল এই খবরে"।
তুষার বললেন "হ্যাঁ স্যার, এই খবরটা দিতেই আমি এখানে এসেছিলাম"।
মন্ত্রী বললেন "এবার কী প্ল্যান আপনার?"
তুষার বললেন "চিন্তার কিছু নেই স্যার। ও কিছুই বলবে না"।
মন্ত্রী বললেন "কাগজপত্র? পাসপোর্ট?"
তুষার বললেন "কিছু নেই"।
মন্ত্রী বললেন "তবু... পাকিস্তান মিডিয়া দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। বুঝতে পারছেন এর কনসিকোয়েন্সেস কী হতে পারে। আমরা কি কিছুই করতে পারি না?"
তুষার হাসলেন "না স্যার"।
মন্ত্রী বললেন "আর ছেলেটার ফ্যামিলি? তাকে কি জবাব দেবেন?"
তুষার বললেন "যেভাবে আর পাঁচটা জওয়ানের পরিবারকে আমরা কিছু জবাব দিতে পারি না স্যার"।
চা দিয়ে গেল। মন্ত্রী চায়ের কাপ হাতে তুলে বললেন "কিছু একটা তো করুন তুষার। পি এম ফোন করেছেন অলরেডি"।
তুষার বললেন "চিন্তা করবেন না স্যার। আব্বাসের সম্পর্কে কোন অফিসিয়াল নথি নেই। আব্বাস নিজেও স্বীকার করবে না কিছু, ওকে যত অত্যাচার করাই হোক। আমরা আমাদের ছেলেদের সেভাবেই ট্রেইন করি। মরে যাবে, কিন্তু মুখ খুলবে না"।
মন্ত্রী তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি জানেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড থেকে আমাদের কাছে ক্রিকেট খেলার প্রস্তাব এসেছে গতকাল?"
তুষার বললেন "না স্যার। জানা উচিত ছিল। কাল স্বাভাবিক দিন গেলে নিশ্চয়ই জেনে যেতাম"।
মন্ত্রী বললেন "তা বটে। সত্যিই আপনার কাছে কালকের দিনটা নাইটমেয়ার ছিল। যাই হোক, দে ওয়ান্ট টু প্লে আ ফুল সিরিজ উইথ আস, ইন পাকিস্তান। পিসিবির অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়, সেটা ইমপ্রুভ করার জন্য ওরা বিসিসিআই এর হেল্প চাইছে"।
তুষার হেসে ফেললেন।
মন্ত্রীও হেসে বললেন "ওরা চায় সিরিজের শেষে আমাদের পি এম ইসলামাবাদে যান। শান্তি আলোচনা এটসেট্রা"।
তুষার বললেন "পি এম কী চাইছেন?"
মন্ত্রী বললেন "আপনার মতামত"।
তুষার মুখের হাসি বজায় রেখে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৩৬

ভারতের হাইকমিশনারকে প্রেসিডেন্ট হাউজে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ড্রয়িং রুমে বসিয়ে প্রেসিডেন্ট নিয়াজিকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিয়াজি ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করা মাত্র হাইকমিশনার নমন সিব্বাল উঠে দাঁড়ালেন।
প্রেসিডেন্ট নিয়াজি এগিয়ে এসে নমন সিব্বালের হাত ধরে বললেন "আপনাকে তড়িঘড়ি প্রেসিডেন্ট হাউজে ডেকে পাঠানোর জন্য আমি খুবই দুঃখিত নমন সাহাব"।
নমন প্রত্যুত্তরে হেসে বললেন "কোন সমস্যা নেই। নিশ্চয়ই কোন সমস্যা হয়েছে, আমি দেরীও করি নি আপনার হাউজ থেকে ফোন আসার পরে"।
নিয়াজি বসে বললেন "প্লিজ বসুন"।
নমন বসলেন।

নিয়াজি বললেন “ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ডকে পিসিবি আমন্ত্রন জানিয়েছে ক্রিকেট খেলার জন্য। এই খবরটা কি আপনাকে কেউ জানিয়েছে?”

নমন বললেন “হ্যাঁ। আমি আজ সকালে নিউজ পেপার পড়ে জানলাম”।

নিয়াজি মাথা নেড়ে বললেন “দিস রিপোরটারস! সব সময় ওত পেতেই আছে। যাক গে, এতে অবশ্য কোন সমস্যা নেই। আমি আপনাকে এই জন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলাম”।

নমন বললেন “বলুন, এই বিষয়ে আমি কী করতে পারি”।

নিয়াজি বললেন “দেখুন জনাব, আপনি আশা করি জানেন, এই মুহূর্তে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড একটা মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তারাই আমার কাছে এই আর্জিটা নিয়ে এসেছিল। পিসিবির খেলা বেশিরভাগই এখন দুবাই বা আবুধাবিতে করতে হচ্ছে। এর ফলে সে মাঠে লোকও হচ্ছে না। পাকিস্তান বোর্ডে সেভাবে কোন টাকাও আসছে না। এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান সিরিজ হলে বুঝতেই পারছেন আমাদের দেশের পক্ষে সেটা কতটা লাভজনক হতে পারে। সব থেকে বড় কথা, আমরা তো কখনই ক্রিকেট আর রাজনীতিকে মেলাতে চাই নি। ক্রিকেটই পারে দু দেশের মধ্যে টেনশন কমাতে। এবার নিশ্চয়ই ইন্ডিয়া থেকে আপনার কাছেও একটা মতামত চাওয়া হবে এই বিষয়ে। আমি চাইব আপনি একটা পজিটিভ ফিডব্যাক দেবেন পাকিস্তান সম্পর্কে। আপনার কি মনে হয় না পাকিস্তান এই মুহূর্তে নিরাপদ হাতে রয়েছে?”

নমন বললেন “অবশ্যই নিরাপদ হাতে আছে। এও জানি ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম পাকিস্তানে এলে নিরাপত্তার অভাব কোনভাবেই বোঝা যাবে না। তবে...”

নিয়াজি বললেন “আপনি বুঝি আমার ওপর হওয়া হামলাটা নিয়ে কিছু বলতে চাইছিলেন?”

নমন হেসে বললেন “পাকিস্তানি মিডিয়া আসলে ব্যাপারটাকে এমনভাবে রিপ্রেসেন্ট করেছিল...”

নিয়াজি বললেন “ঠিকভাবেই করেছিল। আমি নিজেও ভাবতে পারি নি কোন দিন এভাবে হামলা হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখুন, ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টারদের ওপরেও তো হামলা হয়েছিল তাই না? ইন্দিরা গান্ধী কিংবা রাজীব গান্ধীকে তো ইন্ডিয়ানরাই খুন করেছিল। তা বলে কি ইন্ডিয়াতে কোন টিম খেলতে যাবে না? দেখুন জনাব, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের নিরাপত্তা আমরা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে সবার নিরাপত্তার দায় নিতে রাজি আছি। আমি চাইব, এই সিরিজটা যেন অবশ্যই সংঘটিত হয়”।

নমন বললেন “আমি আপনার বার্তা ইন্ডিয়াতে এখনই পাঠানোর ব্যবস্থা করছি”।

নিয়াজি বললেন “থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। প্লিজ হ্যাভ ব্রেকফাস্ট উইথ মি জনাব”।

নমন বললেন “আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আমি অলরেডি ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি স্যার”।

নিয়াজি দুঃখিত হবার মুখ করে বললেন “আমার দুর্ভাগ্য”।

পরক্ষণেই কিছু একটা মনে পড়েছে এরকম মুখ করে বললেন “ওহ, আপনাকে একটা কথা জানাই। আজ সকালে একজনকে ইন্ডিয়ান স্পাই সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরকম কোন খবর আপনি শুনেছেন?”

নমন আকাশ থেকে পড়ার মুখ করে বললেন “ইন্ডিয়ান স্পাই? সেকী? এরকম কিছু আছে সে সম্পর্কে তো আমার কোন ধারণাই ছিল না মিস্টার নিয়াজি”।

নিয়াজি মাথা নেড়ে বললেন “আমারও তাই। আমরা তো বরাবরই দুদেশের সু সম্পর্ক বজায় থাকুক সেটাই চেয়েছি। তবে কী জানেন জনাব, এই স্পাইটিকে পেশোয়ারে এবং লাহোরে আমাদের ইন্টেলিজেন্স স্পট করেছিল। বেচারির ভাগ্য খারাপ যে সে ভেবেছিল হয়ত আমরা তাকে ধরতে পারব না। আরেকজনও আছে... কী নাম যেন তার...”

নমন চুপ করে রইলেন।

নিয়াজি বললেন “আহ, ছাড়ুন। তার নামটা আমি মনে করতে পারছি না। তবে পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া কোন দুর্ঘটনার সঙ্গে যদি এদের কোন লিংক প্রমাণিত হয় তবে কিন্তু সমস্যা হতে পারে জনাব”।

নমন বললেন "আমি এই ব্যাপারে একেবারেই অন্ধকারে জনাব। সেরকম কিছু হলে আমি অবশ্যই সমর্থন করব না। আপনার মত আমিও চাইব দু দেশের সম্পর্কের যেন কখনোই পতন না হয়"।

নিয়াজি বললেন "মাশাল্লাহ। আপনার কাছে আমি এটাই শুনতে চেয়েছিলাম জনাব"।

নমন উঠে বললেন "আমি এবার অফিসের পথে রওনা হব স্যার। আমাকে অনুমতি দিন"।

নিয়াজি উঠে দাঁড়িয়ে নমনকে বিদায় দিলেন। নমন চলে গেলে নিয়াজি মনে মনে বললেন "কূটনীতি হল দাবা খেলার মত। সবাই দেখতে পাবে তুমি রাণী বাঁচাতে নিজের সৈন্যকে কুরবান করছ কিন্তু কেউ স্বীকার করবে না। কেয়া বাত। কেয়া বাত"।

৩৭

সকাল এগারোটা। ইসলামাবাদ ছাড়িয়ে গাড়িটা এগিয়ে চলেছে হাইওয়ে ধরে।

সায়ক গম্ভীর হয়ে বসে আছে।

রাঘব বললেন "প্ল্যান কী?"

সায়ক বলল "কোন প্ল্যান নেই। মাথায় শুধু ঘুরছে আব্বাসকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলাম"।

রাঘব মাথা নেড়ে বললেন "আব্বাসকে ভুলে যেতে হবে সায়ক। এছাড়া আর কোন উপায় নেই"।

সায়ক বলল "স্বাভাবিক। আমি যেদিন ধরা পড়ব, সেদিনও ভারত সরকার সেটাই বলবে"।

রাঘব বললেন "আমার ক্ষেত্রেও। আমাদের কাজটাই তাই"।

সায়ক চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল "আব্বাসকে ওরা ধরেছে মানে আমাকেও ট্রেস করেছে"।

রাঘব বললেন "কী করে বুঝছ?"

সায়ক বলল "আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন?"

রাঘব বললেন "মুজফফরাবাদ"।

সায়ক মাথা নাড়ল "হু। আমারও সেটাই ধারণা ছিল"।

রাঘব বললেন "মানে?"

সায়ক বলল "কত টাকা দিয়েছে আপনাকে? নাকি ফ্যামিলির কাউকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?"

রাঘব চমকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন "এসব তুমি কী বলছ সায়ক?"

সায়ক তড়িৎ গতিতে পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে রাঘবের গলায় তাক করে বলল "আমাদের বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে, মামদোবাজি। এখন সেটাই বলছি। মামদোবাজি হচ্ছে? আব্বাস ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বুঝে গেলেন আর আমাকে নিয়ে মুজফফরাবাদ চললেন?"

শীতল আবহাওয়া সত্ত্বেও রাঘবের ঘাম হওয়া শুরু করল। বললেন "ওদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না সায়ক। ওরা ডেঞ্জারাস। তুমি বুঝতে পারছ না ওরা..."

সায়ক বলল "ওরা আমাদের ফলো করছে?"

রাঘব চুপ করে থাকলেন।

সায়ক রাঘবের মুখে জোরে একটা ঘুষি মেরে বলল "চুপ করে থাকবেন না। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে কোন রকম কম্প্রোমাইজ আমি সহ্য করব না রাঘব ভাটিয়া। যা হয়েছে বলুন"।

রাঘব কেঁদে ফেলে বললেন "দে হ্যাভ মাই ডটার সায়ক। আমি কী করব বল"।

সায়ক বলল "বুঝেছি। এরকমই কিছু একটা সন্দেহ করেছিলাম। কী ইন্সট্রাকশন আছে আপনার ওপর"?

রাঘব বললেন "তোমাকে নিয়ে মুজফফরাবাদে যেতে হবে। ওখানে ওরা তোমাকে হ্যান্ড ওভার নেবে"।

সায়ক বলল "তারপর ওরা আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে তার কোন নিশ্চয়তা আছে?"
রাঘব বললেন "যতক্ষণ না ওরা জানবে তুমি কিছু জানো না আছে নিশ্চয়ই। আমার মেয়েটা..."
রাঘবের গলা ধরে এল।
সায়ক মাথায় হাত দিয়ে বসে বলল "আপনি আমাকে আগে হিন্ট দিতে পারতেন"।
রাঘব ধরা গলায় বললেন "আমার কিছু করার ছিল না সায়ক। অ্যাজ ইউজুয়াল আমি আমার ডেরায় ছিলাম। ওরা এসে বেধড়ক মারল আমায়। আমার মেয়ের ছবি দেখিয়ে বলল দে হ্যাভ মাই ডটার। বউয়ের সঙ্গে কথা বলাল। আমি কী করব বল? আমাদের দেশের ভেতর থেকেই ইনফরমেশন লিক হচ্ছে। নইলে ওরা কী করে জানবে আমার সম্পর্কে?"
সায়ক বলল "আমার হাতে এখন দুটো অপশন খোলা আছে ভাটিয়া সাহেব। আপনি চুজ করুন একটা"।
রাঘব বললেন "আমি আমাকে নিয়ে ভয় পাই না সায়ক, কিন্তু আমার মেয়েকে নিয়ে তো পাই। এক্সট্রিমিস্টরা কী ভয়ানক হতে পারে তুমি জানো। এবার তুমিই বল বাবা হিসেবে কী করার আছে আমার"।
সায়ক চুপ করে কিছুক্ষণ ভেবে বলল "ওকে। ড্রাইভ দেন"।
রাঘব অবাক গলায় বললেন "মানে?"
সায়ক বলল "মুজফফরাবাদে নিয়ে যান আমায়। কী আর হবে? মেরে ফেলবে। এর বেশি তো কিছু হবে না। দেখুন এর পুরস্কারস্বরূপ আপনার মেয়েকে ফেরত পান কিনা"।
রাঘব মাথা নাড়িয়ে বললেন "এটা সলিউশন হয় না"।
সায়ক বলল "আপনার সেটা আগে ভাবা উচিত ছিল"।
রাঘব বললেন "আমার ভাবার ক্ষমতা তখনই চলে গেছিল যখন ওরা আমার মেয়েকে নিয়ে ব্ল্যাকমেল করল। তুমি গাড়িটা নিয়ে চলে যাও সায়ক। আমাকে আধমড়া করে রেখে যাও। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব না হয় তুমি জেনে গেছিলে। যা হয় দেখা যাবে"।
সায়ক বলল "আপনি গাড়ি থেকে নেমে যান। যা করার আপনি করুন"।
রাঘব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে বললেন "বেস্ট অফ লাক সায়ক"।

৩৮

বীরেন নার্সিংহোমের ভিজিটরস রুমে বসে ছিল। বার কয়েক অজানা নাম্বার থেকে ফোন এসেছে। ধরে নি। কিন্তু প্রতিবারই বাড়িতে ফোন করে খবর নিয়েছে সব ঠিক আছে কী না।
আশরফ নার্সিং হোম এলেন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ।
বীরেনকে দেখে বললেন "কোন আপডেট আছে?"
বীরেন মাথা নাড়ল।
আশরফ বললেন "তোমার ফোনে দেখা যাচ্ছে একটা ব্ল্যাঙ্ক নাম্বার থেকে ফোন আসছে। কী বলছে ওরা?"
বীরেন চমকে আশরফের দিকে তাকাল।
আশরফ বললেন "ভয় পাওয়ার কিছু নেই বীরেন, আমাদের টিমের সবার নাম্বারই আমাদের আইটি ডিপার্টমেন্টকে বলে ট্রেস করানো হয়। কে কোথায় ফোন করছে না করছে আমাদের কাছে ইনফরমেশন থাকে। এখানে আসার আগেই দেখলাম তোমার ফোনে এরকম একটা ফোন এসেছে কাল থেকে। আমাকে কি বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করবে?"
বীরেন চারদিকে তাকাল।
আশরফ বললেন "এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো"।
আশরফ সিট থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করলেন। বীরেন আশরফকে অনুসরণ করল।

কয়েক মিনিট পরে আশরফ একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে বলল "কী চাইছে ওরা?"

বীরেন গড় গড় করে সব কথা আশরফকে বলল।

আশরফ তার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত গলায় বললেন "ওরা বার বার তোমাকে টার্গেট করছে। কেন করছে তোমার কাছে কোন হিন্ট আছে?"

বীরেন বলল "না স্যার। বুঝতে পারছি না"।

আশরফ বললেন "তোমার ডিফেন্স একজামে সব বিভাগে ভাল রেজাল্ট করার পরেও ফেল হওয়া থেকে ওরা তোমাকে টার্গেট করেছে। তোমায় সায়ক বড়ালের আইডেন্টিটি দিয়ে কাশ্মীর পাঠিয়েছে, ইনডাইরেক্টলি দিল্লি ব্লাস্ট করিয়েছে, মুম্বইতে উড়িয়ে দেওয়ার প্ল্যান করেছে, ওখানে বেঁচে যাওয়ার পরে আবার পাকিস্তান নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছে, এবং এখন আবার তোমাকে দিয়ে জ্যোতির্ময়ের কাছে ডিভাইস পাঠানোর প্ল্যান করছে। কিন্তু ওদের এত নেটওয়ার্ক স্ট্রং হওয়া সত্ত্বেও ওরা তোমায় এই ফোনেই ফোন করে ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে। সামথিং ইজ নট রাইট বীরেন। তুমি নিজে ভাবো, ঠিক কী কারণে ওরা তোমায় টার্গেট করছে। এভাবে সফট টার্গেট করা সহজ কারণ তুমি নতুন, ফ্যামিলির ওপর অ্যাটাকের কথা বলে তোমাকে ভয় পাওয়ানোও সহজ। কিন্তু হোয়াই ইউ?"

বীরেন বলল "স্যার আমিও তো এটাই ভেবে যাচ্ছি। ইন ফ্যাক্ট ওই নাম্বার থেকে ফোন করে আমাকে বলা হয়েছে আমি নাকি ওদেরই দলের লোক"।

আশরফ থমথমে মুখে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "আই অ্যাম অ্যাফরেড বীরেন, তোমাকে ছুটিতে পাঠাতে হবে"।

বীরেন বলল "চাকরিটা চলে যাবে স্যার?"

আশরফ মাথা নাড়লেন "না, চাকরি যাবে না। কিন্তু তোমাকে আমরা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রাখতে পারব না। থাকলে রিস্কটা তোমারও বাড়বে, আমাদেরও বাড়বে। তুমি আজই বাড়ি যাও। আমি অফিসে কথা বলে তোমার কলকাতার ফ্লাইটের টিকিট করিয়ে দিচ্ছি। তুষার স্যারের সঙ্গেও তোমার ব্যাপারে কথা বলছি। তুমি তোমার ফ্যামিলির কাছে যাও, ওদের সঙ্গে সময় কাটাও"।

বীরেন বলল "কতদিন স্যার?"

আশরফ বললেন "টিল ফারদার ইন্সট্রাকশন। তুমি এখানে থেকো না"।

বীরেন মাথা নিচু করে বসে বলল "ইরাবতী ম্যাডামের এই অবস্থা, আমি চলে গেলে সেটা কি ভাল হবে?"

আশরফ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীরেনের কাঁধে হাত রেখে বললেন "এই মুহূর্তে তুমি এখানে থাকলে আরও কী কী হতে পারে সেটা আমিও জানি না। তুমি আমার জীবন দিয়েছ বীরেন, তুমি না থাকলে সেদিনই কাশ্মীরে আমার শেষ দিন হত, তোমাকে কোন রকম বিপদে ফেলতে আমি পারব না। কিন্তু আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, ব্লু ফ্লাওয়ার মিশনে তোমায় ওরা একটা তাস হিসেবে ইউজ করছে। সেটার সিগনিফিক্যান্স কী, আমি এখনও ক্র্যাক করতে পারি নি"।

বীরেনের ফোন বেজে উঠল। বীরেন দেখল আননোন নাম্বার।

বীরেন ধরল না ফোনটা। আশরফ বীরেনের কাঁধে হাত দিলেন।

বললেন "চিন্তা কোর না, সব ঠিক হয়ে যাবে"।

৩৯

অমৃতসরের আগে একটা গ্রামে কাদরীর গাড়িটা যখন থামল তখন দুপুর গড়িয়েছে। গাড়ির পেছনের সিটে ইসমাইল ঘুমাচ্ছিল।

কাদরী ইসমাইলকে তুললেন।

ইসমাইল বলল “পৌঁছে গেলাম প্রোফেসর সাহাব?”

কাদরী বললেন “এসো”।

এ গ্রামের বাড়ি অধিকাংশই বর্ধিষ্ণু কৃষকের। এ বাড়িটাও অনেক জায়গা নিয়ে। বড় গেট পেরিয়ে ঢুকতে হয়েছে।

ইসমাইল বলল “গা হাত পা ব্যথা হয়ে গেছে প্রফেসর সাহাব। খিদেও পেয়েছে। গোস্তের ব্যবস্থা হবে তো?”

কাদরী হেসে বললেন “দেখা যাক”।

দুজনে বাড়িতে প্রবেশ করলেন।

বাড়ি ভর্তি লোক। হৈ হৈ ব্যাপার। ইসমাইল কাদরীকে বলল “ভুল বাড়িতে এলাম না তো?”

কাদরী হেসে বললেন “চলে এসো দোতলায়”।

সিঁড়ি ভেঙে তারা দোতলায় পৌঁছল। একটা মাত্র বড় ঘর দোতলায়। বাকিটা ছাদ। ঘরের দরজায় গিয়ে কাদরী নক করতে লাগলেন।

এক যুবক দরজা খুলল।

কাদরী বিরক্ত গলায় বললেন “কী করছিলে এতক্ষণ ধরে আসলাম?”

আসলাম বলল “মেইল চেক করছিলাম স্যার। আসুন”।

কাদরী ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে বললেন “এসো”।

দুজনে ঘরে প্রবেশ করল।

নোংরা ঘর। কাদরী আসলামকে বকতে শুরু করলেন ঘরের পরিস্থিতি দেখে। আসলাম চুপ করে শুনল।

অনেকক্ষণ বকা ঝকার পর কাদরী বললেন “খাওয়ার কী ব্যবস্থা আছে?”

আসলাম একটা মাদুর পেতে দিল। কাদরী ইসমাইলকে বললেন “বস”।

ইসমাইল বসল। আসলাম মাংস রুটি বেড়ে দিল থালায়। দুজনে ক্ষুধার্তের মত সেগুলো খেল।

খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে উঠে কাদরী আসলামকে বললেন “কী ইমেল এসেছে?”

আসলাম ইসমাইলকে দেখিয়ে বলল “সবাই ওর খোঁজ করছিলেন”।

কাদরী হেসে ইসমাইলকে বললেন “তুমি তো বিখ্যাত লোক হে”।

ইসমাইল বলল “বিখ্যাত তো বটেই জনাব। এখান থেকে ফোন করা কি নিরাপদ হবে?”

কাদরী বললেন “মেইল কর। কোড ইউজ কর। ফোন করার দরকার নেই”।

ইসমাইল কম্পিউটারে বসল। দরজায় নকের শব্দ হল।

কাদরী পকেট থেকে বন্দুক বের করতে যাচ্ছিলেন। আসলাম হাত দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করে বলল “আমি দেখছি”।

আসলাম দরজা খুলল। এক মেয়ে ট্রেতে তিনটে লস্যির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসলামের ট্রে হাতে দিয়ে চলে গেল।

কাদরী রাগী গলায় বললেন “কে?”

আসলাম সংকুচিত হল খানিকটা “বাড়িওয়ালার মেয়ে। খোঁজখবর নেয় আর কী”।

কাদরী বললেন “তোমাকে কতবার বলেছি মেয়েলি কেসে জড়াবে না?”

আসলাম ঘামছিল। ইসমাইল আসলামের হাতের থেকে গ্লাস নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল “আহ। লা জবাব। অত চিন্তা করবেন না প্রফেসর সাহাব। যদি মেহমাননওয়াজীর জন্য আসলাম আমাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন তাহলে আমি দুঃখিত হব না”।

আসলামের চোখটা এক সেকেন্ড জ্বলে উঠেই স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ইসমাইল সেটা দেখে বলল “ইশক বহুদূর এগিয়েছে বুঝি আসলাম মিয়াঁ?”

আসলাম আমতা আমতা করে বলল “না মানে জনাব, তেমন কিছু না”।

ইসমাইল গ্লাস রেখে মুহূর্তের মধ্যে আসলামের গলা টিপে ধরল, আসলামের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, কাদরী গলা নিচু করে ধমকালেন “কী হচ্ছে?”

ইসমাইল আসলামকে ঠেলে ফেলে দিল। মাটিতে গড়িয়ে পড়ল আসলাম। আসলামের পিঠে জোরে একটা লাথি মেরে ইসমাইল বলল “আমাকে চোখ গরম দেখাচ্ছে মাদারচোদ। সাহস কত বড়। জানিস আমি কে? জানিস?”

আসলাম মাথা নিচু করে বসে রইল।

কাদরী চেয়ার টেনে বসে ঠান্ডা গলায় আসলামকে বললেন “তোমাকে যা যা বলা হয়েছিল তার কোনটাই মেনে চল নি বোঝা যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা করছে তোমায় এখনই কুরবানী দিয়ে দি। সময় এলে তাই দেব বটে। ভুলে যেও না কত ঝামেলা করে এখানে তোমায় নিয়ে আসা হয়েছে। মেয়েদের দেখে জিভ বের করার জন্য আনা হয় নি”।

ইসমাইল আরেকটা লাথি কষাল আসলামের পিঠে। আসলাম যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল কিন্তু কোন শব্দ করল না।

ইসমাইল কাদরীর দিকে তাকিয়ে বলল “এ বিশ্বাসযোগ্য তো?”

কাদরী থমথমে মুখে আসলামের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৪০

রাঘব ভাটিয়াকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে সায়ক গাড়ি ঘুরাল ইসলামাবাদের দিকে।

ঘন্টাখানেক পরে সে মারগালায় ইসলামাবাদ রেলস্টেশনে পৌঁছে গাড়িটা রেখে দেখল প্ল্যাটফর্মে করাচী ক্যান্টনমেন্ট যাওয়ার ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। কোন কিছু চিন্তা না করে সে করাচীর টিকেট কেটে ট্রেনে উঠে পড়ল।

গাড়ির ড্যাশ বোর্ড বক্সে চেক করে বেশ কিছু পাকিস্তানী টাকা পাওয়া গেছিল। সেখান থেকে টিকেটের টাকা হয়ে গেল। ট্রেনের জেনারেল কামরায় ভিড় গিজগিজ করছে। সায়কের ভিড়ে মিশে যেতে অসুবিধা হল না।

সায়কের পাশে একটা পরিবার বসেছে। চার পাঁচটা বাচ্চা খিল খিল করে হাসছে। সবক'টা বাচ্চা বসার জায়গা পায় নি। সায়ক একটা বাচ্চাকে কোলে বসাল। বাচ্চার বাবা হাসিমুখে তাকে জিজ্ঞেস করল “আপনি কি করাচী যাবেন ভাইসাব?”

সায়ক বলল “না, রাওয়ালপিন্ডি নেমে যাব”।

বাচ্চার বাবা মুষড়ে পড়ল “ওহ, আপনি থাকলে ভাল হত। দেখছেন না বাচ্চাগুলোকে সামলানো কত কঠিন। আমার বেগম তো অস্থির হয়ে যাচ্ছে”।

সায়ক হাসল। বাচ্চাগুলো কিচির মিচির করে চলেছে।

সায়ক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানবজন্মের এই সময়টাই সব থেকে ভাল। এরপরেই তারা দেশ, ধর্ম, বর্ণ সহ বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

কথোপকথনে জানা গেল বাচ্চার বাবার করাচীতে রেস্তোরাঁ আছে। ছেলে মেয়ে নিয়ে তারা কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছিল। তাদের গোটা কাশ্মীর দেখারই ইচ্ছা ছিল কিন্তু পাকিস্তানি আর্মি মুজফফরাবাদের পর রাস্তা আটকে দিয়েছে। সাধারন মানুষের জন্য প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছে। বাচ্চার বাবাকে বেশ বিমর্ষ দেখাল।

বাচ্চাদের মা সবার জন্য খাবার দিলেন। সায়ককেও দিলেন।

সায়ক না করল না। প্রচন্ড খিদে পেয়েছিল বুঝতে পারল খাওয়ার সময়। ভদ্রলোকের স্ত্রীও কী করে যেন বুঝলেন সেটা। তাকে আরও দুটো বেশি রুটি দিলেন।

সায়ক আশ্চর্য হল না। মায়েরা সব দেশেই একই হন। ক্ষুধার্তের কষ্ট তারা ঠিক বুঝতে পারেন।

অতি অল্প সময়েই এই পরিবার তাকে আপন করে নিয়েছিল। ট্রেন থেকে নামার সময় যে বাচ্চা তার কোলে বসেছিল সে চাচু চাচু করে কান্না আরম্ভ করল। ভদ্রলোক তার কার্ড দিলেন সায়ককে।

ট্রেন থেকে নেমে সায়ক বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে হাঁটল। জমি খন্ডের জন্য এই মানুষই পিশাচ হয়ে যায়। কী অদ্ভুত এই রাজনীতি। অথচ এক সময় গোটাটাই ভারতবর্ষ ছিল। এক দেশভাগ সব কিছু তছনছ করে দিল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে অটো নিয়ে সায়ক গরডন কলেজ রোড পৌঁছল। রাওয়ালপিন্ডির সবচেয়ে প্রাচীন এলাকা এই রাস্তায়। পুরনো সব বাড়ি, কম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন কোন বাড়ি ভেঙে পড়ছে। রাস্তার পাশ দিয়ে উত্তর কলকাতার মত সরু সরু গলি।

সায়ক অনেকটা রাস্তা গলি দিয়ে হেঁটে একটা চারতলা বিল্ডিঙে পৌঁছল। বিল্ডিঙে লিফট নেই।

সায়ক সিঁড়ি ভেঙে দোতলা পৌঁছে একটা ঘরের সামনে নক করল।

এক যুবতী দরজা খুলল।

সায়ককে দেখে বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

সায়ক বলল "ওভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমি বেঁচে আছি, দেখতে পাচ্ছো তো"!

যুবতী দরজা ছেড়ে দিল।

সায়ক ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল "তোমার বাবা কোথায় মেহের? তুমি চিন্তা কোর না, নিতান্ত নিরূপায় হয়ে আমি এখানে এসেছি। আজকের দিনটা থেকেই চলে যাব"।

মেহের তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল "পানি দেব?"

সায়ক বলল "দাও"।

মেহের রান্নাঘর থেকে তার জন্য গ্লাসে জল এনে দিল।

সায়ক গোটা গ্লাসটা এক চুমুকে খেয়ে বলল "তোমার বাবা কোথায় বললে না তো?"

মেহের বলল "লাহোর গেছেন। তিন দিন পর ফিরবেন"।

সায়ক বলল "শিট। তাহলে তো আমার থাকাটা সমস্যা হয়ে গেল"।

মেহের বলল "কেন? আমি মানুষ নোই?"

সায়ক বলল "তা নয়, কিন্তু এখানে থাকাটা..."

মেহের বলল "থাকুন। আমি পাশে ফুপার বাড়ি গিয়ে থাকব"।

সায়ক বলল "আর কেউ জিজ্ঞেস করলে?"

মেহের বলল "আপনাকে সবাই চেনে। জানে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে। অসুবিধা হবে না"।

সায়ক সোফায় হেলান দিয়ে বলল "যাক। তাহলে নিশ্চিন্ত"।

মেহের বলল "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? আপনি সত্যি বলবেন? আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন?"

সায়ক হেসে মেহেরের দিকে তাকিয়ে বললেন "ব্যবসা বাড়াচ্ছি মেহের। বিয়ে করতে হবে তো তোমাকে, এত কম রোজগারে আজকাল সংসার চলে? তুমিই বল। পেশোয়ারে গেছিলাম আম্মির এক বন্ধুর কাছে। ভাল খবর আছে। হয়ে যাবে হয়ত ব্যবসাটা, তাহলেই তো নিশ্চিন্ত, কী বল?"

মেহের অবিশ্বাসী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বীরেন বাড়ি ফিরল রাত দশটা নাগাদ। বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আশরফ খান তাকে দিল্লিতে থাকতে দিলেন না। বললেন পরিবারের কাছে যাও। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন।

দরজা খোলা মাত্র বাবা তাকে দেখে চমকে উঠে বললেন "আরে! তুই?"

বীরেন মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলল "হ্যাঁ, চলে এলাম ছুটি নিয়ে"।

বাবা বললেন "ভাল করেছিস। আয় আয়"।

বীরেন ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ঘিরে বাড়িতে হৈ হৈ শুরু হল।

মা বললেন "একটু খবর দিয়ে আসতে কী হয়েছিল তোর? ডিম দিয়ে ভাত খাবি। কিচ্ছু নেই আর"।

বীরেন মাকে জড়িয়ে ধরে বলল "ও যা আছে তাই দাও। কোন অসুবিধা নেই"।

মা শুনলেন না। বললেন "দাঁড়া দেখছি কী আছে। অন্তত একটা তরকারি তো করি"।

বুল্টি মার সঙ্গে রান্নাঘরে রওনা দিল।

বীরেন ঘরে এসে হাঁফ ছাড়ল। ব্যাগ রেখে চেঞ্জ করে মোবাইল অন করল। আশরফ মেসেজ পাঠিয়েছেন। তাদের বাড়ির আশে পাশে বেশ কয়েকজন ইন্টেলিজেন্সের লোক নজর রাখবেন বলে জানিয়েছেন।

বীরেনের ভয় লাগছিল না। খারাপ লাগছিল। ইরাবতীর জ্ঞান ফেরাটা দেখে আসতে পারল না। হঠাৎ করে ছুটি হয়ে যাওয়াটাও মন খারাপ করে দিচ্ছিল। এরকম ছুটি তো সে চায় নি। তার মধ্যে কী এমন আছে যার জন্য তাকে এভাবে বারবার টার্গেট করা হচ্ছে?

সে খাটে চোখ বন্ধ করে শুল। ডিফেন্স অ্যাকাডেমির পরীক্ষার দিনের কথা মনে করার চেষ্টা করল। অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছিল, দৌড় সহ বিভিন্ন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।

বীরেন বাড়ি ফিরে সযত্নে সে অ্যাডমিট কার্ড আলমারিতে তুলে রেখেছিল।

কী মনে হতে বীরেন উঠে আলমারি খুলল। ফাইল থেকে অ্যাডমিট কার্ড বের করল।

নাহ, ঠিকই আছে। তার নামই লেখা আছে। সেদিন এমন কিছুই ঘটে নি যাতে বিন্দুমাত্র অন্য কিছু মনে হতে পারে।

বেশ কয়েক মিনিট অস্থির হয়ে বসে থেকে বীরেন ঘর থেকে বেরোল। বাবা তাকে দেখামাত্র বললেন "কোথায় যাচ্ছিস?"

বীরেন বলল "এই পাড়াটা একটু চক্কর মেরে আসি"।

বাবা অবাক গলায় বললেন "এত রাতে? কাল সকালে যাস"।

বীরেন বলল "একটু হেঁটে আসি। চলে আসছি এখনই"।

বাবা যাতে আর কোন প্রশ্ন করতে না পারেন, বীরেন তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরোল। পাড়ার প্রায় সব বাড়ি থেকেই টিভি সিরিয়ালের আওয়াজ আসছে। বীরেন হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড় অবধি গেল।

আশরফ চারটে নাম্বার তাকে মেসেজ করে পাঠিয়েছিলেন। বীরেন একটা নাম্বার ডায়াল করল।

ফোনটা রিং হয়ে গেল। কেউ ধরল না। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন দেখল একটা বাইক এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। তাকে বলল "আপনি এখন বাড়ি যান। চিন্তা নেই। আমরা আছি"।

বীরেন অবাক হল। তাদের প্রত্যন্ত মফস্বলেও আশরফ খান এত তাড়াতাড়ি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ফেললেন? একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস ফিরছিল তার।

বাইকটা চলে গেলে বীরেন আশরফকেই ফোন করল।

রিং হতেই ধরলেন আশরফ "পৌঁছেছ?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ স্যার। আপনি যাদের পাঠিয়েছেন, তাদের একজনের সঙ্গে দেখাও হয়েছে"।

আশরফ বললেন "চিন্তার কিছু নেই। এই চারজন চল্লিশ জনের সমান। তোমার কোন রকম অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করবে"।

বীরেন বলল "শিওর স্যার। ইরাবতী ম্যাডামের জ্ঞান ফিরেছে"?

আশরফ চিন্তিত গলায় বললেন “নাহ। তুষার স্যার এখানেই আছেন। তোমার কথা বললাম। উনিও আমার সিদ্ধান্তকেই সঠিক বললেন। তুমি চিন্তা কোর না বীরেন, আই হ্যাভ ফুল ফেইথ অন ইউ। শুধু তুমি ডিফেন্সের একজ্যামের দিন বা তার আগের দিন তোমার সঙ্গে কী কী হয়েছে, কে দেখা করেছে, এর একটা লিস্ট তৈরী করে যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে পাঠিয়ে দাও। সর্ষের ভেতরের ভূত যত তাড়াতাড়ি বের করতে পারি, আমাদের তত মঙ্গল। গুড নাইট। সেফ থেকো। ভাল থেকো”।

বীরেন ফোনটা রেখে রাস্তার চারপাশে তাকাল। স্বাভাবিক সব কিছুই। ভয়ের কিছু নেই।

তবে কি ওরা তাকে অকারণ ভয় দেখাচ্ছে? বীরেনের অবচেতন মন কিছুতেই মানতে চাইল না। তার মনে হচ্ছিল, আবার কোন ভয়ংকর কিছু ঘনিয়ে আসতে চলেছে তাকে ঘিরে।

৪২

রাত আটটা। সায়ক দুপুর থেকে ঘুমোচ্ছিল।

উঠে ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখল মেহের টিভি দেখছে। সায়ককে দেখে সহজ গলায় বলল “চা খাবেন?”

সায়ক বলল “ভাল হয় করলে। কেউ জানতে পারে নি তো আমি এখানে এসেছি?”।

মেহের বলল “নাহ। আপনি বসুন। আমি চা এনে দিচ্ছি”।

মেহের উঠে চায়ের জল বসিয়ে এসে বসল। বলল “আপনি নিউজ চ্যানেল দেখতে পারেন”।

সায়ক বলল “না থাক। তুমি দেখো। তোমার কি কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?”

মেহের বলল “অনেক কিছুই আছে। তবে সবার আগে একটাই প্রশ্ন, বিয়েটা কি আদৌ আপনার করার ইচ্ছে আছে?”

সায়ক বলল “অবশ্যই। তুমি এসব নিয়ে কেন ভাবো?”

মেহের তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল “তাহলে এভাবে মাঝে মাঝে লা পাতা হয়ে যান কেন?”

সায়ক হাসার চেষ্টা করল “তোমাকে তো বললাম মেহের, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমার আব্বু আম্মি নেই। যা করেছি সবটাই তো নিজের চেষ্টায়”।

মেহের মাথা নিচু করে বলল “আপনার ওপর আমার অনেক অভিযোগ আছে”।

সায়কের ইচ্ছা করছিল মেহেরের পাশে গিয়ে বসে ওর হাত ধরতে। কিন্তু এর কিছুই করল না সে। বলল “জানি মেহের। আমাকে আরও কিছু সময় দাও”।

মেহের কোন কথা না বলে রান্না ঘরে গিয়ে চা নিয়ে এসে চায়ের কাপ সায়কের হাতে দিল। বলল “ফুপুরা কেউ বাড়িতে নেই। আমাকে এখানেই থাকতে হবে”।

সায়ক বলল “অসুবিধা নেই। তুমি ভিতরের ঘরে শুয়ো। আমি সোফায় শুয়ে যাব”।

মেহের বলল “মেহেমানদের সঙ্গে এরকম করে নাকি?”

সায়ক বলল “আমি মেহেমান কেন হব মেহের? আমি তো ঘরের লোক”।

মেহের বলল “নাহ। আপনি মেহেমানই। ঘরের লোক কখনও না বলে নিখোঁজ হয়ে যায় না”।

সায়ক এ কথার কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে রিমোট নিয়ে টিভির চ্যানেল চেঞ্জ করে নিউজ চ্যানেলে দিল। আব্বাসের খবর দেখাচ্ছে। পাকিস্তানি সরকার আব্বাসকে ভারতীয় গুপ্তচর হিসেবে ধরেছে।

ভারত সরকার জানিয়েছে আব্বাস পাকিস্তানে কী করছিল সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। সায়ক চুপ করে দেখে যাচ্ছিল।

মেহের বলল “আব্বুও আপনার ওপর রেগে আছে। মাঝে খুব ক্ষেপে উঠেছিল আমার জন্য ছেলে দেখবে বলে”।

সায়ক বলল “ভাল তো। বিয়ে দিয়ে দিলে ভাল। আমার মত পাগলের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়াই ভাল। সারাজীবন অশান্তিতে থাকবে”।

মেহের রাগী চোখে সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল "এরকম কথা বলবেন না দয়া করে। আপনার জন্য অনেকের অনেকরকম কথা শুনতে হয় আমাকে। আমি কোন কিছুই মনে করি না তাতে। কিন্তু স্বয়ং আপনি যদি এই কথা বলেন তবে সেটা মেনে নিতে পারি না কিছুতেই"।

সায়ক অপ্রস্তুত হল খানিকটা। মেহের এভাবে রেগে যাবে সে বোঝে নি।

মেহের বলল "আপনি নিখোঁজ হয়ে যান ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে তো ফোন করতে পারেন। আমাকে না হোক, আব্বুকে অন্তত। আমরা নিশ্চিন্ত থাকি আপনি ভাল আছেন"।

সায়ক হাসার চেষ্টা করল "ঠিক আছে, এর পর থেকে আমি ফোন করব। খুশি? আচ্ছা তোমার আব্বু তোমাকে এভাবে একা রেখে লাহোর চলে গেলেন কেন? তোমার ভয় করে না?"

মেহের বলল "না ভয় করবে কেন? ভয় করার কিছু তো নেই। তাছাড়া এখানে অত ঝামেলা নেই। সেসব ঝামেলা অন্যদিকে হয়। আব্বু গেছেন ব্যবসার কাজেই। হঠাৎ জরুরি দরকার পড়ে গেল। আমি কি আব্বুকে ফোন করে আপনার কথা বলব?"

সায়ক বলল "না না, থাক। উনি একটা কাজে গেছেন। ওকে ব্যস্ত করে লাভ নেই। তাছাড়া আমি এখানে থাকছি এটাও ভাল দেখায় না"।

মেহের বলল "সব ভাল দেখায়। আপনাকে এত বুঝতে হবে না। আপনি খেয়ে বিশ্রাম নিন। কাল সকালে ভাবা যাবে কী করবেন"।

সায়ক চুপ করে বসে থাকল। এই মেয়ে তার আসল পরিচয় জানলে কি এভাবেই তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে?

৪৩

রাত সাড়ে বারোটা। কাশ্মীর। অনন্তনাগ আর্মি ক্যাম্প।

তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমেছে। মাথুর তার ক্যাম্পের বাইরে চেয়ারে বসে কফি খাচ্ছিলেন।

অবন্তী জিপে বেরিয়েছিলেন, মাথুরকে দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে বললেন "কী ব্যাপার মাথুর, এখানে বসে আছেন এত রাতে?"

মাথুর বললেন "বসুন। কফি খেয়ে যান"।

অবন্তী বসে বললেন "সে না হয় বসলাম। কিন্তু আপনি কি কোন কারণে অতিরিক্ত চিন্তিত?"

মাথুর বললেন "যেভাবে আমাদের লোকেদের ফ্যামিলিতে এরা অ্যাটাক করে চলেছে তাতে চিন্তিত না হবার কোন কারণ আছে কি? ইরাবতী ম্যাম কী দোষ করেছিল বলুন? তাকেও তো ছাড়ল না"।

অবন্তী বললেন "এখানে তো আর বলা যাবে না অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। তাহলে তো মেনে নিতে হয় যুদ্ধবন্দীদের ওপর আমরা যা ইচ্ছা তাই অত্যাচার করতে পারি। সময় পাল্টাচ্ছে মাথুর। এখন নারী, শিশুদের ছেড়ে দেওয়াটাই দস্তুর। কিন্তু এই জানোয়ারগুলো সেগুলো মানে না। ইনফ্যাক্ট এরা কিছুই মানে না। নইলে নিরীহ মানুষ যেখানে আছে, সেখানে বম্ব ব্লাস্ট করে কী আনন্দ পায় এরা? বাই দ্য ওয়ে, আপনি কি আপনার ফ্যামিলি নিয়ে চিন্তিত?"

মাথুর বললেন "না, আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে চিন্তিত নই। আমি সবার ফ্যামিলি নিয়েই চিন্তিত। এভাবে যদি ওরা ডিফেন্স পারসোনেলদের ফ্যামিলি টার্গেট করে তবে আমাদের শুধু সেটাকে ডিফেন্সিভ ট্যাক্টিক্স হিসেবে না রেখে অ্যাটাকিং মেন্টালিটি নিয়ে এগোনোটাই বেশি দরকার বলে মনে হয়"।

অবন্তী বললেন "পাবেন কোথায় তাদের? সব থেকে বড় সমস্যা তো সেটাই, তাই না?"

মাথুর বললেন "ইসমাইলের কোন খবরই কি পাওয়া যাচ্ছে না?"

অবন্তী মাথা নাড়লেন "না। যেন ভোজবাজির মত উবে গেছে। ওকে পাওয়া গেলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম"।

মাথুর বললেন "রেহান খানকে খুন করেছে। ওকে আমি কোন দিন ক্ষমা করতে পারব না"।

অবন্তী কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন “আমিও না। আমাদের ফুল ফোর্স প্রয়োজন হলে তাই সই। কিন্তু ইসমাইলকে আমাদের চাই”।

মাথুর বললেন “ইসমাইল পাকিস্তানে চলে যায় নি তো?”

অবন্তী মাথা নাড়লেন “নাহ। ইসমাইল এই দেশে এসেছে কোন মিশন নিয়ে। মিশন কমপ্লিট না করে ফিরে ও যাব না। ফিদায়ে জঙ্গী তো এরা। মরতে ভয় পায় না। কিন্তু মরার আগে যাতে সব থেকে কম ড্যামেজ করতে পারে, আমাদের সেদিকেই মন দিতে হবে। এর আগে লস্করের একটা গোটা ফিদায়ে টিমকে আমরা লালচক থেকে ধরেছিলাম। একটাকেও বাঁচাতে পারি নি। ওরা সায়ানাইড নিয়েই আসে। ধরা পড়ে গেলে নিজেরাই মরে যাবে”।

মাথুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন “মানবজন্মের কী অপচয় বলুন?”

অবন্তী মাথা নাড়লেন “ওসব ওরা ভাবে না। ওরা হল টয়ের মত। চাবি দিয়ে দিলেন, সেভাবে চলতে থাকবে। অত বুদ্ধি কারো থাকলে তারা নিজেদের মারত, আপনিই বলুন? কতটা মাত্রায় ব্রেইনওয়াশড ক্রিচার হলেই এটা করা সম্ভব হয়”।

মাথুর মাথা নাড়লেন “আপনার সঙ্গে একমত। এরা ব্রেইনওয়াশড। এরা মানুষই নয়। অমানুষ”।

অবন্তীর ওয়াকিটকি বেজে উঠল। অবন্তী কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে পড়লেন “আমাকে বেরোতে হবে মাথুর। বাজারের কাছে একটা দোকানে উটকো কিছু লোক উঠেছে বলে নিউজ আছে। কাল কথা হবে”।

মাথুর মাথা নাড়লেন।

অবন্তী বেরিয়ে যেতে মাথুর টেন্টে এসে শুলেন।

এ ক’দিনে শীত সহ্য হয়ে গেছে।

মাথুরের ফোন বাজছিল। দেখল তুষার ফোন করছেন। অবাক হয়ে ফোনটা ধরল “হ্যাঁ স্যার”।

তুষার বললেন “তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ?”

মাথুর বললেন “না স্যার। কোইন্সিডেন্স। ঘুমাই নি, আর আপনিও ফোন করছেন”।

তুষার হাসলেন “ইন্টেলিজেন্সের সিক্সথ সেন্স আর কী! যাই হোক, ইসমাইলের কোন খবর হল?”

মাথুর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন “না স্যার। চিরুণি তল্লাশি জারি আছে কিন্তু কোন ট্রেস নেই এখনও অবধি”।

তুষার বললেন “টাফ জব ইন এ প্লেস লাইক কাশ্মীর। সব রকম প্রোবাবিলিটি চেক করতে হবে। শুধু অনন্তনাগ না, শ্রীনগরেও অ্যালার্ট থাকতে বলে দাও অবন্তীকে”।

মাথুর বললেন “শিওর স্যার। ম্যাডামের জ্ঞান ফিরেছে?”

তুষার বললেন “নাহ, তবে চান্স পজিটিভ এখন। বেঁচে যাবে হয়ত”।

তুষার যেন রোবটের মত কথাটা বললেন।

মাথুর বললেন “হয়ত কেন? নিশ্চয়ই বাঁচবেন স্যার। এভাবে বলছেন কেন?”

তুষার বললেন “ইসমাইলকে ধর মাথুর। ও বড় কিছু করার আগে ধর। আমি...”

তুষার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মাথুরের তাবুর বাইরে এক জওয়ান মাথুরকে ডাকলেন।

মাথুর বললেন “এক মিনিট স্যার। কেউ একজন ডাকছে”।

তুষার বললেন “শিওর”।

মাথুর তাবুর বাইরে গিয়ে যা শুনলেন তাতে তার গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল।

বাজারে যে দোকানে অবন্তীরা রেইড করতে গেছিলেন, সেখানে তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে।

দোকানের ভিতর থেকে অতর্কিতে বেশ কয়েকজন তাদের ওপর বম্ব ব্লাস্ট করে সবাইকে মেরে ফেলেছে।

মাথুরের বিশ্বাস হচ্ছিল না। লোকটার সঙ্গে একটু আগেও কথা হল!

রাত দেড়টা।

রাস্তাজুড়ে লাশ পড়ে আছে। কারো হাত উড়ে গেছে, কারো পা। চতুর্দিক রক্তাক্ত।

সেনারা কঠিন মুখে লাশগুলোকে এক জায়গায় করে জায়গাটা পরিষ্কার করছে।

সাদা সাদা গুড়ো পাউডারের মত বরফ পড়ছে। গোটা এলাকায় কারফিউ জারি হয়েছে। ইতিউতি কাছাকাছি বাড়ি থেকে মুখ উঁকিঝুঁকি মেরে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। প্রতিটা বাড়ি, দোকান তল্লাশি শুরু হয়েছে।

মাথুর অবস্তীর মৃতদেহের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে রাস্তায় হাঁটতে লাগলেন। কর্নেল সিং দৌড়তে দৌড়তে তার কাছে এসে বললেন "স্যার একা একা কোথাও যাবেন না প্লিজ। ওরা কাছে পিঠেও লুকিয়ে থাকতে পারে"।

মাথুর বললেন "কী করবে আর বলুন? মেরে ফেলবে? এই তো। এভাবে আর ক'দিন?"

সিং বললেন "স্যার প্লিজ। আপনি তাহলে ক্যাম্পে ফিরে যান"।

মাথুর বললেন "ঠিক আছে। আমি এখানেই আছি। আপনারা আপনাদের কাজ করুন"।

তুষারকে জানানো হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সেনাবাহিনীর বিশেষ টিম শ্রীনগর থেকে অনন্তনাগের দিকে রওনা দিয়েছে। বেশ কয়েকজন কাশ্মীরী যুবককে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। দোকানের কাছে পিঠের বাড়িগুলো থেকে। দু চারজনকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রত্যেকের তল্লাশি চলছে। মাথুর তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লম্বা সুন্দর মুখশ্রী।

মাথুর বললেন "আপনারা কাউকে দেখেছেন? কোন রকম সন্দেহজনক লোককে? বা এলাকার বাইরের কাউকে আজ দেখেছিলেন?"

প্রত্যেকে প্রায় একযোগে মাথা নাড়ল।

সিং বললেন "লাভ নেই স্যার। এরা কেউ কিছু বলবে না"।

মাথুর সিং এর দিকে তাকিয়ে বললেন "আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি। আপনি ওদিকটা দেখুন বরং। অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে"।

সিং খানিকটা বিরক্তি নিয়েই চলে গেলেন। মাথুর ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন "ভাল লাগে আপনাদের? রোজ রোজ এরকম অশান্তি?"

একজন বলল "না স্যার। কেন ভাল লাগবে বলুন?"

মাথুর বললেন "এভাবে আমাদের জওয়ানদের মেরে চলে যাবে, আর আমরা চুপ করে থাকব। আপনারা চুপ করে থাকবেন? এটা আপনাদের দেশ না?"

একজন এগিয়ে এসে বলল "এটা আমাদের দেশ স্যার? জওয়ানদের এই দমন নীতি ইন্ডিয়ার কোন স্টেটে আছে বলুন?"

মাথুর বললেন "আপনার নাম কী?"

ছেলেটা বলল "ইস্তিয়াক স্যার"।

মাথুর চারদিকে দেখে নিলেন। আশে পাশে কেউ নেই। ইস্তিয়াকের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন "জানি। আমি আপনাদের জন্য ফিল করতে পারি। আপনারা ইয়ং জেনারেশন। আপনারা ভাল জানবেন, আমাদের কারো জন্যই এই সিচুয়েশন ভাল নয়। আমার বন্ধু অবস্তী সাহেব মারা গেলেন। ভদ্রলোকের ছেলে ক্লাস টেন দেবে এবছর। কী করবে? বাবার কথা তার মনে হবে না? পারবে ছেলেটা নিজের লাইফে ঠিক থাকতে?"

ইস্তিয়াক মাথা নিচু করে বললেন "এখানে অনেকেই আছে স্যার, যারা ক্লাস সেভেন এইটে পড়ে। সামান্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে ওদের চোখে পেলেট গান মারা হয়েছে। কারো কারো চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ার

কোন স্টেটে নিজেদের হকের জন্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে চোখ নষ্ট করে দেওয়া হয় স্যার? আমাদের কাশ্মিরীদের যদি আমাদের কথাই বলতে না দেওয়া হয়, নিজেদের প্রতিবাদ করতে না দেওয়া হয়...”

একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল “আহ, ইস্তিয়াক, চুপ কর। কী বলে যাচ্ছিস?”

মাথুর হাত তুলে ছেলেটাকে থামিয়ে ইস্তিয়াককে বললেন “আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ইস্তিয়াক, আমরা সবাই যদি হিংসার পথেই থাকি, দিন দিন কি পরিস্থিতি ভাল হবে? আপনিই বলুন। আপনি কত অবধি পড়াশুনা করেছেন?”

ইস্তিয়াক বলল “আমি বি এস সি পড়ছি। কেমিস্ট্রি অনার্স”।

মাথুর বললেন “তবে? আপনি শিক্ষিত। আপনার শিক্ষা কোন কাজে লাগবে ইস্তিয়াক যদি দিনের পর দিন এভাবেই কোন দিন এ পক্ষ, কোন দিন ও পক্ষের মানুষ মরতে থাকে। আছে কোন সলিউশন?”

ইস্তিয়াক বলল “আছে স্যার। কাশ্মীর আজাদ করে দিন। সৈন্য সরিয়ে নিন। সব সমস্যা মিটে যাবে”।

মাথুর হাসলেন “মিটে যাবে? পাকিস্তানে সব সমস্যা মিটে গেছে? ওদেশে টেরোরিস্ট নেই? ওরা যদি কাশ্মীরে এসে আবার আপনাদের ওপর দমন পীড়ন শুরু করে, তখন সেটা সামলাবেন কী করে ইস্তিয়াক? বাংলাদেশের কথা ভুলে গেলেন এত সহজে? ওরাও তো ধর্মের ভিত্তিতে পার্টিশন করেছিল। কী লাভ হয়েছিল ওদের?”

ইস্তিয়াক মাথা নিচু করল। মাথুর বুঝলেন ছেলেটা দ্বিধায় পড়েছে। একজন বলল “স্যার, আপনার মত তো কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলে না। সবাই শুধু ভয় দেখায়, আর হ্যারাস করে। আমরা যে মানুষ, তাই তো মাঝে মাঝে ভুলে যাই”।

মাথুর বললেন “আমি কথা বলব আমাদের উপরের অফিসারের সঙ্গে। আমাদের আপনারা হেল্প করুন। একটু ভাবুন, বাইরে থেকে কোন দল এসেছিল কি?”

সবাই চুপ করে গেল। মাথুর ইস্তিয়াকের দিকে তাকিয়ে বললেন “রক্তের বদলে রক্ত আমরা কেউ চাই না। কিন্তু সদ্য হওয়া এই ব্লাস্টে আমাদের সেনাবাহিনী যেভাবে রেগে থাকবে, আপনারা বুঝতে পারছেন এর আঘাত গিয়ে সেই নিরীহ কাশ্মীরি পরিবারের উপরেই পড়বে। যারা অন্তত কিছু জানে না, তাদেরও হ্যারাস হতে হবে। আপনারা বলুন, হেল্প করুন। আমি আছি আপনাদের জন্য, যে কোন সমস্যায়। প্লিজ বলুন”।

আবার সবাই চুপ করে গেল। মাথুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওদের ছেড়ে হাঁটতে শুরু করলেন। অ্যাম্বুলেন্সে বডিগুলোকে তোলা হচ্ছে। হঠাৎ পিছনে হৈ হৈ শব্দ। পিছন ফিরে দেখলেন ইস্তিয়াক তার দিকে আসতে যাচ্ছিল, একজন আটকেছে। মাথুর চেঁচালেন “ওকে আসতে দিন”।

ইস্তিয়াককে ছেড়ে দেওয়া হল। ইস্তিয়াক দৌড়ে তার কাছে এসে বলল “চকবাজারে আব্দুল স্টোরসের ওপরে একটা দল এসেছিল। এখনও আছে ওরা মনে হয়”।

মাথুর ইস্তিয়াকের কাঁধ চাপড়ে বললেন “সাবাশ। আমার কার্ড রাখুন। যখন যা দরকার হবে, আমি আছি আপনাদের সঙ্গে। গোটা দেশ আছে কাশ্মীরের সঙ্গে”।

মাথুর সিং এর দিকে এগিয়ে গেলেন।

#

রাত সাড়ে তিনটের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী পাঁচজন জঙ্গিকে কুকুরের মত গুলি করে মারল।

৪৫

মেহেরের বারণ সত্ত্বেও সায়ক ড্রয়িং রুমের সোফাতেই শুয়েছিল।

মেহের ভেতরের ঘরে।

রাত দুটোর দিকে সায়ক জেগে উঠল। সন্তর্পণে উঠে দরজা খুলতে গিয়ে দেখল দরজা ভেতর থেকে তালা দেওয়া।

চাবি খুঁজতে শুরু করল সায়ক। সারা ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও চাবি পাওয়া গেল না। সায়কের অস্থির লাগছিল। প্ল্যান ছিল রাতে বেরিয়ে যাবে।

সে সোফায় ক্লান্ত হয়ে বসল।

"আপনি এত রাতে কোথায় যেতেন?"

মেহের যে কখন ঘরে চলে এসেছে বুঝতে পারে নি সে। চমকে উঠল।

মেহের আলো জ্বালাল।

সায়ক বলল "তুমি ঘুমাও নি?"

মেহের বলল "না, আমার মনে হচ্ছিল আপনি আগের মতই না বলে চলে যাবেন"।

সায়ক থমকে বলল "হ্যাঁ, আমার করাচী যাওয়ার দরকার ছিল আসলে"।

মেহের বলল "এত রাতে?"

সায়ক বলল "হঠাৎ করেই মনে হল আর কী"।

মেহের কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বলল "ইন্ডিয়ার কোথায় বাড়ি আপনার?"

সায়ক চমকাল না। ঠান্ডা মাথায় মেহেরের দিকে তাকিয়ে বলল "কেন বলতো? ইন্ডিয়ায় আমার বাড়ি হতে যাবে কেন?"

মেহের তার দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল "এই বিলটা আগের বার আপনার প্যান্টের পকেটে পেয়েছিলাম। আপনাকে জিজ্ঞেস করার আগেই আপনি পালিয়েছিলেন। আমি আব্বুকেও কিছু বলি নি। আপনি কে?"

সায়ক দেখল ওষুধের দোকানের ছোট একটা রসিদ। মানিব্যাগে ছিল। সে বলল "ওহ, এটা আমাকে একবার কলকাতা যেতে হয়েছিল তো, সেবার ওষুধ কিনেছিলাম, তার বিল"।

মেহের বলল "আপনি কলকাতা গেছিলেন আমাকে বলেন নি তো কখনও"।

সায়ক বলল "ওহ, বলি নি? ভেবেছিলাম তুমি জানো"।

মেহের বলল "আপনি যাবার দুদিন পর আব্বুর কাছে দুজন এসেছিল। ওরা আপনার ব্যাপারেই আলোচনা করছিল"।

সায়ক কী বলবে বুঝতে পারল না।

মেহের বলল "রাস্তায় মিলিটারি টহল চলছে এখন। ভোর চারটে থেকে পাঁচটা কোন গাড়ি থাকে না। আপনি সে সময় যান"।

সায়ক বলল "তুমি কী করে জানলে সে সময় টহল থাকে না?"

মেহের বলল "উপরের ঘরের আসিফচাচা মিলিটারিতে আছেন। ওর কাছে শুনেছিলাম"।

সায়ক বলল "তোমার আব্বু আমার ব্যাপারে জানেন তার মানে?"

মেহের বলল "জানি না। আপনি বসুন। এখন যাবেন না"।

সায়ক বসল সোফায়।

মেহের বলল "আমায় কি আপনি বলবেন আপনি কে?"

সায়ক বলল "বলতে পারব না মেহের। শুধু বলতে পারি তোমার বা তোমার আব্বুর কোন ক্ষতি করার মানুষ আমি নই"।

মেহের বলল "সেটা জানি আমি। কারো ক্ষতি করার লোক আপনি নন। সে কারণেই জানতে চাই, আপনি কে? আমার সঙ্গে বিয়ের কথাই বা বলেছিলেন কেন? এতটা মিথ্যা বলার দরকার ছিল কি?"

সায়ক শ্বাস ফেলে বলল “কোরাণে আছে এই পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষ কিছু না কিছু কাজের জন্য এসেছে। তুমিও ভেবে নাও, আমি আল্লাহর নির্দেশে সেরকমই কোন কাজের জন্য এই পৃথিবীতে আমি এসেছিলাম। এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই”।

মেহের সোফায় তার পাশে এসে বসল। বলল “যেদিন থেকে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছে, আমি সেদিন থেকে শুধু আপনার কথাই ভেবেছি। আপনার প্রতিটা চলাফেরা, কথা বার্তা, খাওয়া দাওয়া আমি চুপ করে দেখে যাই। আর আপনি যখন থাকেন না, তখনও সেই আপনার অপেক্ষাতেই বসে থাকি। বেল বাজলে দৌড়ে গিয়ে দেখি আপনি এসেছেন নাকি। আমি এই বিলটা দেখার পরেও কাউকে বলিনি। কেন জানেন?”

সায়ক জিজ্ঞাসু চোখে মেহেরের দিকে তাকিয়ে বলল “কেন?”

মেহের হাসল, বলল “আপনি বোঝেন না? আপনার আল্লাহ আপনাকে সেটুকু বোঝার ক্ষমতা দেন নি?”

সায়ক বলল “আমি ফিরে আসব মেহের। তুমি অপেক্ষায় থেকো”।

মেহের বলল “নাহ। আপনাকে একটাই অনুরোধ। আপনি আর আসবেন না”।

মেহের উঠে দাঁড়াল। আলমারি খুলে একটা ব্যাগ বের করে সায়কের হাতে দিয়ে বলল “এখানে বেশ কিছু টাকা আছে। আপনি নিয়ে যান। কাজে লাগতে পারে”।

সায়ক কিছু বলতে পারল না। চুপ করে বসে থাকল।

৪৬

মেঝেতে একটা আর্ট পেপার পাতা হয়েছে। আসলামের মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল কিন্তু কোন রকম ফার্স্ট এইড না করেই সে চুপ করে ঘরের এক কোণে বসে আছে। কাদরী মার্কার পেন দিয়ে আর্ট পেপারের ওপর ম্যাপ এঁকে ইসমাইলকে বললেন “এই হল স্বর্ণমন্দিরের চারপাশ। এবার তুমি বল তুমি কোন পথ দিয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

ইসমাইল ক্রুর চোখে বেশ কিছুক্ষণ ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল “আপনি যে পথ দিয়ে বলবেন, আমার কোন চয়েস নেই। আপনিই বলুন, আপনি এসেছেন এখানে বেশ কয়েকবার”।

কাদরী আসলামের দিকে তাকিয়ে বললেন “কতবার স্বর্ণমন্দির গেছো তুমি?”

আসলামের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা কমে এসেছিল। ইসমাইলের মারগুলো তার বেশ লেগেছে। সে বলল “দশ বারোবার”।

কাদরী বললেন “এবং কোন সময়টা তোমার মনে হয়েছে বেস্ট ফর অ্যাটাক”?

আসলাম বলল “ওখানে সশস্ত্র বাহিনী থাকে, শিখদের নিজস্ব সেনা। ওখানে কিছু করা সমস্যা আছে”।

ইসমাইল আসলামকে ধমক দিয়ে বলল “এই ইবলিশের বাচ্চা, তোর কাছে আমি সাজেশন চেয়েছি? তোর কাছ থেকে শিখতে হবে আমাকে ওখানে সেনা আছে কি নেই?”

আসলাম চুপ করে গেল।

কাদরী বললেন “আসলাম ঠিকই বলেছে। অসংখ্য সিসিটিভি, আর তার সঙ্গে ওখানে অতন্দ্র প্রহরায় থাকে ওদের নিজস্ব বাহিনী। কাজটা কঠিন আছে”।

ইসমাইল হো হো করে হেসে উঠে বলল “প্রফেসর সাহাব, কাজ সোজা হলে কি বর্ডার পেরিয়ে এত ঝক্কি সামলে এতদূর আসতাম? আল্লাহ আমাকে একটা নির্দিষ্ট কাজের হুকুম দিয়েছেন। আমি সেই কাজ করতে প্রস্তুত”।

কাদরী আসলামের কম্পিউটারে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরে স্যাটেলাইট কল করা গেল, ওপ্রান্ত থেকে গলা ভেসে এল “কোড প্লিজ”।

কাদরী কোড বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ও প্রান্ত থেকে স্বাভাবিক গলায় কেউ বলল “সালাম ওয়ালাইকুম জনাব। শের জঙ্গলে পৌঁছেছে তো?”

কাদরী হেসে বললেন “হ্যাঁ। শের জঙ্গলে পৌছেছে। এখন শিকারের মাপজোক চলছে আর কী”।

“মাশাল্লাহ। কোহিনুর হে হামারা শের”।

কাদরী বললেন “তা ঠিক। কিন্তু কোহিনুরকে বড্ড তাড়াতাড়ি জন্নতে পাঠানোটা ভুল পদক্ষেপ হয়ে যাচ্ছে না কি?”

“আল্লাহর মর্জিমাফিক হচ্ছে জনাব। আমরা তো নিমিত্তমাত্র। তিনি চেয়েছেন বলেই তো এত কিছু হচ্ছে। আমরা তার বার্তা পাই, তিনি যেভাবে বলেন, আমরা সেভাবেই চলি”।

কাদরী বললেন “শেরকে তো খালি হাতে শিকারে পাঠানো যায় না জনাব। শেরের জন্য প্রয়োজনীয় আনাজ কোথায় পাব সে সম্পর্কে কোন ইন্সট্রাকশন এখনও আসে নি”।

ওপাশ একটু থেমে উত্তর দিল “আজ রাত আটটায়। ক্যানাল রোড। কোড তকদীর”।

কাদরী বললেন “শুক্রিয়া জনাব”।

ফোনটা কেটে গেল ওপাশ থেকে। কাদরী আসলামের দিকে তাকালেন, বললেন “ক্যানাল রোড চেনো?”

আসলাম মাথা নাড়ল।

কাদরী বললেন “সন্ধ্যের দিকে গাড়ি জোগাড় কর। ক্যানাল রোড যেতে হবে”।

আসলাম বলল “জি জনাব”।

কাদরী ইসমাইলের দিকে তাকালেন। ইসমাইল মাটিতে বসে চোখ বন্ধ করল। শরীর আবেগে থর থর করে কাঁপছে তার, দু চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা।

আসলাম অবাক চোখে ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে আছে।

কাদরী ইসমাইলের পাশে গিয়ে বসলেন। ইসমাইল বিড়বিড় করে একভাবে নিজের মনে কথা বলে যেতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরে ইসমাইল চোখ খুলে বলল “আমি স্নান করব”।

আসলাম দৌড়ে গিয়ে টাওয়েল নিয়ে এল ইসমাইলের জন্য। ইসমাইল বাথরুমে ঢুকে গেল।

দরজায় আবার নক হল। কাদরী সতর্ক গলায় আসলামকে বললেন “দেখো কে”?

আসলাম উঠল। দরজা খুলে দেখল বাড়িওয়ালার মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটি বলল “আর কিছু লাগবে?”

আসলাম ভেতরের দিকে তাকিয়ে সতর্ক গলায় বলল “না। চাচাজান ঘুমাবে এখন। পরে এসো”।

মেয়েটি কৌতূহলী গলায় ঘরের ভিতরের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল। আসলাম খানিকটা রাগী গলায় বলল “পরে এসো বললাম না?”

মেয়েটি আসলামের দিকে তাকাল এতক্ষণে। অবাক হয়ে বলল “তোমার কী হয়েছে? পড়ে গেছো নাকি?”

কাদরী উঠলেন। দরজার কাছে গিয়ে বললেন “চাচাজানের হাতে মার খেয়েছে। এখনও বড় হয় নি তো! তুমি এসো, নইলে তোমাদের বাড়ির লোক তোমার ওপর রাগ করবেন”।

মেয়েটি অবাক চোখে আসলামের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

কাদরী আসলামকে বললেন “শুয়েছ এটার সঙ্গে?”

আসলাম ঘাবড়ে গিয়ে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল “না না। সেসব কিছু না”।

কাদরী আসলামকে থাপ্পড় মারলেন। আসলাম মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

৪৭

ভোর হয়েছে।

অনন্তনাগের আর্মি হাসপাতালের সামনে প্রচুর মিডিয়ার প্রতিনিধি এসে হাজির হয়েছে।

দিল্লি থেকে আর্মির স্পেশাল টিম এসেছে। মাথুর চোখ বন্ধ করে হাসপাতালের বেঞ্চে বসে ছিলেন। তার পাশে ইস্তিয়াক চুপ করে বসে আছে। মাথুরই বসিয়ে রেখেছেন।

ব্রিগেডিয়ার শাহ এসে মাথুরকে ডাকলেন "মাথুর, আপনি কি ক্যাম্পে যাবেন?"

মাথুর চোখ খুলে বললেন "নাহ। দেশের মানুষের বরবাদি দেখছি চোখের সামনে। এছাড়া তো কিছু করার নেই"।

শাহ বললেন "অ্যানাদার ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর?"

মাথুর বললেন "হ্যাঁ। আমরা হেরে যাচ্ছি যুদ্ধটা। প্রতিমুহূর্তে। শুধু মাঝে মাঝে এই ইস্তিয়াকের মত ছেলেরা আমাদের খানিকটা হেল্প করে বলে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নটা এখনও দেখি ব্রিগেডিয়ার"।

ব্রিগেডিয়ার শাহ বললেন "আই অ্যাম অ্যাফ্রেইড মাথুর, ছেলেটিকে আমাদের কাস্টোডিতে নিতে হবে। ও যদি আরও কিছু জানে, তাহলে সেটা আমাদের কাজে দেবে, বিশেষ করে ইসমাইলের ব্যাপারে"।

মাথুর ইস্তিয়াকের দিকে তাকালেন। ইস্তিয়াকের মুখে কোন বিকৃতি হল না। যেন এটাই হবে সে জানত।

মাথুর ব্রিগেডিয়ার শাহকে বললেন "সরি স্যার। ইস্তিয়াককে আমি আপনাকে দিতে পারব না। আমি তুষার স্যারের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। ওকে দেওয়া সম্ভব না"।

ব্রিগেডিয়ার বললেন "আর ইউ সিওর অফিসার? আর্মি কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন দায় নেবে না ফিউচারে যদি কোন প্রবলেম হয়"।

মাথুর বললেন "হ্যাঁ স্যার। আমি সিওর"।

ব্রিগেডিয়ার কাঁধ ঝাঁকালেন, "ওকে, ফাইন দেন। আমাদের দিক থেকে কোন হেল্প লাগলে বলবেন। আমি জওয়ানদের ফ্যামিলিদের খবর দেওয়ার কঠিন কাজটা করতে যাই এবার। মিসেস অবস্তীকে কী করে বলব সেটাই ভাবছি"।

মাথুর ভাবতে চাইছিলেন না। তবু ব্রিগেডিয়ারের কথায় অবস্তী সাহেবের মুখটা মনে পড়ে গেল তার। নিজের মনেই বলে উঠলেন "আই হেট দিস জব"।

ব্রিগেডিয়ার চলে গেলেন কন্ট্রোল রুমে।

ইস্তিয়াক মাথুরকে বলল "শুক্রিয়া স্যার"।

মাথুর বললেন "কী কারণে?"

ইস্তিয়াক বলল "আপনি আর্মির হাত থেকে আমাকে বাঁচালেন"।

মাথুর বললেন "তোমরা আর্মিকে এত ভয় পাও কেন ইস্তিয়াক? ওরা না থাকলে কী হত বলতো? তুমি তো শিক্ষিত ছেলে, তুমি জানো না, টেরোরিস্টরা আসলে কাদের সুবিধা করে দিচ্ছে? নিরীহ কাশ্মীরিরা বুঝতে পারছে না এখনও"?

ইস্তিয়াক বলল "কী করে বুঝব স্যার? দেশের আর পাঁচটা স্টেটের মত তো আমরা থাকি না। রাস্তায় বেরোলে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কী হয় কী হয়। একদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা, একদিকে পাকিস্তানপন্থী, একদিকে ইন্ডিয়ান আর্মি... আমাদের সাধারন কাশ্মীরীদের কথা ক'জন ভাবে স্যার? আমরা কি মানুষ নই"?

মাথুর ইস্তিয়াকের কাঁধে হাত রেখে বললেন "অবশ্যই মানুষ। তুমি না থাকলে আজ ওদের মারতে পারতাম না আমরা। কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা পিপড়ের মত কাশ্মীরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আম কাশ্মীরীদের কানে মন্ত্র দিচ্ছে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে। একমাত্র তোমরাই কিন্তু পারো কাশ্মীরকে রক্তপাতহীন করতে। আমি কথা দিচ্ছি, যত রকম সহায়তা লাগে আমরা করব। আমি করব"।

ইস্তিয়াক কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে বসে বলল "ওদের ধরতে গেলে সেনাছাউনির নিরাপদ ক্যাম্পে বসে থাকলে হবে না। কনভয়ে করে ঘুরলেও হবে না স্যার। ওদের ধরতে গেলে ওদের পদ্ধতিতেই চলতে

হবে। প্রতিটা পথ অবরোধে পেলেট গান চালালে হবে না। বরং আমাদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আমরা কোন পাপ করিনি স্যার কাশ্মীরে জন্ম নিয়ে। আপনাদের সরকার, আপনাদের আর্মি যদি সেটা বুঝতে না পারে তবে সব থেকে ক্ষতি আপনাদেরই হবে"।

মাথুর বললেন "আপনাদের কেন বলছ। আমাদের বল"।

ইস্তিয়াক ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল "সে ফেসিলিটি আমাদের জন্য আন অ্যাভেইলেবল স্যার"।

মাথুর বললেন "কিচ্ছু আনঅ্যাভেইলেবল না। তুমি আমাদের হেল্প কর, তুমি বল তোমার কী চাই। আমি থাকব তোমার পাশে। ইসমাইলের সম্পর্কে কোন লিড দিতে পারবে তুমি?"

ইস্তিয়াক বলল "ওয়াজুরা গ্রামে আমার ফুপু থাকেন। ইসমাইলরা ওখানে নিরীহ মানুষদের ভয় দেখিয়ে থাকত। আমার মনে হয় আপনি ওয়াজুরা গেলে ওদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পেতে পারেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি করে যেভাবে জোর করে তথ্য বের করার চেষ্টা আর্মি করেছে, ওরা তো ভয়েই বলে নি। ওদের সঙ্গে থেকে দেখুন। ওদেরও অনেক কথা বলার আছে"।

মাথুরের চোখ উজ্জ্বল হল, "তুমি আমাকে নিয়ে যাবে ওয়াজুরা?"

ইস্তিয়াক বলল "একটাই শর্তে স্যার। কোন সরকারি গাড়িতে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে যেতে পারবেন না। আমার সঙ্গে যেতে হবে"।

মাথুর একটু চুপ করে থেকে বললেন "রেহান শ্রীনগর জেলে একা গিয়ে খুন হয়েছিলেন। আশরফকে ওরা গুলি করে চলে গেছিল কোন মতে বেঁচেছে। এরপরেও আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব ইস্তিয়াক। আমি বিশ্বাস করি তোমরাই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ। তোমার শর্ত মঞ্জুর। চল, আর দেরী করা ঠিক হবে না। ব্রিগেডিয়ার শাহ জানলে কিছুতেই আমাকে যেতে দেবেন না"।

৪৮

নার্সিং হোমের বেঞ্চে তুষার চুপ করে বসে ছিলেন। একজন নার্স এসে তাকে ডাকল, "স্যার, পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে। আপনাকে খুঁজছেন"।

তুষার কথাটা শুনে কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে বসে থেকে আইসিইউর দিকে রওনা দিলেন।

ইরাবতী তাকে দেখে হাসলেন। তুষারকে ডাক্তার বললেন "পাঁচ মিনিট স্যার, খুব বেশি হলে"।

তুষার মাথা নাড়লেন "রাইট ডক্টর"।

ইরাবতীর বেডের পাশে রাখা চেয়ারে বসলেন তুষার।

বললেন "কেমন আছো?"

ইরাবতী হাসলেন "ভাল। বেঁচে গেলাম বলতে পারো"।

তুষার বললেন "দে আর ডেঞ্জারাস"।

ইরাবতী বললেন "আই নো। বাট ডোন্ট ওরি, ওরা জিততে পারবে না। আমি মন থেকে বিশ্বাস করি"।

তুষার মাথা নিচু করে বসে বললেন "এখনও আশা রাখছো?"

ইরাবতী বললেন "ডেফিনিটলি। কোনবারেই তো তুমি হারো নি। এবারে এত সহজে হেরে যাবে নাকি?"

তুষার ইরাবতীর হাতে আলতো করে নিজের ডান হাত রেখে বললেন "এবার ওরা তোমাকে মেরেছে। আমাদের ছেলেদের ফ্যামিলিকে টার্গেট করছে। ভয় পাওয়ার কারণ আছে, একবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারছি না"।

ইরাবতী বললেন "তুমি এ কথা বললে কী করে হবে তুষার? এ যুদ্ধ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে লড়ছো তোমরা। তুমি সে টিমের ক্যাপ্টেন হয়ে এই কথা বলছ? রেহান যদি শহীদ হতে পারে, আমি কেন নই? পিছুটান রেখো না"।

একজন নার্স এসে তুষারকে বলল "স্যার, ম্যাডাম যত কম কথা বলবেন তত ভাল হয়"।
তুষার মাথা নাড়লেন "ওকে"। ইরাবতীর দিকে তাকিয়ে বললেন "তুমি শোও। চিন্তা কোর না। আমরা এত সহজে হাল ছাড়ব না"।
ইরাবতী কিছু বললেন না। হাসলেন শুধু।
তুষার ঘর থেকে বেরলেন। ভারাক্রান্ত মন খানিকটা হলেও শান্ত লাগছিল।
ফোনটা সাইলেন্ট করা ছিল। পকেট থেকে বের করে দেখলেন একই নাম্বার থেকে তিনবার মিসড কল এসেছে।
তুষার তাড়াতাড়ি কল ব্যাক করলেন।
ওপাশ থেকে ভেসে এল "গুড মর্নিং তুষার, আমি ব্রিগেডিয়ার শাহ বলছি"।
তুষার বললেন "গুড মর্নিং। বলুন।"
শাহ ক্ষোভে ফেটে পড়লেন "কী হচ্ছে তুষার? মাথুর কী শুরু করেছে?"
তুষার অবাক হলেন "কেন? কী হয়েছে বলুন?"
শাহ বললেন "মাথুর একজন লোকাল কাশ্মীরি ছেলের সঙ্গে কোথাও একটা চলে গেছে। আমাদের কোন রকম ইনফরমেশন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি। এবং সব থেকে বড় কথা, ওর সঙ্গে কোন সিকিউরিটিও ছিল না। এই ছেলেটাই টেরোরিস্টদের ব্যাপারে ইনফরমেশন দিয়েছিল। এবার কী করব আপনিই বলুন"।
তুষার বললেন "চলে গেছে? মাথুরের মোবাইল ট্রাই করেছেন?"
শাহ বললেন "ইয়েস। অনেকবার। কিছুতেই পাচ্ছি না। সুইচড অফ বলছে"।
তুষার ফোন কেটে চুপচাপ রিসেপশনের সামনের চেয়ারে বসলেন। মাথুরের ফোনে দুবার চেষ্টা করলেন। পাওয়া গেল না।
কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে তুষার অন্য একটা নাম্বারে ফোন করলেন।
ভেসে এল "হ্যালো স্যার, হাউ মে আই অ্যাসিস্ট ইউ?"
তুষার বললেন "মাথুরের ফোন ট্রেস কর। এক্ষুণি। বেশিক্ষণ সময় দিতে পারব না"।
"ওকে স্যার"।
ফোনটা রেখে তুষার পায়চারি শুরু করলেন।
বেশ কয়েক মিনিট পরে আশরফকে ফোন করলেন। আশরফ খান একবারেই ধরলেন "গুড মর্নিং স্যার"।
তুষার বললেন "সিকিওর লাইন?"
আশরফ বললেন "হ্যাঁ স্যার"।
তুষার হাঁফ ছাড়লেন "মাথুরকে পাওয়া যাচ্ছে না। লোকাল কাশ্মীরি ছেলের সঙ্গে লাপাতা হয়ে গেছে"।
আশরফ চমকে উঠলেন "সেকী!"
তুষার বললেন "ট্র্যাপ হতে পারে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এখন কী করব এখানে বসে"।
আশরফ বললেন "হামিদ কিছু করতে পারবে?"
তুষার মাথা নাড়লেন "কোন আশা করছি না। মাথুর একবার পারমিশন নিতে পারত খান"।
আশরফ ইতস্তত করে বললেন "কাশ্মীরের মোবাইল নেটওয়ার্ক কেমন জানেনই তো স্যার। নিশ্চয়ই টাওয়ার পায় নি"।
তুষার চিন্তিত মুখে খানকে বললেন "এভাবে এখানে বসে থাকলে হবে না। কিন্তু সমস্যা হল, বিপদ যে কোন পথ দিয়ে আসছে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না এখনও। কী বল?"
খান বললেন "আমরা আপাতত অপেক্ষা করি স্যার। এ ছাড়া কোন উপায় নেই আমাদের"।
তুষার ফোন রেখে চুপ করে বসে রইলেন।

৪৯

দুপুর সাড়ে বারোটা। ওয়াজুরা গ্রামে ইস্তিয়াকের বাইকে করে পৌঁছেছেন মাথুর।

উপত্যকার মাঝে একটা ছোট্ট গ্রাম ওয়াজুরা। রাস্তায় আর্মি প্রহরা ছিল, দু বার চেকিংও হয়েছে। তবে কেউ সন্দেহ করে নি। মাথুর একটু টেনশনে ছিলেন সেনারা যদি তাকে চিনে ফেলে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাকে কোন প্রশ্ন করা হয় নি।

ইস্তিয়াক তাকে নিয়ে একটা মাটির বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল "আমার ফুপুর বাড়ি। আসুন"।

মাথুর ইস্তিয়াকের সঙ্গে বাড়িটায় ঢুকল। ইস্তিয়াকের ফুপু বেরিয়ে এলেন। ইস্তিয়াক তাকে দেখিয়ে পুস্তু ভাষায় কিছু বলল। ফুপুর উত্তর শুনে ইস্তিয়াক তার দিকে তাকিয়ে বলল "আসুন স্যার, একটু বিশ্রাম করুন। আমরা গরীব, কিন্তু বাড়িতে মেহেমান এলে আমরা তাদের সহজে ছাড়ি না"।

মাথুর হাসলেন "আমার কোন সমস্যা নেই, কিন্তু কাজের ক্ষতি হবে না তো?"

ইস্তিয়াক বলল "না স্যার। একটু বসুন আগে। আসুন"।

ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন মাথুর। দরিদ্র কাশ্মীরি পরিবার তবু ঘরের মধ্যে রুচির ছাপ স্পষ্ট। মাটির মেঝের মধ্যে কম্বল পেতে দিলেন ইস্তিয়াকের ফুপু। ইস্তিয়াক বলল "বসুন স্যার"।

মাথুর বসলেন।

ইস্তিয়াকও বসল। ফুপু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে একটা প্লেটে একগাদা বিস্কুট দিলেন মাথুরকে। মাথুর দুটো বিস্কুট তুলে নিলেন। ইস্তিয়াক বলল "স্যার, আমি আগের সপ্তাহে এই গ্রামে এসেছিলাম। ফুপুর থেকে শুনেছিলাম এই গ্রামে বেশ কড়া মিলিটারি ছানবিন হয়েছিল"।

মাথুর বললেন "হ্যাঁ, ইসমাইল এই গ্রামেই তো লুকিয়ে ছিল"।

ইস্তিয়াক ফুপুর সঙ্গে পুস্তু ভাষায় কথা বলে তার দিকে তাকাল "ইব্রাহিমচাচার বাড়িতে ছিল ইসমাইল। আমরা ওদিকেই যাব"।

মাথুর বিস্কুটে কামড় দিয়ে বললেন "ওকে। এখনই যাই"।

ইস্তিয়াক বলল "একটু বসুন স্যার, চা খেয়ে যাওয়া যাক"।

মাথুর বললেন "বেশ"।

ফোনটা অফ করে রেখেছিলেন মাথুর। একবার ভাবলেন অন করবেন, পরক্ষণেই সেই প্ল্যান বাতিল করলেন। ফোন অন করলেই একের পর এক ফোন আসা শুরু করবে। এত প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করছিল না তার। ইস্তিয়াক একটা কাগজ আর পেন জোগাড় করে তার সামনে গ্রামের ম্যাপ এঁকে বলল "এই দেখুন স্যার, গ্রামে সব মিলিয়ে পয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশটা বাড়ি আছে। তার মধ্যে এই দুটো বাড়িতে ওরা ছিল"।

মাথুর বললেন "এই গ্রামে এর আগে ওরা কেউ এসেছিল?"

ইস্তিয়াক বলল "না স্যার। আসে নি। ওরা যে কোন একটা আস্তানায় বেশি থাকে না তো। তবে এখানে ওদের শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা তো কম নেই, বুঝতেই পারছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর লোকাল কাশ্মীরীদের প্রচুর রাগ আছে"।

মাথুর মাথা নাড়লেন "কোন কোন গ্রামে ওরা বেশি থাকে বলতে পারবে?"

ইস্তিয়াক বলল "ওরা গ্রামে কম থাকে। গ্রামের পপুলেশন কম। অচেনা অজানা লোক থাকলে ঠিক খবর হয়ে যায়। ওদের বেশিরভাগ শ্রীনগরেই থাকে। ওল্ড শ্রীনগরের বহু বস্তি আছে, ডাল লেকের বিভিন্ন হাউজবোট আছে যেখানে ওরা লুকিয়ে থাকে"।

মাথুর অবাক হলেন "তুমি এত জানলে কী করে?"

ইস্তিয়াক হাসল "এসব তো কাশ্মীরের ঘরে ঘরে সবাই জানে। এ আর এমন কী ইনফরমেশন স্যার"।

মাথুর বললেন “হু, হাউজবোটে রেইড করা অত সহজ কাজ নয়। অতগুলো হাউজবোট, আর অত বড় ডাল লেক। কীসের মধ্যে লুকিয়ে আছে, ইজ ভেরি টাফ টু ফাইন্ড”।

চা এল। তার সঙ্গে লোকাল বেকারির কেক। মাথুর লজ্জিত হয়ে ইস্তিয়াককে বললেন “ওরা গরীব মানুষ। আমাকে এখানে না আনলেই ভাল করতে তুমি”।

ইস্তিয়াক বলল “স্যার এরকম বলবেন না। আপনি যে এখানে এসেছেন, সেটা যে কত ভাল ব্যাপার সেটা বলে বোঝানো যাবে না। আমরা তো এটাই চেয়ে এসেছি সব সময়, দেশের মেইন স্ট্রিমে মিশতে চেয়েছি। পারি নি। সে রাগে দেশের বিরুদ্ধেই চলে গেছি কখনও কখনও”।

মাথুর বললেন “রেহানও তোমার মত কথাই বলত। কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত ছেলেটা। আমাদের দেশকে তো আমাদেরই ভাল রাখতে হবে”।

ইস্তিয়াক হাসল “রাইট স্যার, সমস্যাটা হল এ কথাটা সবাই বুঝল না”।

চা খেয়ে দুজনে বেরোল। গ্রামটা ছোট হলেও অত্যন্ত সুন্দর।

গ্রামের পাশ দিয়ে লিডার নদী বয়ে চলেছে। নদীর ওপারে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় রোদের আলোয় ঝকঝক করছে বরফ।

গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে কৌতূহলী চোখ তাদের দেখছিল।

ইস্তিয়াক ফিসফিস করে বলল “চুপচাপ চলে আসুন স্যার”।

ইব্রাহিম বুড়োর বাড়ি পৌঁছে ইস্তিয়াক চারদিকে তাকিয়ে বলল “আসুন স্যার”।

দরজা বন্ধ ছিল।

ইস্তিয়াক দরজা ঠকঠকালো।

এক বৃদ্ধ দরজা খুললেন। ইস্তিয়াক বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন “চাচা, ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ইসমাইল কোন ঘরে ছিল একটু দেখাবেন?”

বৃদ্ধ কোন কথা না বলে দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।

ইস্তিয়াক মাথুরের দিকে তাকিয়ে বলল “আসুন স্যার”।

মাথুর ইস্তিয়াককে বললেন “যাও ভেতরে যাও”।

অন্ধকার ঘর। এ বাড়িতেও দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট।

ইস্তিয়াক মোবাইলের টর্চ জ্বালাল। ঘরের মধ্যে একটা বড় খাট। বুড়ো ইস্তিয়াককে কিছু একটা বলল।

ইস্তিয়াক মাথুরের দিকে তাকিয়ে বলল “স্যার এই খাটে শুত ইসমাইল”।

মাথুর ঘরের চারদিকে তাকালেন। কিছুই সেরকম লক্ষ্য করার মত নেই।

ইস্তিয়াককে বললেন “ফোনটা দাও”।

ইস্তিয়াক মাথুরের হাতে ফোনটা দিল।

মাথুর ফোনের টর্চ নিয়ে খাটের তলায় নজর দিলেন, বেশ কিছু খবরের কাগজ বের হল।

মাথুর কাগজগুলো ভাল করে ঘাটলেন। পাকিস্তানের কয়েকটা কাগজ। কাগজের মধ্যে কোথাও কোন রকম দাগ দেওয়া নেই।

মাথুর তবু ভাল করে কাগজগুলো দেখলেন। সেরকম কিছু পেলেন না। ইস্তিয়াক বলল “কিছু পেলেন স্যার?”

মাথুর মাথা নাড়লেন।

ইস্তিয়াক, ইব্রাহিম বুড়োকে চেঁচিয়ে কিছু প্রশ্ন করল। বুড়ো কিছু একটা বলল। সেটা শুনে ইস্তিয়াক বলল “সব নিয়েই পালিয়েছে ওরা। তেমন কিছু নেই এখানে। তাছাড়া আর্মির তল্লাশিও হয়েছিল। কিছু না পাওয়ার চান্সই বেশি”।

মাথুর হতাশ মুখে কাগজগুলো ছুঁড়ে মারলেন।

চুপ চাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন।

মাথুর তীক্ষ্ণ চোখে চার দিকে নজর দিলেন। কেউ তাকে দেখছে না এখন। নেইও কেউ আশে পাশে।

একটা সিগারেট ধরালেন। ইস্তিয়াক বলল "স্যার আর কিছু দেখবেন না"?

মাথুর চারদিকে তাকালেন। বাড়িটার ভৌগোলিক অবস্থান বোঝার চেষ্টা করলেন।

এ বাড়িটায় পিছনদিকে অনেকগুলো গাছ আছে। অগোছালো বাগান আছে।

মাথুর বাগানে ঢুকলেন। একগাদা আগাছা। বেশ কিছুক্ষণ ভাল ভাবে সে দিকে লক্ষ্য করে দেখা গেল আগাছার ঝোপের মধ্যে একটা ছোট্ট জায়গায় মাটি দেখা যাচ্ছে। মাথুর এগোলেন। তার মুখে হাসি ফুটল।

পরিষ্কার জায়গার মাটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে মাথুর হাঁটু গেড়ে বসলেন। হাত দিয়েই মাটি সরাতে শুরু করলেন। ইস্তিয়াক বলল "স্যার আমার হেল্প লাগবে"?

মাথুর ইস্তিয়াককে বললেন "মাটি খোড়া যায়, এরকম কিছু আছে?"

ইস্তিয়াক বলল "দেখছি"। ঘরের ভেতর ঢুকে কয়েক মিনিট পরে বেরিয়ে এল একটা শাবল নিয়ে। মাথুরের মুখে হাসি ফুটল, "গুড। এবার মাটিটা সরাও তাড়াতাড়ি"।

ইস্তিয়াক শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। কিছুটা খোঁড়ার পরে ছোট্ট একটা চৌকনো প্যাকেট বেরোল। মাথুরের হাতে সেটা দিল ইস্তিয়াক। চারদিকে কোন লোক আছে কিনা তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হবার পরে মাথুর প্যাকেটটা খুললেন। একগাদা কাগজ বেরোল।

মাথুর কাগজগুলো একের পর এক দেখে যেতে থাকলেন। কাশ্মীর আর পাঞ্জাবের দুটো ম্যাপ আঁকা। তার ওপর উর্দু আর ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন শব্দ। মাথুর একটা কাগজ ইস্তিয়াককে দিয়ে বললেন "কী লেখা দেখো তো উর্দুতে?"

ইস্তিয়াক পড়ে বলল "কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। সম্ভবত কোন কোড ল্যাংগুয়েজ হবে"।

মাথুর ইস্তিয়াকের দিকে তাকিয়ে বললেন "রাইট। সব কাগজের ছবি তুলে আমাকে পাঠাও"।

ইস্তিয়াক ছবি তুলতে শুরু করল।

৫০

ভোর চারটে বেজেছে। মেহের সায়ককে বলল "আপনি বসুন। আমি দেখছি"।

দরজা খুলে মেহের বাইরে গেল। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে বলল "আপনি এবারে যেতে পারেন। পিছনের দরজা দিয়ে বেরোবেন। চকের কাছে অটো পেয়ে যাবেন। স্টেশন চলে যান"।

সায়ক উঠে দাঁড়াল। বলল "শুক্রিয়া"।

মেহের বলল "আপনি যান। শুক্রিয়া বলার দরকার নেই"।

সায়ক কয়েক সেকেন্ড মেহেরের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরোল। যতক্ষণ না সায়ক চোখের আড়াল হল মেহের দাঁড়িয়ে রইল। সায়ক মনে মনে বলল "ভাল থেকো মেহের, আর পারলে আমাকে ক্ষমা কোর"।

বিল্ডিং এর বাইরে টিমটিমে আলো জ্বলছে। সায়ক সন্তর্পণে চারদিকে তাকাল। মেহের ঠিকই বলেছিল। এই সময়ে কোন টহল হচ্ছে না। সায়ক হেঁটে অটোস্ট্যান্ডে পৌঁছল। অটোর মধ্যেই ঘুমাচ্ছিল সবাই। সায়ক একটা অটোতে মুখ ঢুকিয়ে ডাকল "ভাইজান, স্টেশন যাবেন?"

অটোওয়ালা উঠে বসে বলল "কেন যাব না ভাইজান, এমনি এমনি সারারাত অটোতে ঘুমাই? উঠে বসুন"।

সায়ক উঠল।

অটোওয়ালা দেশের হাল আলোচনা করতে করতে গাড়ি চালাতে লাগল। নিয়াজি খুব বাজে লোক, তেলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য হয়ে গেছে। তাদের মত গরীব মানুষরা কী করে বেঁচে

থাকবে ইত্যাদি। সায়ক হু হাঁ করে গেল। শহর পুরোপুরি ঘুমায় নি। বাজারের অনেক জায়গাতেই আলো জ্বলছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সারারাত ধরে মালপত্র আসে। কেউ কেউ দোকানেই ঘুমিয়ে পড়ে। পুরনো চক পেরোতে ঝকঝকে রাওয়ালপিন্ডি শহরটা দেখা গেল। সায়ক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আব্বাসের কথা মনে পড়ছে হঠাৎ করে। আব্বাসকে সে কথা দিয়েছিল দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। পাকিস্তানিরা অকথ্য অত্যাচারের জন্য কুখ্যাত। কথা বের করার জন্য ওরা শেষ পর্যন্ত যেতে পারে।

স্টেশনে পৌঁছে সায়ক চারদিকে তাকাল। সেনা আছে তবে সংখ্যায় কম। সে পাঠান স্যুট পরেছিল। টিকেট কাউন্টারের সামনে গিয়ে দ্বিধায় পড়ল। এই মুহূর্তে তার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়া উচিত। অন্তত দু তিন মাস কেউ তাকে খুঁজে না পায় এরকম ব্যবস্থা করা উচিত। সায়কের ক্লান্ত লাগছিল। টিকেট না কেটে সে কাউন্টারের উল্টোদিকের বেঞ্চিতে বসল। ভোরবেলাতেই একগাদা ফুলের সারি নিয়ে এক দোকানদার কোথাও যাচ্ছে। সায়ক তীক্ষ্ণ চোখে সে দিকে তাকিয়ে রইল। সে মনে মনে বলে উঠল "ইয়েস। ইয়েস। মনে পড়েছে"।

পূবের আকাশ একটু একটু করে আলোকিত হচ্ছে।

সায়ক লাফিয়ে উঠে টিকেট কাউন্টারে গিয়ে বলল "করাচীর ট্রেন কখন ছাড়বে মিয়াঁ?"

টিকেট কাউন্টারের লোকটা বলল "দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। এখনই ছাড়বে"।

সায়ক বলল "একটা টিকিট দিন"।

টিকিটটা নিয়ে সায়ক দৌড় লাগাল। ট্রেন হুইসল দিচ্ছে। কোনমতে দৌড়ে গিয়ে একটা জেনারেল কামরায় উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

বসার সিট ছিল। বসে সায়ক জোরে জোরে শ্বাস ছাড়তে লাগল।

"কী মিয়াঁ, খুব জলদি মনে হচ্ছে?"

পাশের পাঠান ভদ্রলোক উচ্চস্বরে প্রায় কামরার সবাইকে শুনিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল।

সায়ক বলল "হ্যাঁ মিয়াঁ, অটোওয়ালার দৌলতে ট্রেন আরেকটু হলেই মিস হয়ে যাচ্ছিল আর কী"।

পাঠান বলল "তা ঠিক। রাওয়ালপিন্ডির অটোওয়ালাগুলোই এরকম। আমারও কতবার হয়েছে"।

সায়ক বুঝল এ লোকের বকবক করা স্বভাব আছে। সে চোখ বুজে ঘুমনোর ভান করল।

পাঠান অবশ্য বকবক থামাল না। বকে যেতে লাগল।

টিকেট চেকার এসে চেক করে গেল। সূর্য উঠেছে। শীত আছে। সায়কের শীত লাগছিল।

পাঠান বলল "মিয়াঁ, আপনি কোথায় যাবেন?"

সায়ক বলল "করাচী"।

পাঠান আঁতকে উঠে বলল "ওরে বাবা, একটা গোটা দিন আপনি বসে বসে যেতে পারবেন?"

সায়ক মাথা নাড়ল। পাঠান বকবক করে যেতে লাগল, কীভাবে লোকে এতটা রাস্তা বসে যেতে পারে তা নিয়ে তার বড় চিন্তা। সায়কের তন্দ্রা মত এসেছিল। ট্রেনের দুলুনিতে সে ঘুমিয়েই পড়ল।

ঘুম ভাঙল সকাল দশটা নাগাদ। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মধ্যে। পাথুরে মালভূমি অঞ্চল। ধু ধু প্রান্তর। পাঠান নেই। নেমে গেছে। চড়া রোদ উঠেছে।

সায়ক পাশের জনকে জিজ্ঞেস করল "কোন স্টেশন পেরিয়েছে?"

পাশের জন বলল "মালুম নেই"।

সায়ক জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল।

খিদে পাচ্ছে। সায়ক উঠল। ফেরিওয়ালার খোঁজে বেরোল।

৫১

"স্যার মে আই কাম ইন"?

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর চেম্বারে নক করে বললেন তুষার।

মন্ত্রী হাসলেন "আরে আসুন, প্লিজ। গুডমর্নিং। প্লিজ সিট"।

তুষার বসলেন। বললেন "গুড মর্নিং স্যার"।

মন্ত্রী বললেন "পি এম আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন"।

তুষার বললেন "এখন?"

মন্ত্রী বললেন "হ্যাঁ। এক মিনিট"।

মন্ত্রী ইন্টারকমে ফোন করে জেনে নিলেন পি এম ফাঁকা আছেন নাকি। নিশ্চিত হয়ে উঠে পড়ে বললেন "চলুন"।

তুষার উঠলেন। দুজনে বেরোলেন চেম্বার থেকে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বললেন "একসঙ্গে অনেকগুলো ইস্যু এসে গেছে তুষার। উই নিড টু ডিসকাস দিস টুগেদার। আপনার ওয়াইফের খবর শুনলাম। এখন ঠিক আছেন তো?"

তুষার বললেন "হ্যাঁ। শি ইজ রিকভারিং"।

মন্ত্রী খুশি হলেন "গুড"।

প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে আসতে দেখেই দরজা খুলে দিয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীরা। তারা প্রবেশ করলেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন "গুড মর্নিং। প্লিজ সিট"।

দুজনে বসলেন। প্রধানমন্ত্রী তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "মিস্টার রঙ্গনাথন, সায়ক বড়ালের আপডেট কী?"

তুষার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দিকে তাকালেন। মন্ত্রী কিছু বললেন না। তুষার প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন "আপডেট এখনও অবধি কিছু আসেনি স্যার। এলেই আপনাকে জানিয়ে দেব"।

প্রধানমন্ত্রী বললেন "আপনার পাকিস্তান টিমের অবস্থা করুণ মিস্টার রঙ্গনাথন। তাদের আমরা ডিজওন করেছি ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তান ওদের সবাইকে ধরতে পারলে আন্তর্জাতিক মহলে আমাদের মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না"।

তুষার বললেন "দে আর ডুইং দ্য টাফেস্ট জব স্যার। আব্বাসকে ওরা দুমড়ে মুচড়েও কিছুই বের করতে পারে নি। এই মুহূর্তে পাকিস্তান যে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিদেশী অস্ত্র জড়ো করছে, সে খবর ওরা না দিলে আমরা জানতেও পারতাম না। আমার মনে হয় সায়কের ওপর আমাদের ভরসা রাখা উচিত, এছাড়া তো উপায়ও নেই কোন"।

প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত মুখে বললেন "আর কাশ্মীর? কাশ্মীরের কী অবস্থা? অবন্তীকে মেরে দিল, শুনলাম আপনার টিমের একজন সদস্য নিখোঁজ হয়ে গেছে, এরকম ছন্নছাড়া অবস্থা তো রিসেন্ট পাস্টে হয়েছে বলে মনে পড়ছে না"।

তুষার বললেন "আমি কিন্তু নেগেটিভ কিছু ভাবছি না স্যার। আমাদের অফিসারেরা যথেষ্ট এফিসিয়েন্ট। গত কয়েক বছরে আমাদের ফেইলিওর রেটও যথেষ্ট কম। এই মুহূর্তে কাশ্মীর সমস্যা শুধু তো আর্মিদের জন্য হয় নি। পলিটিক্যাল ডিসিশনসও তার জন্য দায়ী"।

প্রধানমন্ত্রী ঈষৎ ক্ষুব্ধ হলেন "আপনি কী বলতে চাইছেন মিস্টার রঙ্গনাথন? আমরা দায়ী কাশ্মীর সমস্যার জন্য?"

তুষার হাসলেন "ব্যাপারটা তো আমরা-ওরার না স্যার। আমাদের তো একটা ইউনিট হিসেবেই কাজ করতে হবে। পাকিস্তান ইজ এ থ্রেট টু দ্য সিভিলাইজেশন। যে দেশের গভর্নমেন্ট সরাসরি টেররিজমকে স্পন্সর করে সে দেশের থেকে আর কী এক্সপেক্ট করা যায়? কিন্তু যে সব দেশ পাকিস্তানকে আর্মস বিক্রি

করছে, তারা তো জেনে বুঝেই করছে? আমাদের বার বার বলা সত্ত্বেও কি তারা পাকিস্তানকে আর্মস বিক্রি করা বন্ধ রেখেছে? এদিকে আমরা কি সেভাবে কূটনৈতিক চাপ দিতে সক্ষম হয়েছি? একই ভাবে, আমরা যদি কাশ্মীরে আরও বেশি করে নজর দিতে পারি, আমার মনে হয় কাশ্মীর বিদ্রোহী হবার আগে একটু হলেও চিন্তায় পড়বে"।

প্রধানমন্ত্রী বললেন "আমরা কাশ্মীরের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। এ কথা আপনার থেকে ভাল কেউ জানে না। কিন্তু ওরা যদি টেরোরিস্টদের শেল্টার দেয়, তখন ন্যাশনাল সিকিউরিটির প্রশ্নে আপনাকে তো কড়া হতেই হবে। কী করবেন তখন আপনি?"

তুষার বললেন "শিওর স্যার। আমি আপনার সঙ্গে একমত। আমাকে অন্তত সাতদিন সময় দিন। আশা করছি আমি আপনাকে একটা ব্রিফ করে দিতে পারব প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের"।

প্রধানমন্ত্রী বললেন "আর একটা কথা"।

তুষার প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকালেন, "ইয়েস স্যার"।

প্রধানমন্ত্রী বললেন "টিম রেডি করুন। নিয়াজি বার বার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আমি ঠিক করেছি ওর আমন্ত্রণ গ্রহণ করব। ক্রিকেট সিরিজেও রাজি হব। আপনি টিম পাঠিয়ে সিকিউরিটি ইস্যুজগুলো দেখে আমায় রিপোর্ট করুন, সাতদিনই সময় দিতে পারি আপনাকে। এক সঙ্গে সবটা দেবেন না হয়, ক্লিয়ার?"

তুষার প্রধানমন্ত্রীর চোখে চোখ রেখে বললেন "ক্লিয়ার স্যার"।

৫২

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল বীরেনের। সারারাত এপাশ ওপাশ করেছে। একবার বাবা মার কথা মনে হচ্ছে। পরক্ষণেই অপরাধবোধ আসছে, মনে হচ্ছে ছুটিতে না এসে আশরফ খানের পাশে থাকলেই ভাল হত।

কোনদিন স্বপ্নেও সে ভাবে নি এরকম চাকরি হতে পারে তার। দেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চাকরি যা দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত।

উঠে পড়ল সে। মুখ হাত ধুয়ে ট্রাইজার আর টি শার্ট পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

পূব আকাশে সবে সূর্য উঁকি মারছে। আকাশ মেঘলা। বাড়ি থেকে পাড়ার মাঠটা হাঁটা পথে মিনিট পাঁচেকের। বেশ বড় মাঠ। অনেকেই দৌড়তে আসে সকালে। বীরেন মাঠে পৌঁছে আগের অভ্যাসমত দৌড়তে শুরু করল। দৌড়নোর সময় সে দেখেছে মাথায় কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। নিজের সঙ্গে অদ্ভুত একটা আত্মিক যোগ তৈরী হয় এ সময়টায়।

মাঠের চারদিকে সাত পাক দৌড়ে বীরেন মাঠের পাশের সিমেন্ট বাঁধানো জায়গায় হালকা এক্সারসাইজ শুরু করল। হরেনকাকা প্রতিদিনের মত প্রাণায়াম করছিলেন। তাকে দেখে বললেন "কী বীরেন, আজকাল তো তোকে আর দেখা যায় না। কোথায় পোস্টিং তোর?"

বীরেন সতর্ক হল। কিছুই বলা উচিত না তার। বলল "আপাতত কলকাতাতেই"।

হরেনকাকা বললেন "বিয়ে থা করবি তো, নাকি?"

বীরেন বলল "সবে তো চাকরিতে ঢুকলাম কাকা। ওসব পরে দেখা যাবে"।

হরেনকাকা বললেন "দেখিস, আমার এক ভাইয়ের মেয়ে আছে। দেখতে শুনতে ভাল। তুই চাইলে তোর বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারি"।

বীরেন হতাশ হল। টেনশনের মধ্যে এসব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না।

সে বলল "আচ্ছা কাকা সেসব দেখা যাবে, আমি মাঠের চারপাশে আরেকপাক দিয়ে আসি"।

হরেনকাকা হাঁ হাঁ করে ওঠার আগেই বীরেন দৌড়তে শুরু করল।

মাঠে বাচ্চারা এসেছে উইকেট ব্যাট নিয়ে। মাঠের মাঝখানে উইকেট পুতে খেলা শুরু করেছে। বীরেন দৌড়তে দৌড়তে সেদিকে তাকাচ্ছিল। খেলতে ইচ্ছা করছিল। কয়েকটা পুশ আপ মেরে আবার দৌড়ে নিল খানিকটা। মাঠটা ঘোরা হয়ে গিয়ে বাঁধানো জায়গাটায় এসে তার একটা হার্টবিট মিস করল।

হরেনকাকা উল্টো হয়ে পড়ে আছেন। বীরেন এগিয়ে গিয়ে দেখল দুচোখের মাঝখানের জায়গাটায় কেউ গুলি করেছে। বীরেন চারদিকে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। সে মোবাইল নিয়ে বেরোয় নি। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। একটা বাইকের জোরে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল।

বীরেন চেঁচিয়ে বাচ্চাগুলোকেই ডাকল। সবাই ছুটে এল। বীরেন তাদের বলল "সবাইকে ডাক শিগগির"। বাচ্চাগুলো সভয়ে হরেন কাকার দিকে তাকাল। এরকম দৃশ্য তারা এর আগে কেউ দেখে নি।

মিনিট দশেকের মধ্যে পাড়ার প্রায় সবাই চলে এল।

শান্ত মফস্বলে এরকম ঘটনা হতে পারে কেউ ভাবতেই পারে না।

পুলিশ এল। থানার ওসি তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন "আপনিই দেখেছিলেন?"

বীরেন মাথা নাড়ল।

ওসি বললেন "আচ্ছা, আমার সঙ্গে একটু থানায় যেতে পারবেন? বডি আপাতত ফরেন্সিক যাবে, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে"।

বীরেন বলল "নিশ্চয়ই"।

পুলিশের গাড়িতে থানায় নিয়ে যাওয়া হল তাকে। ওসি তাকে বসতে বলে বললেন "ঠিক কী হয়েছিল বলুন"।

বীরেন বলল।

ওসি বললেন "কেউ ছিল না, আর আপনি এসে দেখলেন ভদ্রলোক মরে পড়ে আছেন? কথাটা বিশ্বাসযোগ্য"?

বীরেন খানিকটা ঘাবড়েই গেছিল। সে এর উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমন সময় দুজন থানায় ঢুকে সরাসরি ওসির সামনে এসে দাঁড়ালেন "ওকে ছেড়ে দিন"।

ওসি অবাক হয়ে বললেন "মানে? আপনারা কারা?"

একজন পকেট থেকে আই কার্ড বের করে ওসিকে দেখালেন।

ওসি সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন "এক্সট্রিমলি সরি", বীরেনের দিকে তাকালেন ওসি, "আপনি যেতে পারেন"।

দুজন বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "চলুন"।

বীরেন বেরোল। থানার বাইরে এসে একজন বললেন "আপনি বাড়ি চলে যান। এভাবে একা বেরোবেন না এখন"।

বীরেন বলল "ওরা কি আমাকেই ... ?"

ভদ্রলোক বললেন "নাও হতে পারে। আপনাকে ভয় দেখিয়ে বাঁকাতে চাইছে"।

বীরেন আতঙ্কিত হল। তার মনে হচ্ছিল এবার আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

৫৩

ট্রেন লেট করল। সায়ক কখনও ঘুমিয়ে ছিল, কখনও জেগে বসেছিল। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে খাবার কিনে খেল।

করাচী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যখন ট্রেন পৌঁছল তখন সকাল সাড়ে আটটা বাজে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে সে ট্রেন থেকে নামল। স্টেশনে সেনা ভর্তি। সায়ক কোন রকম তাড়াহুড়ো করল না। ধীরে সুস্থে হাঁটতে লাগল। চেকারের কাছে টিকেট জমা দিল এবং স্টেশনের বাইরে এল। স্টেশনের বাইরে বাস স্ট্যান্ড।

সায়ক দেখল নর্থ নাজিমাবাদের বাস দাঁড়িয়ে আছে। সে বাসে উঠে বসল। আরব সাগরের তীরে অবস্থিত করাচী শহর। আধুনিকতার ছোঁয়া এসে লাগলেও উপমহাদেশের শহরগুলোর মতই জনবিস্ফোরণে ধুঁকছে। বাস ছাড়তেই জ্যামের মুখে পড়ল। সায়ক অস্থির হল না, চুপ করে বসে রইল।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাদে সায়কের বাসস্ট্যান্ড এল। সে বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল। নর্থ নাজিমাবাদ করাচীর অন্যতম পশ এলাকার মধ্যে পড়ে। পাকিস্তানের জন্মের পরে ইতালীয়দের দিয়ে এই অঞ্চলটির প্ল্যানিং করা হয়েছিল। সুদৃশ্য বাড়ি, সুপ্রশস্থ রাস্তা। একেকজনের বাড়ি অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরী।

সায়ক নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনিট পনেরো বাদে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। এ বাড়িটাও অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরী, কিন্তু বর্তমানে কেউ থাকে না সেটা বাড়িটার বাগানে আগাছা আর গেটে তালা দেখলেই বোঝা যায়।

বাড়ির সামনের নেমপ্লেটে উর্দুতে লেখা "ওমর শেখ"।

সায়ক চারদিক দেখে নিল। শান্ত জায়গা। রাস্তা দিয়ে গাড়ি গেলেও এলাকার বাড়িগুলো থেকে তেমন সাড়াশব্দ নেই। পাশাপাশি বাড়িগুলোর মধ্যেও দূরত্ব অনেকটাই। দু তিন বার চার পাশে তাকিয়ে পাঁচিল টপকাল সে। সন্তর্পণে বাড়ির দরজার কাছে এসে তালাটা পরীক্ষা করল।

শক্ত তালা। সায়ক হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ির পিছনে গেল। পিছনের দিকে একটা ঘেরা মত জায়গা। দরজাটা ভেতর থেকে তালা দেওয়া। সায়ক চুপ করে দাঁড়াল কয়েক সেকেন্ড। তারপর দরজায় জোরে ধাক্কা মারল। দরজাটা একটুও নড়ল না।

সায়কের ঘাম দিচ্ছিল। তার চোখ পড়ল দেওয়াল সংলগ্ন একটা শাল গাছে। একটুও না ভেবে অতি দ্রুততার সঙ্গে শালগাছে উঠে দেওয়ালের ওপরে দাঁড়াতে পারল। নিচে কংক্রিট। প্রায় দু মানুষ উঁচু জায়গাটা। সায়ক কিছু না ভেবে নিচের দিকে ঝাঁপ মারল। মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেল খানিকটা। কাঁধে ব্যথা হল কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সে ব্যথা সহ্য করে নিল। একটা বড় কুয়ো আছে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে। সায়ক কুয়ো থেকে জল নিয়ে গায়ে মাথায় দিল। চুপ করে কয়েক মিনিট মেঝেতে বসে বাড়ির ভিতরের দরজার দিকে চোখ গেল তার। পাগলের মত চারদিকে তাকাল সে। যদি কিছু পাওয়া যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অবশ্য তার মুখে হাসি ফুটল। কুয়োর পাশে একটা কুড়ুল রাখা।

জোরে শ্বাস ছেড়ে কুড়ুলটা নিয়ে দরজায় মারতে লাগল। শাল কাঠের দরজা। অত সহজে ভাঙার বস্তু নয়। দু তিন বার করে বাড়ি মেরে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। আধঘন্টার চেষ্টায় দরজার নিচের দিকটা ভাঙা গেল।

সায়ক অস্ফূটে উল্লাস করে উঠে নিচের ফাঁক দিয়ে বাড়িটার ভেতর প্রবেশ করল।

অত্যন্ত অভিজাত আসবাবপত্র দিয়ে ঘর সাজানো। কিন্তু বাড়িটায় কেউ থাকে না বলে নোংরা জমেছে। মাকড়সার ঝুল হয়েছে। সায়ক তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে ড্রয়িং রুমে এল। আফসানা সাঈদ এবং ওমর শেখের একত্রে একটা ফটো রাখা সোফার পাশে। সায়কের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে ফটোটা খানিকক্ষণ দেখে বাড়িটা তল্লাশি করতে শুরু করল।

দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় বড় বড় দুটো বেডরুম, একটা ড্রয়িং রুম, আর ডাইনিং রুম। দোতলায় যাবার সিঁড়ি হিন্দি সিনেমার বাড়িগুলোর মত, নিচ থেকেই। প্রতিটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল পড়ল।

একগাদা বই ছাড়া তেমন কিছুই আর পাওয়া গেল না।

সায়কের হতাশ লাগছিল। অন্ধকার হলে আলো জ্বালানো সম্ভব নয়। তাহলে বাইরের লোকের সন্দেহ হতে পারে।

সায়ক দোতলায় একটা বেডরুমে ঢুকল। ওয়ার্ডরোবগুলো তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু করল। কিছুই পাওয়া গেল না। হতাশায় সায়ক দেওয়ালে জোরে ঘুষি মারল।

আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চমকে দিয়ে দেওয়ালের একটা অংশ পাশে সরে গিয়ে একটা ছোট্ট তাক বেরিয়ে এল ।

সায়ক অবাক হয়ে দেখল সেখানে একটা ছোট ল্যাপটপ রাখা।

সায়ক আনন্দে "ইউরেকা" বলে উঠল।

৫৪

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রাত আটটার সময় অমৃতসরের ক্যানাল রোডের একটা বাড়ির সামনে একটা অল্টো গাড়ি এসে দাঁড়াল। আসলাম গাড়ি চালাচ্ছিল। কাদরী বাড়ির নাম্বার মিলিয়ে নিয়ে আসলামকে বললেন "তুমি এখানেই দাঁড়াও। গাড়ি থেকে নামবে না। কোথাও যাবে না, কোথাও কোন ফোন করবে না। বুঝেছ?"

আসলাম মাথা নাড়ল "বুঝেছি জনাব"।

কাদরী ইসমাইলকে ইশারা করলেন। দুজনে গাড়ি থেকে নামল।

কাছাকাছি কোথাও ডিজে চালানো হয়েছে। খুব জোরে গান বাজনা হচ্ছে।

কাদরী বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে কলিং বেল দিলেন। কয়েক সেকেন্ড পর একটা ছোট জানলা খুলে একটা মুখ বেরিয়ে এল "কে?"

কাদরী শুধু বললেন "বলুন প্রফেসর এসছে"।

জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বাড়ির গেটটা খুলে গেল। কাদরী ইসমাইলকে নিয়ে বাড়ির বাউন্ডারিতে প্রবেশ করলে গেটটা আবার বন্ধ করে দেওয়া হল। বিরাট বড় বাড়ি। কাদরী কোন দিকে না তাকিয়ে বাড়ির মূল দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। একজন লম্বা চওড়া পাঠান কাদরীকে দেখে হেসে জড়িয়ে ধরল। বলল "আমার সঙ্গে আসুন"।

বাড়িটার ভিতরে অনেক লোক। কাদরী এবং ইসমাইল কোনদিকে না তাকিয়ে লোকটাকে ফলো করে যেতে লাগল। এ ঘর সে ঘর করে লোকটা একটা ছোট ঘরে এসে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করল। তারপর মেঝের একটা প্লেট সরাতে একটা সিঁড়ি দেখা গেল। লোকটা বলল "আমার পিছন পিছন আসুন"।

লোকটা নেমে গেল।

তার সঙ্গে দুজনে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আরেকটা ছোট ঘরে পৌঁছল তিনজনে। লোকটা ঘরের আলো জ্বেলে দিল। ঘর আলোকিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইসমাইল বলল "মাশাল্লাহ"।

কাদরী হাসি হাসি মুখে ইসমাইলের দিকে তাকালেন। ঘর ভর্তি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ অসংখ্য বিস্ফোরকে।

কাদরী পাঠানের দিকে তাকিয়ে বললেন "শুক্রিয়া"।

পাঠান বলল "আপনাদের জন্য ফারমান আলীর খাস জিনিস পাকিস্তান থেকে পাঠিয়েছেন মেজর সাহাব"।

ইসমাইল একটা মেশিনগান তুলে পরীক্ষা করতে করতে বলল "মেজর সাহাবকে বলে দেবেন ইসমাইল তার জীবনের সঞ্চিত সমস্ত ভালোবাসা তাকে উজাড় করে দিয়েছে। মজা এসে যাবে প্রফেসর সাহাব"।

কাদরী পাঠানের দিকে তাকিয়ে বললেন "এগুলো কবে পাওয়া যাবে?"

পাঠান বলল "এখনই পাবেন। কোন অসুবিধা নেই"।

কাদরী বললেন "এখান থেকে নিয়ে যাব কী করে?"

পাঠান বলল "অপারেশন কবে?"

কাদরী ইসমাইলের দিকে তাকালেন।

ইসমাইল বলল "আজ রাতেই হোক ইনশাল্লাহ। দেরী কেন?"

কাদরী অবাক হয়ে ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে বলল "আজ রাতে"?

ইসমাইল হো হো করে হেসে উঠে বলল "মজা করছিলাম। প্রফেসর সাহাব, এই বারুদের গন্ধ আমার রক্তকে উত্তেজিত করে তুলছে। আমি এখানেই থেকে যাই। কাল ভোরে কাজ করে আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে

রওনা দেব"।

কাদরী ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে বললেন "সেরকম তো নির্দেশ ছিল না"।

ইসমাইল জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল "আসল নির্দেশ তো উপরওয়ালা দেন প্রফেসর সাহাব। আমি ছাড়া আর কেউ তো তার কাছে যাবে না। তাহলে এই সিদ্ধান্তটা আমি নিলেই ভাল হয় না?"

কাদরী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পাঠানের দিকে তাকিয়ে বললেন "ইসমাইল এখানে থাকলে কোন সমস্যা?"

পাঠান মাথা নাড়ল "না। আপনি থাকলেও কোন সমস্যা নেই"।

কাদরী চিন্তিত গলায় বললেন "আমার এখানে থাকলে হবে না। রিপোর্টিং এর ব্যাপার আছে। তবে ইসমাইলকে আমার এখনই ছাড়তে ইচ্ছা করছে না"।

ইসমাইল হেসে বলল "প্রফেসর সাহাবের কি আমার সঙ্গে ইশক হয়ে গেছে? আরে মিয়াঁ, আপনি চিন্তা করবেন না, ইসমাইল কখনও ফেল করে না। জীবনের শেষ যুদ্ধেও করবে না"।

মেঝেতে টুল রাখা ছিল। কাদরী টুলের ওপর বসে বললেন "বেশ। তবে কাল ভোর পাঁচটায় গাড়ি নিয়ে আমি এখানে চলে আসব। বাকিটা তোমার ওপর"।

ইসমাইল কাদরীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুকিয়ে বলল "জ্যায়সে আপ কহে"।

কাদরী আরও কয়েক মিনিট চুপ করে বসে পাঠানকে বললেন "আমি তবে বেরিয়ে যাই। আমাকে নিয়ে চলুন"।

ইসমাইল এগিয়ে এসে কাদরীকে জড়িয়ে ধরল। কাদরী ইসমাইলের পিঠ চাপড়ে বললেন "সাবধানে। চোখ কান খোলা থাকে যেন"।

ইসমাইল বলল "একদম"।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পাঠানের দেখানো পথে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন কাদরী। আসলাম গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কাদরী আসলামের পাশে বসে বললেন "চল"।

আসলাম বলল "উনি?"

কাদরী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে শ্বাস ফেলে বললেন "আসবে না"।

৫৫

বীরেন নিজের ঘরে এসে হাঁফাচ্ছিল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, খোদ তাদের এলাকায় এসে এরা এত বড় একটা কান্ড ঘটিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারে।

সে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আশরফ খানকে ফোন করল। একবারেই ধরলেন আশরফ, "গুড মর্নিং বীরেন, কী হল?"

বীরেন বলল পুরো ব্যাপারটা।

আশরফ বললেন "মাই গড। তুমি কোন সাউন্ড পাও নি? বা লোকটাকে পড়ে যেতেও দেখো নি?"

বীরেন বলল "না স্যার। আমি কিচ্ছু দেখি নি। আমি যখন হরেনকাকার কাছে গেলাম, উনি অলরেডি মরে পড়ে ছিলেন"।

আশরফ বললেন "বুঝেছি। দে হ্যাভ গ্রোন স্ট্রঙ্গার। তুমি চোখ কান খোলা রেখে চল। ফ্যামিলির ওপরে নজর রাখো। আমি তোমাকে পরে ফোন করছি"।

বীরেন বলল "আচ্ছা স্যার"।

ফোন রাখল বীরেন। মা এল ঘরের ভিতরে, উদ্বিগ্ন গলায় বলল "কীরে, কী শুনছি! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! আমাদের এলাকায় তো কোনদিন এসব কিছু হয় নি!"

বীরেন মাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল "তুমি চিন্তা কোর না, দেখো হরেনকাকার কোন শত্রু ছিল হয়ত"।

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "তুই সকালে আর হাঁটতে যাবি না। ঠিক আছে?"

বীরেন মাকে জড়িয়ে ধরে বলল "আচ্ছা বাবা ঠিক আছে। আর যাব না। খুশি?"

বাবা ঢুকল ঘরের ভেতরে। বলল "তোর মার সব কিছুতেই চিন্তা। নকশাল আমল যেন দেখে নি। এই খুন হচ্ছে, এই কাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সে সব ভয়ানক দিন ছিল। এসব ছুটকো ছাটকা মার্ডার নিয়ে চিন্তা করছে"।

মা বলল "তুমি থামো। একটা মার্ডারও ভাল না। কেন এভাবে মারবে? এগুলো ঠিক?"

বাবা বলল "আচ্ছা, তুমি যাও। চা কর একটু। এসব নিয়ে যত চিন্তা করবে তত চিন্তা বাড়বে"।

মা গজগজ করতে করতে ঘরের বাইরে গেল।

বাবা বীরেনের পাশে বসে ঠান্ডা গলায় বলল "ওদের কথাটা শুনতে পারতিস। দেখ তো ওরা কী শুরু করল!"

বীরেন চমকে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল "মানে? তুমি জানো?"

বাবা হেসে বলল "তোকে এখন আর বলতে তো কোন প্রবলেম নেই। ওরা কি তোকে এমনি এমনি সিলেক্ট করেছিল? তুই আমার ছেলে বলে করেছিল"।

বীরেন বিস্ফারিত চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল "মানে?"

বাবা বলল "মুদসসর নওয়াজ খান, রাজাকার ছিলাম। রাজাকার মানে জানিস? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের সাহায্য করেছিল যারা। কেনই বা করবে না? আসল ধর্ম তো ওরাই পালন করে। বাঙালিরা কি সত্যিকারের মুসলমান নাকি? থুঃ। এরা কোনদিন হতেও পারবে না। যাই হোক, মুক্তিবাহিনীর তাড়া খেয়ে একাত্তরে ভারতে ঢুকি। কোথায় যাব? তখন তো এপারেও খুব একটা ভাল পরিস্থিতি ছিল না। হরদম খুন দাঙ্গা লেগে আছে। আমি জয়েন করলাম একটা নকশাল গ্রুপে। কিছুদিন অপারেশন চালাবার পর বুঝলাম নকশালরা মরবে। সব মরবে। চলে গেলাম বম্বে। বছর পাঁচেক গা ঢাকা দিয়ে এখানে চলে এলাম। তখন এত সমস্যা ছিল না। রেশন কার্ড ভোটার কার্ড সব হয়ে গেল। নাম পাল্টালাম। হিন্দু নাম রাখলাম। সদাগরী অফিসে চাকরি করলাম। কারও বাপের সাধ্যি নেই সন্দেহ করে। বিয়ে করলাম অফিসের এক সিনিয়র কলিগের মেয়ের সঙ্গে। তুই হলি, বুল্টি হল। যোগাযোগটা কিন্তু ঠিকই ছিল। নির্দেশ একটাই ছিল, চুপ করে থাকো। কিছু করতে হবে না। যেরকম চলছে সেরকমই চলুক। একদিন কুরবানী দিতে হবে। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। একজন সাচ্চা মুসলমান তো আল্লাহর কাছে তার সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটাকেই কুরবানী দেয়। আমার সব থেকে প্রিয় তুই। মনে আছে তোকে ছোটবেলায় রুমান মিয়াঁ বলে ডাকতাম? ওটাই তোর নাম। এবার বল, তোর বাবার জন্য তুই নিজেকে কুরবান করতে রাজি নোস?"

বীরেন হাঁ করে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না তার অফিস করা বাবা, দৈনন্দিন জীবনে সাধারনের থেকেও সাধারনতর বাবা এই কথাগুলো বলছে। সে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না, কোনমতে বলল "বোম্বেতে ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারত বাবা। হাইজ্যাকিং এর সময়ও"।

বাবা ঠান্ডা গলায় বলল "পারত। এই মিশনে ওরা তোকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। ওদের হাতে আমি তোকে কুরবান করেছি। তোকে অনেকবার অনেকভাবে ওরা বলেছে, যোগাযোগ করেছে। আমি চাইনি তোর সামনে আসতে। কিন্তু কী করব বল, তুই কিছুতেই বুঝছিস না। অগত্যা..."

বাবা তার দিকে তাকাল।

বীরেন বলল "মা জানে?"

বাবা হাসিমুখে বলল "খেপেছিস? এসব কেউ বলে?"

মা চা নিয়ে ঢুকল। তাদের দেখে বলল "কী কথা হচ্ছে বাপ ছেলেতে?"

বীরেন উত্তর দিতে পারল না। তার মনে হচ্ছিল সে মাটিতে মিশে যাচ্ছে।

৫৬

রাত এগারোটা।

প্রেসিডেন্ট হাউজ। ইসলামাবাদ।

আই এস আইয়ের নবনিযুক্ত চিফ মুস্তাকিন শাহরিয়র গোপনে এসেছেন প্রেসিডেন্ট নিয়াজির সঙ্গে দেখা করতে। বসার ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। কিছুক্ষণ পরে নিয়াজির খাস খানসামা জাকির এসে শাহরিয়রকে বলল "আপনি আমার সঙ্গে আসুন জনাব"।

শাহরিয়র উঠলেন। খানিকটা হেঁটে একটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন জাকির। শাহরিয়রের আরেকপ্রস্থ তল্লাশির পর দরজা খুলে দেওয়া হল। শাহরিয়র দেখলেন প্রেসিডেন্ট টিভিতে ক্রিকেট দেখছেন এক মনে। তাকে দেখে বললেন "আসুন"।

শাহরিয়র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে জাকির দরজা বন্ধ করে দিল।

নিয়াজি বললেন "বসুন, নিজেকে স্বাভাবিক করুন"।

শাহরিয়র উসখুস করে বসলেন।

নিয়াজি টিভির দিক থেকে মুখ না ঘুরিয়ে শাহরিয়রকে বললেন "আপনি ঠিক কোন পদে আছেন, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার সম্যক ধারণা আছে মিস্টার শাহরিয়র?"

শাহরিয়র গলা পরিষ্কার করে বললেন "জি জনাব"।

নিয়াজি বললেন "দেখুন মিস্টার শাহরিয়র, আমি চাইলে অনেক ব্যক্তিত্বযুক্ত কাউকে আই এস আই চিফ করতেই পারতাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম তাতে আমার পারপাস সলভ হবে না। ইসলামাবাদকে অনেক ক্ষেত্রে কিছু না জানিয়ে আই এস আই নিজের মত করে কাজ কর্ম করে চলে। সরফরাজের কথাই ধরুন। ও যে কাশেম সোলেমানীর কাছে যাবে, আমার থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতিটুকুর পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করে নি। তাছাড়া যত দিন যাচ্ছে, আমার এ বিশ্বাস তত বেড়ে চলেছে যে, সেদিন আমার গাড়িতে ব্লাস্টের পিছনেও আই এস আইয়ের যথেষ্ট হাত আছে। আমি কি ভুল বলছি মিস্টার শাহরিয়র?"

শাহরিয়র এসির প্রবল ঠান্ডা সত্ত্বেও ঘামছিলেন। কোন মতে বললেন "জি জনাব, সরফরাজের কাজ কর্ম সম্পর্কে আমি খুব বেশি ওয়াকিবহাল ছিলাম না। উনি বহু ক্ষেত্রেই আমাদের অন্ধকারে রেখে অনেক সিদ্ধান্ত নিতেন। তবে আপনার গাড়িতে ব্লাস্টের পেছনে যেই থাকুক, আমরা তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরতে সক্ষম হব, আমি এই আশা অবশ্যই করি"।

নিয়াজি টিভি থেকে মুখ সরিয়ে কয়েক সেকেন্ড শাহরিয়রের দিকে তাকিয়ে বললেন "ইন্টারেস্টিং। ইউ আর এ গুড ম্যান মিস্টার শাহরিয়র। লাইক আ পোয়েট। আপনি আই এস আইতে কী করছেন?"

শাহরিয়র হাসলেন না। চুপ করে বসে রইলেন।

নিয়াজি বললেন "এই মুহূর্তে পাকিস্তানের হাল সম্পর্কে আমাকে কি কোন ব্যাপারে আপনি অবগত করতে চান মিস্টার শাহরিয়র?"

শাহরিয়র বললেন "বিভিন্ন মিডিয়া হাউজ থেকে পাকিস্তানে ডেমোক্রেসি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সওয়াল করা হচ্ছে। এই নিয়ে বিরূপ জনমতও তৈরী হচ্ছে জনাব"।

নিয়াজি ঠান্ডা গলায় বললেন "সেক্ষেত্রে সেই মিডিয়া হাউজের এডিটরগুলোকে বেঁধে এনে ইন্ডিয়া বর্ডারে ট্যাঙ্কের সামনে ছেড়ে দিন। এত ডেমোক্রাসি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। আপনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। মিডিয়া যা চাই, তা দেখাতে পারে না। পৃথিবীর সর্বত্র মিডিয়াকে কন্ট্রোল করা হয়। পাকিস্তান ডাজ নট ডিজারভ ডেমোক্রেসী। এই সাবকন্টিনেন্টের কোন দেশই ডেমোক্রেসী ডিজারভ করে না"।

শাহরিয়র বললেন "ওকে জনাব। আমি ওদের কন্ট্রোল করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছি"।

নিয়াজি সামনে রাখা টেবিলে স্কচের গ্লাস তুলে চুমুক দিয়ে বললেন “ফারমান আলী পাকিস্তানে কী করছে জনাব? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া?”

শাহরিয়র চমকে নিয়াজির দিকে তাকালেন। নিয়াজি বললেন “জানি জানি, আমি জানব না তো কে জানবে? এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ভাল মন্দ দেখার সব দায়িত্ব যখন আমার তখন তো আমিই দেখব, তাই না? ফারমান আলী পাকিস্তানে কী করছে মিস্টার শাহরিয়র?”

শাহরিয়র বললেন “দে আর প্ল্যানিং সামথিং ভেরি বিগ। সো দে আর প্রিপেয়ারিং"।

নিয়াজি বললেন “প্রিপেয়ারিং? অ্যান্ড হাউ বিগ? এতটাই বিগ যে আমাকে জানাবার প্রয়োজনটুকু মনে পড়ে নি কারো?”

শাহরিয়র মাথা নিচু করে বললেন “সরি জনাব। আমিও সম্প্রতিই জেনেছি। আগে জানলে নিশ্চয়ই জানাতাম আপনাকে। তবে কর্নেল খান হয়ত এই ব্যাপারে আমার থেকে অনেক বেশি জানবেন”।

নিয়াজি চোখ ছোট ছোট করে শাহরিয়রের দিকে তাকিয়ে বললেন “কল হিম। নাও”।

শাহরিয়র বললেন “এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন হয়ত”।

নিয়াজি বললেন “ঘুম থেকে তুলে নিয়ে আসুন। আমি ডেকেছি যখন তখন তিনি যে জাহান্নামেই থাকুন, তাকে তো আসতেই হবে মিস্টার শাহরিয়র”।

শাহরিয়র পকেট থেকে ফোন বের করলেন।

৫৭

নথিগুলোর ফটো তোলা হয়ে গেছিল।

মাথুর ইস্তিয়াককে বললেন “এবার আমাদের অনন্তনাগে ফিরে যেতে হবে”।

ইস্তিয়াক বলল “স্যার, আমার ফুপু অনেক কষ্ট করে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। না খেয়ে গেলে যে খুব খারাপ হবে”।

মাথুর ইস্তিয়াকের দিকে তাকিয়ে বললেন “কিন্তু আমায় যে এই ডকুমেন্টগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাতে হবে”।

ইস্তিয়াক বলল “কোন অসুবিধা নেই স্যার। আপনি খেয়ে নিন। আমি যত জোরে সম্ভব বাইক চালিয়ে আপনাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাব”।

মাথুর আর না বলতে পারলেন না।

ইস্তিয়াকের ফুপু অনেক কিছু আয়োজন করে ফেলেছিলেন এইটুকু সময়েই। মাথুর খেতে ভালোবাসেন। তবু খাওয়ায় মন বসাতে পারছিলেন না। মোবাইল দেখছিলেন মাঝে মাঝেই। পাঞ্জাবের ম্যাপের মধ্যে অনেকগুলো দাগ দেওয়া আছে। এই দাগের মানে কী?

ফোনে নেটওয়ার্ক ধরছে না। ইসমাইল এ গ্রামে ছিল জানার পরে নেটওয়ার্কে জ্যামার বসানো হয়েছে। নেটওয়ার্ক কখনও থাকে, কখনও থাকে না। মাথুরের অস্থির লাগছিল।

কোনমতে খেয়ে বেরলেন। ইস্তিয়াক বলল “ফুপু খুব খুশি হয়েছে আপনি এসেছেন। এ তল্লাটে তো চিরুণি তল্লাশি করতে আসা ছাড়া ভারতীয় কোন অফিসার কোন দিন আসে নি”।

মাথুর হাসলেন ইস্তিয়াকের ফুপুর দিকে তাকিয়ে।

ইস্তিয়াক বাইক স্টার্ট দিল।

মাথুর বললেন “যে মুহূর্তে নেটওয়ার্ক অ্যাভেলেবল হবে গাড়ি দাঁড় করাবে। আমার মনে হচ্ছে বড় কোন লিড পেয়েছি আমরা”।

ইস্তিয়াক হাসল “আপনি ধরে বসুন স্যার। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাবার চেষ্টা করছি”।

ইস্তিয়াক অ্যাক্সিলেটর জোরে করল। আশে পাশের পাহাড়ি রাস্তা, লিডার নদী, সব মিলিয়ে একটা মায়াবী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বাইকটা যাচ্ছিল। মাথুরের হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল।

খানিকটা যাবার পরেই পাঁচ জন যুবক বাইক আটকাল। ইস্তিয়াক ফিসফিস করে বলল "স্যার, লোকাল ছেলে, কিছু বলবেন না। আমি কথা বলব"।

মাথুর বললেন "ঠিক আছে"।

ছেলেগুলো মাথুরকে পুস্তু ভাষায় একগাদা কথা বলে গেল। প্রত্যুত্তরে ইস্তিয়াকও বলল। মাথুর বসে বসে দেখছিলেন। এদের ভাষা তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

হঠাৎ একটা ছেলে এগিয়ে এসে ইস্তিয়াককে জোরে একটা ধাক্কা মারল।

মাথুর হৈ হৈ করে উঠলেন, ইস্তিয়াক চেঁচিয়ে উঠল, "স্যার একদম কিছু বলবেন না। ওরা এরকম করেই থাকে। আমি সামলে ..."

ইস্তিয়াক কথা শেষ করার আগেই একটা ছেলে ইস্তিয়াককে চোয়ালে জোরে একটা ঘুষি মারল। ইস্তিয়াক হাত তুলে কিছু একটা বলল। মাথুর বুঝলেন পরিস্থিতি হাতের বাইকে যাচ্ছে। তিনি হিন্দিতে বলতে চেষ্টা করলেন "কী করছ তোমরা, ওকে ছেড়ে দাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব"।

ছেলেটা ইস্তিয়াককে ছেড়ে মাথুরের দিকে এগিয়ে এল। ইস্তিয়াক হতাশ গলায় বলল "কী দরকার ছিল স্যার, আমি বুঝছিলাম তো"।

মাথুর পাঁচজনকেই মেপে নিলেন। একজনের হাতে আবার ছুরি আছে।

প্রথমে একটা ছেলে মাথুরকে মারতে এলে মাথুর হালকা একটা রদ্দা মারলেন ছেলেটাকে। ছেলেটা কচি কলাপাতার মত পড়ে গেল।

ইস্তিয়াক সাবাশ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু এর পরের তিরিশ সেকেন্ড কী হল সেটা সে নিজে না দেখলে কোন দিন বিশ্বাসও করত না। মোটাসোটা চেহারার মাথুর প্রায় চোখের নিমেষে বাকি চারজনকে মাটিতে ফেলে দিলেন। ছেলেগুলো কাতরাচ্ছিল।

ইস্তিয়াক অবাক গলায় বলল "ক্যা বাত স্যার, আমি তো ভাবতেই পারি নি আপনি এত তাড়াতাড়ি..."

মাথুর হালকা গলায় বললেন "অত আনন্দের কিছু নেই। যে চাকরি করি তাতে বরং এগুলো না জানাটাই অস্বাভাবিক। চল এবার আর দেরী করা যাবে না"।

ইস্তিয়াক বাইকের স্পিড তুলল। বলল "চাকরি নেই, কিছু নেই, যত দিন যাচ্ছে, এরকম গ্যাঙের সংখ্যা বাড়ছে স্যার"।

মাথুর কিছু বললেন না। চোয়াল শক্ত করে বসে রইলেন।

অনন্তনাগে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। মাথুর ইস্তিয়াকের কাঁধে হাত রেখে বললেন "থ্যাঙ্কিউ ভেরি মাচ। তুমি না থাকলে..."

ইস্তিয়াক ম্লান হাসল "মনে রাখবেন স্যার, তাহলেই হবে। আমাদের তো কেউ মনে রাখে না, যেন আমরা পথের জঞ্জাল। আপনি মনে রাখবেন শুধু। আর কিছু চাই না"।

৫৮

রাত দশটা।

অমৃতসর শহর পেরিয়ে গাড়িটা যাচ্ছে। রাস্তায় বড় বড় ট্রাক যাচ্ছে। আসলাম ধীরে ধীরে ড্রাইভ করছে।

কাদরী বললেন "তোমার সমস্যাটা কী আসলাম?"

আসলাম ঘাবড়ে গিয়ে বলল "জি, কিছু না জনাব"।

কাদরী বললেন "তোমাকে দেখে তো মনে হয় না কোন মিশনে আছো তুমি। দেখে মনে হয় পিকনিক করতে এসেছো। ক্যানাল রোডে ঘুমিয়ে পড়লে দিব্যি। বাড়িওয়ালার মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়েছো। কী চাও তুমি?"

আসলাম গাড়ির স্পিড বাড়াল। দ্রুত গতিতে একটা ট্রাককে ওভারটেক করে এগিয়ে গেল।

কাদরী ধমকালেন “সাবধানে চালাও। পাকিস্তান থেকে এখানে তোমাকে একগাদা ডলার খরচ করে এমনি এমনি নিয়ে আসা হয় নি”।

আসলাম বলল “সরি জনাব”।

কাদরী কয়েক সেকেন্ড আসলামের দিকে তাকিয়ে বললেন “রাস্তায় সিগারেটের দোকান দেখলে দাঁড়াবে”।

আসলাম মাথা নাড়ল।

কিছুক্ষণ পরে একটা পেট্রোল পাম্পের সামনে গাড়িটা দাঁড়াল। পেট্রোল পাম্প লাগোয়া দোকান আছে। কাদরী আসলামকে বললেন “যাও এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো”।

আসলাম গাড়ি থেকে নেমে গেল।

কাদরী গাড়ি থেকে নেমে পায়চারি করছিলেন এমন সময় একটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। কাদরী ঘাবড়ালেন না। যেভাবে পায়চারি করছিলেন, সেভাবেই করতে লাগলেন।

পুলিশের টহলদারি জিপ। একজন অফিসার গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢুকে গেল।

আসলাম সিগারেট নিয়ে পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তার দিকে দৌড়তে শুরু করল।

আসলামকে দৌড়তে দেখা মাত্র ভ্যানের বাকি পুলিশরা আসলামকে তাড়া করল। আসলাম সম্পূর্ণ উল্টোদিকে দৌড় মারল।

কাদরী দেরী করলেন না। গাড়িতে চাবি রাখাই ছিল। গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিলেন। আসলামের পিছনে দৌড়ে যাওয়া পুলিশেরা হৈ হৈ করে উঠল কিন্তু কাদরী গাড়ি দাঁড় করালেন না। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালালেন। খানিকটা গিয়ে গাড়িটা রাস্তার বাঁ দিকে দাঁড় করিয়ে রাস্তা পেরোলেন। একটা ট্রাক আসছিল। হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে বললেন গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। লিফট পেলে ভাল লাগবে।

ট্রাকওয়ালা ভাল লোক। তাকে তুলে নিল।

কাদরী ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। খানিকটা যাবার পর দেখা গেল পুলিশের গাড়িটা জোরে বেরিয়ে গেল।

ড্রাইভার বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল “নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে পাঁজি”।

কাদরী বোকা সাজলেন “কী হয়েছে?”

ড্রাইভার বলল “আরে এটা হাইওয়ে না, বেশিরভাগ ড্রাইভারই তো নেশা করে গাড়ি চালায়। দেখুন কে কাকে ঠুকে দিয়েছে। পুলিশ এখন ধাওয়া করেছে। এই তো চলে এই রাস্তায়”।

ড্রাইভার জোরে হেসে উঠল।

কাদরী বললেন “আপনার কোন হেল্পার নেই”?

ড্রাইভার বলল “আছে তো। পাঠানকোটে ওর বাড়িতে গেছে। কাল সকালেই চলে আসবে। বিকেলে সেই মুম্বই যাব”।

কাদরী অবাক হবার ভান করলেন “মুম্বই?”

ড্রাইভার মাথা নাড়াল “হ্যাঁ সাহেব, কী করব, আমাদের তো এটাই কাজ। এখান ওখান করে বেড়ানো, দিওয়ালির সময়, বৈশাখীর সময়েও যদি ফিরতে না পারি তাহলে এভাবেই কেটে যায়”।

কাদরী বললেন “হ্যাঁ, আপনাদের তো তাও উৎসব আছে, কাশ্মীরিদের তো তাও নেই”।

ড্রাইভার বলল “কেন নেই সাহেব?”

কাদরী বললেন “কিছু না। আমাকে সামনে নামিয়ে দিন। আমার বাড়ি এসে গেছে”।

ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাল। কাদরী পকেট থেকে একশো টাকা বের করলেন, ড্রাইভার হাঁ হাঁ করে উঠল “কী যে করছেন। কেন লজ্জা দিচ্ছেন। রাস্তায় যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন, আপনার থেকে কীভাবে টাকা নিতে পারি। যান যান”।

কাদরী কয়েক সেকেন্ড ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে ট্রাক থেকে নামলেন। ট্রাক বেরিয়ে গেলে পকেট থেকে ফোন বের করে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। ওপাশ থেকে ভেসে এল "সালাম ওয়ালাইকুম"।

"আসসালাম ওয়ালাইকুম। একটা সমস্যা হয়েছে"।

"কী সমস্যা? ইসমাইলকে নিয়ে কিছু?"

"না, আসলামকে নিয়ে? এই ধরণের লোককে মিশনে ইনভলভ করেছিল কে? এক্কেবারে আকাট"!

"কী হয়েছে বলুন"।

"আসলাম সম্ভবত পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে"।

"ওহ। প্রবলেম নেই। ইন্ডিয়ান জেলে মেহেমানের মত থাকবে। কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে? আমি এখন ডেরায় ফিরে যেতে পারব? কোথায় যাব? আর আসলাম যদি মুখ খোলে?"

"খুলুক না। তার আগে ইসমাইল যা করার করে দেবে"। ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল।

কাদরী বললেন "আই নিড শেল্টার ফর টুনাইট"।

"অমৃতসর ফিরে যান। ইসমাইলের সঙ্গে থাকুন। বাই। গুডনাইট"।

কাদরী কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে গেল।

কাদরী রেগে মেগে শূন্যে লাথি ছুড়লেন।

কেউ দেখল না। কেবল রাস্তার ধারে একটা কুকুর শুয়েছিল। তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

৫৯

দুপুরবেলা। করাচীর কুখ্যাত জ্যামের মধ্যে দিয়ে বাসটা শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে।

শহরের এক প্রাচীন শিয়া মসজিদে খানিকক্ষণ আগে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে।

বাসে প্রচুর ভিড়। মানুষের চোখে মুখে ভীতির লেশমাত্র দেখল না সায়ক। তারা যেন এসব ব্যাপার নিজেদের ভবিতব্য হিসেবেই ধরে নিয়েছে।

জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল শহরে সেনা গিজগিজ করছে। একটা ছোট ব্যাগের মধ্যে ল্যাপটপটা ভরেছে সে।

ওরাঙ্গি টাউন, মুম্বইয়ের ধারাভি বস্তির মতই এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম বস্তি এলাকা।

সায়ক যখন বাস থেকে নামল দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে।

সন্তর্পণে চারদিক দেখে নিয়ে বস্তির ভেতর হাঁটতে শুরু করল সায়ক। মানুষের দারিদ্র চোখে দেখা যায় না। ছোট ছোট বাচ্চাদের পরণের পোশাকটুকু নেই।

সায়ক মনে মনে হাসল। দু দেশের চিত্র একেবারে এক। তবু মানুষ নয়, অস্ত্রই দু দেশের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। দুদেশকে লড়িয়ে দিয়ে প্রথম বিশ্বের দেশগুলো আর ধনী হচ্ছে। আর ধনী হচ্ছে দু দেশের রাজনৈতিক নেতারা। ধর্মের নামে, হিংসার নামে, দ্বেষের নামে নিজেদের মধ্যে হানাহানিটাই যেন মোক্ষ। খানিকটা আনমনা হয়েই হাঁটছিল সায়ক, যার ফলে গন্তব্য ছাড়িয়ে চলে গেছিল।

মনে পড়তে পিছু ফিরল। ছোট একটা ঘুপচি ঘর। ভেতর থেকে আটকানো।

সায়ক দরজা ধাক্কাল।

"কৌণ হে?"

চিৎকার শোনা গেল ঘরের ভিতর থেকে।

সায়ক উত্তর না দিয়ে আবার ধাক্কা দিল।

"আবে কৌন হে বে" বলে দরজা খুলল এক বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোক। চুল দাড়িতে মেহেন্দি করা। সায়ককে দেখে হাঁ করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে চারদিকে তাকাল। সায়ক ঘরের ভিতর ঢুকে ব্যাগটা রেখে মেঝেতে বসে পড়ে বলল "কেমন আছো দিলওয়ার? সব ঠিক তো?"

দিলওয়ার চারদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বলল "আপনি করাচীতে? আই এস আই থেকে শুরু করে সবাই আপনাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে আর আপনি করাচীতে বসে কী করছেন?"

সায়ক বলল "বলছি বলছি। আগে পানি তো পিলাও"।

দিলওয়ার ঘরের ভেতর গিয়ে একটা জলের বোতল এনে সায়কের হাতে দিল। সায়ক এক চুমুকে বোতলটা প্রায় অর্ধেক খালি করে দিয়ে বলল "উফ, বাঁচালে। আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন"।

দিলওয়ার ব্যাজার মুখে বলল "সে যে কী রক্ষা করবে তা তো বুঝতেই পারছি। আপনার দেশ আপনাকে অস্বীকার করছে, পাকিস্তানের সর্বত্র আপনাকে দেখা মাত্র গুলির অর্ডার দিয়েছে, আর সে আপনি আমার কাছে চলে এলেন। আমার আর রক্ষা পাওয়া হল না বুঝলেন জনাব?"

সায়ক দিলওয়ারের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হেসে বলল "তোমার বেগম কোথায়?"

দিলওয়ার বলল "পেশোয়ার গেছে। ফুপার ছেলের বিয়ে। আর আমি এখানে পচে মরছি। এখন মনে হচ্ছে চলে গেলেই ভাল হত। প্রাণটা তো বাঁচত!"

সায়ক বলল "ফালতু কথা বোল না। অনেক কাজ। দাঁড়াও"।

সায়ক ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করল।

দিলওয়ার বলল "এটা কার?"

সায়ক হাসল, বলল "আমার এক দোস্তের। ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে পারবে?"

দিলওয়ার বলল "আমি কী করে করব? এখানে সম্ভব না"।

সায়ক বলল "র কি তোমাকে এখানে সি বিচে বাদাম বেচার জন্য টাকা দেয় দিলওয়ার? জলদি ব্যবস্থা কর। আর্জেন্ট"।

দিলওয়ার মাথায় হাত দিল "উফ, আমি জানি, আপনি এসেছেন মানে আমার মাথা খারাপ করবেনই। আমার কপালেই আছে। আপনার হাতে পড়লেই আমার হয়ে গেল"।

সায়ক ল্যাপটপ অন করল। পাসওয়ার্ড চাইছে। সায়ক কয়েক সেকেন্ড ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে বলল "শিট"।

দিলওয়ার বলল "কী হয়েছে?"

সায়ক চোখ বন্ধ করে বলল "দিলওয়ার, টিউলিপ কেমন লাগে তোমার?"

দিলওয়ার বলল "ভাল লাগে। ফুল, খারাপ লাগবে কেন?"

সায়ক বলল "ব্লু টিউলিপ দেখেছ?"

দিলওয়ার বলল "এখানে কী করে দেখব? সে তো পাহাড়ি জায়গার ফুল। চাষ করে অবশ্য এখানে একটা নার্সারি আছে সি বিচের ধারে"।

সায়ক সচকিত হয়ে বলল "কোথায়? কী নাম?"

দিলওয়ার বলল "শুজামল নার্সারি হাউজ। সব রকমের ফুল পাওয়া যায়। অদ্ভুত ব্যাপার, কীভাবে যে এই ওয়েদারে ওরা এই ফুল ফোটায় খোদায় মালুম"।

সায়ক পাসওয়ার্ড দিল "শুজামল"।

নিল না।

হিন্টসে ক্লিক করল। লেখা মিশন। সায়ক চোখ ছোট ছোট করে কয়েক সেকেন্ড ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে টাইপ করল "আফসানা"।

নিল না।

গম্ভীর হয়ে সায়ক ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে রইল। দিলওয়ারকে বলল “আমার মনে একটা পাসওয়ার্ড আছে দিলওয়ার। প্রথম দুবারেই দিতে পারতাম। ভয়ে দি নি। যদি না নেয়, তাহলে আমার হাতে আর কোন তাস থাকবে না। আমি শেষ হয়ে যাব। আল্লাহর কাছে দুয়া কর যেন এটা নেয়। তাহলে আমি তোমায় কাবাব খাওয়াব। ভাল করে দোয়া কর”।

দিলওয়ার বলল “হু হু। করছি। এক পা মাটিতে, এক পা কাফনে আপনার। কী যে বলি”।

সায়ক দিলওয়ারের দিকে তাকিয়ে হেসে কি বোর্ডে ধীরে ধীরে টাইপ করল “ব্লুফ্লাওয়ার।”

তারপর চোখ বন্ধ করে এন্টার মারল।

চোখ খুলে দেখল পাসওয়ার্ড নিয়ে নিয়েছে।

৬০

বীরেন নিজের মধ্যেই ছিল না। তার কিছুই বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সে স্বপ্ন দেখছে।

মা ঘর থেকে বেরোতে বাবা ঠান্ডা গলায় বলল “ফোনটা কর”।

বীরেন বাবার দিকে তাকিয়ে খানিকটা চমকে ফোনটা বের করল, কাঁপা কাঁপা হাতে তুষারের নাম্বার ডায়াল করল। একবার রিং হতেই ধরলেন তুষার “বল বীরেন, কী খবর?”

বীরেন বলল “স্যার, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। পারলে আজই দিল্লি যেতে চাই”।

তুষার বললেন “তোমাকে তো বাড়ি পাঠানো হয়েছে। তুমি এর মধ্যে আবার দিল্লি আসবে কেন? কী প্রবলেম হল?”

বীরেন বলল “স্যার, ফোনে বলা যাবে না, ফোন ট্যাপ হতে পারে। আমি আজ বিকেলের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সম্ভব স্যার?”

তুষার বললেন “ফাইন, তুমি দিল্লি চলে এসো। আমাদের অফিসেই চলে এসো সরাসরি। তুমি কিন্তু আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলে বীরেন। খুব সিরিয়াস কিছু?”

বীরেন বলল “হ্যাঁ স্যার”।

তুষার বললেন “ওকে। চলে এসো। রাখছি এখন, ইরাবতীর সঙ্গে দেখা করে আসি”।

বীরেন বলল “ওকে স্যার”।

ফোনটা রেখে বীরেন বাবার দিকে তাকাল। বাবা বলল “তোকে হাসান মাকসুদের সঙ্গে আজকে রাতের মধ্যে দেখা করতে হবে। না করলে সবার সমস্যা। বুঝতে পারছিস আমি কী বলছি?”

বীরেন কয়েক সেকেন্ড বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল। এতদিনের একটা চেনা লোক এভাবে অচেনা হয়ে গেল? কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে।

মা ডাক দিল “খেতে আসবে? আর তো পারি না তোমাদের জ্বালায়, তাড়াতাড়ি এসো”।

বাবা বলল “খেয়ে স্নান করে বেরিয়ে যা। এয়ারপোর্ট পৌঁছে দু নাম্বার গেটের কাছে দাঁড়াবি। টিকিট পেয়ে যাবি। যা ইন্সট্রাকশন ওখানেই কাগজে লেখা থাকবে। বুঝেছিস?”

বীরেন মাথা নাড়ল।

কোন মতে সে ডাইনিং রুমে এল।

মা খাবার বাড়ছে। বীরেন মাকে বলল “আমাকে আজকেই জয়েন করতে যেতে হবে মা”।

মা অবাক গলায় বলল “সেকী! এই তো বললি ছুটিতে এসেছিস?”

বীরেন মাথা নাড়ল “ডাক এসে গেছে”।

মা ক্ষুব্ধ গলায় বলল “এ কেমন চাকরি? এটা কোন চাকরি হল? আমাদেরও কি আমাদের ছেলেকে কাছে পেতে ইচ্ছা করে না?”

বাবা এসে খাবার টেবিলে বসে বলল “চাকরির ব্যাপারে কিছু বলতে নেই। আজকালকার বাজারে অনেক কষ্টে চাকরি জোটে। সেটা নিয়ে বাজে কথা বলতে নেই”।

মা গজগজ করতে লাগল।

বীরেন রোবটের মত খেয়ে যাচ্ছিল। বুল্টি এসে বসল। তাকে দেখে বলল “কীরে দাদা, তুই দিল্লিতে আছিস না এখন? শোন না, আমার জন্য ভাল কুর্তা এনে দিবি চার পাঁচটা?”

স্বাভাবিক কথাবার্তা। বাবাও কেমন স্বাভাবিক ভাবে বসে আছে।

বীরেনের মাথার ভিতরটা শূন্য হয়ে যাচ্ছিল। সব মিথ্যা? সব মিথ্যা? এরকম হতে পারে? কীভাবে হতে পারে? সে আসলে কী? মানুষ না? অমানুষ? কুরবানি করা একটা পশু? তার বাবা তাকে বলি দিতে পারল? বাবা কাকে বলছে আবার সে, বায়োলজিকাল বাবা হলেই কি কেউ বাবা হয়? আসলে সব কিছুর আড়ালে উনি একজন ভয়ানক আততায়ী!

খেতে পারল না বীরেন। উঠে পড়ল।

মা হাঁ হাঁ করে উঠল। বীরেন শুনল না। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে স্নানে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরী হয়ে গেল সে। বাবা ঘরে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে বলল “তুই জিতবি। আমি জানি তুই জিতবি। আমার এত বছরের এত পরিশ্রম, দাঁতে দাঁত চিপে শত্রু দেশে পড়ে থাকার মর্ম তুই বুঝবি আমি জানি বীরেন”।

বীরেন বাবার দিকে তাকাল। আর পাঁচটা ভিড়ে মিশে থাকা সাধারন মানুষের মত একটা মানুষ। সে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

টোটো যাচ্ছিল একটা, হাত বাড়িয়ে দাঁড় করাল। টোটোটা খানিকটা এগোতে মুখ ফিরিয়ে দেখল বাবা, মা, বুল্টি তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। একটা সাধারন পরিবারের মত।

৬১

রাত আটটা।

ইসলামাবাদ ক্যাপিটাল টেরিটরি।

পিন্সটেক (পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)

প্রেসিডেন্টের কনভয় সুরক্ষিত জায়গাটার গেটে এসে দাঁড়াল। প্রেসিডেন্টের গাড়ি বাদ দিয়ে বাকি গাড়িগুলো গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে গেল।

গেট থেকে গাড়িটা বেশ খানিকটা রাস্তা গিয়ে একটা বড় বাগানের মত জায়গায় এসে দাঁড়াল। চারদিকে কিছুই নেই, শুধু একটা ছোট ঘর।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজি গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিন্সটেক চিফ আহমেদ আলি প্রেসিডেন্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন দরজার সামনেই।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজিকে অভিবাদন করে আহমেদ আলি দরজার পাশের বায়োমেট্রিক যন্ত্রে নিজের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ালেন। দরজাটা খুলে গেল। একটা লিফট অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দুজন নিরাপত্তারক্ষী লিফটে উঠতে গেলে নিয়াজি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন “আমি একাই যাব। আপনারা অপেক্ষা করুন”।

লিফটে আহমেদ আলি এবং নিয়াজি প্রবেশ করা মাত্র বাইরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল নিজে থেকে। আহমেদ আলী লিফটের সুইচ টিপলেন। লিফট নিচে নামতে শুরু করল।

লিফটটা একটা বিরাট ল্যাবরেটরির সামনে এসে দাঁড়াল। আহমেদ আলী হাত বাড়িয়ে বললেন “আসুন জনাব”।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজি ল্যাবরেটরির ভেতরে প্রবেশ করলেন। যারা কাজ করছিল, তারা সবাই প্রেসিডেন্টকে দেখা মাত্র সতর্ক হল।

নিয়াজি হাত তুলে বললেন "আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আমি আলীসাবের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি"।

সবাই তবু তটস্থ হয়ে রইল।

নিয়াজি আলীকে বললেন "আপনার অফিসে চলুন"।

আলী নিয়াজিকে নিজের চেম্বারে নিয়ে গেলেন। ছোট একটা সাধারন ঘর। দেওয়ালে জিন্নাহর ছবি আর পাকিস্তানের পতাকা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।

টেবিল চেয়ার ছাড়াও ঘরের মধ্যে একটা ছোট সোফা আছে। নিয়াজি সেই সোফাতেই বসে পড়লেন।

আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন "কোয়াইট ইম্প্রেসিভ আলীসাহাব। আপনার চেম্বারে বাহুল্যের চিহ্নমাত্র নেই"।

আলী হাসলেন "জনাব, সময় কোথায়?"

নিয়াজী মাথা নাড়লেন, "তা বটে। জিনিয়াসদের কাছে সময় কোথায়? আর আপনি পাকিস্তানের সম্পদ আলীসাহেব। গোটা দেশ আপনার ওপরে নির্ভর করে আছে"।

আলী বললেন "আই অ্যাম ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট স্যার"।

নিয়াজী বললেন "জানি। আমি এই প্রথম পিন্সটেকে এলাম আলীসাহাব। এর আগে একবার ভেবেছিলাম আসব, কিন্তু আসা হয় নি। সেনাবাহিনীর সঙ্গে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেকশনের সব মানুষের যোগাযোগ থাকে না, যেমন আমার ছিল না"।

আলী হাসলেন "এখন তো আর আপনি শুধু সেনাবাহিনীর নন জনাব। আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট মানে আমাদের সবার প্রেসিডেন্ট। বলুন জনাব, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি"।

নিয়াজী আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন "আলীসাহাব, আমার সঙ্গে আপনার যা কথা হবে তা এই ঘরের বাইরে যাবে না। যদিও আমি জানি, আপনি যে কাজ করেন, তাতে সিক্রেট কিপিংই আসল, তবু আপনাকে একবার নিয়মরক্ষার জন্য বলে রাখলাম"।

আলী মাথা নাড়িয়ে বললেন "জরুর জনাব। বলুন'।

নিয়াজী বললেন "সরফরাজ খান আই এস আই চিফ থাকাকালীন কতবার এখানে এসেছিল জনাব?"

আলী একটু ভেবে নিয়ে বললেন "উনি তো প্রায়ই আসতেন জনাব। আমাদের কাজকর্ম নাকি ওর খুব ভাল লাগত। আমাদের উৎসাহ দিতে প্রায়ই আসতেন তিনি"।

নিয়াজি চোখ ছোট ছোট করে বললেন "একা আসতেন উনি?"

আলী বললেন "অবশ্যই স্যার। পিন্সটেকে আমি অন্য কাউকে ঢুকতে দেবই বা কেন?"

নিয়াজি হাসলেন "রাইট জনাব। আমি জানি আপনি এখানে কাউকে অনধিকার প্রবেশ করতে দেবেন না। আচ্ছা, এই ইন্সটিটিউটে সম্প্রতি কেউ নতুন রিক্রুট হয়েছে?"

আলী বললেন "না জনাব। এখানে রিসেন্টলি আমি কাউকে অ্যালাউ করি নি'।

নিয়াজি চারদিকে তাকিয়ে বললেন "আলীসাহাব, আপনি জানেন পাকিস্তান একটা অদ্ভুত দেশ। একই সঙ্গে আমরা ইন্ডিয়ার এগেইন্সটে লড়ি, আবার ভয়ে থাকি, যাদের সহায়তায় আমরা লড়ছি, তারা যেন আমাদের ওপর সওয়ার না হয়ে পড়ে। বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি?"

আলী মাথা নাড়লেন "শিওর জনাব"।

নিয়াজি বললেন "এই কথাগুলো আমি আপনাকে ডেকেও বলতে পারলাম কিন্তু বললাম না। একজন বিজ্ঞানীকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করি। আমি চাই, আপনার ল্যাবের প্রত্যেকের ওপর নজরদারি চালাতে। আপনি আমাদের তাদের ডিটেলস কালকের মধ্যে দিতে পারবেন?"

আলী নিয়াজির দিকে কয়েকসেকেন্ড তাকিয়ে বললেন "আপনি হুকুম করলে আমি দিতে বাধ্য জনাব। আপনি কালকেই সব পেয়ে যাবেন"।

নিয়াজি খুশি হলেন। তবুও উঠলেন না। চুপ করে বসে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

৬২

তুষার ইরাবতীকে দেখে হাসপাতাল থেকে ফিরে অফিসে এসে বসেছিলেন। জানলার বাইরে দিল্লির কুখ্যাত কুয়াশা সব কিছু কালো করে রেখেছে। তুষার চিন্তিত মুখে আকাশ দেখছিলেন।

আশরফ দরজা নক করলেন।

তুষার বললেন "কাম ইন"।

আশরফ ভিতরে এলে তুষার ইশারা করলেন আশরফকে বসার জন্য।

আশরফ বসে বললেন "বীরেন ফোন করেছিল আপনাকে? কী বলার আছে বুঝতে পারছি না"।

তুষার হাসলেন "বাচ্চা ছেলে। এভ্রি অ্যাকশন ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, ছেলেটা বাড়িতে বোর হচ্ছে। আসতে চাইছে। আসতে দাও"।

আশরফও হাসলেন "ইয়েস স্যার। হি ইজ অ্যা হার্ড ওয়ার্কিং বয়, কিন্তু ওরা ওকেই কেন টার্গেট করছে বার বার বুঝতে পারছি না"।

তুষার বললেন "নতুন ছেলেদেরই তো ভয় দেখানো সহজ। যাই হোক, পাকিস্তান যেতে হবে আশরফ। নিয়াজি ক্রিকেট সিরিজের জন্য বার বার ইনসিস্ট করছেন। পি এম সিকিউরিটি ইস্যুজ সম্পর্কে রিপোর্ট চাইছেন। উই হ্যাভ টু সেন্ড আ টিম। আমাদের দুজনকেই যেতে হবে"।

আশরফ চিন্তিত মুখে বললেন "কিন্তু স্যার, ইসমাইল দেশে ঢুকে বসে আছে, মাথুর এখনও কন্ট্যাক্ট করে নি। আমরা দুজনে পাকিস্তানে গেলে..."

তুষার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশরফের দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে বললেন "মাথুর কোথায় আছে?"

আশরফ বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় তুষারের ফোন বেজে উঠল। তুষার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বললেন "কোইন্সিডেন্স দেখো খান। মাথুর ইজ কলিং"।

ফোন ধরলেন তুষার। আশরফ আগ্রহী চোখে তুষারের দিকে তাকালেন। তুষার বললেন "হ্যালো মাথুর। তোমার খবর তো পি এম অবধি চলে গেছিল। কোথায় হাওয়া হয়ে গেছিলে?"

মাথুর বললেন "স্যার ওয়াজুরা গেছিলাম। এক লোকাল কাশ্মীরি ছেলের সঙ্গে। ওই গ্রামেই ইসমাইল লুকিয়ে ছিল"।

তুষার সোজা হয়ে বসলেন "গুড গড! দেন?"

মাথুর বললেন "বেশ কিছু কাগজ উদ্ধার করা গেছে। অমৃতসর আর কাশ্মীরের ম্যাপ পেয়েছি। আপনাকে মেইল করেছি এখনই। চেক করুন প্লিজ"।

তুষার আশরফকে বললেন "আমার মেইল চেক কর খান"।

খান উঠে তুষারের ল্যাপটপ নিজের দিকে নিয়ে মেইলবক্স খুললেন।

তুষার বললেন "তোমার ফাইন্ডিংস নিশ্চয়ই কাজে লাগবে মাথুর। কিন্তু তুমি উইদাউট সিকিউরিটি ওয়াজুরা গিয়ে রিস্ক নিয়ে নিয়েছিলে। তুমি কিংবা আশরফ আমাদের ওয়েল নোন মুখ। যাবার আগে অ্যাটলিস্ট আমাকে জানিয়ে যেতে পারতে। ব্যাক আপ রাখা যেত"।

মাথুর বললেন "কিছু করার ছিল না স্যার। এখানে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। এদিকে আর্মি আমার যাতায়াত এমনভাবে কন্ট্রোল করছিল যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিছুই করতে পারছিলাম না। মিস্টার অবন্তীও এতটা ওভারকনফিডেন্ট না হলেই ভাল করতেন"।

তুষার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "ইয়েস। উই হ্যাভ লস্ট আ গুড ফ্রেন্ড। তুমি এখন আর্মি ক্যাম্পে ফিরে গেছ?"

মাথুর বললেন “আমি শ্রীনগর যাব স্যার। আমার একটা ডাউট আছে। ফোনে বলতে পারব না। কিন্তু শ্রীনগর না গিয়ে আমি আপনাকে কিছুই বলতে পারব না”।

তুষার বললেন “ওয়েল! যাও। কিন্তু কীভাবে যাবে? আবার একা?”

মাথুর বললেন “না। আর্মি কনভয় যাবে একটা। ওদের সঙ্গে যাব”।

তুষার বললেন “যাও। হামিদের হেল্প নিও। ওকে ইনভলভ কোর। আর্মি চিফের সঙ্গেও আমি কথা বলে নিচ্ছি। উনি তোমাকে যতটা পারবেন হেল্প করবেন”।

মাথুর বললেন “বাই স্যার। বেঁচে থাকলে দেখা হবে”।

তুষার ধমক দিলেন “আমাদের কাজে এইসব নেগেটিভ কথার কোন জায়গা নেই মাথুর। সব সময় পজিটিভ থাকো। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী”।

মাথুর হাসলেন “রাইট স্যার। আমরাই জিতব”।

তুষার খুশি হলেন “শিওর। আমরাই জিতব। বাই নাও। শ্রীনগরে পৌঁছে ফোন করবে”।

মাথুর বললেন “বাই স্যার”।

ফোন রেখে তুষার খানের দিকে তাকিয়ে বললেন “কী আছে মেইলে?”

খান প্রিন্ট আউট নিচ্ছিলেন অ্যাটাচমেন্টগুলো। সব কাগজ তুষারের সামনে দিয়ে বললেন “আমার মনে হচ্ছে অমৃতসরে ওদের কোন অ্যাসাইনমেন্ট আছে স্যার। নইলে অমৃতসরের ম্যাপ নিয়ে কী করবে ইসমাইল”?

তুষার চিন্তিত মুখে প্রিন্টআউটগুলো দেখতে দেখতে বললেন “এগুলো দেখে তো কিছু বোঝা সম্ভব না। আচ্ছা আশরফ, অমৃতসর বললে সবার আগে তোমার মনে কী আসে?”

আশরফ বললেন “অপারেশন ব্লু স্টার স্যার”।

কথাটা বলেই আশরফ চমকালেন।

তুষারও।

৬৩

ল্যাপটপে খুলতেই একগাদা এনক্রিপ্টেড ফাইল বেরোল। সায়ক কয়েক সেকেন্ড ঠোঁট কামড়ে সে দিকে তাকিয়ে বলল “দিলওয়ার মিয়াঁ”।

দিলওয়ার ব্যাজার মুখে বসে ছিল। বলল “কী হল?”

সায়ক বলল “কিছু খাওয়াও মিয়াঁ। খালি পেটে মাথা কাজ করে কখনও? কী রান্না করেছ দুপুরে?”

দিলওয়ার উঠল, “বাখরখানি আছে। চলবে?”

সায়ক বলল “দৌড়বে। দাও। পানিও দিও। পানি ছাড়া তোমার ওই শুকনো বাখরখানি আমার বাঙালি গলা দিয়ে নামবে না”।

দিলওয়ার ঘরের ভিতর থেকে একটা বোতলে জল আর দুটো বড় বড় বাখরখানি এনে দিল।

সায়ক ক্ষুধার্তের মত খেল। দিলওয়ার সায়কের খাওয়া দেখে লজ্জিত হয়ে বলল “হায় আল্লা, আপনার তো অনেক খিদে পেয়েছিল। আগে বলবেন তো”।

সায়ক খাওয়া শেষে অনেকটা জল খেয়ে বলল “আমার নিজেরই খাওয়ার কথা মনে ছিল না। ল্যাপটপ খুলে মনে পড়ল। কিন্তু এ তো কঠিন চিজ দিলওয়ার মিয়াঁ। এর ভেতরে কী আছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এ জিনিস দিল্লি পাঠাতে পারলে ভাল হত”।

দিলওয়ার চমকে উঠল। তারপর ক্যাবলা হেসে বলল “মজাক করছেন মিয়াঁ?”

সায়ক মাথা নাড়ল, “না মিয়াঁ। মজাক করব কেন? সিকিওর লাইনের কী অবস্থা করাচীতে? ফোন করা যাবে?”

দিলওয়ার মাথা দুদিকে নাড়িয়ে বলল "না না। ক্ষেপেছেন? সব জায়গায় পাকিস্তানি আর্মির কড়া নজর এখন। আমি কোন রিস্ক নিতে পারব না"।

সায়ক ঠান্ডা গলায় বলল "কোথায় যেতে হবে বল না। বাকিটা আমি দেখছি"।

দিলওয়ার কয়েক সেকেন্ড সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল "আপনি কিছুতেই কিছু বুঝবেন না, তাই না?"

সায়ক বলল "বুঝব না। কোথায় যেতে হবে বল"।

দিলওয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "নাপিয়ের রোড। কিন্তু সে বাড়িতে পাক আর্মির সন্দেহ আছে। সর্বদা নজর রাখে ওরা। দু বার রেইড হয়েছে, কিছু পায় নি। কোন রকম বেচাল দেখলে কপালে দুঃখ আছে"।

সায়ক বলল "মেক আপ কিট দাও তোমার। আয়নার সামনে বসি। দেখি কতটা চেঞ্জ করতে পারি নিজেকে"।

দিলওয়ার মাথা নেড়ে বলল "আপনি শোধরাবেন না। পাক আর্মির বুলেট না খাওয়া অবধি আপনার শান্তি নেই"।

সায়ক বলল "শান্তি কোথায় আছে দিলওয়ার? সেটার খোঁজেই তো সবাই পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাক গে, তোমার মেক আপ কিট দাও"।

দিলওয়ার আলমারি খুলে গোপনে লুকিয়ে রাখা একটা বাক্স বের করে সায়কের হাতে দিল। সায়ক বাক্সটা খুলে খুশিতে শিস দিয়ে বলল "জিওহ। এবার আধঘন্টা সময় লাগবে কেবল"।

গুণে গুণে ঠিক তিরিশ মিনিট সময়ই নিল সায়ক। আয়নায় নিজেকে বেশ কয়েকবার দেখে দিলওয়ারকে দেখে বলল "কী হে মিয়াঁ, আমাকে চেনা যাচ্ছে?"

দিলওয়ার সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল "আমি কী করে বলব? পাক আর্মি আপনাকে চিনতে না পারলেই হল"।

সায়ক হাসল। কুর্তা পাজামা পড়ল। ল্যাপটপটা ব্যাগে পুরে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দিলওয়ারকে বলল "চলি এখন। রাতে আসব ইনশাল্লাহ"।

দিলওয়ার বলল "সেই আশাই করি। সাবধানে যান"।

সায়ক হেসে দিলওয়ারের ঘর থেকে বেরোল। বাইরে কতগুলো ছেলে ক্রিকেট খেলছিল। সায়ককে দেখে অবাক হয়ে তাকাল। সায়ক সোজা হাঁটতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে বড় রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বলল "নেপিয়ার রোড চল মিয়াঁ"।

ট্যাক্সিওয়ালা কোন কথা না বলে গাড়ি স্টার্ট করল।

ট্যাক্সি খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেনা রাস্তা আটকে রেখেছে। মসজিদে হামলার ঘটনায় শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছে।

ট্যাক্সিচালক বিরক্ত গলায় বলল "আপনি কি নেমে যাবেন জনাব?"

সায়ক বলল "নাহ, আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি। মিছিল শেষ হোক"।

ট্যাক্সিচালক গান চালাল গাড়ির মিউজিক প্লেয়ারে। বলিউডের গান।

রাস্তায় গাড়ির মিছিল হয়ে গেছে। প্রচন্ড জ্যাম।

সায়ক অপেক্ষা করতে লাগল গাড়ির ভেতরে বসে।

৬৪

রাত ১২টা।

একটা মেশিনগান নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল ইসমাইল। পাঠান দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল।

ইসমাইল বলল "ধর্মস্থানের মত ভাল টার্গেট আর কিছু হতে পারে না জনাব। পেশোয়ারে একটা মসজিদে একবার ব্লাস্ট করেছিলাম। আহ, দারুণ লেগেছিল। আল্লাহর ঘর থেকেই আল্লাহর খাস বান্দা হবার দিকে সব রওনা হল"।

পাঠান হেসে বলল "শিখরা খুব ধর্মপ্রাণ হয়। একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে ওরা মেরে দিয়েছিল শুধু মাত্র হরমন্দির সাহিবে সেনা পাঠানোর অপরাধে। এখানে ওরা নিজেদের দেশ বানিয়ে রয়েছে। নিজেদের সেনা, নিজেদের সব কিছু। একটা ভাল অ্যাটাক ইন্ডিয়া কাঁপিয়ে দেবে মিয়াঁ"।

ইসমাইল মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "জানি। নীল ফুলের প্রথম পাপড়ি নীল তারাই হবে। এই মিশনে আল্লাহর পায়ের কাছে বসে খাস সেবা প্রথমে আমিই করব"।

পাঠান সেলাম দিয়ে বলল "ইনশাল্লাহ। নিশ্চয়ই হবে। পার্টিশান মিউজিয়াম বানিয়েছে ইন্ডিয়া"।

ইসমাইলের চোখ জ্বলে উঠল, "তাই নাকি? তা কী কী আছে সেখানে?"

পাঠান বলল "দেশভাগের সময়ের ছবি আছে। আগে ছিল না। এলাকাটাও আগে খুব একটা ভাল ছিল না। ঘিঞ্জি ছিল। আমি যখন আগে এসেছিলাম অনেক নোংরা ছিল। এখানকার গভর্নমেন্ট ঢেলে সাজিয়েছে। মজা আজায়েগা আপকো। তবে সারভাইভ করার চেষ্টা করবেন যতক্ষণ পারেন। যত বেশি বাঁচবেন, দুশমন তত বেশি মরবে"।

ইসমাইল হাসল না। কঠিন মুখে বলল "অমৃতসরে আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল। পার্টিশনের সময় আমার দাদিজানকে এই শিখরা গলা কেটে খুন করেছিল। এই মিশনে আমার এক সঙ্গে দুটো কাজ হবে। এদেরই কোন পূর্বপুরুষেরা আমার দাদিকে মেরেছিল। প্রতিশোধ নেওয়া হবে, একই সঙ্গে আল্লাহর কাজও করা হবে"।

পাঠান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার ফোন বেজে উঠল। পাঠান ফোন ধরল। কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর ফোন রাখল।

ইসমাইল উৎসুক হয়ে বলল "কী ব্যাপার মিয়াঁ? কী হয়েছে? এত উত্তেজিত হয়ে গেলে কেন?"

পাঠান হতাশ গলায় বলল "মিশন পোস্টপন করতে বলা হয়েছে। রাত দশটা থেকে অমৃতসর সিটি ঘিরে ফেলেছে ইন্ডিয়ান আর্মি। ওদের ইন্টেলিজেন্সের কাছে সম্ভবত আমাদের মিশনের খবর পৌঁছে গেছে"।

ইসমাইল কয়েক সেকেন্ড পাঠানের দিকে তাকিয়ে রইল। হাতের মেশিনগানটা ছুঁড়ে মারল দেওয়ালে। দু হাতে চোখ ঢেকে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল "এই দেশের প্রত্যেকটা কাফেরকে একদিন আমি নিজের হাতে কুকুরের মত গুলি করে মারব, যেমন করে রেহান খানকে মেরেছিলাম। একটা কুত্তাকেও ছাড়ব না। সব ক'টাকে মারব। কুকুরের মত গুলি করে। কথা দিলাম"।

পাঠান বলল "সে তো ঠিক আছে মিয়াঁ, কিন্তু সমস্যা হল এবার আপনাকে কয়েক দিন এখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। শহর ছেড়ে বেরনোর সব রাস্তাতেই ওরা নাকাবন্দী করে তল্লাশি করবে। আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোন রাস্তাও তো নেই"।

ইসমাইল ক্রুর চোখে পাঠানের দিকে তাকিয়ে বলল "সমস্যা তো শহর ছাড়তে হলে হবে। শহরের ভেতরে ঢুকে কিছু করলে তো হবে না মিয়াঁ। ভাল হয়েছে তো ইন্ডিয়ান আর্মি শহর ঘিরে রেখেছে। আমার তো ভালই হল। এবার আমি ওদের মেরে মরব। মজা তো অব আয়েগা"!

পাঠান মাথা নাড়ল "না জনাব। মৌলবী সাব কড়া ভাষায় আপনাকে কোন রকম নাড়া চাড়া করতে বারণ করেছেন। পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আপনি যেন চুপ করে থাকেন এখন। আপনি চাইলে আপনাকে ফোনে কথা বলিয়ে দিতে পারি"।

ইসমাইল গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। পায়ের কাছে একটা ছোট টুল ছিল। সেটাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে অপ্রশস্ত জায়গার মধ্যে দিয়ে পায়চারি করতে করতে বলল "ইন্ডিয়ান আর্মির ভয়ে ইসমাইল চুপ করে বসে থাকবে। আমাকে কি ডরপোক বলে মনে হয় মিয়াঁ?"

পাঠান বলল "একেবারেই না মিয়াঁ। কিন্তু আপনি আল্লাহর খাস বান্দা। আল্লাহপাক যদি আপনার কুরবানীর সময়কে নিজে থেকেই পরিবর্তন করতে চান, তাহলে তো আপনাকে মেনে নিতে হবে। ওর কথার ওপরে কি আর কোন কথা হয়?"

ইসমাইল হতাশ হয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। বলল "ফোন করে আমাকে দাও। আমি কথা বলি"।

পাঠান বলল "এখান থেকে বার বার পাকিস্তানে ফোন করা ঝুঁকির কাজ। ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের কাছে খবর বেরিয়ে গেছে মানে ওরা ফোনে নজর রাখবে"।

ইসমাইল অবিশ্বাসী চোখে পাঠানের দিকে তাকিয়ে বলল "সত্যিই ফোন এসেছিল তো? নাকি আমাকে বুদ্ধু বানাচ্ছ?"

পাঠান বলল "আপনাকে বুদ্ধু বানাব কেন মিয়াঁ? আমার কী স্বার্থ? আপনার মত আমিও তো ইন্ডিয়ার বরবাদি দেখতে চাই। কিন্তু যদি মৌলবী সাহেব বললে সত্যিই কি কিছু করার থাকে?"

ইসমাইল গম্ভীর গলায় বলল "আমার ডাক এসে গেছে। মৌলবির হুকুমে তার আর পরিবর্তন হবে না। যথেষ্ট আর ডি এক্স আছে। যথেষ্ট আর্মস, বারুদ, সব আছে। আমি আর কারো কথা শুনব না। কালকে ভোরেই বেরোব আগের প্ল্যান মত। গাড়ির ব্যবস্থা করুন মিয়াঁ"।

৬৫

বীরেনের ফ্লাইট দিল্লি এয়ারপোর্টের মাটি ছুঁল যখন, তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। প্লেন থামল, সবাই নেমে গেল, বীরেন অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। এক এয়ারহোস্টেস এসে তাকে ডাকলে সে চমকে উঠে দাঁড়াল।

প্লেন থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোল সে। দিল্লিতে গরম পড়ছে। বীরেন রুমাল বের করে ঘাম মুছল। ট্যাক্সিতে উঠে তার মনে পড়ে গেল ইতিহাসের স্যার পড়াতেন দিল্লির মসনদের জন্য কত লড়াইই না হয়েছে। কত মানুষ খুনোখুনি করেছে, ভাই ভাইকে মেরেছে, ছেলে বাবাকে অন্ধকূপে পাঠিয়েছে, মানুষ নিমেষের মধ্যে পশুতে পরিণত হয়েছে।

এই দেশ স্বাধীন হবার জন্যও কি কম সংগ্রাম করতে হয়েছে? ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ভগত সিং সহ কত মানুষ নিজেদের জীবনের সর্বস্বটুকু দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করার জন্য লড়াই করেছিলেন। স্যার বলতেন সূর্য সেনকে ফাঁসি দেওয়ার আগে এত মারা হয়েছিল যে তার মুখ কেউ দেখলে চিনতে পারত না। অকথ্য অত্যাচার করে খুন করে মাস্টারদার দেহ সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

কত ভাল বাড়ি, কত ভাল চাকরি ছেড়ে একেকজন মানুষ দেশের জন্য নিজের সব দিয়ে দিয়েছিলেন।

তার বাবা...

একজন দেশদ্রোহী? সন্ত্রাসবাদী? আর সে কিনা একজন বলিপ্রদত্ত সৈনিক?

বীরেন ট্যাক্সির মধ্যে দুহাতে মুখ ঢেকে বসল।

তার মিনির কথা মনে পড়ে গেল। বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে ওর ওপর কী অত্যাচারটাই না করা হয়েছিল? তার বাবা, তার সব থেকে প্রিয় মানুষ, সে দলের একজন, সন্ত্রাসবাদী? জ্যোতির্ময়ের মতই স্লিপিং সেলের মেম্বার?

ভাবতে পারছিল না সে। মাথা কাজ করছিল না তার। কী প্ল্যান করছে ওঁরা? জ্যোতির্ময়কে ফোনটা দিতে চাইছে কেন? কী আছে ফোনের মধ্যে?

তাকে খানিকটা চমকে দিয়েই ফোনটা বেজে উঠল। সে দেখল তুষার ফোন করছেন। ধরল সে "হ্যাঁ স্যার"।

"তুমি পৌঁছে গেছো বীরেন?" তুষারের গলা ভেসে এল।

বীরেন বলল "হ্যাঁ স্যার"।

তুষার বললেন "তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা একটু পিছোবে বীরেন"।

বীরেন অবাক হয়ে বলল "কেন স্যার?"

তুষার বললেন “তুমি যেখানে আছো, সেখানেই থাকো। আশরফের সঙ্গে তোমার লোকেশন শেয়ার কর। ও একটা জরুরি মিশনে অমৃতসর যাচ্ছে। আমি চাই তুমি যখন এসেই পড়েছো তখন ওকে অ্যাসিস্ট কর। ওর সঙ্গে অমৃতসর যাও। একবার তো ওঁকে কাশ্মীরে বাঁচিয়েছো তুমি, তুমি হলে খানের লাকি ম্যাসকট, বুঝলে?”

তুষার হাসলেন ফোনের ওপ্রান্তে।

বীরেন বলল “কিন্তু স্যার...”

তুষার বললেন “কিছু কিন্তু না। ঘুরে এসো, তারপর না হয় কথা হবে। ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার ইওর লোকেশন। খান আসছে তোমায় পিক করতে”।

বীরেন হতভম্ব হয়ে ফোনটা রেখে দিল। খানিকটা অবাক হল, একই সঙ্গে ভয়ও পেল।

বাবা তো তাকে হাসানের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল।

সে বেশি কিছু না ভেবে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে বাবাকে ফোন করল।

ও প্রান্তে একবার রিং হতেই বাবা ধরল “বল। পৌছেছিস?”

বীরেন বলল “পৌঁছতে পারি নি, আমাকে অমৃতসর পাঠানো হচ্ছে। স্যার বললেন ফিরে এসে কথা বলবেন”।

ও প্রান্তে খানিকটা নীরবতা। বীরেন নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছিল।

কয়েক সেকেন্ড পর বাবা বলল “অমৃতসরে কী করতে পাঠাচ্ছে?”

বীরেন বলল “জানি না, আমাকে বলল যেতে হবে। কী করব, কাজটাই এরকম”।

বাবা বলল “তুই কোন রকম চালাকির চেষ্টা করছিস না তো?”

বীরেন অবাক হল। বাবা তাকে অবিশ্বাস করছে। তার নিজের বাবা!

সে কোন মতে বলল “না। আমি তো আমাদের অফিসের দিকেই যাচ্ছিলাম। চাইলে আমার লোকেশন পাঠাচ্ছি, দেখে নাও”।

বাবা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল “ঠিক আছে। যাই হবে, সব ইনপুট আমার কাছে পৌঁছনো চাই। হাসানকে দেওয়ার জন্য যে ফোনটা নিয়ে গেছিস সেটা রাস্তার কোন ডাস্টবিনে ফেলে দে। তুই ফিরে এলে আবার একটা ফোন তোকে দেওয়া হবে”।

বীরেন অবাক গলায় বলল “ফেলে দেব?”

বাবা বলল “ফেলে দে। রাখলাম। ওরা যা বলছে তাই কর। শুধু রিপোর্টটা করে যাবি”।

ফোন কেটে দিল বাবা।

বীরেন ফ্যাল ফ্যাল চোখে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল।

৬৬

ইসলামাবাদে আই এস আই হেড কোয়ার্টারের সামনে প্রেসিডেন্টের গাড়ি দাঁড়াল।

আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল না। পিন্সটেক থেকে বেরিয়ে নিয়াজি সরাসরি চলে গেছেন।

প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি সার্ভিসকে দেখা মাত্র দরজা খুলে গেল। প্রেসিডেন্ট নিয়াজি গাড়ি থেকে বেরিয়ে হেড কোয়ার্টারসে প্রবেশ করলেন। বেশ কয়েকজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ছিলেন। নিয়াজিকে দেখামাত্র স্যালুট করলেন সবাই।

নিয়াজি তাদের বললেন “চিফ রুমে আছেন?” তারা সমস্বরে হ্যাঁ বললেন। নিয়াজি আর কোন দিকে না তাকিয়ে আই এস আই চিফের রুমের দিকে এগোলেন। নিয়াজি এসেছেন, মুস্তাকিনের কাছে খবর চলে

গেছিল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। নিয়াজি তাকে বললেন “আপনার চেম্বারে চলুন। বাকিরা বাইরে থাক”।

মুস্তাকিন তটস্থ হয়ে নিয়াজিকে নিয়ে নিজের চেম্বারে প্রবেশ করলেন।

বেশ বড় চেম্বার। দুজন মহিলা কম্পিউটারে কাজ করছিলেন। মুস্তাকিন তাদের ঘরের বাইরে যেতে বললে তারা বেরিয়ে গেলেন।

নিয়াজি সোফায় বসে বললেন “মিস্টার শাহরিয়র”।

মুস্তাকিন বললেন “জি জনাব”।

নিয়াজি বললেন “আপনি বালোচ রেজিমেন্টে ছিলেন?”

মুস্তাকিন মাথা নাড়লেন “জি জনাব”।

নিয়াজি বললেন “ক্যানাডিয়ান ফোরসেস এন্ড স্টাফ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করে ইসলামাবাদে জয়েন করেছিলেন ১৯৮০ সালে। ঠিক বলছি?”

মুস্তাকিন হেসে বললেন “জনাব সব খবর রাখেন আমার”।

নিয়াজি বললেন “রাখতেই হবে। দেশের যা অবস্থা। যাই হোক, ইন্ডিয়ান চরটির কী খবর? কিছু উগরেছে?”

মুস্তাকিন হতাশ গলায় মাথা দুপাশে নাড়িয়ে বললেন “না জনাব”।

নিয়াজি বললেন “স্বাভাবিক। এদের থেকে কিছু বের করা যায় না। নেক্সট জুম্মায় কুরবানী করব ভাবলাম, কিন্তু এখন ইন্ডিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভস আসবে। সিরিজটা শুরু হোক, সিরিজ চলাকালীন কুরবানীটা হবে। ওদের পলিটিক্যালি কোণঠাসা করা যাবে”।

মুস্তাকিন মাথা নাড়লেন, “জি জনাব”।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন “অপারেশন ব্লু ফ্লাওয়ার সম্পর্কে আপনি কী জানেন মিস্টার শাহরিয়র?”

মুস্তাকিন বললেন “জনাব, আপনি তো দেখলেন সেদিন কর্নেল খানও ব্লু ফ্লাওয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলতে পারল না। তবে আমাদের এক মেজর আজকেই আমাকে ব্লু ফ্লাওয়ার সম্পর্কে কিছু তথ্য দিলেন”।

নিয়াজি বললেন “কে সে? ডাকুন তাকে”।

মুস্তাকিন উঠে গিয়ে চেম্বারের বাইরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এক যুবককে নিয়ে ভিতরে এলেন।

যুবক নিয়াজিকে সেলাম করে বলল “আফতাব খান জনাব”।

নিয়াজি বললেন “অপারেশন ব্লু ফ্লাওয়ার সম্পর্কে আপনি মিস্টার শাহরিয়রকে কী বলছিলেন আফতাব?"

আফতাব বলল “জনাব সরফরাজ খান মাঝে মাঝেই শহরের বাইরে যেতেন জনাব। আপনি তখনও প্রেসিডেন্ট ছিলেন না। তার কাছে আমি এক আধবার এই টার্মসটা শুনেছিলাম”।

নিয়াজি সোজা হয়ে বসে বললেন “আমার সিক্সথ সেন্স বলছে মিডল ইস্ট থেকে আই এস আই এস আফগানিস্থান হয়ে পাকিস্তানে ঢুকতে চাইছে এবং তাদের হেল্প করত সরফরাজ। অ্যাম আই রাইট”?

আফতাব খানিকটা সংকুচিত হয়ে বলল “সে ব্যাপারে আমার কাছে ডিটেলস কোন প্রমাণ নেই জনাব”।

নিয়াজি বললেন “আমার গাড়িতে কারা বোম রেখেছিল সে সম্পর্কে আপনার কোন আইডিয়া আছে?"

আফতাব মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিয়াজি বললেন “আপনি যেতে পারেন”।

আফতাব যেন পালিয়ে বাঁচল।

নিয়াজি বললেন “আফসানা সাইদের জিনিসপত্র কাদের কাস্টোডিতে আছে”?

মুস্তাকিন বললেন “আমাদের। ওমর শেখেরও আছে”।

নিয়াজি বললেন “ইসমাইল এই মুহূর্তে কোথায় আছে জানেন?”

মুস্তাকিন মাথা নাড়লেন।

নিয়াজি বললেন "লস্কর চিফের সঙ্গে গত তিন দিন ধরে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারছি না। মুজফফরাবাদের গভর্নর লন্ডন গিয়ে বসে আছেন। ফারমান আলীকে দিয়ে পাকিস্তান আর্মির একাংশ আর্মস ইমপোর্ট করছে এবং তার কোন রকম সুলুক সন্ধান আমাদের হাইয়ার অফিশিয়ালদের কাছে নেই। আপনার কাছে নেই। আজকেও করাচীতে মসজিদে ব্লাস্ট হয়েছে। এরকম চললে তো দেশ চালানো কঠিন হয়ে যাবে মিস্টার শাহরিয়র। আপনি বলুন আপনি পারছেন না, আমি যোগ্যতর কাউকে আপনার পোস্টে আনব। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ এনি ফারদার ব্যাটল এগেইন্সট এনি অফ আওয়ার রাইভালস। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?"

মুস্তাকিন বললেন "জি জনাব"।

নিয়াজি উঠলেন "ফারমান আলী আর লস্করের কাশ্মীর অপারেশন সম্পর্কে কাল সকাল দশটার মধ্যে আপনি আমাকে রিপোর্ট করছেন মিস্টার শাহরিয়র। আমি আর কিছু শুনতে চাই না"।

মুস্তাকিন ঘাবড়ে গিয়ে বললেন "এত তাড়াতাড়ি জনাব"?

নিয়াজি বললেন "হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়িই। দরকার হলে আপনার ডিপার্টমেন্ট সারারাত জাগবে। এনি প্রবলেম?"

মুস্তাকিন জোরে জোরে মাথা নাড়লেন "নো জনাব"।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুস্তাকিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাম মুছলেন কপালের।

৬৭

আশরফ খানের আসতে বেশিক্ষণ লাগল না। বীরেন লোকেশন শেয়ার করে দিয়েছিল। খান তাকে দেখে খুশিতে হাত নাড়লেন।

বীরেন গাড়িতে উঠলে বললেন "তুষার স্যার তোমায় খুব পছন্দ করছেন দেখছি। ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসতেই অ্যাসাইনমেন্টে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য ছুটি টার্মটা ইউজ করা ঠিক হবে না। তোমার ওপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে এখন। পাড়ায় যে খুনটা হয়েছিল কোন কিনারা হয়েছে?"

বীরেন মাথা নাড়ল।

খান চিন্তিত মুখে বললেন "ওরা খুবই অরগানাইজড। ওদের ধরতে যাওয়া এখন অনেকটা ডিফেন্স খালি রেখে গোল করতে যাওয়ার মত হচ্ছে। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই"।

বীরেন বলল "আমরা এখন অমৃতসর যাচ্ছি?"

খান বললেন "হ্যাঁ। খুব ভয়ংকর একজনের মুখোমুখি হতে। জানি না মুখোমুখি হবার সুযোগ পাব নাকি"।

বীরেন বলল "মানে?"

খান বললেন "রেহানকে খুন করেছিল ইসমাইল। কাশ্মীর দিয়ে ঢুকে এখন খুব সম্ভবত অমৃতসরে বড় কিছু করার প্ল্যান করছে"।

বীরেন চমকে উঠল "বড় কিছু?"

খান হাসলেন "হ্যাঁ, যদি মানুষ মারাকে বড় কিছু বল তো অবশ্যই বড় কিছু। জানি না, কোন স্কেলে ওরা এগোচ্ছে, কিন্তু মাথুরের দেওয়া সোর্স থেকে যা বোঝা গেছে তা হল ও অমৃতসরে আছে। আর অমৃতসর মানে একটাই জায়গা হয়। স্বর্ণমন্দির। লাখ লাখ লোক আসে প্রতিদিন। সেখানে কোন রকম টেনশন তৈরী হলে গোটা দেশে আগুন জ্বলবে। মুজফফরাবাদে মাথাটা আছে, আর প্ল্যান এক্সিকিউট হচ্ছে এখানে। ঠিক কোন চুলোয় ইসমাইল আছে আর এত বড় ঘিঞ্জি শহরে কোথায় কী করছে সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের বের করতে হবে"।

বীরেনের ঠান্ডা লাগছিল হঠাৎ করে। সে আসলে ইসমাইলদের মত খুনীদের দলের লোক?

এরা কী করতে চাইছে? একটার পর একটা ব্লাস্ট? জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে দেখা হবার পরের দিনগুলো মনে পড়ে গেল বীরেনের। দিল্লি পৌঁছে টিভিতে কাশ্মীরে ব্লাস্ট দেখার কথাটা এখনও দুঃস্বপ্নে আসে তার। একগাদা নিরস্ত্র নিরীহ লোককে মেরে ঠিক কোন উদ্দেশ্য সফল হয় এই লোকগুলোর?

সে একজন রাজাকারের ছেলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধর সময়ে যারা পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল, নিজের দেশের মহিলাদের ধর্ষণ, পুরুষ, শিশুদের খুন করতে সাহায্য করেছিল, তাদের রাজাকার বলা হয়। গোটা দেশের মানুষ এদের ঘেন্না করে। এরা ভেবেছিল পাকিস্তান ঠিক মুক্তিযোদ্ধাদের হারিয়ে দেবে। ধর্মের ভিত্তিতে তৈরী হওয়া দেশে ধর্মের ভিতই মজবুত হবে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষদের মারতে সাহায্য করেছিল এই লোকগুলো। কিন্তু ধর্মের নামে অধর্মের পরিবেশে ধর্মের কলই শেষমেশ নড়েছিল। ভারতীয় সেনার সাহায্যে পাকিস্তানকে গোহারান হারিয়ে দেশ ছাড়া করে স্বাধীনতা পেয়েছিল বাংলাদেশ। রাজাকারেরা কেউ মুক্তিবাহিনীর হাতে খুন হয়েছিল, কেউ পাকিস্তানে পালিয়ে গেছিল, কেউ বা দেশেই অন্য প্রান্তে গিয়ে নাম ভাড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল। ভাষার অধিকারে দেশ তৈরীতে বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তার বাবা বাংলাদেশ বিরোধী, সভ্যতা বিরোধী, মানবতা বিরোধী একজন মানুষ। সে এমন বাবার ছেলে। বীরেন চোখ বুজল। কী অপরাধ করেছিল সে? ভালই তো চলছিল সব কিছু। এত বড় দুঃস্বপ্ন অপেক্ষা করছিল তার জন্য?

এয়ারপোর্ট এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

তাকে নিয়ে সেনার হেলিকপ্টারে উঠলেন আশরফ। আকাশ থেকে রাতের দিল্লি শহর মায়াবী লাগছিল।

খান বীরেনকে বললেন “মাঝে মাঝে মনে হয়, চাকরি বাকরি ছেড়ে বাড়ি গিয়ে পানের দোকান দি বীরেন। এত টেনশন, এত চাপ, নিজের পরিবারের ওপরেও সব সময় শত্রুদের নজর। যখন তখন যা খুশি হয়ে যেতে পারে। তারপর যখন এই মিশনগুলোতে যাই, তখন কেন জানি না, অদ্ভুত একটা গর্ব হয়। আমাদের জব প্রোফাইলটা সব থেকে প্রেস্টিজিয়াস বীরেন। প্রাউড টু বি আ পার্ট অফ দিস জব”।

বীরেন ম্লান হাসল। খানের কথাটা অনেকটা নাড়া দিল তাকে।

কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে খান ট্যাব বের করে মাথুরের পাঠানো নথিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

বীরেন চোখ বন্ধ করল। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে। আশরফ খানের প্রাণ বাঁচিয়েছিল সে। সেই ঘটনার পর থেকে তার গুরুত্ব বেড়েছে। আশরফ খান, তুষার রঙ্গনাথন, প্রত্যেকেই তাকে আলাদা চোখে দেখেন। স্নেহ করেন।

এটাও কি প্ল্যান করেই করা হয়েছিল? আশরফ খানকে ওরা খুন না করে ইচ্ছা করে আহত করেছিল যাতে সে খানকে বাঁচিয়ে সবার বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে?

বীরেনের মাথা ঘুরে উঠল হঠাৎ করে। ঠিক কতটা গোড়া থেকে প্ল্যানটা করা হয়েছিল?

৬৮

পাকিস্তানি সময় রাত সাড়ে এগারোটা (ভারতীয় সময় রাত বারোটা)।

প্রেসিডেন্ট হাউজের টিভি রুমে বসে স্কচের গ্লাস হাতে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট নিয়াজি।

তার পাশে খাস খানসামা জাকির দাঁড়িয়ে আছে ত্রস্ত ভঙ্গিতে।

নিয়াজি টিভিতে খেলা দেখতে দেখতে জাকিরকে বললেন “ক্রিকেট দেখো জাকির?”

জাকির বলল “হ্যাঁ জনাব। সময় পেলে দেখি’।

নিয়াজি বললেন "কাকে ভাল লাগে?"

জাকির বলল "জি জনাব, আমি রাওয়ালপিন্ডির মানুষ, আমার শোয়েব আখতারকে ভাল লাগত। এছাড়াও ইজাজ আহমেদ, ইনজি ভাইজান, আমির সোহেলের খেলাও ভাল লাগত"।

নিয়াজি বললেন "জাভেদ মিয়াদাদের খেলা ভালো লাগত না? সেই লাস্ট বলে ছয় মেরে জেতানো, ভুলে গেলে?"

জাকিরের মুখে হাসি ফুটল, "জি জনাব। কী করে ভুলি?" নিয়াজি মাথা নাড়লেন "সব দেশের সঙ্গে জেতায় এক আনন্দ, ইন্ডিয়ার সঙ্গে জিততে পারলে আরেক রকম আনন্দ, কী বল জাকির?"

জাকির বলল "জরুর জনাব। ইন্ডিয়াকে হারানোর মজাই আলাদা। তবে ইন্ডিয়াতেও ভাল ভাল প্লেয়ার ছিল। শচীন টেন্ডুলকারের ব্যাটিং দেখেছিলাম জনাব রাওয়ালপিন্ডিতে"।

জাকির উৎসাহিত হয়ে বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

নিয়াজি মাথা নাড়লেন "বল বল। আমি রাগব না। গ্রেটের সম্মান দিতে জানতে হয়। তা সে যে দেশেরই হোক না কেন! তবে আমাদের সাইদ আনোয়ারকে ইন্ডিয়া কিছুতেই আউট করতে পারত না সেটা ভুললেও চলবে না। হি ওয়াজ অলসো এ গ্রেট ব্যাটসম্যান। ইন্ডিয়ার সামনে পড়লেই আনোয়ার বাঘের বাচ্চা হয়ে যেত"।

নিয়াজির গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছিল। জাকির বলল "জনাব, আর দেব?"

নিয়াজি বললেন "হ্যাঁ। দাও। আমার ঘুম আসছে না আজকে। সিক্সথ সেন্স কাকে বলে বোঝ জাকির?"

জাকির নিয়াজির পেগ তৈরী করতে করতে বলল "জি জনাব"।

নিয়াজি গ্লাস হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখে চুমুক দিতে লাগলেন।

জাকির কোন কথা বলল না। তার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছিল সাহেব কেন সিক্সথ সেন্সের কথা বললেন কিন্তু সে প্রশ্নটা করল না। সে তার সীমানা জানে। ঠিক কোন জায়গাটায় গিয়ে থেমে যেতে হয় সেটা এত বছর এই হাউজে থেকে তার থেকে ভাল কেউ জানে না।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজি অস্থির হাতে রিমোট কন্ট্রোলে চ্যানেল চেঞ্জ করতে করতে বললেন "বর্ডারে থাকাকালীন শত্রুপক্ষ যখন অতর্কিতে আমাদের চার্জ করত, তখন অতটা ভয় কখনই লাগে নি। ইউ নো দেম, দে নো ইউ। কোথাও কোন অসুবিধা নেই। সমস্যা নেই। তোমরা জানো কী হতে পারে, কী হতে চলেছে। বি অলওয়েজ প্রিপেয়ারড। পাকিস্তানী আর্মি কেন, পৃথিবীতে যুযুধান সমস্ত দেশের আর্মির মূল মন্ত্র এটাই। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় জানো জাকির?"

জাকির জিজ্ঞাসু চোখে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল। কিন্তু এবারেও কোন প্রশ্ন করল না।

প্রেসিডেন্ট বললেন "সমস্যাটা হল যখন শত্রু বন্ধুবেশে সাপ সেজে তোমার আস্তিনেই লুকিয়ে বসে থাকবে। তখন তোমার কিছু করার থাকবে না। নিজের লোকেরাই যখন... পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের গাড়িতে বোমা রেখে দিচ্ছে আই এস আই...ভাবা যায়?"

জাকির এবার না বলে থাকতে পারল না "জনাব আপনি কি প্রাক্তন আই আস আই চিফ সরফরাজ খানের কথা বলছেন?"

প্রেসিডেন্ট জাকিরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন "ইউ আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট জাকির মিয়াঁ। সহি পাকড়ে হো আপ। ইয়েস। অ্যান্ড দে প্ল্যান্ড সামথিং বিগ... ভেরি বিগ..."

ড্রয়িং রুমের ফোন বেজে উঠল। নিয়াজি ভ্রু কুঁচকে জাকিরের দিকে তাকালেন।

জাকির তড়িঘড়ি ফোন তুলল। কয়েক সেকেন্ড কথা বলে ফোন হাতে রেখে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল "জনাব আই এস আই চিফ মুস্তাকিন শাহরিয়র এসেছেন, দেখা করতে চান"।

প্রেসিডেন্ট বললেন "লেট হিম কাম"।

জাকির ফোন তুলে বেরিয়ে গেল। নিয়াজি গ্লাসে চুমুক দিয়ে ফিসফিস করে বললেন "সিক্সথ সেন্স... সিক্সথ সেন্স"।

মুস্তাকিন শাহরিয়র প্রায় ঝড়ের গতিতে ঢুকলেন।

জাকির দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

নিয়াজি হাসিমুখে বললেন "বলুন শাহরিয়র সাহেব, নিশ্চয়ই কোন সমস্যার কথা বলতে এসেছেন?"

শাহরিয়র হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন "জনাব, আপনার কথা মতো, আফসানা সাইদ আর ওমর শেখের করাচীর বাড়িতে আমাদের লোক গিয়েছিল। কেউ ট্রেসপাসিং করেছিল জনাব ও বাড়িতে। জিনিসপত্র ওলোট পালোট করে রাখা"।

নিয়াজি বললেন "চমৎকার, আপনাদের কোন পাহারাদারই ছিল না ওখানে? সব ঘটে যাওয়ার পর জানতে পারলেন বুঝি? বাহ বাহ। নিন স্কচ খান"।

শাহরিয়র থমথমে মুখে বসে রইলেন।

৬৯

রাত এগারোটা। আর্মির কপ্টার একটু দেরী করে অমৃতসর বিমানবন্দরে নেমেছে।

অমৃতসর এয়ারপোর্টে তারা নেমে বেরোতে যেতেই ভারতীয় সেনার মেজর গুরবীর সিং আশরফকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। আশরফ তাকে জড়িয়ে ধরলেন। মেজর বীরেনকে দেখিয়ে আশরফকে বললেন "নতুন শের?"

আশরফ হাসলেন "একদম। একদম তাজা শের। আমাকে দেখতে পেতেন না এই ছেলেটা না থাকলে"।

মেজর বীরেনের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন "সাবাশ বেটা। তোমাদের মত নওজওয়ানদেরই তো আমাদের দরকার"।

আশরফ বললেন "আপডেট দিন মেজর। কী হাল?"

মেজর বললেন "সেনা নেমে গেছে শহরে। নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। দুশমন যেই থাকুক, কিছুই করতে পারবে না, ইন্ডিয়ান আর্মি আপনাকে এই আশ্বাস দিচ্ছে"।

আশরফ বললেন "দুশমনকে এত হালকাভাবে নিলে হবে না মেজর। দুশমন অত্যন্ত ধূর্ত। শুধু কোল্যাটেরাল ড্যামেজ করে পালাবে এটা তো হতে দেওয়া চলবেই না, আমাদের তাকে ধরতেও হবে। এরাই ইরাবতী ম্যাডামের ওপর হামলা করেছে। আমাদের কারো জীবন নিরাপদ নয় এদের দৌরাত্ম্যে। কেন এরকম হবে বলুন তো? নিজের দেশে কেন আমাদের এত ভয়ে কাটাতে হবে? হয় আমাদের এই ভয়কে জয় করে দুশমনকে একদম শেষ করে দিতে হবে গোঁড়া থেকে, নইলে এভাবেই ভয়ে ভয়ে একদিন ঘরে বসে খুন হয়ে যেতে হবে। আর সবার উপরে, রেহান খানের খুনীকে আমি ফ্রি স্পেস দিতে পারব না, কী প্ল্যান করেছে এরা খানিকটা আঁচ করছি। যদি সেটা হয় তাহলে ভয়াবহ কান্ড হবে একটা"।

মেজর আশরফ খানের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন "আপনি ভাববেন না খান, শেয়াল যতই ধূর্ত হোক, বাঘের কাছে তাকে মাথা নত করতেই হবে। ইসমাইলকে ছাড়ব না। আপনি শুধু হুকুম করুন আমাদের কী করতে হবে"।

আশরফ খান বললেন "আপাতত আমরা গোল্ডেন টেম্পল যাই। ওখানের সিচুয়েশন দেখে আপনাকে এর পরে কোথায় যেতে হবে জানাচ্ছি"।

মেজর বললেন "ফাইন, আসুন"।

তারা বিমানবন্দর থেকে বেরোতে বীরেন দেখল সেনার কনভয় দাঁড়িয়ে আছে। একটা গাড়িতে তারা উঠতেই কনভয় চলতে শুরু করল।

আশরফ খান বললেন "আমাদের ধর্মটা জানো তো বীরেন, দিনে দিনে কিছু লোকের জন্য এভাবে কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। যে ছেলেটা বড় হয়ে ভাবছে একজন ভাল নাগরিক হবে, এসব লোকের জন্য তারা বিপথে চলে যাচ্ছে। শিক্ষা শুধু না, আরও অনেক কিছু দরকার রিফর্মের জন্য। তুমি তো বুঝবে না, তুমি হিন্দু ঘরে জন্মেছ, একজন মুসলমান হয়ে জন্মানোর পর যে কীভাবে আমাদের দিন দিন পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে সেটা আমরাই জানি"।

অমৃতসর ঘিঞ্জি শহর। রাত বলে গাড়ির গতিতে কোন রকম সমস্যা হচ্ছিল না। আশরফ খানের কথাগুলো শুনে বীরেন খানিকটা গুটিয়ে গেল। সে হিন্দু ঘরে জন্মেছে তো জন্ম থেকে জানত। আদতে তার বাবার পরিচয় জানার পর তো তার মাথা আর কাজ করছে না। হিন্দু, মুসলিম বা খ্রীষ্টান পরিচয় নিয়ে এই এখনও ভাবতে হবে? কেন? কাশ্মীর নামের একটা ছোট ভূখণ্ড নিয়েই বা দু দেশের মধ্যে এত ঝামেলা কেন হবে, যে দেশের বেশিরভাগ মানুষই এখনও পেট ভরে দু বেলা খেতে পারে না?

বীরেনের প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছা হচ্ছিল খানকে সব খুলে বলে কিন্তু অদৃশ্য একটা হাত যেন তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। বাবার মুখটা মনে পড়ছিল। জন্মদাতা বাবা। নিজের বাবা। কী করে নিজের পিতৃপরিচয় অবলীলায় ভুলে যাবে সে?

আশরফের মোবাইলে ফোন আসছিল। আশরফ ফোন ধরলেন। খানিকক্ষণ কথা বলে ফোন রেখে বললেন "মাথুর ফোন করেছিল। ইসমাইলের সঙ্গে শ্রীনগর ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসরও আছে। সিমস লাইক দে হ্যাভ এ ভেরি বিগ প্ল্যান"।

বীরেন চোখ বন্ধ করল। বিগ প্ল্যান? কী হতে পারে বিগ প্ল্যান?

কনভয় একটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় এসে দাঁড়াল। খান গাড়ি থেকে নামতে আর্মির বেশ কয়েকজন দৌড়ে এলেন।

খান বীরেনকে বললেন "এসো"।

আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে আছে। খান বীরেনকে নিয়ে এগোতে এগোতে বললেন "গোল্ডেন টেম্পলে এসেছো কোনদিন? ওয়ান্ডারফুল প্লেস। এখানকার হালুয়া লা জবাব"।

বীরেন মাথা নেড়ে বলল "আসি নি"।

বেশ খানিকটা পথ হেঁটে তারা মন্দিরের প্রবেশ পথের থেকে একশো ফুট দূরে দাঁড়াল। একজন আর্মির জওয়ান বললেন "স্যার মন্দিরের ভেতর তো আর্মি ঢুকবে না। তবে খালসাবাহিনীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় কারো এত সাহস হবে না"।

আশরফ বললেন "তবু, কোন রকম রিস্ক নেওয়া যাবে না। সিসিটিভি মণিটরিংএ যেন কোন ফাঁক থেকে না যায়"।

বীরেন হাঁটতে হাঁটতে স্বর্ণ মন্দিরের বাইরে জুতো রেখে জলে পা ধুয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেতরের দিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠল। এখনও কত মানুষ আছেন। বিশ্বাসে চলে এসেছেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। মানুষই ঈশ্বর তৈরী করে আবার তারাই ঈশ্বরের ঘরে আসার অপরাধে মানুষকে মেরে ফেলে।

বীরেন ক্লান্ত ভঙ্গীতে সিঁড়িতে বসে পড়ল।

এক বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোক বেরোচ্ছিলেন, তার বসে পড়া দেখে কিছু একটা আঁচ করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

বীরেনের খুব কান্না পেল।

অনেক কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে সে কান্না চাপল।

এ কী রকম অভিশপ্ত জীবন পেল সে?

পাকিস্তানি সময় রাত একটা। আই আস আই চিফ মুস্তাকিন শাহরিয়র অপরাধীর মত মুখ করে নিয়াজির সামনে বসে আছেন। নিয়াজি চুপ চাপ একটার পর একটা পেগ শেষ করছেন। ভরছেন, আবার খাচ্ছেন। খানসামা জাকির একবার এসে দেখে চলে গেছে। কোন কথা বলে নি।

অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিয়াজি ঠান্ডা গলায় বললেন "আপনার চার্জ হ্যান্ড ওভার পাওয়ার সময় খুবই কম। খুব রিসেন্টলি আপনি আই এস আই চিফ হয়েছেন মিস্টার শাহরিয়র। কিন্তু এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, তাতে আপনাদের আরও ট্যাক্টফুলি কাজ করতে হবে আশা করি সেটা আপনি বুঝতে পারছেন"।

শাহরিয়র ঘাড় নাড়লেন "জি জনাব"।

নিয়াজি টিভির দিকে তাকিয়ে বললেন "ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমটাকে দেখেছেন? ওদের বিধ্বংসী সব ব্যাটসম্যান আছে, দুর্দান্ত অলরাউন্ডার বোলার আছে, তবু ওরা হেরে যায় কেন ম্যাচগুলোতে বলুন তো?"

শাহরিয়র বললেন "দে হ্যাভ ল্যাক অফ কনসিসটেন্সি জনাব"। নিয়াজি মাথা নাড়লেন "ইয়েস, সেটা একটা কারণ তো বটেই, কিন্তু আরও কারণ আছে। দে হ্যাভ ল্যাক অফ সিরিয়াসনেস। ওরা খেলাটাকে এনজয় করতে মাঠে যায়। আর বিভিন্ন দেশের লোকেদের এক সঙ্গে খেলার সমস্যাটা আলাদাভাবে ধরলে আছেই। আপনি জিনিসটাকে এনজয় করুন, খুব ভাল কথা। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আপনার প্রপার সিরিয়াসনেসটা না থাকে সেটাও চিন্তার ব্যাপার। ওমর শেখ আর আফসানা সাইদ দুটো পাকা ঘুটি ছিল আই এস আই এর। তাদের বাড়িতে মিনিমাম সিকিউরিটি থাকবে না, এটা কেন হবে?"

শাহরিয়র মাথা নাড়লেন "ঠিকই জনাব"।

নিয়াজি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় জাকির ঘরের ভেতর এসে নিয়াজির দিকে তাকিয়ে বলল "জনাব একজন ফোন করেছেন। নাম বলছেন না। শুধু বলছেন ফোনটা আপনার জন্য খুব জরুরি"।

নিয়াজি অবাক চোখে জাকিরের দিকে তাকিয়ে বললেন "প্রেসিডেন্ট হাউজের নাম্বার আছে তার কাছে? তাহলে জরুরিই হবে। দাও ফোনটা"।

জাকির নিয়াজির কাছে ফোনটা এনে দিল।

নিয়াজি ফোনটা কানে দিয়ে বললেন "হু ইজ দেয়ার"?

ওপাশ থেকে ভেসে এল "জনাব, বেঁচে থাকতে কেমন লাগছে?"

নিয়াজি জাকিরকে বললেন "খোঁজ নাও কোত্থেকে ফোনটা এসেছে। এখনই"। তারপর কয়েক সেকেন্ড ফোনটা কানে ধরে থেকে ঠান্ডা গলায় বললেন "কে বলছেন? পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এইভাবে কথা বললে কী হতে পারে কোন ধারণা আছে আপনার?"

ওপাশে হালকা হাসির আওয়াজের সঙ্গে ভেসে এল "জনাব, মুস্তাক জিমরির সঙ্গে মুজফফরাবাদে দেখা করে আসার পর ফতিমা জিন্না পার্কে আপনার গাড়িটা ব্লাস্ট করল। গোটা দুনিয়াকে আপনি বলে দিলেন ব্লাস্টটা ইন্ডিয়া করেছে। আপনার একবারও জানতে ইচ্ছা করে নি, ব্লাস্টটা সত্যিই কে করেছে?"

নিয়াজি বললেন "আপনি জানেন? বলুন তবে?"

"অবশ্যই জানি জনাব। আপনি আমাকে চিনবেন না হয়ত। তবে পাকিস্তান আর্মি আর আই এস আই আমাকে খুব ভাল ভাবেই চেনে। আমার নাম সায়ক বড়াল। নামটা কি শোনা শোনা লাগছে জনাব?"

নিয়াজির চোখ বড় বড় হয়ে গেল, পরক্ষণেই শান্ত হয়ে বললেন "চিনি আপনাকে। না চেনার তো কিছু নেই। আপনি আমাকে ফোন করেছেন কেন?"

"আপনার দেশের ইন্টেলিজেন্স ফেইল করেছে জনাব। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমাদেরও তো কিছু কর্তব্য আছে, তাই না?"

নিয়াজি মুস্তাকিনের দিকে তাকালেন। মুস্তাকিন বিমর্ষ মুখে বসে আছেন।

জাকির ঘরে এসে জানাল ফোন ট্রেস করা যাচ্ছে না। স্যাটেলাইট কল।

নিয়াজি বললেন "মিস্টার বড়াল, আপনি আমাকে ফোন করেছেন যখন তখন নিশ্চয়ই আমার হাল হকিকত জানার জন্য ফোন করেন নি। দ্বিতীয়ত দিল্লি থেকে এই ফোন এলে সেটা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হত"।

সায়ক বলল "অবশ্যই জনাব। কিন্তু দিল্লিতে ফোন করার আগে আমি আপনাকেই ফোন করেছি। কারণ ব্লু ফ্লাওয়ার কোড আমি এই মাত্র ক্র্যাক করেছি জনাব"।

নিয়াজি চমকালেন খানিকটা। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বললেন, "কী বলবেন? আই এস আই চিফ সরফরাজ খান আর আই এস আই এস চিফ কাশেম সোলেমানির ব্রেইন চাইল্ড ব্লু ফ্লাওয়ার?"

সায়ক বলল "অবশ্যই জনাব। কিন্তু সেটাই সব নয়। মুস্তাক জিমরি আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছিল পাক অধিকৃত মুজফফরাবাদে আর্মস ইমপোর্ট করার। সেটা আপনি মানেন নি। এর ফলেই আপনার ওপর হামলা হয়েছিল। জনাব, কাশেম সোলেমানি পাকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট করতে চেয়েছিল। তার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে দ্রুত গতিতে। ফারমান আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তানে একের পর এক আর্মস ঢুকছে লেবানন থেকে। পেশোয়ার, করাচী, লাহোরে প্যারালাল ফোরস তৈরী হচ্ছে। এবার আপনিই ঠিক করুন, মিডল ইস্টের সিরিয়া, ইরাকের মত পাকিস্তানেরও সেই হাল হবে, নাকি ওদের আটকাবেন। সবটাই এখন আপনার হাতে জনাব"।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন "এত কথা আমাকে বললেন কেন আপনি?"

সায়ক বলল "আমার তরফ থেকে গুডউইল জেসচার ভাবতে পারেন। আমার দেশকে আমি বলব না আপনাকে ফোন করেছিলাম। গোটা ব্যাপারটাই আনঅফিশিয়াল থাকবে। এত বছর আপনাদের মেহমান হয়ে আছি, হতে পারে, দেখলেই গুলি করবেন, কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক একটা দেশকে চোখের সামনে শ্মশান হয়ে যেতে দেখব কী করে জনাব? এরাই তো এর পরে আমাদের দেশের দিকে এগোবে। অলরেডি এগিয়েছেও অবশ্য, তবে ওদের মেইন প্ল্যান কিন্তু পাকিস্তানই"।

নিয়াজি চোয়াল শক্ত করে বললেন "আপনি কী চান?"

সায়ক বলল "ইসমাইলকে আটকান, লস্করকে বলুন ওকে যেন পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।"

নিয়াজি হতাশ গলায় বললেন "ওর কন্ট্রোল আমাদের কাছে নেই"।

সায়ক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "বেশ। তবে আব্বাসকে ছেড়ে দিন। ওকে ইন্ডিয়া যেতে দিন। এটুকু আশা করি করবেন আপনি আমাদের জন্য"।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড ফোনটা ধরে থেকে বললেন "করব। থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন"।

ফোনটা রেখে নিয়াজি মুস্তাকিন শাহরিয়রকে বললেন "কনভয় রেডি করতে বলুন। আমি বেরব"।

মুস্তাকিন বললেন "এত রাতে?"

নিয়াজি মুস্তাকিনের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন "দেশ চালাচ্ছি। নউটঙ্কি করছি না। চলুন"।

৭১

তুষার রঙ্গনাথন কম্পিউটার খুলে বসেছিলেন। কাশ্মীরের ম্যাপের দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে ছিলেন। ফোন বেজে উঠল তার। তুষার ফোন ধরলেন।

ওপাশ থেকে ভেসে এল "এক লডকি কো দেখা তো এয়সা লাগা"।

তুষার উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন "তুমি বেঁচে আছো?"

সায়ক হাসল "মরে গিয়ে যাই কোথায় স্যার? গোটা পৃথিবী ঘুরলেও আমি আমার দেশেই মরব স্যার"।

তুষার বললেন "বল কী বলবে"।

সায়ক বলল "স্যার ব্লু ফ্লাওয়ারের কোড ব্রেক করেছি। ভেবেছিলাম পীযূষকে লাগবে কিন্তু নিজেই পেরেছি। আমি করাচীতে আছি এই মুহূর্তে। আমার হাতে বেশি সময় নেই। পালাতে হবে এখান থেকে। পাকিস্তানি আর্মি কড়া টহলদারি রেখেছে এই চত্বরে"।

তুষার বললেন "ওকে, ওকে, তুমি কী বলতে চাও সেটা বল"।

সায়ক বলল "আব্বাসকে কাল ছাড়ছে ওরা"।

তুষার বললেন "কী করলে তুমি? কেন ছাড়বে?"

সায়ক বলল "এত এক্সপ্লেইন করার সময় নেই স্যার। সেকেন্ড হল, ওরা আগেরবারে হাসান মাকসুদের সাহায্যে যে সিরিয়াল ব্লাস্ট করেছিল, তারই কন্টিনিউশনে ওদের প্ল্যান এবার আরেকটু প্যাচালো। ওরা গোল্ডেন টেম্পল, বাবরি মসজিদ বা রাম মন্দির, সিদ্ধি বিনায়ক টার্গেট করেছিল। কিন্তু প্রথম বারেই ওমর মারা যাওয়ায় ওরা এখন একটা একটা করে এগোবে। কোড অনুযায়ী গোল্ডেন টেম্পলই ওদের ফার্স্ট টার্গেট"।

তুষার বললেন "হ্যাঁ, তুমি ঠিক। মাথুর ওয়াজুরা থেকে যা ডকুমেন্ট পেয়েছে তাতে জানা গেছে গোল্ডেন টেম্পলেই ওরা আছে"।

সায়ক বলল "স্যার, আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে, এমনকী ইন্টেলিজেন্সের মধ্যেও ওদের লোক আছে। একদিন হঠাৎ করে নেই, বহুদিন ধরে আছে। ওদের বেশ কয়েকজন স্পাই ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বছরের পর বছর ধরে আছে"।

তুষার বললেন "স্বাভাবিক। তাদের ডিটেলস কি পাওয়া গেছে?"

সায়ক বলল "না স্যার। আফসানার ল্যাপটপে অসংখ্য এনক্রিপ্টেড ফাইল আছে। আমার কাছে এখন এত সময় নেই। আমি এই সেফ হাউস ছাড়ছি এখন। করাচী ছাড়ব আজ রাতেই"।

তুষার বললেন "কোন রিস্ক নেই তো? এত রাতে বেরোবে?"

সায়ক বলল "থাকাটাই রিস্ক। আমার ছবি দেওয়া সর্বত্র। ভয় নেই স্যার। মরব না"।

সায়ক হাসল। ফোনটা কেটে গেল।

তুষার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে আশরফ খানকে ফোন করলেন।

আশরফ ধরলেন একটা রিং এই "হ্যাঁ স্যার"।

"ইটস কনফার্মড। গোল্ডেন টেম্পল আশরফ"।

"ইয়েস স্যার। আমরা তৈরী"।

"তুমি কোথায় এখন?"

"এখানেই স্যার। রাতেও লোকজন থাকে তো। আপনি এসেছেন অনেকবার ভুলে গেছেন?"

"আরে আমি রেনোভেশনের আগে গেছিলাম। ব্লু স্টারের পরে ওখানেই ডিউটি ছিল আমার। তারপর তো অনেক কিছু ঘটেছে। এখন কমপ্লিট মডারনাইজেশন ঘটেছে। সেটা দেখা হয় নি"।

"ইসমাইল অত্যন্ত ধূর্ত স্যার। ও যদি গোল্ডেন টেম্পল ছেড়ে অমৃতসরের অন্য কোন জায়গায় কিছু করে? এ প্রাচীন শহরের অসংখ্য গলিঘুঁজি, অসংখ্য মানুষ থাকে এখানে"।

তুষার ফোনটা ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন "আমরা হেল্পলেস। করলে করবে। দেখো পালিয়ে না যেতে পারে। আর কি বলব? নাকা চেকিং চলছে ঠিক ঠাক?"

আশরফ বললেন "হ্যাঁ স্যার। সন্দেহজনক বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে"।

তুষারের চোখ তীক্ষ্ণ হল "তাদের মধ্যে কাশ্মীরি ক'জন? শিক্ষিত?"

আশরফ বললেন "ওদের এখানে আনা হয় নি। বেশিরভাগই ড্রিংক এন্ড ড্রাইভিং এর কেস ছিল। আপনার ডিটেলস লাগবে?"

তুষার বললেন “সারটেনলি। যে ক’জন কাশ্মীরি আছে করতে বল। তুমি যেখানে আছো সেখানে এনে আমার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং করে মুখ দেখাও। ইমিডিয়েটলি”।

আশরফ বললেন “রাইট স্যার”।

ফোন কাটলেন আশরফ।

তুষার প্রবল উত্তেজনায় পায়চারি করতে শুরু করলেন।

ফোনটা এল আধঘন্টা বাদে। তুষার ফোন ধরে বললেন “বল আশরফ”।

“স্যার, এরা বেশিরভাগই গরীব মানুষ। সেরকম কিছু নেই। ট্রাক চালাচ্ছিল, কেউ বা রাস্তার ধারে ফুটপাথে শুয়ে ছিল”।

তুষার বললেন “ঠিক আছে। ভিডিও কল কর”।

আশরফ ফোন কেটে ভিডিও কল করলেন। পাঁচজন কাশ্মীরি ছিল। তুষার প্রত্যেকের মুখ দেখলেন। শেষ জন মদের নেশায় টলছিল। তুষার তাকে একবার দেখেই আশরফকে চেঁচিয়ে উঠে বললেন “একে আলাদা কর। ইউ হ্যাভ গট ইওর ম্যান। কাদরী। এই কাদরী। এ অভিনয় করছে”।

কাদরী তুষারের গলাটা শুনে চমকে আশরফের ফোনের দিকে তাকালেন। তিনি ভাবতেও পারেন নি তুষার তাকে চিনে ফেলবেন। ইসমাইলের কাছে অমৃতসর ফিরছিলেন ক্যানাল রোডে। শহরে ঢোকার মুখে রাস্তায় তল্লাশি হচ্ছে দেখে একটা দোকান থেকে মদ কিনে খেয়ে এক ট্রাকওয়ালাকে ম্যানেজ করে ট্রাকে উঠেছিলেন। তবুও আর্মির লোক তাকে সন্দেহ করে আটক করেছিল। তুষার যে একবার দেখেই তাকে চিনবেন কাদরী কল্পনা করতে পারেন নি। আশরফ চিনতে পারলেন না সামনে দেখে, শুধু ফোনে দেখেই তুষার চিনে ফেললেন? কাদরী কোন কিছু না ভেবে দৌড়তে গেলেন।

আশরফ এগিয়ে গিয়ে সপাটে চাপড় মারলেন কাদরীর পিঠে। কাদরী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

৭২

প্রফেসর কাদরীকে সেনারা ঘিরে রয়েছে। আশরফ খান এগিয়ে গিয়ে তার চোখে চোখ রেখে বললেন “তো প্রফেসর সাব, একজন প্রকৃত মুসলমান হয়ে নিরীহ মানুষদের মারার শিক্ষা আপনাকে কোন ইসলাম দিয়েছে জানতে পারি?”

কাদরী একটা রামের বোতল পুরোটাই খেয়ে ফেলেছিলেন। তার নেশা প্রবল হয়েছিল। তবু লাল চোখে আশরফ খানের দিকে তাকিয়ে বললেন “যে ইসলাম তোকে শিক্ষা দিয়েছে অসহায় কাশ্মীরিদের খুন করার, ছোট ছোট মেয়েদের বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে রেপ করার, সেই একই ইসলাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছে তার প্রতিশোধ নেবার। বুঝেছিস?”

আশরফ খান কয়েক সেকেন্ড কাদরীর দিকে তাকিয়ে কাদরীর মুখে জোরাল একটা ঘুষি মারলেন। কাদরীর নাক থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

খান বললেন “পাকিস্তান কত ভাল রেখেছে তোদের ওপাশের কাশ্মীরকে? কত ভাল রেখেছে? প্রতিটা সাধারন মানুষের বাড়িতে জঙ্গীদের পুষে রেখেছিস তোরা। সেখানে মেয়েদের হায়াত শরমের খেয়াল কে রাখে?”

কাদরী জোর গলায় বললেন “ওরা আমাদের যোদ্ধা, যোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া প্রতিটা মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য। তোরা কী করে বুঝবি কাশ্মীরিদের কষ্ট! রাষ্ট্রের টাকায় পালিত হওয়া কুকুরের দল”!

খান আবার সজোরে ঘুষি চালালেন কাদরীর মুখে। পর পর ঘুষি মারতে থাকলেন। আর্মির এক জওয়ান খানকে আটকাতে গেছিল খান লাল চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন “দূরে থাকুন। আমাকে বুঝতে দিন। এই ধরণের মানসিকতার লোকেদের জন্য ভারতের প্রতিটি নিরীহ মুসলমানকে প্রতিদিন শুনতে হয় তারা

সন্ত্রাসবাদী। প্রতিদিন তাদের পরীক্ষা দিতে হয় তারা দেশকে ভালোবাসে না পাকিস্তানকে। এদের কোন রকম ক্ষমা করা যাবে না। কোনভাবেই না"।

কাদরীর মুখ থেকে রক্ত পড়ছিল। বীরেন শিউরে খানিকটা দূরে সরে গেল। তাকে ধরতে পারলে এভাবেই মারবেন আশরফ? বীরেন বুঝতে পারছিল না কী করবে। তার জল পিপাসা পেল হঠাৎ। আবার জুতো খুলে হেঁটে হেঁটে স্বর্ণ মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করল সে। জল খেল আজলা ভরে। জলাশয়ের জলে পা চুবিয়ে বসল। জলের ওপর সোনার মন্দিরটা কী অপূর্ব দেখতে লাগছে। মায়ের কোলে এক বাচ্চা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কোথাও গরীব মানুষেরা মেঝেতেই শুয়ে পড়েছে।

ফোন বেজে উঠল তার। বীরেন চমকে উঠে ফোন হাতে নিয়ে দেখল বাবা ফোন করছে।

ধরতে ইচ্ছা করল না তার। ফোনটা পুরো বেজে বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার বাজতে শুরু করল।

এবার বীরেন ধরল "হ্যালো"।

"কী করছিলি?"

অধৈর্য গলায় বাবা বলল।

বীরেন সতর্ক হল। বলল "গাড়িতে যাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলাম না কিছু"।

"তুই এখন কোথায়?"

"অমৃতসরে পৌছেছি তো। হোটেলে আছি। কাল কী সব কাজ আছে বলল"।

মিথ্যে করে বলল বীরেন।

"ও। তুই সত্যি বলছিস তো?"

বীরেনের মনে পড়ে গেল মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার পর সে বলেছিল সে একশোতে একশোই উত্তর করেছে তখন বাবা ঠিক এভাবেই তাকে জিজ্ঞেস করেছিল। তার দু চোখের কোণা জলে ভিজে উঠল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল সব দুঃস্বপ্ন ঘটছে তার সঙ্গে। সে কোন রকমে বলল "হ্যাঁ বাবা, আমি সত্যি বলছি"।

"ঠিক আছে। কী হল বলবি"।

"তুমি ভাল আছো বাবা?" বীরেন কথাটা বলতে চায় নি। বলে ফেলল।

বাবা ওপাশে খানিকটা থমকে গিয়ে বলল "হ্যাঁ। ভাল আছি। কেন, কী হয়েছে?"

বীরেন "কিছু না" বলে ফোনটা কেটে দিল। আশরফ ফোন করছেন। বীরেন তড়িঘড়ি ধরল "হ্যাঁ স্যার"।

"তুমি কোথায় বীরেন?" আশরফ খানের গলা উত্তেজিত শোনাল।

বীরেন বলল "টেম্পলের ভেতরে স্যার। জল খেতে এসেছিলাম"।

"চলে এসো। উই হ্যাভ গট দ্য পাসওয়ার্ড"।

"মানে?"

"এসো জলদি। রেহান তোমাকেও খুব ভালবাসত। ভুলে গেছো?"

বীরেন উঠল। দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে জুতো নিয়ে খানের কাছে পৌঁছল।

কাদরীকে আধমরা করে ফেলে রাখা হয়েছে।

আশরফ বীরেনের কাঁধে হাত রেখে হেসে বললেন "চল বীরেন। শহরটা ঘুরে দেখি"।

৭৩

রাত আড়াইটা। ইসমাইল প্রার্থনা করছিল। প্রার্থনার শব্দ কখনও খাদে চলে যাচ্ছিল, কখনও উচ্চস্বরে ইসমাইল চিৎকার করছিল। তার চোখ জ্বলছে, শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়, দু চোখ দিয়ে নামছে জলের ধারা। পাঠান ইসমাইলকে দেখছিল।

পাঠান গাড়ির ব্যবস্থা করেছে ভোরবেলায়। ঠিক হয়েছে ইসমাইল শিখের ছদ্মবেশে বেরোবে।

সে ইসমাইলকে সাজিয়ে দেবে। ছদ্মবেশের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা হয়েছে। পাগড়ি বেঁধে পাক্কা শিখ সেজে ইসমাইল মন্দির চত্বরে ঢুকবে। ভেতরে কড়া নিরাপত্তার বলয় থাকবে বলে মন্দিরের বাইরের ভিড়েই ইসমাইল তার অপারেশন শেষ করবে। যতজন মানুষকে পারবে এলোপাথাড়ি গুলি করে মারবে।

পাকিস্তান থেকে বেশ কয়েকবার মিশন অ্যাবর্ট করার বার্তা এসেছিল কিন্তু ইসমাইল একটা বার্তাও রিসিভ করে নি।

ঘন্টা খানেক পরে ইসমাইল প্রার্থনা সেরে উঠলে পাঠান এসে ইসমাইলকে জড়িয়ে ধরল "আপনার এই পবিত্র আওয়াজ গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ুক মিয়াঁ। আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই করি। কালকে যেন একজন মানুষও আপনার গুলিতে বেঁচে থাকতে না পারে। প্রতিটা মানুষ, যার দিকে আপনি চোখ দেবেন, সেই যেন ঝাঁঝরা হয়ে যায় আপনার গুলিতে। কাফেরদের অপবিত্র ভূমি তাদের রক্তেই পবিত্র হোক। ইনশাল্লাহ"।

ইসমাইল একটা জ্যাকেট বের করল। মন দিয়ে তার ওপরে একটা সার্কিট বসাতে শুরু করল। পাঠান অবাক গলায় বলল "আপনি বাঁচার চেষ্টা করবেন না?"

ইসমাইল আবেগঘন গলায় বলল "বাঁচার চেষ্টা করে ডরপোকরা। আমি ডরপোক নই। আল্লাহর খাস বান্দা। গোটা দুনিয়া আমার নাম জানবে, আর তার আওয়াজ সূর্য চাঁদ অবধি পৌঁছে যাবে"।

পাঠান দু হাত তুলে উপরের দিকে নির্দেশ করে বলল "আমার এদেশে আসা সার্থক হয়েছে। এত দিন থাকাও। মৌলবী সাহেব ঠিকই বলেছিলেন, আমার কাছে শের আসবে। শের আপনি। আপনি পারবেন, আমি জানি"।

ইসমাইল জ্যাকেটের সার্কিট ঠিক করার চেষ্টা করতে শুরু করল।

স্যাটেলাইট ফোন আবার বাজতে শুরু করেছে।

ইসমাইল বিরক্ত গলায় পাঠানকে বলল "ফোনটা ধরুন। নইলে এরা শান্তিতে কাজ করতে দেবে না"।

পাঠান ফোন রিসিভ করল। "সালাম ওয়ালাইকুম"।

ওপাশ থেকে উত্তেজিত গলা ভেসে এল "ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইসমাইল কোথায়?"

পাঠান ইসমাইলের দিকে তাকাল। ইসমাইল আঙুল দিয়ে পাঠানকে মিথ্যা বলতে বলল।

পাঠান বলল "উনি বেরিয়েছেন"।

"বেরিয়েছে মানে কী? কোথায় বেরিয়েছে?" ওপাশের গলার উত্তেজনা একটুও কমল না।

পাঠান বলল "এই বাউন্ডারিতেই আছে। কোন কিছু বলতে হবে?"

"হবে। ওকে বল সব জায়গা থেকে নির্দেশ এসেছে। কিছুতেই যেন কালকের মিশনে ও না যায়। কিছুদিন তোমার সঙ্গেই থেকে কাশ্মীরে ফিরে যায়। আমরা নতুন তারিখ বলব খুব তাড়াতাড়ি। আই রিপিট, ইসমাইল যেন কিছুতেই এই মিশনে না এগোয়। শুনতে পাচ্ছ?"

পাঠান ফোনটা কেটে দিয়ে ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে বলল "মিশন অ্যাবর্ট করতে বলছে"।

ইসমাইল শিষ দিতে দিতে জ্যাকেটে বোমা পরাতে লাগল। পাঠানকে বলল "পানির ব্যবস্থা কর মিয়াঁ। অনেকটা পানি খেতে হবে। বুকটা কাফেরদের রক্তের জন্য পিপাসার্ত হয়ে উঠছে"।

পাঠান মাথা নাড়ল "জরুর। আমি এখনই নিয়ে আসছি"।

সিঁড়ি বেয়ে পাঠান উপরে উঠল।

কয়েক মিনিট পরে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আশরফ খান আর বীরেন। ইসমাইল বুঝতেও পারে নি প্রথমে, ভাবতেও পারে নি সুদূর কল্পনাতেও। তড়িঘড়িতে নামতে গিয়ে বীরেনের পা সিঁড়িতে জোরে শব্দ করা মাত্র ইসমাইল সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রিভলভার তুলতে যাচ্ছিল। খান তৈরী ছিলেন, সিঁড়ি থেকেই নিখুঁত নিশানায় ইসমাইলের ডান হাতে গুলি করলেন। ইসমাইল ছিটকে পড়ে গেল।

খান সিঁড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে ইসমাইলের কলার জোরে চেপে ধরে মুখে সজোরে একটা ঘুষি মারলেন।

ইসমাইল যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। খান হাসিমুখে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল "ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স। এনি ডে এদের আমাদের থেকে এগিয়ে রাখে। তাই না বীরেন? দেখে নাও, এই জানোয়ারটাই রেহানকে খুন করেছিল। এই আমাদের জওয়ানদের খুন করেছে। ধর্মের নামে এরা লজ্জা। ইসলাম এদের বর্জন করে, এই মানবতার শত্রুদের ঘেন্না করে।"

ইসমাইল যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে জোরে হেসে উঠল। খান রিভলভারের বাট দিয়ে ইসমাইলকে মারতে যাবেন, এমন সময় বীরেন খানের মাথায় রিভলভার তাক করে বলল "ওকে যেতে দিন স্যার"।

৭৪

বাইরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে। তুষার জানলা খুলে দিলেন। আশরফ একটু আগেই জানিয়েছেন কাদরী সব উগড়ে দিয়েছেন। ক্যানাল রোডে ইসমাইলের গোপন আস্তানার লোকেশনও পাওয়া গেছে।

তুষারের অস্থির লাগছিল। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল। ইরাবতীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তুষার অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরের রাস্তায় দুয়েকটা গাড়ি যাচ্ছে কেবল। পথের কুকুরেরা তাকে দেখে দৌড়ে এল। তুষার ভয় পেলেন না। তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন। দেখা গেল কুকুরগুলো তাকে আর তেড়ে এল না। তুষার রাস্তায় হাঁটতে লাগলেন। কুকুরগুলো তার পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

নিজের অজান্তেই তার হাত ফোনের দিকে চলে যাচ্ছিল। খানের ফোনের অপেক্ষা করছেন তিনি। খানিকটা তাকে চমকে দিয়েই ফোনটা বেজে উঠল। তুষার তড়িঘড়ি ফোন বের করে দেখলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফোন করছেন। বিরক্ত হলেন, তবু ধরলেন "বলুন স্যার। ঘুমান নি?"

মন্ত্রী হাসলেন "ঘুম কি শুধু আপনার উড়বে তুষার? আমরাও তো মানুষ, না কি? গোল্ডেন টেম্পলে এত সেনা নামিয়েছেন আপনারা। আমার তো প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। শুধু সেখানে সেনা ঢোকানোর অপরাধে একজন প্রাইম মিনিস্টার খুন হয়ে গেলেন। আপনারা যা করছেন, ভেবে করছেন তো? পি এম কিন্তু সব খবর রাখছেন"।

তুষার সবটা মন দিয়ে শুনে বললেন "স্যার, আপনার কাছে হয়ত ঠিক ঠাক বার্তা পৌছয় নি, আর্মি মন্দিরে কোথাও ঢোকে নি, শুধু অমৃতসরের ওপর থ্রেট আছে বলে ওই চত্বরটা ঘিরে রেখেছে। আপনি বুঝতেই পারছেন, যদি টেম্পলে কোন রকম আঘাত আসে তাহলে সমস্যাটা আরও অনেকটাই বেড়ে যাবে"।

মন্ত্রী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন "উই আর ওয়ারিড তুষার। প্লিজ কিপ আস আপডেটেড। বেস্ট অফ লাক"।

ফোনটা কেটে গেল। তুষার ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলেন আর কোন নাম্বার থেকে ফোন এসেছিল নাকি। হাঁটতে হাঁটতে আবার অফিসের গেটের কাছে এলেন। কুকুরগুলো তাকে লক্ষ্য করে আসছিল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। তুষার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের বললেন "বিস্কিট আছে আমার চেম্বারে। নিয়ে যাও কেউ। এদের দাও"।

একজন নিরাপত্তারক্ষী তার পেছন পেছন এল। তুষার খালি পেটে থাকতে পারেন না বলে বিস্কুটের কৌটো রাখেন। যে এসেছিল তার হাতে দিয়ে দিলেন কৌটোটা। জানলা দিয়ে দেখলেন কুকুরগুলোকে বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। তারা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সে বিস্কুট খাচ্ছে।

তুষার খানিকক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে দুটো চেয়ার সামনা সামনি রেখে একটা চেয়ারে বসে আরেকটা চেয়ারে পা রাখলেন। চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করলেন, তার ফোন বেজে উঠল। তুষার চমকে উঠে ফোনটা ধরলেন "হ্যালো"।

“স্যার, সায়ক বলছি”।

সায়কের গলা উত্তেজিত। তুষার হাসলেন “কোন কোড বললে না সায়ক? কী ব্যাপার?”

“স্যার, আমি লাহোরের ট্রেনে আছি। আপনি আমাকে শুধু বলুন আমাদের ডিপার্টমেন্টে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে নতুন রিক্রুট কে হয়েছে?”

তুষার সোজা হয়ে বসে বললেন “বীরেন। হি ইজ এ গ্রেট ফাইটার। ওই তো গেছে আশরফের সঙ্গে”।

“স্যার, বীরেন রাজাকারের ছেলে। পাকিস্তানি স্পাই। আশরফের সঙ্গে গেছে মানে? কোথায় গেছে?”

তুষার চেঁচিয়ে উঠলেন “কী সব বলছ তুমি? নরম্যাল মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে। আশরফকে তো ওই বাঁচিয়েছিল। ও কেন স্পাই হতে যাবে? তোমার কোড ভাঙতে কোন প্রবলেম হয়েছে সায়ক”।

সায়ক বলল “আমার কোন ভুল হয় নি স্যার। অপারেশন ব্লু ফ্লাওয়ারে আফসানা সাইদের কম্পিউটারে সবার আগে এই ছেলেটির নামই লেখা আছে। এর বাবার নাম মুদসসর নওয়াজ খান। রাজাকার ছিল। ইন্ডিয়াতে ঘাপটি মেরে ছিল। নিজের ছেলেকে কুরবান করেছে মুদসসর। হাসান মাকসুদ ঠিক সময়ে একে মিশনে পাঠিয়েছিল। প্ল্যান ছিল একে দিয়েই একটার পর একটা সিরিয়াল ব্লাস্ট করানো হবে”।

সায়ক গড়গড় করে বলে যাচ্ছিল। তুষার ফোনটা পাশে নামিয়ে রেখে অস্ফুটে বললেন “হোয়াট আ শেম”!

৭৫

পাকিস্তানি সময় রাত তিনটে।

ইসলামাবাদের শাহ ইমামের মসজিদের সামনে প্রেসিডেন্টের গাড়ি যখন দাঁড়াল। নিয়াজি গাড়ি থেকে নামলেন। সঙ্গে মুস্তাকিন শাহরিয়র।

নিয়াজির নিরাপত্তারক্ষীরা তাড়াতাড়ি এসে তার পাশে দাঁড়াল। নিয়াজি বললেন “মসজিদের দরজা কখনও বন্ধ করতে নেই এরা জানে না? মসজিদের দরজা খোলাও”।

নিরাপত্তারক্ষীরা চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। নিয়াজি জোরে চেঁচালেন “যা বলছি কর, মসজিদের দরজা খুলতে বল। নইলে ভেঙে দাও”।

দুজন এগিয়ে দরজা ধাক্কা দিল। সুনসান রাস্তাঘাট। শীতল হাওয়া ভেসে আসছে কোথা থেকে। শাহরিয়র বললেন “এখানে কী আছে জনাব?”

নিয়াজি তীব্র দৃষ্টিতে শাহরিয়রের দিকে তাকিয়ে বললেন “আপনার বিদেশী ডিগ্রি নিয়ে কোন লাভ হয় নি মিস্টার শাহরিয়র। লজ্জা করুন নিজের ওপর। আপনি আই এস আই চিফ?”

শাহরিয়র ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে গেলেন। মসজিদের দরজা একটু ফাঁক হল।

একটা মাথা বেরিয়ে এসে বলল “জি”।

নিয়াজি এগিয়ে গিয়ে বললেন “প্রেসিডেন্ট সাহাব এসেছেন। দরজা খোল”।

ও প্রান্তে খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। পরক্ষণেই দরজা খুলে গেল। নিয়াজি শাহরিয়রের দিকে তাকিয়ে বললেন “আসুন”।

দরজা খোলার পর দেখা গেল মূল মসজিদের পাশে একটা ছোট করিডর মত আছে। নিয়াজি সরাসরি সে করিডর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। বাকিরা তার পিছন পিছন।

খানিকটা গিয়ে একটা সিঁড়ি পড়ল নিচে নামার। অদৃশ্য কেউ যেন সিঁড়ির আলো জ্বালিয়ে দিল। নিয়াজি নেমে গেলেন। পিছন পিছন সবাই।

একটা দরজা পড়ল। সার দিয়ে লোক শুয়ে ছিল।

নিয়াজিকে দেখা মাত্র সবাই উঠে পড়ল।

নিয়াজি শাহরিয়রের দিকে তাকিয়ে বললেন "জনাব আই এস আই চিফ, চিনে রাখুন, লস্করের ইসলামাবাদ ব্রাঞ্চ"।

শাহরিয়র খানিকটা চমকে উঠে বললেন "আমি শুনেছিলাম এই ব্যাপারে জনাব। ডিটেলস নিতাম শিগগিরি"।

নিয়াজি শাহরিয়রের কথা যেন শুনলেনই না এমন ভঙ্গি করে একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন "মৌলবী সাহেব কোথায়?"

ছেলেটির বয়স আঠেরোও হয় নি। নিয়াজির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে মৌলবি সাহেবের ঘর দেখিয়ে দিল।

নিয়াজি মৌলবির ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় নক করলেন। দরজা খুলে গেল।

মৌলবি নিয়াজীকে দেখে নতজানু হয়ে বললেন "আসুন জনাব, আসুন"।

নিয়াজি মৌলবির দিকে তাকিয়ে বললেন "ইসলামাবাদে আপনাদের কেন আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে আপনার সম্যক ধারণা আছে আশা করি"।

মৌলবি চিন্তিত মুখে বললেন "জরুর জনাব। আপনি এ কথা কেন বলছেন জনাব?"

নিয়াজি বললেন "ফারমান আলী সম্পর্কে আমাকে কেন জানানো হয় নি?"

মৌলবি হাত নাড়িয়ে বললেন "প্রেসিডেন্ট সাহেব এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে জানবেন না, আমি ভাবতেই পারি নি জনাব। যদি কোন রকম গুস্তাখি করে থাকি, মাফ করে দেবেন জনাব"।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড মৌলবির দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনারা কাল সকালের মধ্যে ইসলামাবাদ ছাড়বেন। যদি না ছাড়েন, কুকুরের মত গুলি করে মারা হবে আপনাদের প্রত্যেককে"।

মৌলবির দু চোখ একবার জ্বলেই নরম হয়ে গেল "জনাব, আমাদের ওপর এত রেগে আছেন কেন যদি একবার জানতে পারতাম"।

নিয়াজি বললেন "ইসমাইলের ওপর আমরা কন্ট্রোল চেয়েছিলাম, আপনারা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন"।

মৌলবি বললেন "জনাব, ইসমাইলের ওপর আমাদেরই কন্ট্রোল নেই। আমরা ওকে মিশন ক্যান্সেল করে কাশ্মীরে ফিরতে বলছি, কোন উত্তরই দিচ্ছে না। ওর জন্য আমাদের কেন শাস্তি দেবেন জনাব?"

নিয়াজি মৌলবির চোখে চোখ রেখে বললেন "অপারেশনের ব্লু ফ্লাওয়ারের সম্পর্কে আমরা কেন কিছু জানতে পারি নি? কেন জানান নি? আপনি জানতেন না আমার গাড়িতে বম্ব ব্লাস্ট হতে পারে?"

মৌলবি কান ছুঁয়ে তওবা তওবা করে বলল "জনাব, আমি যদি এত কিছু জানতাম তাহলে কি আর আমাদের আপনার শরণাপন্ন হতে হত? আমরা তো আপনার আশ্রয়েই আছি। আপনি তাড়িয়ে দিলে চলে যেতে হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নেমকহারামি আমি অন্তত করি নি"।

নিয়াজি ক্রুদ্ধ গলায় বললেন "তাহলে কে করেছে?"

মৌলবি বললেন "জনাব লস্কর বরাবর আপনার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। আমরা আপনাদের থেকে উপকৃত। কেন খামোখা আপনাকে..."

কথা শেষ না করেই মৌলবি রিভলভার বের করলেন জ্যাকেটের পকেট থেকে। নিয়াজি তৈরী ছিলেন। পকেট থেকে রিভলভার বের করে মৌলভীর বুকে পর পর চারটে বুলেট ছুড়লেন। সশব্দে প্রতিধ্বনিত হল আওয়াজ। নিয়াজির নিরাপত্তারক্ষীরা আগেই পজিশন নিয়ে নিয়েছিল। মৌলবীর লোকেরা উঠতেও সাহস পেল না।

নিয়াজি রিভলভার পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন "শেয়ালকে কুকুর ভেবে কখনও পুষতে নেই মিস্টার শাহরিয়র। এই সব ক'টাকে আটক করে জেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা করুন। ফারমান আলীর খোঁজ লাগান, যেখানে পাবেন, যেন কুকুরের মত গুলি করে মারা হয়। নো মার্সি। দেশে এই মুহূর্ত থেকে এক্সট্রিম

এমারজেন্সি লাগু করুন। যে কজন জেনারেল প্রেসিডেন্টের এগেইন্সটে অভ্যুত্থানের প্ল্যান করেছিল, তার লিস্ট পেয়ে যাবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। প্রত্যেকের কোর্ট মার্শাল হবে আজ রাতেই। কেউ যেন কাল ভোরের আলো দেখতে না পায়"।

ঠান্ডা গলায় কথাগুলো বলে প্রেসিডেন্ট নিয়াজি মৌলবীর শরীরে একটা লাথি মেরে বাইরের দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

৭৬

খান অবাক হয়ে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "মানে?"

বীরেনের হাত কাঁপছিল। তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না সে কী করছিল।

সে কোন মতে বলল "ছেড়ে দিন স্যার। ও চলে যাক। সেফ প্যাসেজ দিন। রিভলভারটা ফেলুন নইলে আমাকেই আপনাকে শ্যুট করতে হবে"।

আশরফ খান বীরেনের দিকে অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে বললেন "তুমি..."

ইসমাইল শুয়ে থাকা অবস্থাতেই চেঁচিয়ে উঠে বলল "পাকিস্তানি। শাবাস জুনিয়র মুদসসর নওয়াজ খান। ইউ হ্যাভ ডান ইট। নাও হিট হিম। হিট হিম হার্ড"।

বীরেন আশরফের দিকে তাকাল "রিভলভারটা ফেলুন স্যার। ছুঁড়ে ফেলুন, প্লিজ"।

আশরফের অবিশ্বাস যাচ্ছিল না। সে রিভলভারটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে বলল "তাহলে সেদিন তুমি আমায় বাঁচালে কেন? ওদিন তো আমায় মেরে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল"।

বীরেন বলল "প্লিজ স্যার। এত কথা শোনার সময় নেই আমার। আপনি ওকে সেফ প্যাসেজ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন"।

ইসমাইল খানিকটা গড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল "তিনজন আছি আশরফ খান। তিনজনের শরীরেই বইছে এমন রক্ত যারা গোটা দুনিয়াকে পায়ের তলায় ফেলে রাখতে চায়। এই যে ছেলেটিকে নিয়ে আপনি আমাকে মারতে এসেছেন, ও জানত না যে, শুরু থেকেই ও আমাদের সঙ্গে আছে। ফসল হবার জন্য যখন বীজ বোনা হয়, তখন কি জানা যায় সব ফসল থেকেই ফল পাওয়া যাবে নাকি? আমরা কিন্তু জানতাম মুদসসর নওয়াজের ছেলে বেইমান হতে পারে না। রক্ত কথা বলে অফিসার। এই ছেলেটির রক্ত যেমন বলেছে। কোকিলের বাচ্চা যেমন কাকের বাসায় বাড়ে, জুনিয়র মুদসসরও তেমনই আপনাদের বাসায় বেড়েছে। এবার আপনাকে অফিসিয়াল অফারটা দি। চলে আসুন আমাদের সঙ্গে। কেউ জানবে না। আমাকে সেফ প্যাসেজ দিন। আপনি শুধু আমাদের ইনফরমেশন দিয়ে যাবেন। যা চাইবেন, তাই দেব আপনাকে আমরা। জন্নত যেতে চাইলে মরতে হবে না, এই দুনিয়াতেই নামিয়ে আনব জন্নত আপনার জন্য। কাল সকালের মধ্যে আমাকে এল ও সি পৌঁছে দিন"।

আশরফ গর্জে উঠে বললেন "কোন দিন না। তোরা শুধু ভারতের শত্রু না, তোরা গোটা মানবতার শত্রু। সেফ প্যাসেজ তো দূরের কথা, যারা নিরীহ মানুষদের মেরে ভাবে জন্নত যাবে, তাদের আমি জাহান্নামে নিয়ে যাব। আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই তোকে এ দেশ ছেড়ে পালাতে দেব না"।

ইসমাইল জোরে হেসে উঠে বলল "কে পালাতে চেয়েছে? আমি তো চাইনি। আমি চেয়েছি আপনার দেশ থেকেই আমার অভীষ্ঠ উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে। আপনাকে অফার দিয়েছিলাম, আপনি নিলেন না। আমার আর কিছু করার নেই। সরি আশরফ মিয়াঁ। জানি না জন্নতের ভারত পাকিস্তান আছে কি না, যদি থেকে থাকে, তবে সেখানেই দেখা হবে। আলভিদা। বীরেন, শ্যুট হিম"।

বীরেন আশরফ খানের দিকে বন্দুক তুলল।

ইসমাইল জোরে প্রার্থনা করা শুরু করল। আশরফ খান হাসিমুখে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "শ্যুট বীরেন। ভাল থেকো"।

বীরেনের বন্দুকের নিশানার সামান্য পরিবর্তন হল। ইসমাইলের মাথায় পরপর তিনটে গুলি করল বীরেন। প্রার্থনা করতে করতেই কাটা কলাগাছের মত পড়ে গেল ইসমাইল।

বীরেন হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে কেঁদে ফেলল।

আশরফ খান বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "বন্দুকটা দাও"।

বীরেন আশরফ খানের দিকে রিভলভারটা এগিয়ে দিল। আশরফ ইসমাইলের শরীরে বাকি বুলেটগুলোও বসিয়ে দিয়ে বললেন "রেহান তোমাকে তার জন্নত থেকে চকলেট পাঠিয়েছে বীরেন। আর এই জানোয়ারটার জাহান্নামেও জায়গা হবে না। জাহান্নামে মানুষের বাচ্চারা যায়। এই টেরোরিস্টের বাচ্চা, নিরীহ মানুষদের খুন করতে যাদের হাত কাঁপে না, তারা যায় না"।

বীরেন ধরা গলায় বলল "আমার বাবা..."

আশরফ বীরেনকে জড়িয়ে ধরে তুলে ধরে বললেন "আমরা বুঝে নেব। ভেবো না। ইউ আর এ হিরো বীরেন। আমাদের দেশ, সরি তোমার দেশ তোমাকে স্যালুট জানায়"।

বীরেন কিছু বলার আগেই সিঁড়ি বেয়ে একদল সেনা নেমে এসে বীরেনের দিকে রাইফেল তুলে বলল "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট"।

আশরফ হো হো করে হেসে উঠে বললেন "নিশ্চয়ই তুষার স্যার পাঠিয়েছে। হায় হায়। এবারে স্যার লেট করে ফেললেন। বাই দ্য ওয়ে, সবাই বাইরে যাও। চা বানাও। মালাই চা খাব। ভোর হয়েছে। এখন এসব নাটক আর ভাল্লাগে না"।

৭৭

জ্যোতির্ময়কে অন্ধকার ঘরে একলা বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

তুষার ঘরের আলো জ্বেলে জ্যোতির্ময়ের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে বললেন "এই জীবনটা কেমন লাগছে মিস্টার মাকসুদ? ভাল লাগছে? অন্ধকার ঘরে বসে আছেন একা একা! স্ত্রীকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক ছেলে, সেও মৃত। গোটা পরিবার আপনার অস্তিত্বটাকেই ঘেন্না করে। কেমন লাগছে এই জীবনটা?"

জ্যোতির্ময় তুষারের চোখের দিকে না তাকিয়ে বললেন "আমার হাজার হাজার সহকর্মী এভাবেই বেঁচে আছে। তাদের কষ্টের তুলনায় আমার কষ্ট কিছুই নয়"।

তুষার পায়ের ওপর পা তুলে বসে বললেন "আপনার সহকর্মীরা আমার স্ত্রীর ওপরে গুলি চালিয়েছিল, যার সঙ্গে আপনাদের দূর দূরান্তের কারো কোন সম্পর্ক নেই। একটার পর একটা সিরিয়াল ব্লাস্টে অসংখ্য গরীব মানুষ আপনারা মেরেছেন যার মধ্যে মুসলিমরাও আছে। এ দেশের অসংখ্য মুসলিম সর্বক্ষণ সিটিয়ে থাকেন, কখন আপনারা কোথাও একটা বিস্ফোরণ করবেন, আর তাদের শুনতে হবে তারা সন্ত্রাসবাদী..."

জ্যোতির্ময় বললেন "আমার স্ত্রীর ওপরেও আপনারা অত্যাচার করেছেন যার সঙ্গে দূর দূরান্তেও আমাদের কাজের কোন সম্পর্ক ছিল না"।

তুষার বললেন "হ্যাঁ এবং তার পরে তাকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সব থেকে ভাল চিকিৎসা দেওয়ার পর নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছে। আপনার প্রভুদের মত কোন স্টেডিয়ামে রেখে চারদিক থেকে পাথর ছুঁড়ে মারা হয় নি"।

জ্যোতির্ময় উত্তেজিত হয়ে বললেন "বার বার আমার প্রভুদের মত কথাটা বলবেন না। আমার কোন প্রভু নেই। আমি স্বাধীন। আমি যে পথ বেছে নিয়েছি, তা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়"।

তুষার হাসতে হাসতে বললেন "আপনার প্রয়োজন ওদের কাছে ফুরিয়েছিল মিস্টার মাকসুদ। ওরা ভয়ে পেয়েছিল, যদি আপনি ওদের সম্পর্কে সব উগড়ে দেন। আপনাকে মারতে আপনারই তৈরী অত্যাধুনিক

মোবাইল বম্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছিল। কত শুভাকাঙ্খী আপনার ওরা"।

জ্যোতির্ময় স্থির চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমি ওদের আর কোন ভাবে সাহায্য করতে পারতাম না। ওরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আমার তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে"।

তুষার পকেট থেকে একটা আপেল বের করে চিবোতে চিবোতে বললেন "সেটা ঠিক। একটা শেয়াল ডাকলে সব শেয়ালই ডাকে। জেহাদী মানেই তাই"।

জ্যোতির্ময় হো হো করে হেসে উঠে বললেন "সিরিয়াল ব্লাস্টের মত। একজায়গায় হলে সব জায়গায় পর পর হতে থাকে। ঠিক না?"

তুষার শব্দ করে আপেল খেতে খেতে বললেন "একদম তাই। তবে কী জানেন তো, যে পথ আপনারা নিয়েছেন তাতে অন্যের ঘর পোড়াতে গিয়ে নিজের ঘরও পুড়ে যায়। কেউ যখন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে তখন প্রথমে ধর্মে করে, তারপর ধর্মের ভেতরে করে। ভেদাভেদটাই তখন রাজনীতি, সেটা না থাকলে সব কিছু মিথ্যা হয়ে যায়। এদেশে হিন্দু মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ দলিত, ইসলামী দেশগুলোতে তেমনই শিয়া সুন্নী। এভাবে মানুষে মানুষে ভাগ করতে করতে একদিন মানুষেরাই সব শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য সেটাই মঙ্গল। কী হবে বলুন দেখি মানুষের বেঁচে থেকে। পৃথিবীটাকে নোংরা করে, বাকি প্রাণীদের বসবাস অযোগ্য করা ছাড়া মানুষ তো আর কিছু করে নি। আপনি শিক্ষিত মানুষ, কাশ্মীরীদের জন্য আপনার প্রাণ কেঁদে আকুল হয়ে যাচ্ছে, অথচ এই কাশ্মীরীদেরই হিউম্যান শিল্ড হিসেবে সব থেকে বেশি ব্যবহার করেন আপনারা"।

জ্যোতির্ময় বললেন "স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান জরুরি"।

তুষার হাসতে হাসতে বললেন "তাই বুঝি? তা আত্মবলিদান যে জরুরি সেটা ওদেরই ঠিক করতে দিতে পারতেন তো। তা তো করছেন না। নিজেরাই পরিস্থিতিটা আরও জটিল করে তুলছেন"।

জ্যোতির্ময় বললেন "যাই বলুন, কাশ্মীর একদিন আজাদ হবেই"।

তুষার হাসি থামিয়ে বললেন "দারিদ্র থেকে আজাদ হবে? সন্ত্রাসবাদ থেকে? হিংসা থেকে? জঙ্গি সংগঠনগুলোর আরোপিত বাধা নিষেধ থেকে আজাদ হবে? যদি হয়, সেদিন আপনার সঙ্গে আমিও কাশ্মীরের আজাদি চাইব। কথা দিলাম'।

জ্যোতির্ময় বললেন "আমাকে একা থাকতে দিন। আর বকতে ভাল লাগছে না"।

তুষার দাঁড়িয়ে বললেন "আপনাকে আর বকতে হবেও না বেশিদিন। কাল ভোরটা আপনার আর দেখা হবে না মিস্টার মাকসুদ। আপনি যার কাছে যেতে চান, আমরা আপনাকে তার কাছেই পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। তৈরী হন। আমাদের কাছে আপনার প্রয়োজন ফুরিয়েছে"।

জ্যোতির্ময় চমকে উঠে বললেন "এটা আপনারা করতে পারেন না। মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে। এই দেশের নাগরিক হিসেবে আমার পূর্ণ অধিকার আছে একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলার"।

তুষার আপেলটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে বললেন "যারা নিরীহ মানুষদের মারার জন্য প্ল্যান করে, আমরা তাদের মানবাধিকার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি মিস্টার মাকসুদ। এ দেশ আপনার মত নাগরিকদের ডিজওন করে। তৈরী হোন। ডোন্ট ওরি। ইট উইল বি আ সাইলেন্ট ডেথ"।

জ্যোতির্ময় কয়েক সেকেন্ড তুষারের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে বললেন "গো টু হেল"।

তুষার হেসে বললেন "ক্ষতি নেই। জন্নত যাবার জন্যই এসব করছিলেন তো। দেখুনই না, কীভাবে আপনাকে অভ্যর্থনা করা হয়। গুড বাই হাসান মাকসুদ। এ শেম টু হিউম্যানিটি"।

৭৮

শ্রীনগরের অফিসে বসে কাজ করছিলেন মাথুর। হামিদ বললেন "স্যার আসব?"

মাথুর হাসিমুখে বললেন “নিশ্চয়ই। আবার পারমিশন নেওয়ার কী হয়েছে? আপনারই তো অফিস। আপনিই থাকবেন। আমাকে তো আবার দিল্লি ফিরতে হবে। বসুন, বসুন”।

হামিদ মাথুরের সামনের চেয়ারে বসে বলল “ইসমাইল নিকেশ হয়েছে খবরটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি স্যার। এই ধরণের লোকেরা শুধু ভারতের জন্য না, কাশ্মীরের জন্যও ক্ষতিকারক। কিন্তু প্রফেসর কাদরীর জন্য খারাপ লাগছে। শিক্ষিত মানুষেরাও কীভাবে ভুল আদর্শে চালিত হয়ে যাচ্ছে...”

হামিদ দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়লেন।

মাথুর একটু চুপ করে থেকে বললেন “সবটা দোষ কাশ্মীরীদের উপর দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তভাবে বসে থাকতে পারি না বোধ হয়। আমার রিপোর্টেও তাই থাকছে। উই শুড বি মাচ মোর সিমপ্যাথেটিক টু দ্য কাশ্মীরি পিপল। এই দেশটা তাদেরও। ইস্তিয়াক...”

মাথুর কথাটা শেষ করতে পারলেন না একজন পিওন এসে খবর দিল মাথুরের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে। মাথুর তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে বললেন। মিনিট খানেক পরে ইস্তিয়াক এসে দাঁড়াল। মাথুর হাসিমুখে বললেন “আরে কী সারপ্রাইজ ইস্তিয়াক, আমি হামিদসাহেবকে তোমার কথাই বলছিলাম। এসো এসো”।

ইস্তিয়াক মাথুরের চেম্বারে প্রবেশ করল। হামিদকে মাথুর বললেন “হামিদ সাহেব, ইস্তিয়াক না থাকলে হয়ত আজ গোটা দেশে আগুন জ্বলত। ও যদি আমাকে ওয়াজুরা গ্রামে নিয়ে না যেত তাহলে ইসমাইলের মিশন সফল হত, সেটা যে কী হত, ভাবাও যাচ্ছে না”।

ইস্তিয়াক বলল “স্যার দুঃখজনক হলেও সত্যি, বেশিরভাগ কাশ্মীরীই এখন ইসমাইলের মৃত্যুর খবরে দুঃখিত। তারা খুশি হয় নি। ইসমাইলদের এরা সমর্থন করে”।

মাথুর হামিদের দিকে তাকিয়ে বললেন “হামিদ, গাড়ি বের করুন। একজনের বাড়ি ঘুরে আসা যাক। এসো ইস্তিয়াক”।

তিনজনে বেরোলেন।

মাথুর ড্রাইভারকে গন্তব্যের কথা বললেন। গাড়ি স্টার্ট নিল। ডাল লেকের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। উপদ্রুত হবার জন্য শ্রীনগরে পর্যটক খুবই কম। দোকানীদের মুখ শুকনো।

মাথুর বললেন “পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে সবার আগে”।

ইস্তিয়াক বলল “আফস্পা প্রত্যাহার করুন। স্বাভাবিক হয়ে যাবে”।

মাথুর ইস্তিয়াকের দিকে তাকিয়ে বললেন “ইশক মোহাব্বত সম্পর্কে ধারণা আছে তো ইস্তিয়াক? কখনও কারো সঙ্গে ইশক করেছো?”

ইস্তিয়াক ঘাবড়ে গিয়ে বলল “না মানে করি নি, তবে ধারণা আছে”।

মাথুর বললেন “তোমার আর তোমার মাশুকার মধ্যে ঝামেলা হচ্ছে। এই সময় যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি এসে ক্রমাগত তোমার মাশুকাকে উস্কিয়ে যায় তাহলে তোমাদের সম্পর্কটা কোনদিন স্বাভাবিক হবে না। ঝামেলা লেগেই থাকবে। কাশ্মীর আর ভারতের সম্পর্কটা এখন ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে। পরিস্থিতি যতবার স্বাভাবিক হবে, আফস্পা প্রত্যাহারের পরিস্থিতি আসবে, পাকিস্তান ঠিক সেটাকে বিগড়ে দেওয়ার জন্য উস্কানি দেবে। আমি মানছি আমাদের সরকারের আরও সংবেদনশীল হওয়া উচিত, অবশ্যই হওয়া উচিত, কিন্তু পাকিস্তানের ইন্ধনকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না। কাদরীর মত শিক্ষিত লোকেরা ইসমাইলদের মত জানোয়ারদের কেন সাহায্য করবে বল তো? এত রাগ আমাদের ওপরে?”

গাড়ি গন্তব্যে এসে পৌঁছল। রেহান খানের বাড়ি। মাথুর বললেন “আমি ভেতরে যাচ্ছি। হামিদ সাহেব আর ইস্তিয়াক চাইলে আসতে পারেন”।

দরজায় বেল বাজালেন মাথুর। রেহানের মা দরজা খুললেন। মাথুর রেহানের মায়ের পা ছুঁয়ে বললেন “চিনতে পারছেন মা জী?”

রেহানের মা বললেন "ভেতরে এসো"।

সবাই ভেতরে গেলেন। ড্রয়িং রুমের দেওয়ালে রেহান খানের ছবি রাখা। মাথুর কয়েক সেকেন্ড সে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন "ইসমাইলকে তোমার কাছেই পাঠিয়েছি রেহান। ছেড়ো না ওখানেও"।

রেহানের মা চায়ের ব্যবস্থা করতে ভেতরে গেছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন "আপনারা কি কোন কাজে এসেছেন?"

মাথুর হেসে বললেন "হ্যাঁ, আপনার খোঁজ নিতে এসেছিলাম। আপনি ভাল আছেন তো?"

রেহানের মা কেঁদে ফেললেন। সবাই চুপচাপ বসে রইল তাকে ঘিরে।

৭৯

ওয়াঘা সীমান্তে তীব্র রেষারেষি চলছে নিউজ চ্যানেলগুলোর। বি এস এফের আধিকারিক প্রমোদ ভাট প্রবল রেগে রয়েছেন। তাদের দেওয়া বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করেই চ্যানেলগুলোর প্রতিনিধিরা মনের সুখে যত্র তত্র বিচরণ করছে। প্রমোদ ঠিক করেছেন একটা সময় অবধি দেখবেন, তার পরে লাঠি চার্জের অর্ডার দেবেন। তাতে নিউজ চ্যানলগুলো তাকে ভিলেন বানাবে ঠিকই কিন্তু এই মুহূর্তে আইন শৃঙ্খলা সামলাতে লাঠি চার্জ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

বসন্তের দুপুর। মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে বটে, কিন্তু গরম আছে। ট্যুরিস্টরা কাতারে কাতারে ভিড় জমাচ্ছে। এত ট্যুরিস্টকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না দর্শক গ্যালারিতে। দর্শক গ্যালারি পূর্ণ হয়ে গেলে বাকিরা বাইরের বড় স্ক্রিণে দেখবে।

এক চ্যানেলের প্রতিনিধি ক্যামেরার সামনে লাফাতে শুরু করল "আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ভারত সরকারের তীব্র চেষ্টা এবং চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পাকিস্তান শেষ অবধি ভারতীয় নাগরিক আব্বাসকে সসম্মানে রিলিজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন আব্বাসের ওপর ভারতীয় স্পাই হবার আরোপ ছিল, আদতে তিনি ব্যবসার কাজে পাকিস্তানে গেছিলেন"।

আব্বাসের পরিবার এসেছে। তাদের সযত্নে ভি আই পি গ্যালারিতে বসানো হয়েছে। বক্সে দেশপ্রেমের গান বাজানো হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভারতীয় পতাকা নিয়ে মনের আনন্দে খেলছে।

পাকিস্তানী গ্যালারিতেও আজ প্রচুর মানুষ। বেশিরভাগ মানুষই আব্বাসকে ফিরিয়ে দেওয়ার তীব্র বিরোধী। মাঝে মাঝেই তারা ভারত বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে। এদের মধ্যেই একজন পাঠান পোশাক পরিহিত মানুষ চুপ করে বসে আছে। তার মনের ভেতরে কী চলছে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

লাহোর থেকে আব্বাসকে নিয়ে কনভয় ওয়াঘা সীমান্তে পৌঁছেছে। বিভিন্ন রকম সরকারী কাগজপত্রে আব্বাসকে সই করানো হচ্ছে। আব্বাসের হাত ভাঙা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন। হাতের চিকিৎসা করা হয়েছে। সামনের দুটো দাঁত সাড়াশি দিয়ে তোলা হয়েছে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও আব্বাসের মুখ থেকে আই এস আই এবং পাকিস্তানী আর্মি কিছুই বের করতে পারে নি।

পাকিস্তানের বিভিন্ন টিভিতে প্রেসিডেন্ট নিয়াজীর বক্তব্য দেখানো হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট নিয়াজী দেশের সর্বত্র শান্তি আরোপের কথা বলেছেন। ভারতের প্রতি গুডউইল জেসচার হিসেবে আব্বাসকে ছাড়া হয়েছে। আব্বাসকে শারীরিক নিগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

পাকিস্তানের কোণায় কোণায় সেনা নেমেছে। আই এস আই এর বেশ কয়েকজন অফিসারের কোর্টমার্শাল অর্ডার বেরনোয় গোটা দেশে সাড়া পড়ে গেছে। ফারমান আলীকে আটক করা হয়েছে। তাকে তার দেশে পত্রপাঠ ফেরত পাঠানো হচ্ছে। পাকিস্তানী আর্মির একাংশের থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আটক করা হয়েছে। আমেরিকা সহ বিভিন্ন পশ্চিমী দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিয়াজীকে সব রকম সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছে।

আব্বাসকে পাকিস্তানী গেটে আনা মাত্র মিডিয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। পাকিস্তানী আর্মি জেনারেল ভারতীয় সেনার হাতে আব্বাসকে হস্তান্তর করলেন।

আব্বাস গোটা প্রক্রিয়ায় পাথরের মত শক্ত ছিল।

ভারতের মাটিতে পা রাখামাত্র আব্বাস শব্দ করে কেঁদে উঠল। মিডিয়ায় আব্বাসের কান্নার ছবি দেখানো হচ্ছে। পাকিস্তানী গ্যালারিতে অবশ্য ভারত বিরোধী স্লোগান বিন্দুমাত্র কমেনি।

আব্বাস ভারতে প্রবেশ করা মাত্র ভারতীয় পোশাক পরিহিত মানুষটি উঠে দাঁড়ালেন। পাশ থেকে একজন বলল "ও মিয়াঁ, কোথায় যাচ্ছ? এই নৌটঙ্কি রোজ রোজ দেখা যায়? ভারতের কাছে আমাদের প্রেসিডেন্ট এভাবে মাথা নোয়ালো দেখে লজ্জা পাচ্ছ বুঝি?"

সায়ক লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল "হ্যাঁ মিয়াঁ। এ লজ্জা চোখে দেখা যায় না। চলেই যাই"।

লোকটা বিরক্ত গলায় উঠে পড়ে বলল "ঠিকই বলেছো। এ আর চোখে দেখা যায় না। চল মিয়াঁ, আমিও ফিরি। লাহোরেই থাকো তো?"

সায়ক গ্যালারি থেকে নামতে নামতে বলল "হ্যাঁ, লাহোরেই থাকি। তুমি কোথায় থাকো?"

লোকটা বকবক করতে শুরু করল। সায়ক বেরোতে বেরোতে একবার পিছন ফিরে তাকাল। তার দেওয়া কথা সে রাখতে পেরেছে মনে পড়তে তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল।

৮০

দিল্লি অফিস।

তুষারের সামনে আশরফ খান আর বীরেন বসে আছে।

একটু আগেই তারা এসেছে।

তুষার বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "চা খাবে? দার্জিলিং টি আছে। নিজের হাতে বানাবো"।

বীরেন মাথা নাড়ল।

তুষার উঠে বীরেনের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন "বীরেন, আবেগবর্জিত হতে শেখো। আমাদের কাজে আবেগ থাকলে চলবে না"।

আশরফ হাসতে হাসতে বললেন "স্যার আপনি এখান থেকে বলছেন, আমার কথাটা ভাবুন, আমাদের বাচ্চা আমাদের মাথায় রিভলভার রেখে বলছে ইসমাইলকে যেতে দিন"।

বীরেন মাথা নিচু করল।

তুষার বীরেনের সামনের টেবিলে উঠে বসলেন। বললেন "জানো তো বীরেন, কিছু মানুষ ভুল আদর্শের জন্য সারাজীবন বেঁচে থাকেন। তারা সে আদর্শকে এতটাই আঁকড়ে ধরে থাকেন, যে তারা কোনদিন ভাবতেও পারেন না, তাদের আদর্শটা কত ভুল। তুমি ভাবতে পারো বীরেন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি আর্মি যখন বুঝতে পারল যে তারা যুদ্ধটা হেরে যাচ্ছে, তখন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশজন শিক্ষক এবং অসংখ্য ছাত্রকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে মেরেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যেন দেশটা স্বাধীন হবার পর কোন দিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। দেশ চালাতে তো বুদ্ধিজীবিদের দরকার হয়, যদি তারাই না থাকেন, তাহলে আর দেশ চালাবার দরকার কী করে হবে। তোমার বাবার ভেতরে এই ভুল আদর্শটাই ছিল। ভাল মন্দের ভাবনা তার মধ্যে ছিল না। আমাদের লড়াইটা হিন্দু মুসলিমের বিরুদ্ধে নয় বীরেন, আমাদের লড়াইটা এই সমস্ত রকম অশুভ চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে। যারা মানুষের ভাবনার জায়গাগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে শুধু মাত্র হিন্দু এবং মুসলমানে সব কিছুকে ভাগ করে দিতে চায়। আমাদের লড়াইটা শুধুমাত্র দেশের বাইরের শত্রুর সঙ্গে নয়, আমাদের লড়াইটা আমাদের ভেতরের মানুষটার দ্বিধা দ্বন্দ্বের সঙ্গেও। এই লড়াইটা নিরন্তর ভাল মন্দের সঙ্গে চলতে থাকে, ঠিক যেমনটা তোমার চলেছিল তোমার পিতৃপরিচয় এবং দেশের স্বার্থের মধ্যে। আসলে লড়াইটা কিন্তু তা ছিল না। লড়াইটা ছিল তোমার সঠিক

শিক্ষার সঙ্গে সমস্ত রকম ধ্বংসাত্মক চিন্তার মধ্যে। লড়াইটা তুমি জিতে গেছো বীরেন। আর কোন দিন পিছন ফিরে তাকিও না"।

বীরেন বলল "আমায় কি এবার ক্লোজ করা হবে স্যার? আমার সম্পর্কে এত কিছু জানার পরে আপনারা আমাকে কি আর কোন মিশনে পাঠানোর ঝুঁকি নেবেন?"

তুষার বললেন "নাহ। তোমাকে আরও কঠিন দায়িত্বে পাঠানো হবে। তোমার ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, সে কাজে তুমি আমাদের নিরাশ করবে না"।

বীরেন তুষারের দিকে তাকাল।

তুষার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "পাকিস্তান ইন্ডিয়াকে যে ক্রিকেট সিরিজ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল, তা পাকিস্তানে চলা বর্তমান টানাপোড়েনের জন্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট নাকচ করে দিয়েছেন। আমাদের পাকিস্তানে যাবার কথা ছিল, কিন্তু সে ট্যুর ক্যান্সেল হয়েছে। এই মুহূর্তে পাকিস্তানে আমাদের এজেন্ট সায়ক বড়াল আছে। উই হ্যাভ ডিসাইডেড টু সেন্ড ইউ দেয়ার। সায়কের সঙ্গে কাজ কর। অনেক কিছু শিখতে পারবে। তখন আর তোমার মধ্যে কোন রকম টানাপোড়েন থাকবে না। বুঝতে শিখবে, দেশের ওপরে কেন কিছু নেই"।

বীরেনের মুখ হাসিতে ভরে উঠল "থ্যাংক ইউ স্যার"।

তুষারও হাসলেন, "ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আমার স্ত্রী অনেকটা রিকভার করেছেন। তিনি তোমাকে দেখতে চান বীরেন। একবার দেখা করে এসো"।

আশরফ বললেন "স্যার, ম্যাডাম আমাকে দেখতে চান না?"

তুষার জোরে হেসে উঠলেন "অবশ্যই, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের হিরো কে, তা তো বুঝতেই পারছো"।

আশরফ হাসতে হাসতে বললেন "রাইট স্যার। আচ্ছা আমি তবে বীরেনের সঙ্গেই ম্যাডামকে দেখে আসব"।

বীরেনের ফোন বেজে উঠল। বীরেন দেখল বোন ফোন করছে। তুষার বললেন "ধর"।

বীরেন ফোন তুলল "বল"।

ওপাশ থেকে বোনের কান্নার শব্দ ভেসে এল, "দাদা, কাল রাতে বাবাকে কয়েকজন ডেকে নিয়ে গেল, বাবা সেই যে বেরিয়েছে,এখনও ফেরে নি। মা খুব চিন্তা করছে। দেখ না, থানায় একটু ফোন করে"।

বীরেন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "দেখছি রে। রাখ আমি দেখছি"।

ফোনটা কাটল বীরেন।

তুষারকে বলল "স্যার আমার একটাই আর্জি আছে, মুদসসর নওয়াজ খানকে যেন খুব বেশি কষ্ট দেওয়া না হয়, একটা বুলেটেই যেন..." বীরেনের গলা কান্নায় ভিজে এল।

তুষার বীরেনের কাঁধে হাত রেখে বললেন "তোমার কথা রাখা হবে। তুমি বাড়ি যাও। ছেলের যা যা কাজ আছে, সব শেষ করে জয়েন কর। হ্যাঁ, ভদ্রলোককে কবর দিও না, পুড়িও। যে পরিচয়ে বেঁচে ছিলেন, সে পরিচয়েই থাকুন উনি। তোমার মা আর বোন যেন কোন দিন জানতে পারে তিনি কে ছিলেন। উই আর প্রাউড অফ ইউ বীরেন। তোমার দেশ তোমার জন্য গর্বিত। জয় হিন্দ"।

বীরেন মাথা নিচু করে অস্ফূটে বলল "জয় হিন্দ স্যার"।

৮১

মধ্যপ্রাচ্য। এই সময়।

রিয়াজ মানসিক হাসপাতালে আছে এখন।

মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে ওঠে। বার বার দুঃস্বপ্নে আসে ছেলে সোহান আর স্ত্রী আমিনা। তারা হাত নাড়ছে তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে। বোমার আঘাতে ব্যালকনিটা ভেঙে পড়ছে। তলিয়ে যাচ্ছে তার পরিবার। তলিয়ে

যাচ্ছে সর্বস্ব।

একই অ্যাসাইলামে তার সঙ্গেই আছে আরও অসংখ্য রিয়াজ।

ধর্ম ব্যবসায়ীরা এগিয়ে চলেছে পৃথিবীতে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায়ে।

মানবিকতা, মনুষ্যত্ব ধ্বংস হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে।

আমেরিকা সেনা পাঠিয়েছে তাদের শহরে।

বিদ্রোহীরাও বিন্দুমাত্র বসে নেই।

তারাও দ্বিগুণ উৎসাহে এলাকা দখলের লড়াইতে নেমেছে।

কেউ কাউকে রেয়াত করছে না। আজ এর বাড়ি ধ্বসে যাচ্ছে, কাল তার বাড়ি।

এই বিশ্বাসহীনতার পৃথিবীতে আমরা ফিরে যাই পাকিস্তানের এক শহরে।

এক যুবক ধীর পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক দরজার সামনে।

ঠক ঠক করে করছে দরজায় কড়া নাড়ছে।

এক যুবতী দরজা খুলল।

যুবক হেসে বলল "ভাল আছো?"

যুবতী যুবককে দেখা মাত্র চমকে ভিতরের ঘরের দিকে তাকাল সভয়ে।

বলল "বাবা আছে তো"।

যুবক হাত ধরে যুবতীকে বাইরে নিয়ে এসে বলল "আমাকে বিয়ে করবে মেহের? কথা দিচ্ছি আমি, তোমাকে কোন দিন কষ্ট দেব না, ছেড়ে যাব হয়ত, কিন্তু ঠিক ফিরে আসব। বারে বারে ফিরে আসব তোমার কাছে। তোমার চোখের দিব্যি মেহের। আমি আসবই।"

মেহের যুবকের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল। বলল "তোমাকে বিশ্বাস করি না"।

যুবক মেহেরের হাত ধরে বলল "বিশ্বাস কর না? সত্যি? তাহলে তুমি দরজা খুললে কেন?"

মেহের যুবকের হাত ছাড়িয়ে নিল "ও তো এমনিই খুলি। যাও। তোমাকে চাই না আমার"।

যুবক বলল "তাই? আচ্ছা, তবে চলে যাই বরং"।

মেহের এবার যুবকের হাত শক্ত করে ধরে বলল "না, তুমি কোথাও যাবে না। একদম যাবে না। পুলিশকে দিয়ে ধরিয়ে দেব তখন বুঝবে"।

মেহেরের দু চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল। সায়ক মেহেরের দুচোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল "সংসার পাতবে আমার সঙ্গে? বিশ্বাস করবে আমায়?"

মেহের সায়কের হাত ধরে বলল "করব। কথা দাও, আর কোন দিন ছেড়ে যাবে না"।

সায়ক হাসল। বলল "যাব না। খুশি?"

মেহের বলল "আব্বাজান এসেছে। ওর সামনে আবার বেশি কথা বলতে যেও না। ভালোবাসা দেখাতে হবে না অত"।

সায়ক বলল "আচ্ছা দেখাব না। আব্বাজানের সঙ্গে কথা না বললে বিয়েটা হবে কী করে?"

মেহের দুষ্টু হাসি হেসে বলল "পালিয়ে যেও আমাকে নিয়ে। তোমার মুলুকে। আচ্ছা, কী আছে ওখানে?"

সায়ক বলল "মা আছে আমার। দেখা করবে আমার মায়ের সঙ্গে?"

মেহেরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "হ্যাঁ। করব। তোমার মা আমাকে ভালবাসবেন?"

সায়ক বলল "খুব। কেন বাসবেন না?"

মেহের বলল "আমার দেশ আলাদা যে? ধর্মও আলাদা তো!"

সায়ক বলল "মায়ের কাছে মেয়ের কোন ধর্ম হয় না মেহের। এ পৃথিবীতে একটাই ধর্ম থাকা উচিত, ভালোবাসা, আর সব কিছুর অস্তিত্ব বিপন্ন হোক"।

মেহের সায়কের হাত শক্ত করে ধরল।

বাইরের রাস্তায় প্রতিদিনের মত টহল দিচ্ছে পাকিস্তানী সেনা।
তারাও ক্লান্ত। বাড়ি ফিরতে চায় তারাও।
এ পৃথিবীর প্রতিটা পাখিই একদিন ঘরে ফিরতে চায়।
শত সহস্র যুদ্ধের পরেও...